চূড়ান্ত লড়াই
নসীম হিজাযী

ঐতিহাসিক উপন্যাস

চূড়ান্ত লড়াই

নসীম হিজাযী

অনুবাদ

ফজলুদ্দীন শিবলী

আল-এছহাক প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল : আগষ্ট ২০১৪ইং

ঐতিহাসিক উপন্যাস

চূড়ান্ত লড়াই : মূল : নসীম হিজাযী

অনুবাদ : ফজলুদ্দীন শিবলী

প্রকাশক : তারিক আজাদ চৌধুরী

আল-এছহাক প্রকাশনী, বিশাল বুক
কমপ্লেক্স (দোকান নং-৪৫) ৩৭, নর্থব্রুক
হল রোড বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৩
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
০১৯১৬৭৪৩৫৭৭, ০১৯১৬৭৪৩৫৭৯

বর্ণ বিন্যাস : আল-এছহাক বর্ণসাজ

প্রচ্ছদ : আরিফুর রহমান

মূল্য : ২৮০ (দুইশত আশি) টাকা মাত্র

ISBN-984-837-001-6

ইতিহাসের এক কিংবদন্তী

তিনি– ....

এক দিগ্বিজয়ী বীর, যার তলোয়ার কখনো ঝংকৃত হয়েছে তুর্কিস্তানে, আবার কখনো ঝলসে উঠেছে হিন্দুস্তানের মাটিতে। যার ঘোড়া কখনো জাইহুন, আবার কখনো গঙ্গার পানি পান করেছে।

তিনি– ....

জীবন চলার গৌরবোজ্জ্বল পথে ঐ সব মুসাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের কাফেলা এক স্থানে স্থায়ী না হয়ে দুশমনের সকল বাধার বিন্ধ্যাচল ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যেত দূরে-বহুদূরে।

তিনি– ....

এমন এক ব্যক্তিত্ব, যার ডায়রীতে বিশ্রাম শব্দটি স্থান পায়নি কোন কালে, দেশ জয়ের দুরন্ত নেশায় কেবল ঘোড়া ছুটিয়েছেন দেশ-দেশান্তরে। পাহাড়, সাগর, অরণ্য, মাঠ তাঁর চলার পথে কোনদিন অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। **নাম তাঁর সুলতান মাহমুদ গজনবী।**

চূড়ান্ত লড়াই ———

সেই কালজয়ী ব্যক্তিত্বের কাহিনী, গজনী জলপ্রপাত থেকে জন্ম নেয়া সংহার মূর্তি ধারণকারী শক্তি স্রোত; সমুদ্র বক্ষের মাঝে ফুঁসে ওঠা তর্জন-গর্জন যার সামনে এসে শান্ত হয়ে যেত। যার পাহাড়সম বিশাল ব্যক্তিত্ব চলার পথের তামাম উপল খন্ডকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত।

আসুন! ইতিহাসের কিংবদন্তী সেই মহান দিগ্বিজয়ী বীরের সাথে পরিচিত হই। ঐতিহাসিক উপন্যাসের পাতায় সেই মহান ব্যক্তিত্বের বিশালতা অনুধাবন করি।

আমাদের প্রকাশিত
নসীম হিজাযীর কয়েকটি উপন্যাস

১. রক্তাক্ত ভারত
২. রক্ত নদী পেরিয়ে
৩. চূড়ান্ত লড়াই
৪. লৌহ মানব
৫. মরু সাইমুম
৬. শত বর্ষ পরে
৭. সংস্কৃতির সন্ধানে
৮. হেজায থেকে ইরান
৯. আঁধার রাতের মুসাফির
১০. মুহাম্মদ বিন কাসিম

এনায়েতুল্লাহ আলতামাসের
কয়েকটি উপন্যাস

১. দামেস্কের কারাগারে
২. শেষ আঘাত ১ম খণ্ড
৩. শেষ আঘাত ২য় খণ্ড
৪. শেষ আঘাত ৩য় খণ্ড
৫. সিংহ শাবক

উপমহাদেশের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক সাদিক হুসাইন
সারধানভীর ঐতিহাসিক তুর্কি অভিযানের অমর উপাখ্যান
বাংলা ভাষায় এখন বাজারে

১. বীরদীপ্ত নারী (সাদিক হুসাইন সারধানভী)

লেখকগণের অন্যান্য বই ধারাবাহিকভাবে বের হবে ইনশাআল্লাহ।

চূড়ান্ত লড়াই
প্রথম পর্ব
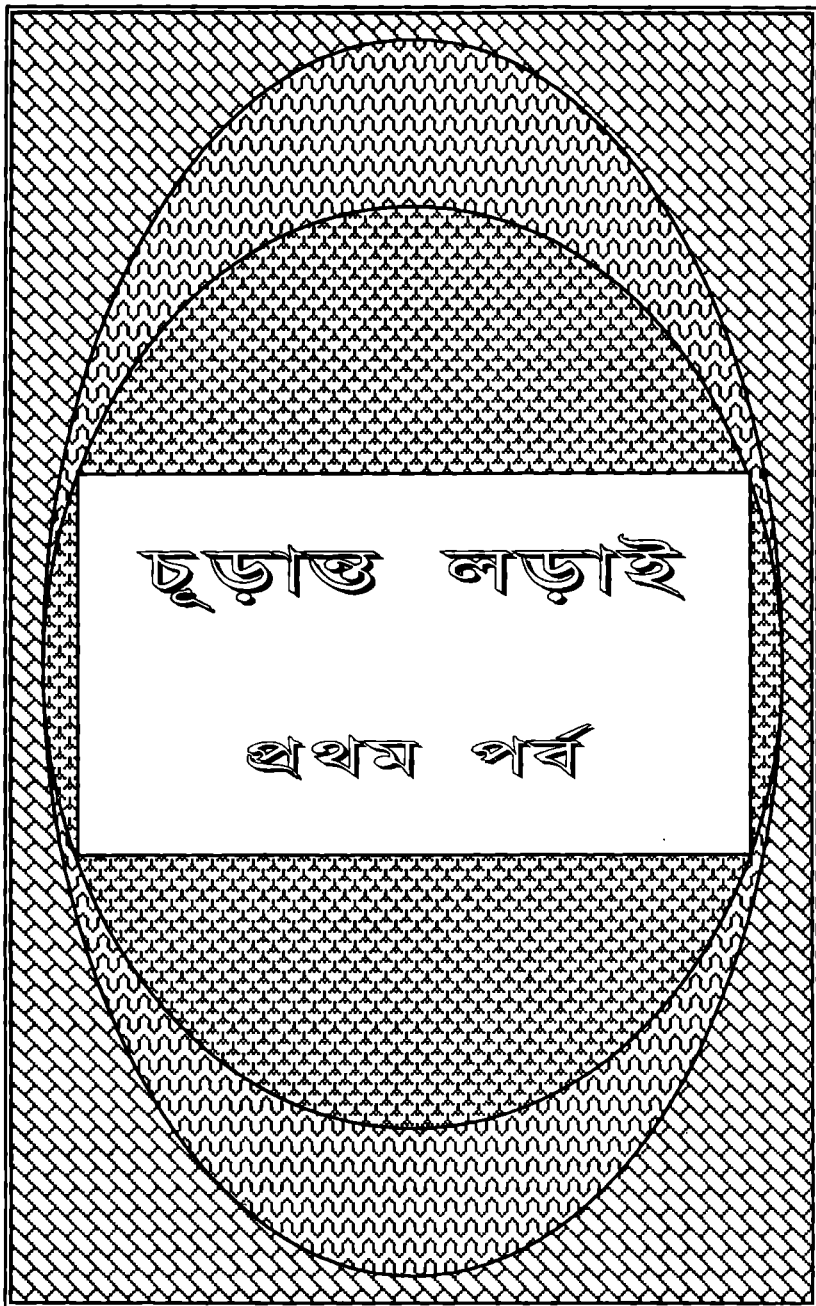
যুগের নকীব

যুদ্ধবন্দী হিসেবে নন্দনার কেল্লায় রণবীরের জিন্দেগীর সকাল-সন্ধ্যা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। বন্দী জীবনের গোড়ার দিকে সে বেশ ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছিল। পলায়ন করার বাসনা তার মনে বাসা বেঁধেছিল। কল্পনার পাখায় ভর করে সে কখনো দক্ষিণ হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজাদের সম্মিলিত হামলা করতে দেখত। স্বপ্নঘোরে দেখত, কারার লৌহ কপাট খুলে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সে গাঙ্গেয় এলাকাস্থিত বাড়িতে পৌঁছে গেছে। ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখত, হায়! কোথায় গঙ্গা? সেতো শুয়ে আছে নন্দনার অন্ধকার কুঠরীতে। কখনো স্বপ্নে দেখত- তার বন্ধুদের নিয়ে খোলা ময়দানে তীরন্দাযী করছে আর তার বাবা মহলের ঝুলন্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুত্রের রণচর্চায় অভিভূত হয়ে মুচকি হাসির রেখা ওষ্ঠ প্রান্তে বিলীন করছেন। তার সহোদরা বোন শকুন্তলা সখীদের সাথে দোলনায় দোল খাচ্ছে। কিন্তু বন্দীজীবনের তিক্ত অনুভূতি তার স্বপ্নের দুনিয়াকে দুমড়ে মুচড়ে দেয়। এক একটি মুহূর্ত তার কাছে বছরের মত দীর্ঘ মনে হয়। সময়ের কাটা যত ঘুরত, ততই তার অসহায়ত্ব বাড়ত, অন্ধকার হয়ে আসত তার সামনে ভবিষ্যত।

রণবীর কনৌজের সর্দার মোহন চাঁদের পুত্র। কনৌজের দরবারে তাঁর বিশেষ পদমর্যাদা ছিল। যৌবনের দিনগুলিতে তিনি রাজ্যপালের ফৌজে একজন অফিসার হিসেবে কাজ করে আসছিলেন। উত্তর সীমান্তে জয়কৃষ্ণ নামী এক জায়গীরদার কনৌজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে রাজ্য পাল তাকে শায়েস্তা করতে প্রেরণ করেন এই মোহন চাঁদকেই। মোহন চাঁদের অকস্মাৎ হামলায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় বিদ্রোহী জয়কৃষ্ণ। উপায়ন্তর না দেখে সে মহাবনের রাজ্যে আশ্রয় নেয়। রাজ্যপাল জয়কৃষ্ণের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করে তা কয়েকজন সর্দারকে ভাগ করে দেন। এ জায়গীরস্থ বেশ কিছু ভূ-সম্পত্তিসহ জয়কৃষ্ণের আলীশান মহলটি পেয়ে যান রণবীরের বাবা মোহন চাঁদ। এ আলীশান মহলে মোহন চাঁদের খুশীর দিন স্থায়ী হয়নি।

বছর তিনেক পর বছরের রণবীর আর শকুন্তলাকে রেখে তার স্ত্রী পরলোক গমণ করেন। এ দু'সন্তানই মোহন চাঁদের আশা-আকাঙ্খা আর সুখ আহলাদের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি রণবীরকে রাজ্য পালের পর সর্ব শ্রদ্ধেয় আর শকুন্তলাকে রাজরানী হিসাবে কল্পনা করতেন।

॥ দুই ॥

ওরা ছিল মুর্খ। ছিল এর উপর ওদের অহমিকা। ওদের ইতিহাস রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের। সামান্য উটের পানি খাওয়াকে কেন্দ্র করে ওদের মাঝে লেগে যেত গোষ্ঠীগত দাঙ্গা। যুগ যুগ ধরে অব্যহত থাকত তা। যাদের বাহুতে জোর ছিল না, জালেমদের যাঁতাকলে পিষ্ট হত তারা। ঠিক এমনি এক সময়ে ইসলাম এলো যুগের নকীব হয়ে। মহান বিধাতা তাঁর রহমত বর্ষণ করতে বেছে নিলেন লতা-পাতা গুল্মহীন এক মরু। উঠে এল জাবালে নূর থেকে এক দিগন্ত প্রসারী আলোর বন্যা। গোষ্ঠীগত দাঙ্গা আর বংশীয় কৌলিন্যকে বগলদাবা করে তা আছড়ে পড়লো গোটা বিশ্বে। খৈ ফোটা তৃষিত মরুতে ইসলাম ছিল এক শান্তিদায়ক মিষ্ট পানির ঝর্ণা, সৃষ্টি জীব তার পিয়াসী। কুহেলিকার ঘোর অমানিশায় মুদিত ছিল পৃথিবীর চোখ, প্রভাতী স্নিগ্ধ আলো নিয়ে ইসলাম এলো তার ঘুম ভাঙ্গাতে। মানবতা মুখে আঁচল দিয়ে কাঁদছিলো অঝোর নয়নে, ইসলামের সাম্য, সৌ-ভ্রাতৃত্ব তার মুখে হাসি ফোটাল। জাহিলিয়াতের দন্ত-নখর কামড়ে ধরেছিলো মানবতার সত্য সুন্দর বিবেক; হেরার দীপ্ত মশালের আলোক রশ্মিতে বিদূরিত হলো তা।

বদর, হুনাইনের যুদ্ধে ইসলামের জয় ছিল মূলতঃ শত কালের জলুম নিপীড়ণ সওয়া ইনসানিয়াতের বিজয়। যে ঐতিহাসিক একদিন দেখেছিল রোম ইরানের শাহী দাপট, আজ দেখলো সে গৃহ যুদ্ধে বিপর্যস্ত জাতির এমন এক দল জানবায যোদ্ধাদের, যারা পট্টি বাঁধছিল মানবতার দগ্ধ ক্ষতে। আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে দুর্ভেদ্য দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল যুগের ফেরাউন। সে দেয়াল একদিন টুটে গেল। প্রতিবেশী রাজন্যবর্গরা দেখলেন, ইসলাম মরুচারী বেদুঈনদের দুশমন রূপে নয় বরং দোস্ত ও মোহাফেজ হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং যারা বংশীয় গৌরব আর জাতীয়তাবোধের অন্ধ অহমিকার দরুন একদিন ইসলামের পথে কন্টক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এক্ষণে তারা হেলাল ও কুফরের লড়াইতে আরবদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল।

খোলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগ ছিল ইসলামী শাসন ব্যবস্থার এক সুমহান আদর্শিক রূপরেখা। কিন্তু পরবর্তীতে খেলাফতের স্থলে যখন রাজতন্ত্র জেঁকে বসল, শুরু হল তখন থেকে ইসলামের বিপর্যয়। রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোতে ইসলাম হারালো তার কালজয়ী ঐতিহ্য। সত্যি বলতে কি, এমনও যুগ ছিল, খলিফা ছিলেন সে যুগে ইসলাম বৈরীদের অন্যতম। অবশ্য সে যুগে এমনও খলিফা দু'চারজন অতিবাহিত হয়েছেন, যারা ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শ মহিমায় মহিমান্বিত। হিজরী প্রথম শতাব্দীর মুসলমানরা যে উদারতা, সহিষ্ণুতা ও চরিত্র মাধুরীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, তা দেখে সবক হাসিল করেছিল পাশ্চাত্যের শেতাঙ্গ কাফেলার

সহযাত্রী ও সিপাহসালাররা। ওরা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যেত, যে কানন কুঞ্জের মালি এতটা উদার সর্বস্ব, না জানি তার পুষ্পকলি কতটা সৌরভসিগ্ধ! মুসলিম সাধারণ্যের অন্তরে যুগ যুগান্তরে ঐ আহামরি যুগের ঈর্ষণীয় তড়পানি পয়দা হয়েছে। তারা যদি অমন কোন দিশারী পেয়ে যেত, তাহলে তাদের দিগ্বিজয়ী অশ্ব আবারো প্রাচী-প্রতিচীর শহরে টহল দিতে পারত। ঝংকৃত হত তাদের আজানের স্বর্গীয় সুর লহরী ভিসুভিয়াসের পাষাণ গাত্রে। উড়ত পত্ পত্ করে স্পেনের সবুজ চত্বরে ভাগ্যের চমকদার পতাকা।

॥ তিন ॥

উমাইয়াদের পতন শেষে হুকুমতের লাগাম যখন আব্বাসীয়দের হাতে এল, তখন রাজতন্ত্রের অশুভ প্রতিক্রিয়ার সাথে সাথে অনারবী বর্বরতাও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোতে ঢুকে পড়ল। নতুন উদ্যমে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো স্বজনপ্রীতি আর জাতীয়তাবোধের উগ্রতা। আলমে ইসলাম এতদিন যে মহান ধর্মীয় সম্পর্কের দরুন একই বৃন্তের ফলস্বরূপ ছিলো, খসে পড়তে লাগলো এক এক করে তা। হাতছাড়া হয়ে গেল শত শত করদ রাজ্য, যা জয় করতে বুকের তাজা খুন নজরানা দিয়েছিল আত্মাভিমানী জাতির সন্তানরা। এক ঘরে হয়ে পড়লো আব্বাসীয় সাম্রাজ্য।

১৩৮ হিজরীতে আব্দুর রহমান আদ-দাখেল স্পেনে উমাইয়াদের স্বাধীন সালতানাতের গোড়াপত্তন করলেন। এর কিছুদিন পর আলাবী খান্দানের ইদ্রীস নামী এক শাসক মরক্কোতে স্বায়ত্তশাসনের অভ্যুদয় ঘটান। সম্ভবতঃ ঐ বছরই তিউনিস আব্বাসীয়দের হাতছাড়া হয়ে যায়। তৃতীয় শতকে মুহাম্মদ ইবনে জিয়াদ এ দেশটিতে পরোপুরি স্বায়ত্বশাসন কায়েম করেন। এ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে মিশরের গভর্ণর আহমদ ইবনে তূলূন আববাসীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে মিসরও হাতছাড়া হয় তাদের। ৩৫৮ হিজরীতে মিসরে ফাতেমী হুকুমত কায়েম হলে কব্জা করেন তারা কয়েক বছরের মধ্যে গোটা শাম দেশ।

বিপর্যয়ের এ যুগে পারস্য, খোরাসান ও উত্তর আরব দেশসমূহে নামমাত্র আব্বাসীয়দের শাসন ছিল। এ রাষ্ট্রগুলোকে তারা উত্তরাধিকার হিসাবে কয়েক খান্দানে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। আব্বাসীয়দের উত্থানকালে ক্ষমতার মসনদে আরবদের স্থলে ইরানীদের প্রভাব বেশী ছিল। কিন্তু পতন যুগে ইরানীদের স্থান দখল করে নিয়েছিল তুর্কীরা।

চতুর্থ শতাব্দীতে প্রতিটি রাজ্যেই স্বায়ত্বশাসন শুরু হয়। ক্ষমতার লালসায় নতুন নতুন নীল ভ্রমরের অভ্যুদয় ঘটে রাজনীতির মঞ্চ-ময়দানে। আববাসীয়রা খেল তামাশার বস্তু হয়ে নিজেদের পতন দেখত। তাদের পতন শুরু হলে গোলামী

চুক্তি করে মসনদ আঁকড়ে রাখতে চেষ্টা করত। রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোতে চলত গোলাম-মনিবের ক্রীড়া- কৌতুক।

খলিফা মামুনুর রশিদের যুগে সাসানী সাম্রাজ্যের উত্থান কাল শুরু হয়েছিল। দেখতে দেখতে এ নতুন শক্তি একদিন পরাশক্তিতে পরিণত হয়ে খোরাসান থেকে নিয়ে সিজার, খারযাম ও তিবরিস্তানের বিশাল এলাকা কব্জা করে নিল। আব্বাসীয় খলিফাদের পূর্বসুরীদের যারা সাসানীদেরকে কৃপা স্বরূপ খেরাসানের প্রাসাদ দান করেছিল, তারা আজ মুরুব্বী ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নয় বরং ওদের করুণার পাত্র হয়ে কালাতিপাত করতে শুরু করল। ৪র্থ শতকের শেষের দিকে আব্বাসীয়দের পতন ঘটলে সাসানীরা মুসলিম জাহানকে গ্রাস করে নিল, আর আব্বাসীয়রা নিক্ষিপ্ত হল ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। পরবর্তীতে তাদের মাঝেও শুরু হল কোন্দল। ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল ওদের স্বপ্নপুরী। কিন্তু গজনীর হিমেল উপত্যকায় সেদিন এমন এক বিশাল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটল, যার সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল ভাগ্যান্বেষীদের উৎসাহ। যে বনে একদিন ভেড়া ও শিয়ালে চিৎকার দিত, এক ব্যাঘ্রের হুংকারে সে বন এখন প্রকম্পিত হতে লাগল।

মাহমুদ গজনবীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল সমুদ্রের মাঝে ফুঁসে উঠা ঐ উত্তাল তরঙ্গের মত, পাহাড়সম ঢেউঝুটি যার কাছে এসে চুপসে যেত। তিনি এমন এক বিজয়ী বীর ছিলেন, যার তরবারী কখনও তুর্কিস্তান, আবার কখনো হিন্দুস্তানের রণাঙ্গনে ঝংকার তুলেছে। যার ঘোড়া কখনো জাইহুন, আবার কখনো গঙ্গার পানি পান করেছে। তিনি এমন এক জীবন্ত সৈনিক ছিলেন, যার অভিধানে বিশ্রাম শব্দটি ছিল না। পাহাড়-সাগর, অরণ্য-মাঠ তাঁর গতি কখনো রুদ্ধ করতে পারেনি।

সুলতান আলপাতগীনের কালে গজনীর খ্যাতি তেমন একটা ছিল না। কিন্তু মাহমুদ গজনীর ক্রমবর্দ্ধমান বিজয়ের দরুন তা মধ্য এশিয়ার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল। তাঁর বিজয়ের ফিরিস্তিতে ছিলো সিস্তান, মাকরান, তিবরিস্তান, আজারবাইজান ও খারজামের নাম। রজতাবৃত উত্তর মেরু বিজয়কে কেন্দ্র করে ইতিহাস তাঁকে এক দিগ্বিজয়ী বীর হিসাবে তাবৎকালের মানুষের কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেও বক্ষ্যমান পুস্তকে আমরা মাহমুদ গজনীর ঐসব কাহিনী বর্ণনা করব, যার জন্ম দিয়েছিলেন তিনি হিন্দুস্তানের মাটিতে।

দেশ জয়ের নেশা এ ক্ষণজন্মা মানুষটিকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, তিনি বিজয়ী ঝান্ডা উড্ডীন করাকে জীবনের ব্রত বানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুস্তানে কুদরত বুঝি তাঁকে আরো কোন মহান অভিপ্রায়ে নির্বাচিত করেছিলেন। বৃক্ষচ্যুত শুষ্ক পুষ্পটির নিরস পাপড়িগুলো ঝেড়ে সেখানে বাসন্তি ছোঁয়ায় সুবাসিত ফুলকলি বসানোর মহান দায়িত্ব দিয়ে কুদরত তাকে পাঠিয়েছিলেন শতধাবিচ্ছিন্ন

তেত্রিশ কোটি দেবতাপোসনার তামসী ছায়ায় সমাদৃত ভারত ভূমিতে। পাহাড়ের গা বেয়ে আসা জল প্রপাতকে স্তব্ধ করে দেয়ার কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তাঁর স্কন্ধে।

প্রাচীন কাল ধরে ভারত বর্ষে 'পৌত্তলিক দর্শন' চর্চা হয়ে আসছিল, যার নিষ্ঠুর ছোঁয়া মানুষের মাঝে জাত-পাত ভেদ ও অচ্ছুৎ– অস্পৃশ্য সমাজের জন্ম দিয়েছিল। মধ্য এশিয়া থেকে আগত আর্য সমাজ ভারত বর্ষে প্রবেশ করে তাদের স্থায়ী ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছিল। দখল করেছিল সুদৃশ্য শ্যমলিমাময় চারণ ক্ষেত, ফসলা জমি ও ফলদার বাগ-বাগিচা। অবশ্য আর্য সমাজ উপজাতিদের দখলকৃত জনপদে বিজয়ী ঝান্ডা প্রোথিত করতে পারেনি। বাদ বাকী তামাম জনপদ ঢুকে গিয়েছিল ওদের খাই খাই উদরে। পড়িয়ে দিয়েছিল বিজয়ী জাতির গলে গোলামীর সুকঠিন জিঞ্জির। বানিয়ে রেখেছিল ধর্মের নামে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ। জন্ম দিয়েছিল এমন একটি পৌত্তলিক সমাজ, দেবতাগণ ছিলেন যার শাসনকর্তা। এ সমাজের সম্মানের পাত্র ছিল ব্রাহ্মণ জাতি আর সর্বধিকৃত ছিল শুদ্ররা। উঁচু সমাজের হিন্দুদের জঘন্য কর্মকান্ড যেমনিভাবে তাদের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাকে এতটুকু কলংকিত করতে পারেনি, তেমনিভাবে চরিত্র মাধুর্যতায় মহান হওয়া সত্ত্বেও শুদ্রজাতি পায়নি সামাজিক মর্যাদা।

নিম্নশ্রেণীর একজন শুদ্রকে মানুষ ভাবলে উচ্চশ্রেণীর যে কাউকে ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করত তদানীন্তন হিন্দু সমাজ। অচ্ছ্যুৎ– অস্পৃশ্যতার যে দুর্ভেদ্য দেয়াল সেদিন গড়ে উঠেছিল পৌত্তলিক সমাজে, তা ভেদ করা কল্পনাতীত ছিল। হিন্দুদের আদি মানব 'মনুর আদর্শ' মানবতার সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের কবর রচনা করেছিল সেদিন। তার আদর্শে মানবতার মুক্তি কল্যাণ ও উদারতার নাম গন্ধ ছিলনা; ছিল জাত-পাত ভেদের জিঘাংসু বেদী বানিয়ে মানুষকে গলা টিপে মারার সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র। উচ্চ শ্রেণীর বর্ণ হিন্দুদের সাফাই গাওয়ায় মুখপাত্র হিসাবে 'মনু চিন্তাধারা' সেদিন ওকালতি করেছিল। শুদ্রদেরকে সমাজের ঘৃণিত কীট সাব্যস্ত করে তাদের পৈত্রিক ও ভূ-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে জঙ্গলে তাড়িযে দিত পৈতাধারী ব্রাহ্মণরা। লোকালয় হতে শুদ্রজাতিকে তাড়িয়ে দিতে ওদের তরবারী উঠানো লাগত না, বরং তরবারীরচে' কার্যকরী ভূমিকা রাখত কথিত দেবমূর্তির কাল্পনিক শক্তির ভয়। এ সব মূর্তি যেসব এলাকায় স্থাপন করা হতো, সে এলাকায় শুদ্রশ্রেণীর মত নিম্নজাত বসবাস করতে পারত না। যে কূয়া থেকে মূর্তির শিষ্যরা পানি তুলত, তা এমন বরকতময় হয়ে যেত যে, সেখানে শুদ্রদের প্রবেশ জেনেশুনে মৃত্যুকে হাতছানি দেয়ার নামান্তর ছিল। যে মন্দিরে ভজন গীত চলত, মন্দিরের সে প্রবেশ পথে লেখা থাকত 'শুদ্র প্রবেশ নিষিদ্ধ'। শিষ্যরা সংস্কৃত ভাষায় মূর্তিদের সাথে কথা বলত।

শুদ্ররা এ পবিত্র ভাষায় একটি কথা বলতেই তাদের কানে ঢেলে দেয়া হত গলিত সীসা। অচ্ছ্যুৎদের সাথে কথা বললে কিংবা তাদের গাত্র স্পর্শ করলে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ধর্মকর্ম বৃথা যেত। পরিস্থিতি বাধ্য করত নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘরবাড়ী ছাড়তে। জুলুম নিপীড়নের এ নজির তাবৎকালের কোন ধর্মে মেলা মুশকিল। একজন শুদ্র কেবল ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতেই ধিকৃত ও ঘৃণার পাত্র ছিল না বরং খোদ নিজের কাছেও সে অবজ্ঞার পাত্র বলে বিবেচিত হত। অবশ্য শুদ্ররা দুশমন হবার স্থলে ধিকৃত ও অস্পৃশ্য হওয়ায় ভগবানকে ধন্যবাদ জানাত। ব্রাহ্মণদের পেশীশক্তির ভয়ে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা সর্বদা শংকিত থাকত। ওরা দূর-দূরান্ত হতে উচ্চ বাবুদের প্রণাম ঠুকত। মন্দিরের বেশ দূর থেকে দেবতার নামে ভজন দিত।

যে উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ সমাজ মনুর চিন্তা ধারাকে সমাজে প্রচলন করেছিল, তা প্রতিফলিত হল একে একে। চিরদিনের তরে উঠে গেল মজলুম মানুষের হৃদয় থেকে হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের আশা।

জাত-পাত ভেদের বিভাজন স্রেফ এতটুক ছিলনা বরং খোদ উঁচু স্তরের হিন্দুদের মধ্যেও একটা বিভাজন ছিল। ব্রাহ্মণরা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য সকলে তাদেরকে সমীহ করে চলত। তারা ছিল ধর্মের ঠিকাদার। দেবতাদের ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে সাথে সমপর্যায়ের ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র বলে তারা পরিগণিত হত। ক্ষত্রিয়রা ছিল হিন্দু ধর্মের সেপাই। নিজেদের কর্মকান্ড কিছুটা শিথিল করার স্বার্থে এদের কিছুটা অধিকার দিতেন ব্রাহ্মণ বাবুরা। তলোয়ারের জোরে ক্ষত্রিয়রা রাজ্য জয় করলেও প্রশাসনিক অবকাঠামোর শিরোমণি থাকতেন হিন্দু ব্রাহ্মণগণ। তাই ব্রাহ্মণদের পর শ্রেষ্ঠত্বের আসনটি নির্দিষ্ট থাকত ক্ষত্রিয়দের জন্যই। দেশের মুটে মজুরদের 'বৈশ্য' বলা হত। এদের স্থান ছিল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের পরে। এদের কলজের খুন আর ঘামঝরা শ্রম দিয়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা নির্মাণ করা হত ক্ষত্রিয়দের মহল আর ধর্ম ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের মন্দির। এতদসত্ত্বেও ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন অজুহাতে ট্যাক্স আদায় করত। শ্রমজীবি বৈশ্য সম্প্রদায় যেমনটি ক্ষত্রিয় প্রশাসন ও ব্রাহ্মণদের ট্যাক্স দিত, ঠিক তেমনটি ক্ষত্রিয় প্রশাসকদের মোটা অংকের একটা চাঁদা দিতে হত ব্রাহ্মণদেরকে। একই রাজ্যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের চাঁদা দিতে দিতে শ্রমজীবি হিন্দুদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলেও উষ্মা প্রকাশ কিংবা অভিযোগ করার কোনই অধিকার ছিল না।

ভারতবর্ষে নিম্নশ্রেণী যখন শতাব্দীকাল ধরে উচ্চশ্রেণী কর্তৃক নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত হয়ে আসছিল, ঠিক তখন বৌদ্ধ ধর্ম এল বর্ণ হিন্দুদের জন্য বিরাট এক চ্যালেঞ্জ হয়ে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কিছুদিনের মধ্যে সুউচ্চ ইমারতগুলো দখল করে নিল, যা ছিল ব্রাহ্মণদের প্রমোদ ভবন। কিন্তু আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া

বৌদ্ধদের উত্থানে যেদিন ভাটা পড়লো সেদিন নেমে এলো তাদের উপর 'মনু আদর্শ' অনুসারীদের পৈশাচিক প্রতিশোধ লীলা। বৌদ্ধ ধর্ম মানুষকে ভালো মন্দের কষ্টি পাথরে যাচাই করতে চেয়েছিল, জাত-পাত ভেদের শ্লোগানবাজদের জন্য যা ছিল প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল।

সুতরাং হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে উঠে এলো প্রতিশোধের এমন এক তলোয়ার, যা ঐ তলোয়ারের চেয়ে শত গুণে বেশী ধারাল ছিল, যা দিয়ে তারা একদিন ঝাল মিটাত শূদ্রদের উপর।

জনতার কর্মকান্ড ও পূজা-অর্চনার কষ্টি পাথরে দেব-শিষ্যদের কর্মকান্ড পরখ করতে যে ধর্ম স্বীকৃতি দিত, সে ধর্মের ঠাঁই অন্ততঃ সেদিনের পৌত্তলিক সমাজে ছিল না। উচ্চ হিন্দু বাবুদের আকাশ ছোঁয়া সম্ভ্রমে আঘাত না হানে, এমন ধর্মনীতি প্রয়োগের স্বীকৃতি দিলে বৌদ্ধরা বাহ্‌বা পেত।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম হিজরী প্রথম শতকে লসবেলা থেকে মুলতান পর্যন্ত জয় করলে ভারতবর্ষের ধর্মীয় অনুভূতিতে এক ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ইবনে কাসিমের যুগ খোলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণালী যুগ না হলেও ঐ যুগের বৈশিষ্ট্যের ছাপ বিদ্যমান ছিল। যারা একদিন মুসলমানদেরকে দুশমন ভেবে তাদের অগ্রযাত্রায় বাঁধার দেয়াল হয়ে দাঁড়াত, তাদের সিংহভাগই ইসলামের কালজয়ী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম প্রচারে নিমগ্ন হল। ১৭ বছরের মুসলিম সেনাপতির অশ্রুতপূর্ব বিজয় কৃতিত্ব ভারতবর্ষের জাত-পাত ভেদের উপর চরম আঘাত হেনেছিল। কিন্তু তার অকাল মৃত্যুতে সে স্রোতধারা স্তব্ধ হয়ে যায়। আটকে যায় তার বিজয় গতির সয়লাব মুলতানে এসে।

উমাইয়াদের যুগে সিন্ধুর সাথে আরবদের কূটনৈতিক সম্পর্ক তেমন একটা উষ্ণ ছিল না। কিন্তু আব্বাসীয়দের শাসনকালে যতটুকু যা ছিল তা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আব্বাসীয়দের উদাসীনতার দরুন সিন্ধু প্রদেশটি বেশ দাম্ভিক হয়ে উঠল। নানাবিধ জুলুম ও নিপীড়নের আখড়া হিসাবে খ্যাতি লাভ করলো হিন্দু শাসিত এ প্রদেশটি। সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী চরমপন্থীদের যে দলগুলো আব্বাসীয়দের কচুকাটা করার অঙ্গীকার করেছিল, তারা এসে জমায়েত হল সিন্ধুতে। সিন্ধুতে বেশ পূর্বেই অনারবী চিন্তাধারা ও হিন্দুয়ানী ধ্যান-ধারণার খপ্পরে পড়ে ইসলাম বিকৃত হয়েছিল। যেটুকু অক্ষত ছিল- তা এই নয়া বেদাতীদের হস্তক্ষেপে পরিপূর্ণ রূপে বিকৃত হয়ে গেল।

হিজরী চতুর্থ শতকের শেষের দিকে গজনী উপত্যকায় যে তুফান উছলে উঠেছিল, শতাব্দীকাল ধরে নির্যাতিত মানবতা তার দিকে চেয়েছিল অধীর আগ্রহে।

॥ চার ॥

বিন্ধ্য সাম্রাজ্যের হিন্দু শাসকদের সাথে সর্বপ্রথম যুদ্ধ হয়েছিল সুলতান মাহমুদ গজনবীর পিতা সবুক্তগীনের আমলে। রাজা জয় পালের যুগে এ সাম্রাজ্য লমগান থেকে চেনাব নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। রাজা জয়পাল তার ফৌজি শক্তির উপর এতই আস্থাশীল ছিল যে, সবুক্তগীনের উত্তর সীমান্তে হামলার জবাবে সীমাহীন প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে সে সরাসরি গজনীতে হামলার সিদ্ধান্ত নিল। একদিন সে পূর্ণ শক্তিতে গজনীর উপর চড়াও হল। সবুক্তগীন লমগান ও গজনীর মধ্যবর্তী জনপদে হামলাবাজ হিন্দু সৈন্যের মোকবেলা করেন। হিন্দুরা বীর বিক্রমেই যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু মুসলিম বাহিনীর ক্রমবর্দ্ধমান হামলা আর অকস্মাৎ তুষারপাতের দরুন ওদের বায়ু ঢিল হয়ে গেল। জয়পাল সীমান্তের কিছু বস্তি ও একটি কেল্লাসহ বার্ষিক একটা হারে ট্যাক্স দেয়ার শর্তে সন্ধি করেছিল। কিন্তু ধূর্ত রাজা সীমান্ত পার হয়েই সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে সবুক্তগীনের ট্যাক্স আদায়কারী অফিসারদের কয়েদ করে ফেলল।

এদিকে সবুক্তগীন এ খবর শুনেই প্রতিশোধবশতঃ জয়পালের সীমান্তবর্তী বেশ কিছু এলাকা দখল করে নেন। জয়পাল হিন্দুস্তানের কয়েকজন রাজার কাছে সৈন্য চেয়ে প্রায় এক লাখ সৈন্যের এক বিশাল বহর নিয়ে পুনরায় গজনীর উপর চড়াও হয়। কিন্তু হাতে গোনা কিছু সৈন্য নিয়ে সবুক্তগীন পেশোয়ার ও লমগানের মধ্যবর্তী এলাকায় জয়পালকে শোচনীয়ভাবে পরাভূত করেন।

মাহমুদ পিতার সাথে এসব যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি আন্দাজ করেছিলেন- গজনী ও হিন্দুস্তানের মাঝে চূড়ান্ত লড়াইয়ের এখনও ঢের বাকী। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, প্রতিটি যুদ্ধেই জয়পালের সৈন্য সংখ্যা পূর্বের চেয়ে বাড়ছে। আর এভাবে প্রতিনিয়ত সৈন্য বাড়লে গজনীর সামান্য ক'জন সৈন্যকে পিপীলিকা বহরের মত বিশাল ফৌজের সাথে লড়াই করতে হবে। সে ক্ষেত্রে একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে গজনীর প্রতিরোধ শক্তি। হিন্দুস্তানে বিশাল সৈন্য বহর রয়েছে, গজনীর পাহাড় আর চেনাব নদী ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না কিছুতেই। সুতরাং মাহমুদ প্রতিরক্ষা শক্তি মজবুত কল্পে বিভীষিকাময় হিন্দু সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেন। কেননা, পঙ্গপালের মত সৈন্যদের ঐক্য ও সংহতি শুধু গজনীর নয় বরং উত্তর-পশ্চিমের তামাম মুলকগুলোর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

হিন্দুস্তানে বিন্ধ্যের সমতুল্য আরো কয়েকটি সালতানাৎ ছিল। মাহমুদ বিন্ধ্যের শক্তি খর্ব করতে বছরে কমপক্ষে একবার হলেও কোন না কোন সালতানাতের সাথে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সবুক্তগীনের ওফাতের পর মাহমুদ মসনদে বসেই হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে হামলা জোরদার করেন। ৩৯০ হিজরীতে মাহমুদ গজনবী লমগণ সংলগ্ন জয়পালের এলাকাগুলো দখল করেন। পরবর্তী বছর জয়পাল ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য, বার হাজার সওয়ার ও তিনশ' হাতি নিয়ে মাহমুদের মাত্র পনের হাজার সৈন্যের মোকাবেলায় গজনীর দিকে অগ্রসর হল। ৩৯২ হিজরী মোতাবেক ১৮ই মুহাররম পেশোয়ারের নিকটে এক রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হয়। দুপুরের দিকে তীর কামানের অনবরত আক্রমণে জয়পালের সৈন্য শিবিরে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুরা পাঁচ হাজার লাশের স্তুপ মাড়িয়ে পিছপা হয়। বন্দী হয় জয়পাল তার পনের জন নাতি-পুত্রসহ। আড়াই লাখ দীনার আর পঞ্চাশটি হাতির বিনিময়ে তাদের মুক্তি দেয়া হয়।

জয়পাল অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে ক্ষোভে দুঃখে আত্মহত্যা করে। তার স্থলে ক্ষমতায় আসে তদ্বীয় পুত্র আনন্দ পাল। সুলতান মাহমুদের সাথে আপাততঃ মৈত্রী চুক্তি করে পিতার মৃত্যুশোক সামাল দিতে প্রয়াসী হল বিন্ধ্যের এই নয়া শাসক।

মাহমুদ গজনবীর ক্রমবর্দ্ধমান বিজয় হিন্দু সমাজে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এ আকস্মিক বিজয় ইসলাম প্রচারে বিশেষ সহায়ক হতে পারে ভেবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা উৎকণ্ঠিত হল। জাত-পাত ভেদের সৌধচূড়া ভেঙ্গে তামাম ইনসানকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধকারী ধর্ম- ইসলাম পৌত্তলিক সন্তানদের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়াল। টনক নড়ল ব্রাহ্মণদের। তারা গোটা হিন্দুস্তানের রাজপুতদের জমা করে পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করল। হিন্দুদের শক্তিশালী অঞ্চলগুলোর মধ্যে ছিল গঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও বরেন্দ্র জনপদ।

জয়পালের শোচনীয় পরাজয়ের দরুন এসব জনপদে প্রতিশোধের একটা আগুন যে জ্বলে উঠতে যাচ্ছে-সুলতান মাহমুদের তা অজানা ছিল না। তিনি ভীতিকর সালতানাৎগুলোর সাথে টক্কর দেয়ার পর ভাতিন্ডা সালতানাতের দিকে মনোনিবেশ করেন।

৩৯৫ হিজরীতে সুলতান মাহমুদ সিন্ধু নদ পাড়ি দিয়ে ভাতিন্ডার দিকে অগ্রসর করেন। ভাতিন্ডার দাম্ভিক রাজা বাজী রায় সৈন্যাধিক্যে অগাধ আস্থাশীল হয়ে কেল্লায় থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ না করে মুসলিমদের সাথে সম্মুখ সমরে নামেন। একাধারে তিনদিন পর্যন্ত লড়াই হল। জয়-পরাজয় নির্ধারিত হল না এই তিন দিনে। যুদ্ধ চলাকালীন নতুন ফৌজ এসে যোগ দিল হিন্দুদের সাথে। মাহমুদ গজনবী পূর্বে এমন শৌর্য বীর্যের সাথে পৌত্তলিকদের লড়াই করতে দেখেননি। চতুর্থ দিনে বাজী রায়ের সৈন্যরা মুসলমানদের পিছু হটতে বাধ্য করল। কিন্তু

সুলতান মাহমুদ মুসলিম সৈন্যদের সম্ভ্রমবোধহীনতার প্রতি ধিক্কার দিয়ে নিজেই ঘোড়া ছুটিয়ে দুশমনের অগ্রবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। জানবায সৈনিকরা সালারের এহেন দুঃসাহসিক হামলায় নতুন জীবন ফিরে পায়। মাহমুদের ঘোড়া যেদিকে রোখ করত সেদিকেই লাশের স্তুপ জমা হয়ে যেত। ডান-বাম ও মধ্যবর্তী সৈনিকরা বীর বিক্রমে লড়াই শুরু করেন।

যারা এতোক্ষণ বিজয়ের স্বপ্ন দেখছিল, তাদের সে স্বপ্নসাধ ধুলোয় মিলিয়ে দেন আত্মাভিমানী সুলতান।

সূর্যাস্তের পূর্বেই বাজী রায় রণাঙ্গন ছেড়ে কেল্লায় আশ্রয় নেয়। ভাতিন্ডার কেল্লার চারপাশে গভীর খাদ ছিল। হামলাকারীদের পক্ষে সহজে তা অতিক্রম করে কেল্লার উপর চড়াও হওয়া সম্ভব ছিল না। মাহমুদ গাছ কেটে, পাথর ফেলে পরিখা ভরাট করতে নির্দেশ দেন। মুসলিম সৈনিকদের পরিখা ভরাট করতে দেখে ভয়াকাতুরে বাজী রায় রাত্রীর আঁধারে কেল্লা ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু পথিমধ্যে সুলতান মাহমুদের সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে হাতিয়ার সমর্পন না করে আত্মহত্যা করে বসে।

ভাতিন্ডার কেল্লা জয় করে মাহমুদ আরো বেশ কয়েকটি জায়গীর জয় করেন। অতঃপর তিনি গজনীর উদ্দেশ্যে মুলতান ত্যাগ করেন। কারামতিয়া প্রশাসক আবুল ফাতাহ দাউদ মাহমুদের কৃতিগাথা এ বিজয়কে ভালো চোখে দেখছিলেন না। এদিকে সুলতান পথিমধ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পড়ে বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হন। একদিকে সিন্ধু নদের অকস্মাৎ ঢল তার বহু সৈনিকের জীবন কেড়ে নেয়, অপর দিকে আবুল ফাতাহর দুরভিসন্ধি তাকে হুমকীর সম্মুখীন করে তোলে। বিপদের পর বিপদ সূতা ছেড়া পুঁতির দানার মত তার উপর নিপতিত হয়।

৩৯৬ হিজরী সনে সুলতান মাহমুদ কারামতিয়া চক্রকে উৎখাত করতে মুলতান অভিমুখী হন কিন্তু আনন্দ পাল গাদ্দারী করে আবুল ফাতাহর সাথে হাত মেলায়। ধূর্ত আনন্দ পাল তার সীমান্ত দিয়ে মাহমুদকে পেশোয়ার যেতে বাধা দেয়। এমনকি মাহমুদের অগ্রযাত্রা রোধকল্পে সে সৈন্য বহর নিয়ে অগ্রসর হয়। মাহমুদ, রাজা পালকে শোচনীয়ভাবে পরাভূত করে চেনাব নদীর দিকে তাড়িয়ে দেন। আনন্দ পাল তার অবশিষ্ট ফৌজ নিয়ে কাশ্মীরের পাহাড়ী অঞ্চলে গা ঢাকা দেয়। মাহমুদ খামোকা আনন্দ পালের পশ্চাদপসরণ না করে মুলতান পানে রোখ করেন। কিন্তু খোরাসানের 'আলাক খান' বিদ্রোহী হওয়ায় কারামতিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো তার পক্ষে ঐ বছর সম্ভব হয়নি। অবশ্য বছর পাঁচে'ক পর তিনি মুলতান জয় করেছিলেন।

৷৷ পাঁচ ৷৷

মধ্য এশিয়ায় তখন পর্যন্ত সুলতান মাহমুদের পুরোপুরি বিজয় সাধিত হয়নি। মুসলিম রাজন্যবর্গের টুকিটাকি গাদ্দারী আর ঈর্ষাপরায়ণ শাসকদের জন্য তিনি হিন্দুস্তানের হামলা জোরদার করতে পারেননি। তদুপরি তিনি বছরে একবার হলেও হিন্দুস্তানের ছোট ছোট সালতানাৎগুলোর উপর হামলা চালাতেন। প্রতি বছরই তাই তার রাজত্বের সীমা কিছুটা হলেও প্রশস্ত হত। কিন্তু সমস্যার অন্ত নেই। পাহাড় আর নদীমাতৃক ভারত ভূমিতে যুদ্ধ করতে তার ফৌজ পারদর্শী ছিল না। তিনি কখনো সিন্ধু নদ পাড়ি দিয়ে কোন কওমের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গেলে মধ্য এশিয়ার জাইহুনে ততক্ষণে একটা ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। গঙ্গা-যমুনা পাড়ি দিয়ে রাজপুত-রাণাদের বিরুদ্ধে হামলা চালালে ততক্ষণে মাকরান থেকে খারযম পর্যন্ত কোন না কোন এলাকার বিদ্রোহীরা ফুঁসে উঠত। সুতরাং সুলতান মাহমুদ পররাজ্যে হামলা করতে গিয়ে বারবারই পিছপা হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ইতিহাসের সোনালী পাতায় দেশজয়ীদের তালিকায় অনেকের নাম দেখা যায়। কিন্তু এমন দিগ্বীজয়ী বীর খুব কম ছিলেন-যারা জীবনের সিংহভাগ সময় ঘোড়ার পিঠে কাটিয়েছেন। মরমর পাথরের প্রাসাদের চেয়ে রনাঙ্গণ যাদের কাছে প্রিয় ছিল। ফুল বিছানো পালঙ্কের চেয়ে কন্টকময় প্রান্তর অতিক্রম করা ছিল যাদের শখ। গজনী জল প্রপাতে সাঁতার কাটার চেয়ে দূর-বহু দূরের যমুনা নদীতে বিজয়ী অশ্ব নামিয়ে দেয়াকে তিনি ভালবাসতেন। কুদরত এ ক্ষণজন্মা মানুষটির মধ্যে এমন বিস্ময়কর উপাদান জমা করছিলেন, যদ্দরুন তিনি বসে থাকার ফুরসত পাননি জীবনেও। সর্বদা কেবল ঘোড়া ছুটিয়েছেন দেশ-দেশান্তরে।

৷৷ ছয় ৷৷

মুলতানাভিমুখী না হয়ে মাহমুদ খোরাসানের দিকে রোখ করায় রাজা আনন্দ পাল তার সৈন্য বাহিনী ঢেলে সাজানোর সুযোগ পেল। মুসলিমদের হাত থেকে ভারত মাতার ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখার ধুয়া তুলে সে গোটা ভারতবর্ষের রাজপুত- রাণা ও প্রশাসকদের ঐক্যবদ্ধ করে মাহমুদকে অংকুরেই বিনাশ করতে আদা নূন খেয়ে নামল। কিছুদিনের মধ্যে বিশাল এক সৈন্যবহর নিয়ে সে পেশোয়ারাভিমুখী হল। সুলতান মাহমুদ গুপ্তচর মারফত খবর পেয়ে গজনী থেকে বিন্ধ্য সাম্রাজ্যের নিকটে উপনীত হন। এক রক্তক্ষয়ী তুমুল যুদ্ধের পর হিন্দু সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দেয়। সুলতান মাহমুদ কংগ্রো পর্যন্ত তাদের পশ্চাদপসরণ করেন। হিন্দুদের সবচেয়ে সুরক্ষিত কেল্লা নগরকোট অবরোধ করে তাও কব্জা করে নেন তিনি।

এ কেল্লার মাঝে একটি খ্যাতনামা মন্দির ছিল। মন্দিরের শিষ্যরা গোটা ভারত বর্ষের রাজা প্রজাদের থেকে ট্যাক্স উসুল করত। সুলতান মন্দিরে প্রবেশ করে

স্বর্ণ-রৌপ্যের পাহাড় দেখতে পান। ব্রাহ্মণদের এ অঢেল সম্পত্তি ঐসব অগনিত মানুষের ঘাম ঝরা শ্রমের ফসল, যারা দেবতাদের ফুট ফরমাস শোনার জন্য পয়দা হয়েছিল। এ মন্দির থেকে ৭ কোটি রূপী মূল্যের মালামাল আর ৭ হাজার মণ স্বর্ণ-রৌপ্য উদ্ধার করা হয়েছিল। নগর কোটের সম্পত্তির আন্দাজ করা যায় ছোট একটি পরিসংখ্যানে- তাহলো মণি মুক্তা আর অমূল্য রত্নাদির পরিমাণ ছিল ২০ মণের মত।

সুলতান মাহমুদ ফিরে গেলে রাজা আনন্দ পাল নন্দনাকে রাজধানী করে কোহেস্তান এলাকার বেশ কিছু ভূ-সম্পত্তি দখল করে নেয়, কিন্তু হায়াত তার অনুকূল ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই সে মৃত্যুবরণ করল। তার স্থানে তারালোচন পাল ক্ষমতায় আসল। সুলতান মাহমুদ তারালোচন পালকেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে না দিয়ে নন্দনা হামলা করে বসেন। নতুন রাজা তারালোচন পাল সুলতানের অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে স্বীয় পুত্র ভীম পালকে কেল্লার দায়িত্ব দিয়ে কাশ্মীরে ছুটে যান সৈন্য সংগ্রহের আশায়।

সরু গিরি পথের মাঝে হাতির বহর খাড়া করে মাহমুদের অগ্রাভিযান রোধ করতে ভীমপাল বেশ সফল হয়েছিল। মুসলিম ফৌজ দীর্ঘদিন গিরি পথে আটকে থাকে। ইত্যবসরে কাশ্মীর ও অন্যান্য এলাকা হতে তাজাদম ফৌজ ভীমের সাহায্যে এগিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত ভীমপাল প্রতিরক্ষা ব্যূহ তুলে নিয়ে খোলা ময়দানে মুসলিম ফৌজের মোকাবেলায় নেমে পড়ে।

হিন্দু ফৌজের অগ্রে ছিল হাতির প্রাচীর। সুলতান বাহিনীর তুখোড় তীরন্দাজরা হাতির মুখ ফুটো করে দেন। এ সুযোগে মধ্য ও ডান-বামের সৈন্য বহর অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়েন দুশমনের উপর। দুশমনদের রণব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। বাযু ঢিল হয়ে আসে ওদের। ভীম পাল বেগতিক অবস্থা দেখে লাশের স্তূপ মাড়িয়ে পলায়ন করে। এদিকে মাহমুদ নন্দনার কেল্লা অবরোধ করলে কেল্লার মোহাফেযরা রণাঙ্গনে ভীম পালের পরাজয় কাহিনীতে প্রভাবিত হয়ে নিঃশর্তে হাতিয়ার সমর্পণ করে।

নন্দনা বিজয় করে সুলতান মাহমুদ তারালোচন পালের বিরুদ্ধে সৈন্য কোচ করেন। তারালোচন পাল খয়রাতী সৈন্য নিয়ে ঝিলাম নদীর তীরে তাঁবু গেড়েছিল। মাহমুদের ছোট একটি বহরকে পরাজিত করে কাশ্মীরের সিপাহসালার শক্তিদর্পে বিভোর হয়েছিল কিন্তু সুলতানের সাথে সম্মুখ সমরে লড়াই করে তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। অনেক চেষ্টা সাধনার পরও সুলতানের বিজয়কে সে ঠেকাতে পারল না। শোচনীয় পরাজয় বরণ করে তারালোচন পাল পূর্ব পাঞ্জাবের শ্যালক পাহাড়ে আত্মগোপন করল। সুলতান মাহমুদ তারালোচন পালকে কুপোকাতের মাধ্যমে বিন্ধ্য সাম্রাজ্যের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকলেন।

দিন যায় রাত আসে। সময় এগিয়ে চলে তার নিজস্ব গতিতে। দেখতে দেখতে শিশু রণবীর আঠারো বছরের দূরন্ত যুবকে পরিণত হল। বাবার কাছ থেকে সে পেয়েছিল একজন সৈনিক হবার প্রেরণা, শিক্ষা-দীক্ষায় তার ধারে কাছে ঘেষতে পারে এমন নওজোয়ান খুঁজে পাওয়া মুস্কিল ছিল। অল্পদিনে রণবীরের খ্যাতি রাজার কানে পৌছলে তিনি রণবীরকে দেহরক্ষী বাহিনীর অফিসারের পদে নিয়োগ করেন।

সন্তানদের সম্পর্কে মোহন চাঁদের স্বপ্ন যখন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছিল, তখন মাহমুদ গজনবীর পাঞ্জাব বিজয়কে কেন্দ্র করে হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজা, সর্দার ও পন্ডিত মহলে ব্যাপক গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। ধর্ম রক্ষার তাগিদে চিন্তাবিদদের যে দলটি রাজা তারালোচন পালের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন, মোহন চাঁদ ছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম। কনৌজ প্রশাসন অন্যান্য করদ রাজ্যের রাজাদের দেখাদেখি ১ হাজার সৈন্যের একটি দল তারালোচন পালের সাহায্যে প্রেরণ করেন। কনৌজের রাজা এ সৈন্য বহরের সিপাহসালার বানান যুবরাজ রণবীরকে। খোদ মোহন চাঁদও এ যুদ্ধে শরীক হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জ্বরের প্রকোপ তাকে যেতে দেয়নি রণাঙ্গনে।

জীবনের প্রথম সিপাহসালার পদ পেয়ে রণবীর যখন কনৌজ ত্যাগ করছিল, তখন সে সবেমাত্র বিশ বছরের যুবক। রাজ জ্যোতিষি যখন তার হাতগুণে বলছিল যে, 'তুমি নন্দনা বিজয় করে ফিরবে', তখন রণবীরের আত্মবিশ্বাস আকাশচুম্বি হয়ে যায়। সে আত্মগর্বে বলেছিল, 'নন্দনা নয়, আমি গজনী যাচ্ছি'। রণবীরের কথায় এক বুড়ো সেপাই যখন বলেছিল, 'গজনী খুব দূরে' তখন মোহন চাঁদ গোস্বায় কাঁপতে কাঁপতে বলেছিলেন- 'গজনী দূরে নয়। তুমি আত্মসম্ভ্রমবোধহীন।'

কনৌজ ত্যাগের পূর্বে রণবীর বাড়িতে আসলে তার বোন শকুন্তলা দৌড়ে বের হয়। মহলের গাত্রে ঝুলানো তরবারী এনে অকস্মাৎ তা দিয়ে আঙ্গুল কেটে রক্ত বের করে দাদার কপালে রক্ত তিলক এঁটে দিয়ে অশ্রুসজল নয়নে বললো, 'দাদা! দেবতা তোমায় রক্ষা করুক! জলদি ফিরে আসার চেষ্টা করো।'

রণবীর বললো, 'আমি জলদি ফিরে আসব, কিন্তু আমার অভিমানী বোনটি এখনো বলেনি, তার জন্য কি নিয়ে আসব?

'কিছু না, এক বোনের জন্য তার দাদাই হচ্ছে বড় উপহার।' একথার সাথে সাথে শকুন্তলার পটল চেরা চোখ অশ্রুতে টইটুম্বুর হয়ে যায়।

রণবীর খানিকটা নীরব থেকে মহল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

॥ দুই ॥

নন্দনার যুদ্ধে কনৌজ প্রশাসন ব্যতিত দক্ষিণ হিন্দুস্তানের বেশ কিছু রাজপুত-রানারা ভীমপালের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। যার যার সৈন্য বহরের সাথে ধর্মীয় প্রেরণাদানের জন্য এসেছিল রণসংগীত গাওয়া ব্রাহ্মণগণও। তন্মধ্যে বেশ কিছু ব্রাহ্মণ হিন্দুদের মূর্তিও বগলদাবা করে এনেছিল। নন্দনা যুদ্ধোত্তরকালে যে জিনিসটি হিন্দুদের বেশী পীড়া দিয়েছিল, তা ছিল-এত দেবতা উপস্থিত থাকতেও কি করে তারা পরাজয় বরণ করল? নন্দনার রণাঙ্গনে ভীমপাল ও মাহমুদ গজনীর সৈন্যরা যখন তুমুল লড়াই করছিল, তখন ঘন্টা ও কাঁস বাজিয়ে হিন্দু ব্রাহ্মণগণ দেবতাদের মরণ ঘুম ভাঙ্গানোর কোশেশ করছিল। কিন্তু পাষাণ পাথর থেকে বেরিয়ে মুসলিমদের বিজয় ঠেকাতে পারেনি নিস্প্রাণ দেবদেবীরা। যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে ভীম পালের ফৌজের একটা অংশ কেল্লায় আশ্রয় নিয়েছিল, বাদবাকীরা পালিয়ে ছিল পাহাড়ের গুহায়। রাজা-মহারাজাদের কেউ কেউ পুনরায় হামলা করতে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু ভীম পালের কাপুরুষোচিত অন্তর্ধানের দরুন তা আর হয়ে উঠেনি। অবশ্য আত্মঘাতী কিছু ফৌজ হামলা চালিয়েছিল, কিন্তু গজনীর মরণজয়ী মুজাহিদদের ঝড়ো গতির হামলায় খড়কুটোর মতো ভেসে যায় ওদের অগ্রাভিযান। সুলতান একদল ফৌজ নিযুক্ত করলেন আত্মঘাতী হামলাবাজদের পিছু ধাওয়া করার জন্য। অন্যদের নিয়ে ঘেরাও করেন নন্দনার কেল্লা। দুপুরের দিকে মুসলিম ফৌজ একদিকে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল দুশমনদের, অপরদিকে সুলতানের সাথে বাকী সৈন্যরা পুরোপুরি দখল করে রেখেছিল নন্দনার কেল্লা।

রণবীর মারাত্মক যখমী হওয়া সত্বেও ময়দানে বীরদর্পে লড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ময়দান খালি হয়ে গেলে অন্য সৈন্যদের দেখাদেখি একটি পাহাড়ে আত্মগোপনের চেষ্টা করে সেও। রণবীরের স্যাথে ছিল স্রেফ ১৫ জন জানবায যোদ্ধা। বিজয়ী ফৌজরা দুশমনদের দূরে ভাগিয়ে দিচ্ছিল। রণবীর ও তার সাথীরা মুসলিম সৈন্যদের মোকাবিলায় কিছু করতে পারছিল না। তুর্কী ও আফগানের একদল তীরন্দাজ ওদের ঘিরে ফেলল। রণবীরের সঙ্গীরা পাহাড়ের আড়ালে থাকলো তীর ধনুক তাক করে। অস্ত্রসমর্পণ না করে ওরা মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগল।

রণবীর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললো, 'ভায়েরা! এখান থেকে আমাদের বেঁচে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। সূর্য ডুবতে যাচ্ছে, তাই এখন তীর পাথর ছুঁড়লে রাতের আঁধারে আমাদের কেউ কেউ বেঁচে যেতে পারে। আমরা সুবিধামত জায়গায় বসে আছি। এখানে দুশমনদের তীর পৌছুবে না, আর দুশমনরা এতটা নির্বোধ নয় যে, জয়লাভ করার পরও আমাদের মত সামান্য ক'জন সৈন্যকে তাড়া করতে গিয়ে খামোকা তাদের লোকজন হারাবে। তারপর তারা এমনটি করে বসলে রাজপুতগণ

ধর্মবৈরীদের হাতে কয়েদ না হয়ে অন্ততঃ মৃত্যু আলিঙ্গন করতে পারবে। যারা পলায়ন করেছে তাদেরকে কাপুরুষ না বললেও কমপক্ষে বেকুফ বলতে হয়। দুশমনরা আমাদের বায়ু ঢিল হতে দেখে তাজাদম ফৌজ নামিয়ে দিয়েছে। রিজার্ভ ফৌজ না নামালে আমাদের লোকজন হত্যা না হলেও তাদের হাতে বন্দী হত। কিন্তু আহাম্মকরা সব পালিয়ে গেল। হায়! সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওরা যদি আমাদের সাথে থাকত!'

খানিক পর মুসলিম ফৌজ ঘোড়া থেকে নেমে পাথরকে আড়াল করে সাবধানে এগুতে লাগল। রণবীরের সাথীরা পেরেশান হয়ে তাকে লক্ষ্য করে বললো, 'দেবতাগণ বোধহয় আমাদের জিন্দা থাকতে দিবেন না। কিন্তু ওরা আমাদেরকে বীরত্বপূর্ণ মৃত্যু থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। রাজসৈনিকগণ! তোমারা মজবুত হয়ে বস! আমাদের তীরের আওতায় না আসা পর্যন্ত কেউ হামলা করো না।'

আচানক ৫০ গজ দূরত্বের উঁচু টিলা থেকে কেউ পরিষ্কার হিন্দি ভাষায় বুলন্দ আওয়াজে বলে উঠল, 'জান বাঁচাতে চাইলে তোমরা হাতিয়ার সমর্পণ কর!' এ কথার জবাবে সাঁ করে একটা তীর রণবীরের ধনুক থেকে বেড়িয়ে গেল। কিন্তু আচানক হিন্দিভাষী পাথরের নীচে আত্মগোপন করল। অবরোধকারীরা এবার চতুর্দিক থেকে তীর ও পাথর বৃষ্টি শুরু করল। সৈনিকদের প্রায় ২০/৩০ গজ কাছে এসে হিন্দিভাষী আবার বললো, 'তোমরা দেখছি একেবারে গর্দভ! ভেবে দেখ কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে। আমি তোমাদেরকে আবারও বলছি-হাতিয়ার সমর্পণ কর, এবার অবশ্য সে পাথরের আড়াল দিয়েই কথাগুলো ছুঁড়ল। হিন্দি ভাষায় তার সাবলীল বাচনভঙ্গি এ কথার ইঙ্গিত বহন করছিল-সে হয় হিন্দুস্তানী, না হয় জীবনের একটা বিরাট অংশ হিন্দুস্তানে থেকেছে। রণবীর ও তার সাথীদের থেকে কোন প্রকার জওয়াব না পেয়ে সে বলল, 'আমি দৃঢ়তার সাথে বলছি-সূর্যাস্তের পূর্বেই এ টিলা আমরা দখল করবো, আত্মহত্যা তোমাদের প্রলুব্ধ না করলে এখনও সময় আছে- হাতিয়ার ফেলে দাও। আমি তোমাদের জান বাঁচানোর জিম্মা নিচ্ছি। তোমাদের কি ঘরে ফিরবার আশা-আকাঙ্খা নেই?'

রণবীর ও তার সঙ্গীদের জন্য বাক্যগুলো সুখকর হলেও আত্মসম্ভ্রমবোধে আঘাত লাগে দেখে তারা মানতে পারছিল না। জীবনের আশা ছেড়ে দেয়া সাগর বক্ষে ডুবন্ত যাত্রীর খড়কুটো পাবার মত তারা বেঁচে যাবার একটা ক্ষীণ আশার ঝলক দেখতে পেয়েছিল। হিন্দিভাষীর শেষের কথাগুলো তাদের কানে প্রতিধ্বনি তুললে তারা কল্পনায় দেখছিল, দূর বহুদূরের বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন যেন ডেকে বলছে-তোমরা হতোদ্যম হয়ো না, তোমরা বাঁচবে।

হিন্দিভাষী চুপ করে রইল। আচানক রণবীরের এক সঙ্গী হাতিয়ার ফেলে দিয়ে দু'হাত উঁচু করে দাঁড়াল। পরক্ষণে আরও তিনজন তার দেখাদেখি হাতিয়ার ফেলে

দিল। বাদবাকীরা রণবীরের দিকে তাকালে সে আহত কণ্ঠে বললো, 'আমার দিকে তোমরা ওভাবে তাকিও না। যারা চাও হাতিয়ার ফেলে ভাগতে পারো। আমি সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি।' জনা চারে'ক উঠে যেতে যেতে বললো, 'মুসলমানগণ মিথ্যা কথা বলে না, হিন্দিভাষী আমাদেরই লোক হবে। অবশ্য সে দুশমনের দলে কোন কারণে হয়ত ভিড়েছে। তার উদ্দেশ্য আমাদের জীবন বাঁচানো ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।'

রণবীর ভাঙ্গা আওয়াজে বললো, 'ভগবানের দিক চেয়ে তোমরা জলদি স্থান ত্যাগ কর। আমাকে পরামর্শ দেয়ার দরকার নেই।'

টিলায় পিন পতন নীরবতা ছেয়ে গেল। পাথরের আড়াল থেকে ভেসে এলো- 'সূর্য ডুবে যাচ্ছে, তোমাদের আর একবার চিন্তার সুযোগ দিচ্ছি; বাহাদুরী আর বোকামির একটা সীমা থাকা দরকার। তোমাদের দেখছি তাও নেই।'

সবাই চুপচাপ। শেষ পর্যন্ত হিন্দিভাষী বললো, ' আমি একাকী তোমাদের মাঝে আসছি। দেখি তোমরা আমার কি করতে পার।'

দীর্ঘ দেহের অধিকারী এক অফিসার পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। রণবীর ধনুক সই করতে করতে বললো- 'এটা কোন চাল নয় তো! সে একাকী টিলায় চড়তে পারে না। তোমরা চৌকান্না থেকো।' অবরোধকারীরা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেল। কেউ হামলা করল না। মুসলিম অফিসার তাদের একেবারে কাছে এলে রণবীর ধনুক তাক করতে করতে দাঁড়িয়ে গেল। অবরোধকারীরা ধনুকে তীর সংযোজন করলে লম্বু লোকটি তাদেরকে ইশারায় নিষেধ করল। অতঃপর সে শান্ত স্থির চিত্তে রণবীরকে লক্ষ্য করে উপরে উঠতে লাগল। দৈহিক অঙ্গ সৌষ্ঠব ছাড়াও তার চেহারায় এক ধরনের আকর্ষণ ছিল। সুন্দর মুখশ্রী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কাজল কালো চোখ, প্রশস্ত ললাট সব মিলিয়ে তাকে এক অনন্য সুপুরুষ বলা যায়। তার চলনভঙ্গী বিজয়ীর মত ছিল, কিন্তু ঠোঁটের মৃদু হাসি বিজিতকে হত্যা করার সাক্ষ্য দিচ্ছিল না বরং তাকে বুকে তুলে নেয়ার ইঙ্গিত বহন করছিল। রণবীরের সঙ্গীরা বিস্ময়ের সাথে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। রণবীর তীর ছুঁড়তে ধনুক বাঁকা করল, কিন্তু অবশ হয়ে এল তার হাত। সে দু'তিন কদম পিছু হটে পুনরায় তীর ছুঁড়তে ধনুক বাঁকা করল। আচানক তার সঙ্গিরা বাধা দিয়ে বললো, 'না না!! রণবীর থাম!!!'

আগন্তুক বললো, 'তোমাদের খুবছুরত নওজোয়ানের জিন্দেগীর প্রতি এতটা বীতশ্রদ্ধ হওয়া ঠিক নয়। তোমরা কি চাও না, বাবা মায়ের আওয়াজ তোমাদের কানে যাক? তোমরা আবার মিলিত হও পরিবারের সাথে?' রণবীর নিরুত্তর। তার হাত থেকে ধনুক পড়ে যায়। সে হাজার মাইল দূর থেকে যেন কারো আওয়াজ

শুনছিল-'দাদা! দেবতা তোমায় রক্ষা করুন! তুমি শীঘ্র ফিরে এসো! এক বোন তার ভাইকে ছাড়া আর কিছুই চায় না!'

'তুমি যখমী', আগন্তুক মুসলিম অফিসার রণবীরের রক্ত মাখা জামা কাপড় দেখে বললেন। রণবীরকে নিরুত্তর দেখে তিনি অগ্রসর হয়ে তার হাতের যখমের উপর রুমাল বেঁধে দেন। অতঃপর বলেন- 'তোমার যখম আশংকাজনক নয়। তবে তোমাকে খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে।' ইত্যবসরে চিকিৎসকরা এসে সালারের নির্দেশে রণবীর ও তার দু'সঙ্গীর যখমে পট্টি লাগিয়ে দিল।

মুসলিম ফৌজের এ উদারতা রণবীর ও তার সঙ্গীদের ধারনাতীত ছিল। তাদের দুশ্চিন্তার দৃষ্টি দুশমনের চেহারায় এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে ফিরছিল, 'এর পর কি হবে? টিলার আশপাশের কয়েক ক্রোশ দূর পর্যন্ত ধুলি মেঘ খবর দিচ্ছিল-পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন এখনো অব্যাহত রয়েছে। খানিক পর রণবীরসহ ৭ জন লোক কয়েদী বেশে নীচে নেমে এল। তাদের সাথে সাক্ষাৎ হল ঐসব সঙ্গীর, যারা পূর্বেই হাতিয়ার সমর্পণ করেছিল।

সেনাপতি কয়েকজন সঙ্গীকে কয়েদীদের তাঁবুতে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়ে ঘোড়ায় চেপে অন্য দিকে চলে গেলেন। 'কে এই লোক?' রণবীর মনে মনে এ প্রশ্নের জওয়াব খুঁজছিল।

তাঁবুতে যাবার পথে ফৌজের পরস্পর আলাপ রণবীরের কানে যেন গরম সীসা ঢালছিল। এক সেপাই বললো, 'এ পরাজয়ের পর হিন্দুস্থানের তামাম রাজাদের একীন হয়ে যাবে যে, এক্ষণে হিন্দু সাম্রাজ্যকে সাহায্য করে কোন লাভ হবে না। তারালোচন পাল এবং তার পুত্রের পাঞ্জাবে এখন মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও রইল না।' আরেক সেপাই বললো, তবে আমার মনে হচ্ছে, 'ব্রাহ্মণরা হিন্দুস্তানীদের শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়াই করতে উৎসাহ যোগাবে।'

তৃতীয় সেপাই বললো, 'কিন্তু আমার মন বলছে অন্যটা-হিন্দু ব্রাহ্মণগণ রণাঙ্গনে আসতে সাহসই পাবে না। তারা কেল্লায় বসে কিছু মূর্তির সামনে ঘন্টা পিটিয়ে 'হরিবল' দিবে। তোমরা দেখবে, নগরকোটের মত কেল্লা ছেড়ে পালানোর সময় তারা দেবমূর্তিদের কথা ও বেমালুম ভুলে যাবে।'

'তোমার খেয়াল কি, তারা এখনো কেল্লায় আছে?' প্রথম সেপাই একথা বলে রণবীরকে লক্ষ্য করে বললো-

'আপনার বাড়ী কোথায়?'

রণবীরকে নিরুত্তর দেখে বয়োবৃদ্ধ এক হিন্দু সেপাই বললেন, 'আমাদের বাড়ি কনৌজে।'

সেপাই বললো, 'এর মানে এই যে, আমাদের কনৌজেও যেতে হবে।' এক তুর্কী অফিসার ভাঙ্গা হিন্দিতে বললেন, 'কয়েদীদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করার অধিকার তোমাদের কে দিয়েছে?'

সেপাই বললো, 'এটা ঠাট্টা নয়, আমি ভেবে চিন্তে বলছি, জঙ্গী হিন্দুরা গঙ্গা-যমুনার তীরে আমাদের যেতে বাধ্য করবে। কেননা, ওখানকার অধিবাসীরা সীমাহীন জুলুম নিপীড়নের যাঁতাকলে নিস্পেষিত হচ্ছে। কুদরতের পক্ষ থেকে মজলুম জনতার আওয়াজ সুলতান মাহমুদের কানে পৌছুলে অবশ্যই আমাদের পরবর্তী রোখ ওদিকে হবে।'

এ ধরনের আলাপ একজন তুর্কী কিংবা আফগানী করলে এতটা কষ্ট পেত না রণবীর, যতটা পেল পরিষ্কার হিন্দিভাষী এক হিন্দুস্তানীর মুখে শুনে। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলেও এ মুহূর্তে সে দাঁত কামড়ে চুপ রইল। সে মনে মনে বললো, 'ভগবান যেন এ ধরনের মূর্খ লোকের কথায় সুলতান মাহমুদকে গাঙ্গেয় জনপদে নিয়ে যান। দেবতাদের তীর্থ ভূমিতে পা রাখলে সে উপলব্ধি করতে পারবে-ভেড়া শিকার করতে এসে সে বাঘের লেজে হাত দিয়েছে।'

সে কল্পনায় এমন একটা দিনের দৃশ্য অবলোকন করছিল-যেদিন মধ্য ভারতের গঙ্গা-যমুনার তীরে রাজপুতদের অগণিত ফৌজ মাহমুদের মোকাবেলায় সমবেত হচ্ছে। থাকছে তাদের অগ্রে বিশাল হস্তী বহর। দুমশনরা হস্তী ভয়ে পিছপা হচ্ছে। যারা আজ দুশমনের বিজয়ে প্রভাবিত হয়ে তাদের গুণকীর্তন করছে, করছে ঠাট্টা বিদ্রুপ মহান দেব দেবীদের সাথে; তারা মাহমুদের পরাজয় তরান্বিত দেখে সেদিন আবার আমাদের সাথে হাত মিলাবে। হিন্দিভাষী সেপাইদের বিরুদ্ধে রণবীরের ক্ষোভ ও পেরেশানী, ঘৃণা ও ধিক্কারে পরিণত হল।

নন্দনার কেল্লা দখল করার পর সুলতান মাহমুদ কাশ্মীরমুখো হন। মাহমুদ চলে যাবার পর রণবীর জিন্দেগীর প্রতি ভোরে তালাশ করতো সেই অফিসারকে যিনি অবয়ব আকৃতি আর অসম হিম্মত প্রদর্শনের দরুন তার হৃদয়ে অক্ষয় প্রতিচ্ছবি এঁকে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার দৃষ্টিতে ঐ অফিসার দ্বিতীয়বার আর উদ্ভাসিত হয়নি।

॥ তিন ॥

রণবীরের বন্দী জীবনের চার চারটি বছর কেটে যায়। এ সময় সে শুনেছে, হিন্দুস্থানের বিভিন্ন এলাকা ও মধ্য এশিয়ায় বেশ কয়েকটি দেশ মাহমুদ গজনবী জয় করেছেন। কেল্লার বন্দী তালিকা ক্রমশঃ কমে আসছিল। তন্মধ্যে অনেকে মুসলিম মুবাল্লিগদের প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করে মুক্তি পেয়েছিল। কেউবা

মুক্তিপণ দিয়ে আযাদ হয়েছে। একেবারে নিঃস্ব কিংবা বয়োবৃদ্ধদের যারা মুক্তিপণ আদায় করতে পারেনি, তাদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া হয়েছে। ইসলাম গ্রহণকারী কয়েদীদের সিংহভাগই মাহমুদ গজনবীর ফৌজে শামিল হয়েছিল। চতুর্থ বছরে শ'দেড়েক কয়েদী ছিল, যারা তখন পর্যন্ত সধর্মে অটল। মুক্তিপণ আদায় করার সামর্থ থাকতেও তারা তা করেনি। রণবীরের মত এসব কয়েদীদের ধারণা ছিল-অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের রাজা-রাজপূতদের অগনিত ফৌজ মুসলিমদের দলিত মথিত করে লৌহকপাট খুলে দিয়ে 'ধর্ম কি-জয়' এর মত উল্লাস ধ্বনি দিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নিবে। অতঃপর স্রেফ গজনী নয় বরং গোটা মধ্য এশিয়া থেকে মুসলিম জাতিকে উৎখাত করা হবে।

নন্দনার কেল্লা এক্ষণে কয়েদখানার স্থলে মারাত্মক যখমীদের চিকিৎসা স্থলে পরিণত হল। যদি এমন কোন রাজা-মহারাজাকে রণাঙ্গনে গ্রেফতার করা হত, যাকে কোন নিশ্ছিদ্র কয়েদখানায় রাখা প্রয়োজন-তাকেও এ কেল্লায় চালান দেয়া হত।

হিন্দুস্থান কিংবা মধ্য এশিয়ায় মাহমুদের সদ্য বিজয়ের কোন খবর নব মুসলিম কয়েদীদের মুখে শুনলে রণবীর বিশ্বাস করত না, কিন্তু নতুন কয়েদীদের কেউ এ সংবাদ দিলে তার কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যেত।

কয়েক মাসের ব্যবধানে কয়েদী সংখ্যা দু'হাজারে উন্নীত হল। রণবীর শুনতে পেল, মাহমুদ গজনবী ডেরা গোপীপুরের রাজাকে পরাভূত করে থানেশ্বরের দিকে রোখ করছেন। রণবীররা অবশ্য এতে গোস্বা না হয়ে খুশীই হচ্ছিল। কয়েদীদের বলতে গেলে সকলেই থানেশ্বর মন্দিরের চক্করস্বামী মূর্তির অদৃশ্য শক্তির অলীক কাহিনী শুনে আসছিল। তারা পরস্পরে বলত- মৃত্যু মাহমুদকে থানেশ্বরে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মুসলিম ফৌজ চক্করস্বামী মন্দিরের নিকটে পৌঁছতেই দেবতার অভিশাপে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সুতরাং তারা ধর্ম প্রচারক আলেমের কাছে এসে ভীড় জমিয়ে বলত- আপনারা বলেন, আমাদের দেবতাদের কোন শক্তি নেই। কিন্তু আপনাদের বাদশাহ এ যাবত কেবল পুঁচকে মূর্তিগুলিই ভেঙ্গেছে। বর্তমানে সে এমন এক তীর্থস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে- কোন দুশমন যেখান থেকে জিন্দা ফিরে আসতে পারে না। যদি আপনাদের খোদা সুলতান মাহমুদকে চক্কর স্বামী'র অভিশাপ থেকে বাঁচাতে পারেন, তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব।

জনৈক ধর্ম প্রচারক মুচকি হাসি দিয়ে বলেন, 'তোমরা 'চক্করস্বামী'কে খোদার সমপর্যায়ের মনে করছ। কিন্তু অচিরেই টের পাবে-সে এক নিষ্প্রাণ পাথরের টুকরো মাত্র।' কিছুদিন পর থানেশ্বরের রাজাকে একদল ফৌজসহ নন্দনার কেল্লায় বন্দী করে নিয়ে আসা হল। রাজা মশাই হিন্দু কয়েদীদের যখন শুনালেন- মুসলিম ফৌজ 'চক্কর স্বামী'র মূর্তিকে কাঁধে তুলে থানেশ্বরের অলিতে গলিতে টেনে হেঁচড়ে তার

অসহায়ত্বের প্রমাণ রেখেছে, তখন বেশ কিছু কয়েদী মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু রণবীর দেবতাদের ধিক্কার না দিয়ে শিষ্যদের কাপুরুষ ও আত্মসম্ভ্রমবোধহীন বলে মুখ রক্ষা করে।

এরপর রণবীর শুনতে পেল- সুলতান মাহমুদের কাফেলা গঙ্গা-যমুনার তীরে পৌঁছে গেছে। শুনতে পেল-তিনি গঙ্গা-যমুনার তীরবর্তী দেশ জয় করে নিয়েছেন। তার উৎকণ্ঠার শেষ নেই। তাহলে কি দেবতাদের তীর্থভূমি সবই হাত ছাড়া হয়ে যাবে? তার আশা ছিল, সরসের রাজা শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন। কিন্তু সেও ময়দান ছেড়ে পালাল। বারণের রাজার উপর রণবীরের আস্থা ছিল তুঙ্গে। কিন্তু রাজা হিরুত তার একলাখ ফৌজসহ মুসলমান হয়ে গেলে রণবীরের আফসোসের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেল। অতঃপর মহাবনের রাজা কালাচাঁদ গজনীর উপর চড়াও হলে রণবীরর অন্তরে আশার প্রদীপ জ্বলে উঠছিল। কিন্তু তার আশা ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল যখন সে শুনতে পেল- কালাচাঁদ দুশমন কর্তৃক ঘেরাও হয়ে আত্মহত্যা করেছে।

মহাবন বিজয় করে মাহমুদ গজনবী মথুরার দিকে অগ্রসর হন। রণবীর শুনতে পায়-মথুরাবাসী নিস্প্রাণ পাথরের মধ্যে ঘুমন্ত দেবতাদের মরণ ঘুম ভাঙ্গাতে না পেরে দুশমনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। দুশমনের ফৌজ পাঁচশ' স্বর্ণ ও দু'শো রৌপ্যের মূর্তি নিয়ে গেছে। এ মূর্তিগুলো শতাব্দীকাল ধরে নিম্ন হিন্দুদের থেকে ট্যাক্স আদায় করে নির্মাণ করা হয়েছিল।

তারপর একদিন পালা এল তার জন্মভূমির। চার বছর পূর্বে সে সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বলেছিল, যারা কনৌজ যায়, তারা ফিরে আসে না। কনৌজের রাজপূত আর পাঞ্জাবের রাজপূতদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। কনৌজের সন্তানদের লাশ না মাড়িয়ে দুশমন তাদের সীমান্তে পা রাখতে পারবে না। দেবতাদের শত্রুর মুখে রেখে তারা কিছুতেই পালাবে না। দেবতাদের চরণে জীবন উৎসর্গই তাদের ধর্ম।' কিন্তু ইদানিং তার উপলব্ধি পাল্টেছে। বিগত চার বছর কনৌজ ছাড়া কেবল অন্যান্য এলাকার খবর নিয়ে তার পেরেশানী ছিল। সকাল-সন্ধ্যা সে দেবতাদের গুণকীর্তন করে বলত-"জন্মভূমির পবিত্র দেবতাগণ! জন্মভূমিকে রক্ষা করুন!"

কিন্তু তার ভক্তিগান ও কামনার প্রতি দেবতারা চরম আঘাত হেনেছিল। দেবতারা পারল না মাহমুদের বিজয় গতির সয়লাব রুখতে। কনৌজও চলে এল মাহমুদের হাতে। গোটা দুনিয়া রণবীরের চোখে অন্ধকার হয়ে গেল। বিকেলের সোনালী রোদ্দুরে কেল্লায় মুসলিম পাহারাদাররা যখন কনৌজ বিজয়ে উল্লাস করছিল, তখন কেল্লার এক কোনে বসে ছোট্ট শিশুটির মত রণবীর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

একদিন সে শুনতে পেল, কাশ্মীর রাজা 'চন্দ্র পাল' ও সরওয়ার রাজা 'চন্দ্র রায়' পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু এসব খবর শুনতে শুনতে তার কান ঝালাপালা হয়ে যাওয়ায় সে চুপচাপ থাকত। কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না এর প্রতি। কনৌজ পতনের পর কারো হারজিত নিয়ে তার মাথাব্যথা ছিল না। এক্ষণে তার চিন্তা বুড়ো বাবা আর ছোট বোনটিকে নিয়ে।

-'ওরা কোথায়? কেমন আছে? কনৌজ বিজয়ের পর ওদের ভাগ্যে কি জুটেছে? রণবীর কেবল এ প্রশ্নের জবাব খুঁজত।

॥ চার ॥

কেল্লার নিকটস্থ নওমুসলিমরা কয়েদীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়ে তাদের ভারাক্রান্ত মন চাঙ্গা করতে চেষ্টা করত। সুলতানের পক্ষ থেকে এসব লোকদের মাধ্যমে কয়েদীদের প্রিয়জনের কাছে সংবাদ পাঠানোর অনুমতি ছিল।

অনেকের আত্মীয়-স্বজন খবর পেয়ে মুক্তিপণ দিয়ে তাদের প্রিয়জনকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছেন। ছ'মাস পূর্বে রণবীরের আত্মীয়-স্বজনরা মুক্তিপণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেছিল। জনা তিনে'ক মুসলমান হয়ে মুক্তি পেয়েছিল। শুধুমাত্র চারজন ছিল নিঃস্ব। তাদের জন্য কেউ মুক্তিপণ নিয়ে এল না।

রণবীরের জন্য মুক্তিপণ একটি মামুলী ব্যাপার ছিল। কিন্তু একজন রাজপুত হয়ে পরাজিত বেশে দেশে ফেরা তার কাছে বেখাপ্পা লাগছিল। তাই সে পিতৃপক্ষের মুক্তিপণ আদায়কারীদের বলে দিয়েছিল-'বাবাকে বলবেন। মুক্তিপণের টাকা দিয়ে কনৌজের সৈন্য তালিকায় যেন আরো কয়েকজনের নাম লেখানো হয়।'

কনৌজরাজের পলায়নের পর রাজ্যের অন্ধকার নেমে আসে রণবীরের চোখে। সে উপলব্ধি করতে পারল, বিশাল পাহাড়ের গতি সামান্য খড়কুটো রুখবে কি করে? বাবা হয়ত তার প্রস্তাবে খুশী হয়ে রাজাকে বলবে- 'মহারাজ! পুত্রের প্রস্তাবে খুশী হয়ে আমি এতটা হাতি-ঘোড়া দান করছি। আমার পুত্র এখানে না এসে নন্দনার কেল্লায় আপনাদের সম্বর্ধনা দিতে চায়।' কিন্তু সে আশা আজ দুরাশার বাঁকে ঘুরপাক খেয়ে হারিয়ে গেল। সে মনে মনে আওড়ালো, 'কনৌজের শাসন কর্তাদের সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখব না। দেবতাদের মূর্তি কনৌজের খোলা ময়দানে কিংবা গজনীর বাজারে ভাঙ্গলেও আমার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আমি শুধু বাবা ও বোনকে অক্ষত দেখতে চাই।'

দেবতাদের শক্তি ও বড়ত্বের উপর রণবীরের সন্দেহ হতে লাগল ক্রমশঃ। কিন্তু আচানক সে মনকে প্রবোধ দিয়ে বললো, 'না রণবীর। দেবতাদের সম্পর্কে কু-ধারণা ত্যাগ করা চাই। তারা শিষ্যদের সামান্য পরীক্ষা নিচ্ছেন মাত্র। তারা অবশ্যই

সচেতন হবেন এবং ধর্মের মুখ রক্ষা করবেন। মাহমুদ গজনবী শুধুমাত্র হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজাদের কুপোকাত করনেনি বরং দেবতাদের ভাবমূর্তিও নষ্ট করেছেন। এরা সেই দেবতা, যারা ভগবানের মর্জি মত জনগণের দেখ্ভাল করে থাকেন। ভগবান কিছুতেই তার উপদেষ্টাদের তামাশার পাত্র বানাবেন না। অচিরেই একদিন ভারত ভূমিতে এক আত্নীমুশ্বান শক্তির অভ্যুদয় ঘটবে। যারা মূর্তি ভাঙ্গা মুসলিমদের হাত থেকে তরবারী ছিনিয়ে নিবেন। তুমি সেদিনটির জন্য অপেক্ষা কর।'

এ ধরনের খেয়ালে রণবীরের মন প্রশান্তি পেত। সে অত্যন্ত বিনীতভরে ভগবানকে লক্ষ্য করে জপত-'ভগবান! আমার ভগবানের দেবতাগণ! আমাকে শক্তি দাও। আমি যেন শত বিপদের মাঝে ইস্পাত কঠিন হয়ে স্বধর্মের উপর অটল থাকতে পারি। আমার শেষ ভরসা কেবল তোমরাই।'

কিন্তু ভগবানের কাছে এ জপনাম তাকে স্বস্তি দিতে পারত না। গঙ্গা-যমুনার রণক্ষেত্রে মাহমুদের বিজয় কাহিনী শোনার পর রণবীরের অবস্থা ঠিক সাগর বক্ষে ডুবন্ত ঐ যাত্রীর মত হয়েছিল, যে জ্বলন্ত প্রদীপের আশায় কাতর নয়নে উপকূলে তাকিয়ে থাকত। দীর্ঘ চার বছর ধরে যে সব কয়েদী বুকে পাথর বেধে দেবতাদের আশায় তাকিয়েছিল-তাদের মন মুকুরে দেবতা বিদ্বেষী ভাব জন্মাতে লাগল। ২৪ জন কয়েদী মথুরা পতনের পরপরই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল। বাদবাকীদের অন্তর ক্রমেই আকর্ষিত হচ্ছিল- সত্য চিরন্তন ধর্ম গ্রহণের প্রবল আকাংখায়। এদিকে কালচক্রের আলো আঁধারীতে ঘুরপাক খেয়ে রণবীরের হতাশা যখন ক্রমশঃ দূরীভূত হচ্ছিল, ঠিক তখন মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তনে সে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শায়িত হল।

একদিন রণবীরের জন্য হেকিম দাওয়া নিয়ে এলে সে উহা সেবন করতে অস্বীকৃতি জানায়। ডাক্তার তার চারপাশের সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বলেন- 'তোমরা তাকে বোঝাও। গতকাল থেকে সে দাওয়া পান করছে না। পাহারাদাররা বলছে, সে নাকি খাদ্যও স্পর্শ করছে না। কয়েদখানার নাযেম আজ ওকে দেখতে আসবেন। তোমরা সবে সাক্ষী। আমি তার জান বাঁচাতে কোন প্রকার ত্রুটি করিনি।'

জনৈক কয়েদী হেকিমের হাত থেকে দাওয়ার পেয়ালা নিয়ে বললোঃ 'আপনি চিন্তা করবেন না! আমরা ওকে পান করাব।' রণবীরের মুখে পেয়ালা তুলে ধরে সে বললো, 'নিন মহারাজ! এতে আপনার উপকার হবে।'

রণবীর চিৎকার দিয়ে বললো, 'ভগবানের দিকে চেয়ে তোমরা আমায় জ্বালাতন করো না। কারো সহমর্মিতার দরকার নেই আমার।'

দ্বিতীয় কয়েদী হাত ধরে তাকে উঠাতে গিয়ে বললো, 'রণবীর! আমরা আপনার দুশমন নই। এ করুণ বন্দীদশায় জেদী মনোভাব ঠিক নয়। উঠুন! দাওয়াই সেবন করুন!'

গোস্বাভরে হাত ঝাড়া দিয়ে রণবীর পূর্বের তুলনায় চিৎকার দিয়ে বললো, 'এখানে কারো বন্ধুত্বের প্রয়োজন নেই। আমাকে মরতে দাও! ভগবানের দিকে চেয়ে আমায় মরতে দাও! এ তিক্ত জিন্দেগীর চেয়ে মওত কষ্টদায়ক হবে না।'

আচানক কামরার দরজা থেকে কেউ আওয়াজ দিয়ে বলে উঠলেন, 'এ ভাষা অন্ততঃ একজন সেপাইর মুখে শোভা পায় না।'

যারা এতক্ষণ রণবীরের দিকে তাকিয়েছিল তাদের দৃষ্টি এখন দীর্ঘকায় এক অফিসারের দিকে নিবদ্ধ হল। কয়েদীরা রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াল। আগন্তুক রণবীরের বিছানার পাশে এসে বললেন, 'সেপাইরা হাসি মুখে মৃত্যু আলিঙ্গন করে, তবুও নিরাশ হয়ে হাতিয়ার সমর্পণ করে না।' রণবীর পেরেশান হয়ে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বসতে লাগল। তার অন্তরের ঘৃণা ও ধিক্কারের উথলে ওঠা তুফান আনন্দে পরিণত হল।

এ সেই ব্যক্তি, যে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে এ কেল্লায় পাঠিয়েছিলেন। এ সেই মহামানব, টিলার উপর এক নজর দেখার পর বিগত চার বছর ধরে তার দৃষ্টি যাকে খুঁজে ফিরছে।

'ও দাওয়া পান করছে না'। হেকিম সাহেব আগন্তুক ও কেল্লার নাযেমকে লক্ষ্য করে বললেন। 'আমি চেষ্টায় কোন ত্রুটি করিনি'।

'কোথায় দাওয়া? আমাকে দিন তো!' এ কথা বলে আগন্তুক কয়েদীর হাত থেকে দাওয়ার পেয়ালা নিয়ে রণবীরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমার সাথে পূর্বেও বোধহয় আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। নাও পান কর!'

রণবীর নির্দেশের চেয়ে তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির কাছে বেশি প্রভাবিত হচ্ছিল, এতদসত্ত্বেও ঔষধ সেবনে তেমন একটা আগ্রহ দেখাল না।

'তুমি যতক্ষণ ঔষধ সেবন না করছ, ততক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে থাকব।' এ কথা বলে রণবীরের মুখে আগন্তুক পেয়ালা তুলে ধরেন। রণবীর তাঁর হাত থেকে পেয়ালা নিল। তার মন বলছিল ঔষধ দেয়ালে ছুঁড়ে মারতে, কিন্তু হিম্মতে কুলালো না।

আচানক সে এক ঢোক গলধঃকরণ করল।

আগন্তুক মুচকি হাসি দিয়ে হেমিককে লক্ষ্য করে বলেন, 'বোধহয় আপনার ঔষধ মাত্রাতিরিক্ত তেঁতো। আমি নিজেও তেঁতো ঔষধ ভয় পাই।'

কেল্লার নাযেম আগন্তুককে বললেন, 'চলুন! আপনার অনেক কিছু পরিদর্শন করতে হবে।'

আগন্তুক নাযেমের সাথে কামরা থেকে নিস্ক্রান্ত হয়ে গেলে হেকিম সাহেব রণবীরকে বলেন, 'কিছুক্ষণ পরে দুধপান করবেন। ঔষধ ভালো কাজ দেবে।'

'দাঁড়ান!' রণবীর বললো, 'আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'বলুন!' কে এই লোক?

'ইনি সুলতান মাহমুদের একজন পদস্থ ফৌজী অফিসার। নাযেম কিছুদিনের জন্য ছুটিতে যাচ্ছেন, ইনি আসছেন তার জায়গায়। বোধহয় কয়েদীদের মুক্তি দেয়ার বিশেষ অধিকার নিয়ে তিনি এসেছেন।'

'কিন্তু তাঁর বাচনভঙ্গি দ্বারা অনুমিত হচ্ছে, তিনি হিন্দুস্তানী।'

'হ্যাঁ! ইনি নও মুসলিম। হিন্দুস্তানের কোন এক রাজবংশের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল।'

॥ পাঁচ ॥

১৫ দিন পর রণবীর চলাফেরা করার মত সুস্থ হল। এ সময়ে কেল্লার নাযেম তার সাথে কয়েকবার দেখা করেছেন। অস্ত্রাগার ও ফৌজী অফিসারদের বৈঠক কক্ষ ছাড়া কয়েদীদের সর্বত্র বিচরণের অনুমতি ছিল। একদিন রণবীর কামরা ছেড়ে হাওয়া সেবন করতে বাইরে বের হল। কেল্লার নাযেম জনা চারে'ক সেপাইসহ তার কাছে এসে বললেন, 'আমি প্রত্যহ হাওয়া সেবন করতে বের হই। সকালের মৃদুমন্দ হিমেল সমীরণ তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

রণবীর খানিকটা থেমে বললো, 'সুস্থতা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কামরায় দম আটকে আসছিল, তাই একটু বাইরের প্রকৃতি দেখতে বের হলাম।'

'আমিতো তাই বলছিলাম। ভোরের তাজা বায়ু তোমার সুস্থতার জন্য ফলদায়ক।' একথা বলে নাযেম এক সেপাইকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমার ঘোড়াটা ওকে দাও! ও আমাদের সাথে যাবে।'

সেপাই নাযেমের হুকুম তামিল করতে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম রণবীরের হাতে তুলে দিলে রণবীর তাঁকে লক্ষ্য করে বললো ঃ 'শুকরিয়া! কিন্তু সওয়ার হবার ইচ্ছা আপাততঃ নেই।'

'তোমার মর্জি! তবে বিচরণ করার খায়েশ হলে আমায় বলো কিন্তু।' নাযেম ঘোড়ায় পদাঘাত করে সাথীদের নিয়ে ক্ষেতের আড়ালে চলে গেলেন।

পর দিন। জনৈক সেপাই এসে রণবীরকে বললো, 'নাযেম সাহেব আপনাকে তার কামরায় ডেকে পাঠিয়েছেন।' রণবীর উঠে নাযেমের কামরায় গেল।

নাযেম সাহেব অফিস সংলগ্ন একটি বাগানে পায়চারী করছিলেন। রণবীর এসে তার কাছে ঘেষে দাঁড়াল। নাযেম ফুলগাছের নীচস্থ একটি চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'এখানে বস। আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। আজ কামরা খুব জনাকীর্ণ।' রণবীর ইতস্ততঃ করে চেয়ারে বসে পড়ল। নাযেম মুখোমুখি একটি চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'তুমি নন্দনার যুদ্ধে সেনাপতি বেশে শরীক ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বহুত সঙ্গী ছাড়া পেয়ে চলে গেছে।'

'জানি।'

'আচ্ছা, কোন শর্তটি তোমার কাছে অনভিপ্রেত মনে হয়েছে?'

রণবীর জওয়াব দিল, 'আমি দুশমনদের আরোপিত শর্তের উপর চিন্তা ভাবনা করার অবকাশ পাইনি।'

নাযেম মুচকি হেসে বললেন, 'হিন্দুস্তানের কোন রাজার হামলা তোমাকে নন্দনা থেকে মুক্ত করে নেবে ভাবছ?'

'হতোদ্যম হয়ে আপনার কাছে মুক্তি ভিক্ষা চাইব, তা ভাবছেন বুঝি?'

'আমি বলতে চাই, 'যুদ্ধ করার মত এ কয়েদী জীবন ও তোমার জন্য অনর্থক। তুমি যাকে দৃঢ়তা মনে করছ, তা নিছক জেদ ছাড়া কিছু নয়। তুমি কল্পনায় এমন এক পরাশক্তির মোকাবেলা করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে-কুদরত যাদেরকে এক মহান উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তানের জন্য নির্বাচিত করেছেন।'

রণবীর বললো, 'মন্দিরে হামলা করে মূর্তি ভাঙ্গা যদি আপনাদের মহান উদ্দেশ্য হয়, তবে এ কর্মকাণ্ডের জন্য গর্ব করতে পারেন আপনারা।'

'মানুষের হাতে তৈরী মূর্তি মানুষেই ভাঙ্গবে-এতে বৈচিত্রের কি আছে! আহা, তুমি যদি জানতে, দেবতাদেরকে পাথরের মধ্যে বন্দী করে ব্রাহ্মণরা মানবতার কত বড় দুশমন সেজে বসে রয়েছে। তুমি রাজপূত-তাই মূর্তির প্রতি তোমার অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা থাকা স্বাভাবিক। দেবতারা তোমাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে। শতাব্দী কাল ধরে তুমি লাখো মানুষের জন্মগত অধিকারের উপর চরম আঘাত করে আসছো। তোমাদের মূর্তিগুলো ব্রাহ্মণ-হরিজনদেরকে দেবতার আসনে বসিয়েছে, আর বাদ বাকী মানুষকে অচ্ছুৎ বানিয়ে চরম একচোখা নীতির পরিচয় দিয়েছে। হিন্দুস্তানে মূর্তি বিনাশ তাই নিগৃহীত মানবতার বিজয়। মন্দিরস্থ মূর্তি রক্ষায় তলোয়ার উঠানোর পূর্বে তুমি যদি অচ্ছুৎ শ্রেণীর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে যে, তোমাদের কাছে শুকনো হাড্ডির উপর রাজা-মহারাজার মহল বেশি ভারী মনে হয়, না মন্দিরের ইট পাথর? কোন 'বৈশ্য'কে যদি জিজ্ঞাসা করতে, তাদের অর্জিত ধন-সম্পদের বড় অংকটা কি ছুরি ধরে ব্রাহ্মণরা নেয়, না মূর্তিদের জন্য মন্দিরে নেয়া হয়?'

রণবীর কোনক্রমে গোস্বা সংবরণ করে বললো, 'মনে হয় পূর্বে আপনি রাজপূত ছিলেন। দুশমনের মোকাবেলায় আপনার হিম্মতের বাযু ঢিল না হলে আপনি মূর্তি বিদ্বেষী হতেন না।'

'হ্যাঁ! আমি রাজপূত ছিলাম। কিন্তু কালচক্র আমায় মানবতাকে মূল্যায়ন করতে শিখিয়েছে।'

'আপনার কথার মানে হচ্ছে- আপনি মুসলমানদের সামনে হাতিয়ার ফেলে অচ্ছুৎদের পক্ষপাতিত্ব করবেন।'

'না। আমি স্বৈরাচারের পক্ষ ত্যাগ করে মানবতার নিশান বরদারদের দলে ভিড়েছি।'

'মাহমুদ গজনবী এবং তার সেপাইদের আপনি মানবতার নিশান বরদার মনে করেন?'

'হ্যাঁ! তাদের বিজয় ভেরী পুরোপুরি ভারতবর্ষে নিনাদিত হলে ঐ মহান দ্বীনের প্রচার প্রসার সহজতর হবে। এ ধর্ম তোমাদের জাতপাত ভেদ ও অচ্ছুৎ অস্পৃশ্য সমাজকাঠামোকে ভেঙ্গে সাম্য ও মানবতার ঝাণ্ডা উড্ডীন করতে চায়। এ ধর্ম তাদের জন্য হুমকি স্বরূপ, যারা মন্দিরে বসে নিজেদের খোদা মনে করছে। পাষাণ ঐসব মন্দিরগুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে না দিলে ইসলাম প্রচারের রাস্তা কন্টকমুক্ত হবে না। এক্ষণে আমার কথাগুলো তোমার কানে ভালো লাগবে না ঠিকই, কিন্তু যেদিন তুমি উচ্চ শ্রেণীর অনুভূতি পিছে ফেলে একজন সাধারণ মানুষের মেধা নিয়ে চিন্তা করবে, সেদিন সত্যই তোমার কাছে প্রতিভাত হবে যে, মাহমুদ গজনবীর আগমন নিগৃহীত মানবতার আহাজারীর প্রত্যুত্তোর মাত্র।

'একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আমি এতটুকু ভাবতে পারি-আমি আপনাদের কয়েদী- যারা নিজেদেরকে মানবধিকার প্রতিষ্ঠার নিশান বরদার মনে করছেন।'

'মাহমুদ গজনবীকে আমি মানবধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিভূ মনে করছি না। কিন্তু সততার যে চরম পরাকাষ্ঠা তিনি প্রদর্শন করেছেন, তাতে বলতে পারি-তিনি নিজগুণে এ যুগের মানবতার পরম বন্ধু। এ কেল্লার কোন পাহারাদারের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ থাকতে পারে। কিন্তু তোমার উপলব্ধি থাকবে হয়ত-শত শত বছর ধরে লাখো মানুষ ব্রাহ্মণ সমাজের বলির পাঠা হয়ে আসছে। তাদেরকে শুদ্র বানিয়ে ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। ঐসব নিস্প্রাণ মূর্তির উপর আজো অগাধ বিশ্বাস রাখছেন ব্রাহ্মণ ও হরিজনরা, যাদের হাত রঙ্গীন হয়েছে নিম্ন শ্রেণীর খুনে। নিকৃষ্ট মনের অধিকারী একজন মুসলমান কোন হিন্দু জঙ্গীর সাথে ঐ ব্যবহার করতে পারে না, যা করে আসছে আবহামান কাল ধরে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা শুদ্রদের সাথে। বন্দী জীবন তোমার কাছে বিরক্তিকর হলেও আমি আশ্বাস দিতে পারি, অচিরেই তুমি মুক্তি পেতে যাচ্ছ। তোমার চোখের সামনে হাজারো কয়েদীকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। তুমি কখনো ঐ সব নিগৃহীত মানবতার জীবনকাল নিয়ে ভাবছ কি, জিল্লতীর কোলে জন্ম নিয়ে যারা আবার জিল্লতীর সাথেই মরনের কোলে ঢলে পড়েছে? আমি তোমার কাছে একটি প্রশ্নের জওয়াব চাই। মনে কর, আনন্দ পাল কিংবা জয় পালের ফৌজ যদি গজনীর উপর চড়াও হয়ে জয় লাভ করে, তাহলে

জঙ্গী কয়েদী তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানের সাথে তাদের ব্যবহারটা কেমন হত? বন্দীদের সাথে তাদের ব্যবহার কি ঐ ব্যবহারেরচে' ভিন্নতর হত, যা করে আসছিল তারা তাবৎকাল ধরে শুদ্র, চণ্ডাল ও কায়স্থদের সাথে? গজনীর উপর হামলা করার পূর্বে ব্রাহ্মণগণ কি ঘোষণা করছিলেন না যে- মুসলমানরা ম্লেচ্ছ, সুতরাং অচ্ছুৎদের মত তাদেরকে পরাজিত করা ধর্মের দাবী?'

রণবীর লা-জওয়াব হয়ে গেল। নিজকে কোন রকম সংযত করে বললো,' আপনার এসব বাক্য ব্যয়ের গরজটা জানতে পারি কি?'

'তুমি পেরেশান হয়ো না। আমি তোমাকে এমন কোন কাজ করতে বাধ্য করব না, যা গ্রহণ করতে তোমার অন্তর অনীহ হবে। তোমার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ছিল ক্ষণিকের তরে। ভীম পালের অবশিষ্ট সৈন্যের যে দলটি কাশ্মীরে তারালোচন পালের সাথে যোগ দিয়েছিল, তাদেরকে বাধা দিতে আমি একদল ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলাম। অতঃপর এদিকে আসার মওকা মিলেনি আমার। অবশ্য তোমাকে স্মরণ করেছি সর্বদা। তোমার হিম্মৎ ও বীরত্বের স্বীকৃতি দিতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, হায়! তোমাকে যদি এমন একটি পথের সন্ধান দিতে পারতাম- যে পথে চলে তুমি মানবতাকে মূল্যায়ন করতে শিখবে! আমি আশাবাদী, এমন একদিন আসবে সেদিন তোমার আমার জীবন চলার রাস্তা এক হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার সাথে আমার বেশিক্ষণ থাকা হবে না। গতকাল জানতে পারলাম, জলন্ধরের রাজা তারালোচন পাল তার হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে গোয়ালিয়র রাজাদের সহায়তায় সৈন্য সমাবেশ করছে। কনৌজের পরাজিত রাজা গজনীর বিরুদ্ধে বিষোদগার তুলছে। এহেন পরিস্থিতিতে সুলতান মাহমুদ অভিযান চালিয়ে যেতে পারেন। তাই আমাকে তার সাথে প্রতিটি রণক্ষেত্রে থাকতে হবে। অবশ্য এখান থেকে যাবার পূর্বে তোমার ব্যাপারে ফায়ছালা করে যেতে চাই। মুক্তি পেয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে তরবারী উঠাবে না, এমন একটা অঙ্গীকার দিলে তোমায় মুক্তি দিতে পরি।'

'আমার অঙ্গীকারে আপনি আস্থাভাজন হতে পারবেন?'

'হ্যাঁ!'

'আর যদি আমি অঙ্গীকার না দেই-তবে?'

'তখন অবশ্য জলন্ধর অভিযান পর্যন্ত তোমায় এখানে থাকতে হবে। আশাকরি এ অভিযানের পর গঙ্গা-যমুনার তীরবর্তী প্রশাসন আমাদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহস পাবেনা। তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে- আসন্ন যুদ্ধে আমরা যদি বিজয়ী হই, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তোমায় যেন ছেড়ে দেয়া হয়। যে সততা আমায় মানুষের মত মানুষ বানিয়ে একজন দুশমন কয়েদীর সাথে এতক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করে কথোপকথনে মদদ যুগিয়েছে, তার একটা প্রতিক্রিয়া হয়ত

তোমার মাঝে দাগ কাটবে। তুমি পরাজিত সৈন্য হয়ে নও বরং নতুন জীবন নিয়ে বাড়ীতে ফিরবে। যখন খুশী তখন তুমি আমার সাথে আলাপ করতে পার। আমার ঘরের দরজা সর্বদা তোমার জন্য উন্মুক্ত।'

নন্দনার যুদ্ধের পূর্বে রণবীর ব্রাহ্মণদের মুখে শুনেছিল, মাহমুদ গজনবীর ফৌজে যাদুকর আছেন বেশ কিছু। এদের যাদুকরী বক্তৃতায় পরাজিত হিন্দুরা ধর্মত্যাগে আগ্রহী হয়। সুতরাং রণবীরের কাছে ধর্ম প্রচারকদের কেউ এলে তার কথায় কান না দিয়ে সে গীতা পাঠ করত। কিন্তু আজকের কথোপকথন তার মনের গতি ঘুরিয়ে দিয়েছে। আজ আর সে গীতা পাঠ করেনি। মোলাকাত শেষে সে যখন কামরায় প্রবেশ করছিল, তখন নাযেমের কথাগুলো তার কানে প্রতিধ্বনি তুলছিল। সে দোদুল্যমান মানসিক ধুক ধুকানীকে মনে স্থান না দেয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে কামরায় প্রবেশ করল। সারাদিন মানসিক পীড়ায় ভুগল। শুয়েছিল বিছানায়। 'যুদ্ধের মত এ কয়েদী জীবন তোমার জন্য নিরর্থক' কথাটি বারবার উচ্চারণ করল। এভাবে নাযেমের সাথে আর দু'একটি বৈঠক করলেই তার সনাতন বিশ্বাসের সৌধচূড়া যে ভেঙ্গে পড়বে, তাতে রণবীরের সন্দেহ ছিলনা। অস্বস্তিতে ভুগে বার বার পার্শ্ব পরিবর্তন করে ও সিদ্ধান্ত নিলো, নাযেমের সাথে আর মিলিত হওয়া যাবেনা। ডেকে পাঠালে বলে দিব, 'আপনি খামোকাই আমার সময় নষ্ট করছেন। দুনিয়ার কোন শক্তিই পূর্বসূরীদের ধর্ম থেকে আমাকে বিমুখ করতে পারবে না।'

কিন্তু পরের দিন রণবীরকে অন্য চিন্তায় ধরল। সে কয়েদীদের সাথে প্রাণ খুলে কথা বলতে চাচ্ছিল। আসছিল না তাতে মনে প্রশান্তি। তার অন্তর বার বার বলছিল-এটা কাপুরুষতার লক্ষণ। তোমাকে প্রমাণ করতে হবে- পাথুরে জমীনের মত শক্ত তোমার ধর্মীয় বিশ্বাস, কোন যাদুকরী কথা যেন তোমার সে বিশ্বাসে চির ধরাতে না পারে। আজ তিনি ডাকলে তুমি অবশ্যই যাবে। তিনি একজন রাজপূত, তার চেহারায় মহানুভবতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তিনি তোমাকে কোন ধরনের গোলামি চুক্তি ছাড়াই মুক্তি দিতে পারেন।

দুপুর পর্যন্ত রণবীরকে কেউ ডাকতে না এলে অনাহূত ভাবে সে নাযেমের কামরার দিকে পা বাড়াল। তার মনের গভীর থেকে একটি মৃদু আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল, 'রণবীর! তুমি আত্ম প্রবঞ্চিত হয়ো না। বীরত্ব প্রদর্শন করতে যাচ্ছ না, যাচ্ছ অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে। তাকে তুমি জাদুকর ভাবছ না, ভাবছ তোমার সহকর্মী ও সংবেদনশীল।'

নাযেমের দফতরে প্রবেশ করে দেখল তিনি মুন্সি দিয়ে চিঠি লেখাচ্ছেন। রণবীরকে দেখে তিনি একটি খালি চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বস! আমার কাজ শেষ প্রায়।'

কয়েক লাইন লিখিয়ে মুন্সিকে বিদায় করে তিনি বললেন,

'ভালোই হল, তুমি আসায়। নতুবা আমি স্বয়ং তোমাকে দেখতে যেতাম।'

রণবীর তার সম্মুখস্থ চেয়ারে বসতে বসতে মনকে ধিক্কার দিয়ে বলল, 'আহা, আমি যদি আর কিছুক্ষণ দেরী করতাম!'

নাযেম কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'গতকাল তুমি চলে যাবার পর মনে খেয়াল জাগছে, ঘটনাচক্রে কয়েকটি ব্যাপারে আমার অন্তর রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি না হলে আমিও তোমার মত নন্দনার যুদ্ধে এসে একজন কয়েদী হিসাবে তোমার সাথে পরিচিত হতাম। সেমতাবস্থায় আমাদের পারস্পারিক কথা এক ও অভিন্ন হত। অবশ্যই আমরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতাম, তুমি কোত্থেকে এসেছ? তোমরা ক'ভাই বোন? পিতা-মাতা কেমন আছেন? এর মধ্যে কার স্মৃতিচারণ তোমাকে পীড়া দেয়? ইত্যাদি.......! আজও ভাবছিলাম তুমি এসে ও ধরনের প্রশ্ন করবে। এ কেল্লার নাযেম হিসাবে নয় বরং সাধারণ একজন মানুষ হিসাবে যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করি-তুমি বন্দী জীবনে দুঃসহ যাতনা সহ্য করছ। এক্ষণে তাই কিছু শোনা কিংবা শোনানোর চিন্তা এ পাষাণ চৌহদ্দীর মাঝে করা যায় না। যদি আমি আমার পূর্ব কাহিনী তোমায় শুনাই তাহলে বিরক্তি বোধ করবে না তো?

ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে রণবীর বললো, 'সাধারণ একজন প্রজা হিসাবে আপনার প্রশ্নোত্তর কিংবা অতীত কাহিনী শোনানোতে আমার বিরক্তির কি আছে? অবশ্য আমার অতীত কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। শুনবেন?

'আমার মা পরলোকগত। ভাই নেই। একমাত্র বোন ছাড়া কারো স্মৃতি আমাকে পীড়া দেয়না। আর হ্যাঁ, আমি মুক্তি ভিক্ষা চাইতে এসেছি, এ গলদ চিন্তা আপনাকে যেন পেয়ে না বসে। আপনার আকাঙ্খা অতীত কাহিনী শোনাবেন, তাই সর্বাগ্রে আমার সংক্ষিপ্ত কাহিনী আপনাকে শুনিয়ে দিলাম।'

রণবীরের আওয়াজ বসে আসছিল। উছলে উঠছিল দু'চোখে অশ্রু বন্যা। সে অশ্রু সংবরণ করতে চাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর তার মনের দুঃসহ বোঝা হালকা হয়ে এলো। আত্মকাহিনী বলায় তার তড়পানি কিছুটা কমল। প্রতিটি কথায় ফুঁসে উঠছিল অশ্রু।

রণবীর অশ্রু সংযত করে বললোঃ 'মহারাজ! আপনি কি কাহিনী যেন শোনাতে চাচ্ছিলেন- যা নাকি আপনার মনোজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল? আপনি কোন্ যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন?'

'আমার অতীত কাহিনী তোমার চেয়ে ভিন্নতর। তা যেমন দীর্ঘ, তেমনি বেদনাদায়ক। জলদি শুয়ে পড়ার অভ্যাস না হলে রাতের খানা খেয়ে চলে এসো। গভীর রাত পর্যন্ত চলবে আমার কাহিনী বলা।'

আশা

রাতের বেলায় হালকা বৃষ্টি পড়ছিল। রণবীর খানা খেয়ে নাযেমের কামরায় পৌঁছে গেল। 'উনি নামায শেষ করে আসছেন। আপনি এ রুমে বসুন' বললো এক কর্মচারী। কিছুক্ষণ পরে নাযেম কামরায় প্রবেশ করলেন। তিনি রণবীরের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে নিজের অতীত কাহিনী বলতে শুরু করলেনঃ-

আব্দুল ওয়াহিদ আমার ইসলামী নাম। পূর্ব নাম অসিৎ কুমার। কংগ্রোতে জন্ম। আমি পিতা মাতার একমাত্র পুত্র। তাঁরা দু'জনেই আমার দুধ পানকালে পরলোকগমণ করেন। নগর কোটের ফৌজি সেনাপতি ছিলেন আমার বাবা। নগর কোটের অদূরেই শস্য-শ্যামল একটি জায়গীরের অধিকারী ছিলাম আমরা। বাবার মৃত্যুর পর জ্যাঠামশাই আমাকে প্রতিপালন করেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান, এ জন্য আমায় খুব আদর করতেন। তাঁর আশা, আমিও বাবার মত খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হব। নগর কোটের শাহী মহল থেকে দেড়শ' সওয়ার ও চারশ' পদব্রজী সেপাইর খরচা জোগানোর দায়ভার আমাদের কাঁধে ছিল। এ জন্য সেই শৈশবকালেই একজন সৈনিক হওয়ার রঙিন স্বপ্ন মনে মনে বুনতাম। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য জ্যাঠামশাই আমাকে এক পন্ডিতের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় বইয়ের পৃষ্ঠা ওল্টানোর চেয়ে জঙ্গী সরঞ্জামাদি নিয়ে খেলাধূলা করা আমার শখ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার ও বিল কিংবা নদীতে সাঁতার কাটারও শখ ছিল আমার। বৈশ্য শ্রেণীর কিষাণ ও রাখালদের সাথে লড়াই করতে আমি ছিলাম অকৃত্রিম। আমাদের জায়গীরে স্রেফ একটা বস্তি ছিল। ওখানে যেতে জ্যাঠা আমায় নিষেধ করতেন। কেননা ঐ বস্তিতে অচ্ছুৎদের বাস।

আমার বয়স বারোর কোঠা পেরিয়ে গেলে নগর কোটের রাজা আমাদের জায়গীরে এলেন। পরিদর্শন করলেন সেপাইদের অবস্থান। আমি ময়দানে খেলাধূলা করছিলাম। রাজা মহাশয় আমার নেযাবাজী ও তীরন্দাজীতে খুশী হয়ে জ্যাঠাকে বললেন- 'আমার মনে হচ্ছে তোমার ভাইপো তার বাবার মুখ উজ্জল করবে। তুমি ওর দিকে বিশেষ খেয়াল রাখবে। সবচেয়ে ভালো হয় ওকে শহরে পাঠাতে পারলে।'

রাজার কথা মত জ্যাঠা মশাই আমাকে নামী দামী একটি পাঠশালাতে ভর্তি করিয়ে দেন-যেখানে অভিজাত ঘরের সন্তানরা লেখাপড়া করত। পাঠশালার ব্রাহ্মণ সর্বপ্রথম যে শিক্ষা দিলেন-তা ছিল ঘৃণাসূলভ। আমাকে তিনি বলেন- 'তুমি রাজপুত, তাই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়দের ছাড়া বাদবাকী আওয়ামকে ঘৃণার চোখে

দেখবে।' অচ্ছুৎদের সংস্পর্শে আগে কখনো যাইনি, কিন্তু নগর কোটের পাঠশালা থেকে শিক্ষা সমাপন শেষে বাড়িতে এলে বৈশ্য সম্প্রদায়ের বাল্য বন্ধুদেরও ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলাম।

বাড়ি আসার কিছু দিনের মধ্যে জ্যাঠার স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকল। তিনি জায়গীর ও ফৌজী খরচা সামলানোর দায়িত্ব আমায় বুঝিয়ে দেন। দায়িত্ব পাবার পর অনুমান করি-এ জিন্দেগী অতটা মজাদার নয়, যতটা ভেবেছিলাম। জায়গীরের স্বায়ত্বশাসন ছিল না। আমি রাজার জায়গীরদার ছিলাম, আর রাজা ছিলেন বিন্ধ্য সাম্রাজ্যের মহারাজার করদাতা।

অবশ্য নগরকোটের হুকুমত একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। এখানে রাজা-প্রজা ও জায়গীরদার সকলেই ছিল অসহায়। ছিল এখানে মন্দির– পুরোহিতদের একচ্ছত্র শাসন। প্রতিবছর ট্যাক্স আদায় করার জন্য মন্দিরের প্রতিনিধি নগরকোটে আসতেন। তারা কোন প্রকার শিথিলতা না করে ট্যাক্স আদায়ে সর্বদা কঠোর মনোভাবের পরিচয় দিতেন। রাজা-প্রজা ও জায়গীরদারদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থার তারা কোন তোয়াক্কা করতেন না। পুরোহিতদের পক্ষ থেকে কোন কোন বছর এ রকম এলানও আসতো, অমুক মন্দিরে এ বছর স্বর্ণ-রৌপ্যের মূর্তি স্থাপন করা হবে, সঙ্গত কারণে ট্যাক্সের মাত্রাটা একটু বৃদ্ধি পাবে। দেখা গেছে মূর্তির স্বর্ণ জোগাড় করতে গিয়ে দিনমজুর প্রজাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়া হয়েছে।

বিগত যুদ্ধে নগরকোটের মন্দিরে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাহাড় দেখে আমার ধারনা হয়েছে, এগুলো দেবতাদের বরকত নয় বরং ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের নিষ্ঠুর মনোবৃত্তির ফসল। বাল্যকালে আমাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, ব্রাহ্মণরা ধর্মের রক্ষাকর্তা, রাজা-মহারাজারাও তাদের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য।

উত্তর ও পূর্ব ভারতের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসীরা বেশীর ভাগই বৌদ্ধ ধর্মমতাবলম্বী ছিল। পুরোহিত তন্ত্র মন্ত্র তারা বেশ পূর্বেই দেয়ালে ছুঁড়ে মেরেছিল। কাজেই নগরকোটের ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতে শুদ্রদের চেয়ে অধিক ঘৃণার পাত্র হয়েছিল ওরা। নগরকোটের ফৌজ বারবার ঐ এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। এসব অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল লুটপাট ও হত্যালীলা সাধন করে বৌদ্ধদের জানমালের ক্ষতি সাধন করা। হামলার কথা শুনে বৌদ্ধরা তুষারাবৃত পাহাড়ে আশ্রয় নিত। লুটতরাজ করে ফৌজরা প্রত্যাবর্তন করলে ওরা ফিরে আসত। লুটপাটকারীদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল গবাদি পশুর প্রতি। যারা কয়েদ হত তাদেরকে ওখানেই হত্যা করা হত। স্রেফ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের ওরা নিয়ে আসত কালী মন্দীরে। দেয়া হত সেখানে বেদীমূলে বলি। নগরকোটের সীমাহীন নিপীড়ন এসব লোকদের যুদ্ধাংদেহী বানিয়ে দেয়। একবার পাঁচ হাজার সেপাই লুটতরাজ করে ফেরার পথে

সন্ধ্যা হয়ে গেলে তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। সেনাপতির খেয়াল ছিল, বৌদ্ধরা এক্ষণে ক্ষেত-খামারে কাজ করছে, তাই ওদের থেকে কোন প্রকার হামলার আশংকা নেই। কিন্তু সেনাপতির এ ধারনা নিতান্ত ভুল প্রমাণিত হল। সূর্যাস্তের পূর্বেই বৌদ্ধরা ওদের ঘাঁটির আশপাশের পাহাড় ও গাছের আড়ালে তীর-ধনুক তাক করে বসেছিল। আচানক তীর ও পাথরের বৃষ্টি শুরু হল। কপাল ভাল নগরকোটের সৈন্যদের। বৌদ্ধরা সংখ্যায় ছিল খুব কম। নতুবা একজনও বেঁচে আসতে পারতো না। তদুপরি ঐ গেরিলা হামলায় দু'হাজার সৈন্য মারা গিয়েছিল। নগরকোটের ফৌজ কয়েদী ও গবাদী পশু ফেলে পালিয়েছিল সেদিন।

এ হামলার পর দীর্ঘদিন নগরকোটের পুরোহিত-রাজারা বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকায় হামলা করার সাহস পায়নি।

আমার পিতা সেনাপতি হিসাবে নগরকোটের রাজার স্থলে পুরোহিতদের মনোরঞ্জনের জন্য জীবনের শেষদিকে ঐ এলাকায় হামলা করেছিলেন। জয় করেছিলেন বেশ কিছু এলাকা। কিন্তু শীত শুরু হওয়ায় ঐ এলাকা ধরে রাখা সম্ভবপর ছিল না বিধায় তিনি রাজা -পুরোহিতদের নির্দেশে বৌদ্ধদের সাথে সন্ধি করেছিলেন। সন্ধি চুক্তিতে লেখা ছিল, বৌদ্ধ সমাজ বার্ষিক একটা হারে ট্যাক্স দিলে কোন প্রকার হামলা করা হবে না। পাহাড়ী বৌদ্ধরা এ শর্ত মেনে নিলে নগরকোটের ফৌজ ফিরে আসে। পরবর্তী বছর থেকে বৌদ্ধরা তাদের উৎপাদিত ফসলের এক চতুর্থাংশ ট্যাক্স দেয়। কিন্তু রাজা-পুরোহিতরা তাদের চিরাচরিত নিয়ম মাফিক পুনরায় ঐ এলাকায় লুটতরাজ শুরু করেন। বিরক্ত হয়ে বৌদ্ধরা ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়। এ কাহিনী আমি বিশদাকারে খুলে বলছি এ জন্য যে, আমার অতীত উপাখ্যানের সাথে এর গভীর যোগসূত্র রয়েছে। শৈশবে যখন জ্যাঠা মশাইয়ের কাছে প্রতিপালিত হচ্ছিলাম তখন তার সাধ ছিল আমায় বিয়ে দিবেন। সুতরাং তিনি নগরকোটের এক সর্দার– কন্যার সাথে আমার বাগদান করেন। সেই সর্দারের নাম ছিল জগৎ নারায়ণ। ইনি রাজা মহাশয়ের নিকটতম আত্মীয়। জ্যাঠা মশাই আমার এই নতুন সম্পর্কের দরুন বহুত খোশ হয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর করাল থাবা তার সেই আহলাদকে বেশীদিন স্থায়ী হতে দেয়নি। আমার বাগদানের দেড় সপ্তাহ পর তিনি পরলোকে চলে যান।

॥ দুই ॥

বাগদানের দিনগুলোতে আমি যখন খুশী আহলাদে বিভোর ছিলাম, তখন নগরকোটের সর্বত্রই সুলতান মাহমুদের আকস্মিক বিজয়ের দরুন হতাশা নেমে এসেছিল। একদিন রাজা মহাশয় নগরকোটের তামাম সর্দারদের নিয়ে বিন্ধ্য

সাম্রাজ্যের মহারাজাকে সাহায্য করার ব্যাপারে বৈঠক করছিলেন। বৌদ্ধদের ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়ার বিষয়টিও সেদিন আলোচনার টেবিলে স্থান পেয়েছিল।

কিছু কিছু সর্দার মত পেশ করেন, আগে মাহমুদ গজনবীকে প্রতিহত করার চিন্তা করা হোক। মুসলমানদের নাস্তানাবুদ করতে পারলে বৌদ্ধদেরকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যাবে।

অনেকে মন্তব্য করেন, না। সর্বপ্রথম ঘরের ইঁদুরদের শেষ করতে হবে। তারপর মুসলমানদের প্রতিহত করা হোক।

এদিকে রাজা ও সেনাপতিদের দ্বিতীয় প্রস্তাবকে সমর্থন করতে দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ি। বৌদ্ধরা তো বেশ কয়েক বছর ধরে ট্যাক্স বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন হামলা না করে এ নাযুক পরিস্থিতিতে ওদের ওপর হামলা করার কারণ কি? চিন্তা করে দেখলাম, মাহমুদ গজনবীর অগ্রযাত্রা রোধ করার হিম্মত হারিয়ে ফেলেছেন নগরকোটের রাজা ও সেনাপতিগণ। শেষ পর্যন্ত বাঘের সাথে লড়াই করার সাহস হারিয়ে তারা ভেড়ার সাথেই লড়াই করতে প্রস্তুত হন।

মন্দিরের পুরোহিতগণ সম্পদের হিসাব নিকাশ নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। তাদের ধারনা, সুলতান মাহমুদ পাহাড়ী অঞ্চলে আক্রমণ করবেন না। কিন্তু নগরকোটের ফৌজ বিন্ধ্য সাম্রাজ্যের সাহায্যার্থে গিয়ে যদি পরাজিত হয়, সেক্ষেত্রে মাহমুদ নগরকোটে হামলা করবে না-এর নিশ্চয়তা কোথায়? এজন্য সিংহভাগ ঘরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ না করে ঘরে থেকেই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে প্রাধান্য দিলেন।

রাজা মহাশয় বাধ্য হয়ে পুরোহিত ও তার সমর্থনকারীদের মতামতের সামনে মাথা নিচু করে রইলেন, অবশ্য তার শেষ প্রচেষ্টা ছিল-নগরকোটের তামাম ফৌজ বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষ করে যথাশীঘ্র বিন্ধ্য সাম্রাজ্যের সাহায্যে যাক। এতেও বাধ সাধেন পুরোহিতগণ। তারা বলেন, অভিযানের জন্য জায়গীরের ফৌজ পর্যাপ্ত নয়, তাই মন্দির রক্ষার জন্য কিছু ফৌজ রাখতে হবে। শেষ পর্যন্ত রাজা মহাশয়কে এ সিদ্ধান্ত দিতে হল-অর্ধেক ফৌজ যাবে অভিযানে, বাদ বাকী থেকে যাবে মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

সেনাপতি আট হাজার সৈন্য তিনভাগে ভাগ করে অর্ধেকটা নিয়ে পাহাড়ী জনপদের দিকে রোখ করেন। দু'হাজার সৈন্য জগৎনারায়ণ এর অধীনে দিয়ে তাকে নির্দেশ দেন-নগরকোটে উপস্থিত হয়ে সরাসরি যেন পূর্ব জনপদে তার সাথে মিলিত হন। বাকী দু'হাজারকে অন্য এক জনের নেতৃত্বে দিয়ে তাকেও উক্ত নির্দেশ দেন। পূর্ব জনপদের বিক্ষুব্ধ দুশমনকে এ চালবাজি কুপোকাত করতে পারত। কিন্তু দূর্গম পাহাড়ী এলাকায় এ চালবাজি ছিল নিছক নির্বুদ্ধিতা। পাহাড়ী জনতা জানত টিলার সুবিধাজনক স্থানগুলো। কুদরত তাদের কপালে লিখে রেখেছিল দূর্গতি।

সামাজিক দাপটে তাই তারা পারেনি প্রকাশ্যে হিন্দুদের বিরোধিতা করতে। আমাদের ফৌজ হাতেগোনা কয়েকটি ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়েছিল। পাহাড়ী জনপদে এসে ঐ ঘোড়াগুলো একটি সুরক্ষিত ঘাঁটিতে রাখা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আমি ও আমার সেপাইরা সর্দার জগৎনারায়ণের নেতৃত্বে ছিলাম। অভিযানে তার দু'পুত্রও শরীক ছিল। আমাদের কর্মকান্ড নিরিখ করতে সাথে ছিল জনৈক পুরোহিতের ভাই। বেশ কিছুদিন তেমন একটা বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়নি আমাদের। হয়নি কোন হামলা। বস্তিগুলো ছিল জনশূন্য। বৃদ্ধলোক কিংবা বধূ-মাতা সামনে পড়লে আমাদের ফৌজ তাদের কচুকাটা করত। কিন্তু হিন্দু ফৌজের এসব কাপুরুষোচিত রক্তারক্তি তখন আমার ভালো লাগছিল না। যদিও আমি দুশমনদের বিরুদ্ধে অভিযানে এসেছি।

একদিন আমরা খোলা ময়দানে অবস্থান করছিলাম। ফৌজের একটা দল পাশের কোন বসতি থেকে দু'জন মহিলা ও ক'জন নাবালক সন্তানকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছিল। জগৎনারায়ণের নির্দেশে ওদেরকে বৃক্ষের সাথে বাঁধা হল। সর্দার বেছে বেছে ক'জন সেপাইকে বললেন- 'তোমাদের হাতের নিশানা ঠিক কর।' আমি বাধ সাধলে তিনি বললেন- 'তুমি দেখছি পুরুষ হয়েও ক্রমশঃ নারী হয়ে যাচ্ছ অসিৎ! দুশমনদের বিরুদ্ধে এক রাজপূতের অন্তর পাথরের মত সুকঠিন হওয়া দরকার।'

আমি তার জওয়াবে বললাম, 'নারী ও নাবালক বাচ্চারা আমাদের দুশমন নয়।'

'আমরা কি এখানে পাথরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছি? তাকাও আমার দিকে।' বলে তিনি একটি তীর ছুঁড়লেন। তীরটি একটি বাচ্চার বুক এফোড় ওফোড় করে দিল। পর পর তার ধনুক হতে কয়েকটি তীর সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে গেল। নারীদের আর্তচিৎকার চাপা পড়ে গেল পাষণ্ডদের অট্টহাসির কাছে। জগৎ নারায়ণ, তার পুত্র ও সর্দাররা তৃপ্তির হাসি দিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

এরপর যা দেখলাম তা আরো লোমহর্ষক। আমি ওদিকে যাচ্ছি না।

একদিন আমরা দুশমনদের উপর চড়াও হলে তারা পিছপা হয়ে যায়। পরের দিন আমরা একটি গভীর নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নদীটি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত। ওপার যাওয়া সম্ভব ছিল না। সর্দার ভাবছিলেন গাছের সাঁকো তৈরী করতে। গাছের অভাব ছিল না। এক দুপুরেই আমরা সাঁকো বানিয়ে ফেললাম। পার হলাম নদী। জগৎনারায়ণকে বলেছিলাম, সাঁকো পাহারা দিতে কিছু ফৌজ নিযুক্ত করা হোক। দুর্যোগের সময় সাঁকোর প্রয়োজন পড়বে। অনেক পীড়াপীড়ির পর ২০/৩০ জনকে পুল হেফাজতের জন্য রেখে বাকী ফৌজ নিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন। জগৎনারায়ণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সেনাপতির সাথে

মিলিত হতে। ঐ পুলের থেকে তারা ৫০ ক্রোশ দূরে অবস্থান করছিলেন। কিছুদুর অগ্রসর হয়ে আমরা আর একটি নদীর সম্মূখীন হই। হাতের দু'পাশে আকাশচুমো পাহাড়। সরাসরি পাহাড়ের গা বেয়ে টিলায় ওঠা সম্ভবপর ছিল না। এমনিতেই উঁচু পাহাড়, তার উপর ছোট ছোট ডোবা। সঙ্গত কারণে চলতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। দুপুরের মধ্যে আমরা দু'ক্রোশ অতিক্রম করলাম। সামনে ছিল পাহাড় কাটা সুন্দর রাস্তা। জগৎনারায়ণকে বললাম, এ রাস্তা ছেড়ে অন্য কোন রাস্তা ধরতে। তিনি বললেন, আমাদের চলার পথে এ ধরনের পাহাড়ী রাস্তা অসংখ্য।'

'চলুন! নদীর তীরে ছাউনি ফেলি। একদলে গাছ কাটুক। সাঁকো বানাতে হবে তো। সাঁকো বানানোর পর নির্বিঘ্নে নদী পার হওয়া যাবে। পাহাড়ের ঘাঁটিতে দুশমন ওঁৎপেতে থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে পাথরের ঘা খেয়ে সকলকে মরতে হবে।' কিন্তু জগৎনারায়ণ তার ভুল সিদ্ধান্তকে খোঁড়া যুক্তি দিয়ে প্রমাণপুষ্ট করতে প্রয়াসী হলেন। তিনি বললেন, 'দূর্গম পথ আমি এজন্যে বেছে নিয়েছি, যাতে দুশমন আমাদের ভয়ে এপথ ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নেয়।'

'দুশমনদের চর আমাদের পুল বানানো দেখতে পারে। তারা আমাদের চলার সম্ভাব্য পথে টিলার সুবিধামত স্থানে ওঁৎপেতে থাকতে পারে।'

জগৎনারায়ণ বিরক্তিভরে বললেন, 'আমি তোমার সাথে বচসা করতে চাইনা। হিম্মৎ হারিয়ে ফেললে তুমি ফিরে যেতে পার। আমরা নিরাপদ এলাকায় পৌছুলে তোমাকে খবর দেব। তখন চলে এসো।'

ভাবী শ্বশুরের এ স্বগতোক্তিতে আমি ধৈর্য্য হারিয়ে বললাম, বাহাদুরি প্রদর্শনের সময় আসলে আমাকে কাপুরুষের ধিক্কার দিতে পারবেন না।'

জগৎনারায়ণ জবাব দিতে যাবেন ঠিক সেই মূহূর্তে উঁচু টিলা থেকে এক বিভীষিকাময় আওয়াজ ভেসে এলো। সৈন্যরা দাঁড়িয়ে গেল তীর ধনুক নিয়ে।

তারা ভয়ে একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। আমার আশংকা বাস্তবে রূপ নিল। শুরু হল পাথর বৃষ্টি। খানিক পর তামাম সৈন্য রক্ত পাথারে সাঁতরাতে লাগল। যারা অগ্রসর হয়েছিল তারা পিছু হঠতে লাগল। পাথরের ঘা খেয়ে সিংহভাগ নদীবক্ষে ঝাঁপ দিল। বাদবাকীরাও ওদের দেখাদেখি নদীতে ঝাঁপ দিল। জগৎনারয়ণ প্রকান্ড একটি পাথরের আড়ালে বসে চিৎকার করছিলেন। কিন্তু তিনি কি বলছিলেন, তা নিজেও বোধহয় উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। সেপাইরা সকলেই পিছপা হওয়া ছাড়া কোন পথ দেখল না। অবশ্য মাত্র চারজন ছাড়া সকলেই নদী বক্ষে হাবুডুবু খাচ্ছিল তখন।

যে দুর্গম পথে সন্তর্পনে অগ্রসর হয়েছিলাম গত দিন ধরে, সে পথে পিছপা হলাম আমরা। ভাগ্যিস পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষের ঝাড় ছিল। শত্রুরা আমাদের না

দেখে এলোপাতাড়িভাবে পাথর ছুঁড়ছিল। সুতরাং তাদের সিংহভাগ পাথরই বৃক্ষ সমূহে টক্কর খেয়ে ওদের নিশানা ব্যর্থ করে দিল। আমাদের সৈন্যরা পাথরের আঘাতে যতটা ধরাশায়ী হয়েছিল, তার চেয়ে অধিক ধাক্কাধাক্কি করে গভীর খাদে নিপতিত হল। পেছনের পুলের দিকে যতই অগ্রসর হচ্ছিলাম পাথরের বৃষ্টি ততই কমে আসছিল। পুলের আধা ক্রোশ আগে সমতল ভূমি ছিল। পাহাড়ের টিলা থেকে তীর ও পাথর বৃষ্টি ভাঁটা পড়লেও কদাচ দু'একটা তীর এসে আমাদের ঘাবড়ে দিচ্ছিল। আচানক একটা তীর এসে আমার বাহুতে বিঁধল। কিন্তু আমাকে শুশ্রূষা করার মত পরিবেশ সেখানে ছিল না। জগৎনারয়ণের এক পুত্র আমার চোখের সামনে ঘায়েল হয়েছিল। অন্য পুত্রকে হাজার তালাশ করেও পাওয়া যায় নি।

পুলের কাছে এসে দেখলাম ৫০/৬০ জনের মত গেরিলা আমাদের লোকজনের উপর হামলা করছে। পাহারাদাররাও সাধ্যমত ওদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। কালবিলম্ব না করে আমরাও হামলা করলাম। ভাগিয়ে দিলাম হামলাবাজ গেরিলাদেরকে। সামনের রাস্তা ছিল দূর্গম। গেরিলাদের হামলার শংকায় তখন পর্যন্ত আমাদের ফৌজ ভীত সন্ত্রস্ত। পুলটি নেহায়েত সরু। এক একজন করে পার হতে পারতো। গেরিলারা এ সুযোগে তুমুল লড়াই শুরু করল। কিন্তু আমাদের তীর বৃষ্টিতে ওরা টিকতে না পেরে পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে আর কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে খরস্রোতা নদীতে। আমরা কাউকে বাঁচার সুযোগ না দিয়ে মরণপণ হামলা করে ৪০/৫০ জনকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দিলাম। অবশ্য বিনিময়ে হারালাম আমাদের অর্ধেক ফৌজ।

জগৎনারায়ণের হুঁশ ছিল না। তিনি পাগলের মত পুত্রদের নাম ধরে ডাকছিলেন। ফৌজরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পুল পার হচ্ছিল। পুল ভেঙ্গে পড়ার আশংকায় আমি নদীর তীরে এসে সকলকে সাবধানে পার হতে বলি। শ'দু'য়েক সেপাই তখনও ওপারে ছিল। আচানক পাহাড় থেকে তীর বৃষ্টি শুরু হল। বিকট চিৎকার দিয়ে হাজার খানেক গেরিলা নীচে নেমে এলো। ৫০ জন সৈন্য নিয়ে আমি দুশমনদের পথ আগলে দাঁড়ালাম। মারা পড়ল আমার বহু সৈন্য। আমার ঘাড় ও কোমর তরবারীর আঘাতে জর্জরিত হল। অবশ্য দুশমনদের পুল পর্যন্ত পৌছতে দেইনি। আমার সহায়তায় বাকী ফৌজ পুল পার হতে থাকে। তবে হারিয়ে ফেলি ইতিমধ্যে শ'দেড়েক ফৌজ। দুশমনের ক্রমাগত হামলায় ভীত হয়ে সম্মিলিতভাবে ফৌজরা পুলের উপর চড়লে পুল ভেঙ্গে পড়ে। আমি কাল বিলম্ব না করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। অলৌকিকভাবে বেঁচে যাই। সাথীদের অনেকেই পুল পার হয়ে অগ্রসর হয়েছিল। বাদ বাকীরা ভাঙ্গা পুলের কড়িকাঠ ধরে জান বাঁচানোর কোশেশ করছিল। কিন্তু খরস্রোতা নদী ঐ কড়িকাঠকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমরা এতক্ষণ

গেরিলারদের তীরের হামলার আওতায় ছিলাম। কিন্তু নদীর অপর প্রান্তে গিয়ে গেরিলাদের সম্মিলিত হামলার সম্মুখীন হলাম। ওদের হামলার ধরণ আমাদের থেকে ভিন্নতর ছিল। আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দেখে ওরা অস্ত্র তুলে শ্বাস নিচ্ছিল।

প্রকান্ড একটি পাথরের সাথে টক্কর খেয়ে আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। কুদরত আমাকে বাঁচানোর জন্য একটি কাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমি ঐ কাঠ জড়িয়ে ধরছিলাম। প্রবল স্রোত আমাকে দ্রুত ভাসিয়ে নিচ্ছিল। ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছিল নদী। কিছু দূর পর নদীটি একটি খালের মত অনুমিত হল। দু'পাশে আকাশ চুম্বি পাহাড়ের দেয়াল। সঙ্গীদের কেউ ছিল না আমার সাথে। সেদিনের ভয়াল কাহিনী মনে পড়লে লোমকূপ এখনো শিউরে উঠে। কাষ্ঠ খন্ডটি আমাকে স্রোতের তালে তালে নিয়ে যাচ্ছিল। জানি না পরিণতি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে। হয়ত সামনে বরফের সমুদ্র আসবে। জমে ঠান্ডা হয়ে যাবো আমি। কিংবা পাথরের ক্রমাগত টক্করে আমার ভবলীলা সাঙ্গ হবে। এ ধরনের শংকায় হার লমহা কাটাচ্ছিলাম। এক্ষণে কতদুর এসেছি তা বোঝার উপায় ছিল না। যখমের জ্বালায় আমি অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলাম। এভাবে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমি মারা পড়ব-এখন কি করা? খালের আকৃতি শেষ হয়ে সামনে প্রশস্ত নদী দেখতে পেলাম। শুনতে পেলাম পাহাড়ের গাঁ বেয়ে পড়া ঝর্ণার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। আমি সাঁতরে একটি ডোবায় ঢুকলাম। ডোবাটি দেখতে একটি কূপের মত। ঝর্ণার পানি এসে ঐ কূপের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করছিল। কূপের মধ্যে থাকলে নিশ্চিত মৃত্যু ভেবে একপাশে সরে গেলাম। আচানক একটি ডুবোচর আমার দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। বেশ গাছপালা ও ঝোপ-ঝাড় নির্জন এ নদী বক্ষে নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের স্বাক্ষর বহন করছিল।

॥ তিন ॥

কুদরত আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করছিলেন। কাষ্ঠ খন্ডটি ছেড়ে ঐ চরে উঠলাম। বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহা আমার চলৎ শক্তিহীন দেহে প্রাণের সঞ্চার করল।'

থামলেন আব্দুল ওয়াহিদ। রণবীরের দিকে একনজর তাকিয়ে বললেনঃ 'উপখ্যান দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে ফেলছি। তুমি বিরক্ত হচ্ছ না তো? রণবীর চকিতে জবাব দিল, 'না! না!! এ উপখ্যান সারা রাত ধরে শোনার ধৈর্য্য আমার আছে। মনে হচ্ছে আমি নিজেই মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসেছি।'

আব্দুল ওয়াহিদ তার কাহিনী পুনরায় শুরু করলেন–

'চরে বসে এদিক ওদিক নযর বুলিয়ে নিলাম। চরের এক পাশে মানুষের পায়ের ছাপ দেখে উপলব্ধি করলাম- এখানে মানুষের বিচরণ আছে। পায়ের ছাপগুলো অনুসরণ করে চলতে থাকলাম। কি জানি, হয়তো কোন লোকালয় মিলেও যেতে পারে। কিন্তু নির্জন এ মরণপুরীতে লোকালয় যে আমার জন্য আরও ভয়াল হতে পারে-তখন ঐ চিন্তা করার পরিবেশ ছিল না। পশ্চিম গগণের লাল নীলিমা সূর্য ডোবার সংবাদ দিচ্ছিল। যখমের জ্বালা আর শীতের ঠক্ ঠক্ দৈহিক কম্পন আমাকে অসার করে দিয়েছিল। কিন্তু একটি শংকা আমাকে পেয়ে বসেছিল, মাথা গোজার ঠাঁই খুঁজে না পেলে হাড় কাঁপানো শীতে মরতে হবে। তীরের যখম আর শীতের শিশিরে আমার চোখ সর্ষে ফুল দেখছিল। তবুও হিম্মত না হারিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে অগ্রসর হতে থাকলাম। টিলার উপর ১৫/২০ কদম চলতেই একটি ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেলাম। দাঁড়িয়ে থাকলাম চিত্রার্পিতের মত। উপলব্ধি করলাম শত্রুর হামলা আসন্ন। সজাগ হয়ে উঠল আমার প্রতিরোধ শক্তি। হাত চলে গেল কোষাবদ্ধ তরবারীর বাটে। মনে হচ্ছে, শত্রু আমাকে উপরে দেখলে চেচামেচি শুরু করবে। মুহূর্তে তার সাহায্যে জড়ো হবে অসংখ্য সাথী। এ আশংকায় নেমে এলাম টিলা থেকে। টিলার গাঁয়ে পিঠ রেখে শিকারী বিড়ালের মত পরবর্তী ঘটনা দেখার আশায় রইলাম ওঁৎপেতে। বাড়ছিল আমার মনের ধুক-ধুকুনী দ্রুত।

আওয়াজ যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, একটি ছায়ামূর্তি এদিকে আসছে। কাছাকাছি এলে দেখি সে এক নারীমূর্তি। নারীটিকে দেখে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। ওর কাঁখে একটি কলসি। নদী থেকে পানি ভরে কলসি কাঁখে নিল সে। ভাবলাম কলসি নিয়ে প্রত্যাবর্তনের সময় আমাকে ও অবশ্যই দেখবে। পারবো ওকে সহজেই কুপোকাত করতে। কিন্তু দেবতা সমাজের পুজারী হওয়া সত্বেও আমার হিম্মত হল না। টিলার পাদদেশ থেকে সোজা নদীর কিনারে চলে এলাম, একেবারে ওর মুখোমুখি। কলসী ভরে কাঁখে তুলতেই আমাকে দেখে নারীমূর্তি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঝাঁপসা আলো আঁধারীতে তাকিয়ে দেখলাম, সে এক অনুপম সৌন্দর্যের অপূর্ব প্রতিমূর্তি!

তলোয়ার কোষাবদ্ধ করে বললাম, 'ভয় নেই। তোমাকে কিছু বলব না। কিন্তু চেঁচামেচি করলে তোমার উপর হাত উঠাতে বাধ্য হব।'

যুবতী ভাঙ্গা আওয়াজে বললো, 'তুমি ....তুমি কে?'

'তুমি শুধু আমার একটি প্রশ্নের জবাব দাও, তোমার পিছে আর কেউ নেই তো?'

সে বললো, 'না! কিন্তু আমার গায়ে হাত দিলে খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিব।'

দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলছিলাম আমি।

উঠলাম কোনক্রমে তীর থেকে উপরে।

জিজ্ঞাসা করলাম ওকে,

'তোমাদের বসতি এখান থেকে কতদূরে?'.

'কাছে।'

'এর মতলব হচ্ছে, সন্ধ্যা নাগাদ আরও অনেকে পানি নিতে আসবে!'

'না! বসতি একেবারে খালি। বসতির লোকজন জঙ্গলে পালিয়ে গেছে।'

'সত্যি কথা বললে তুমি বাঁচতে পার, আমার ওয়াদা এক রাজপুতের ওয়াদা।'

'এক বর্ণও মিথ্যা বলছি না।'

'তোমার মত ভরা যৌবনা মেয়েকে রেখে ওরা বসতি ছেড়ে পালিয়েছে? কেমন যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না।'

ঘরে আমার অন্ধ ঠাকুর দাদা আছেন। যেতে পারলাম না তাকে ছেড়ে। ভাইয়া এখন পর্যন্ত ফিরেন নি। তিনি এলে অবশ্য ঠাকুর দাকে নিয়ে আমিও গা ঢাকা দিতাম।'

যুবতীর চোখের টল টল অশ্রু আমাকে প্রভাবিত করল। এতদসত্ত্বেও আমি ওর কথায় আশ্বস্ত হতে পারছিলাম না। বললাম, 'সন্ধ্যা নাগাদ তুমি এখানে থাকবে। একটি কাক-পক্ষীও এদিকে এলে দু'টুকরো করে তোমাকে নদী বক্ষে ভাসিয়ে দিব। তোমার কথা সত্যি হলে আমি তোমাদের জনপদে যেতে পারি।'

আমার কথায় যুবতীর ভয় ও ঘৃণা, ধিক্কারে পরিণত হল। সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বললো, 'না। আমাকে হত্যা করতে পারো, কিন্তু তোমাকে নিয়ে কিছুতেই ঠাকুর দাদার কাছে যাব না। তাকে এমন এক জনপদে রেখে এসেছি, হাজার তালাশ করেও তুমি তাঁর সন্ধান পাবে না।'

চিন্তা করে দেখলাম-মাথা গোজার ঠাঁই না পেলে আমার জিন্দেগী কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। রাতের আঁধারে কিছুতেই একাকী চলতে পারব না। এ যুবতীই আমার শেষ ভরসা। ওর সাহায্য ছাড়া আগামীকালের সূর্য দেখা সম্ভব নয়। অসহায় অনুভূতি আমার শরীরকে নিস্তেজ করে দিয়েছিল। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল আমার অহমিকাবোধ।

যুবতীর দৃষ্টি বলছিল, তুমি চলৎশক্তিহীন মুসাফির। আমার ভাবনা জাল ছিন্ন হল ওর কথায়–

'জানি, তুমি নগরকোটের সেপাই, তোমার কাছে কৃপা ভিক্ষা করছি না। অসহায় মানুষের খুন দেখে তোমাদের দেবতাগণ হাসিতে লুটোপুটি খান। আমাকে হত্যা করতে চাইলে জলদি কর। হাতে তোমার তলোয়ার। দৃষ্টি বন্ধ করছি আমি। আর দেবতাদের পূজারী হওয়া সত্ত্বেও মানবতাবোধ তোমাকে এক অসহায় নারীর

উপর হাত ওঠাতে বাধা দিলে আমার পথ ছেড়ে দাও। জনপদটি হিংস্র প্রাণীতে ভরপুর। সন্ধ্যা নেমে আসতেই রাস্তায় ওঁৎপেতে থাকে বাঘ-সিংহ।'

তরবারী দূরে ছুঁড়ে মারলাম। বললাম, 'তুমি যেতে পার।'

আমার কথা ওর অন্তরে দাগ কাটল। দাঁড়িয়ে রইল ও কিছুক্ষণ স্থানুর মত। কাঁখে কলসি উঠিয়ে বললো, 'তুমি যখমী!'

উত্তর না দিয়ে চোখ দু'টো বন্ধ করলাম শুধু।

ও বললো, 'এখানে রাত্রি যাপন করতে পারবে না। এসো আমার সাথে!'

কিছু না বলে ওর পিছু নিলাম। পাথুরে জমীন। চলছিলাম পা পা করে। পনের-বিশ কদম হেঁটে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলাম। ও প্রাথমিক শুশ্রূষায় সেরে উঠলে তাজাদম হয়ে চলতে লাগলাম। আমার বাঁ দিকে সবুজ শ্যামল চারণ ভূমি। ডানে বিশাল জল প্রপাত। পাহাড়ের কান্না যেন ছলাৎ ছলাৎ করে নেমে যাচ্ছে অবিরাম ধারায়। স্বল্প দূরে উপত্যকায় বেশ কয়েকটি বসতি দেখলাম। কিন্তু ততক্ষণে প্রায় অসার হয়ে পড়েছি। মুখ থুবড়ে আবারো পড়ে গেলাম সবুজ ঘাসের উপর। ও আমার কাছে এসে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'দেখ, ঐ আমাদের বসতি। হিম্মত কর। আমি ভেবে পাচ্ছিনা তুমি যখমী অবস্থায় নদীর ধারে কি করছিলে?

বললাম, 'নদীতে ভেসে এখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম ভাগ্য দেবতার।'

কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়ালাম। বসতি নিকটবর্তী হলে আমার সন্দেহের পর্দা সরে যেতে থাকে আস্তে আস্তে। যুবতী এক হাত দিয়ে আমাকে ধরে চলছিল। মনে হল-এ কোন শত্রুর হাত নয়। বসতির দরজায় এক অন্ধ বৃদ্ধ আওয়াজ দিলেন– 'আশা! আশা!!' তার দরদ মাখা আওয়াজের মধ্যে ব্যথার মোচড় ছিল।

যুবতী তাকে বললো, 'ঠাকুরদা! এই তো আমি এসেছি।'

বৃদ্ধ হাতড়াতে হাতড়াতে সামনে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে বললেন, 'খুকী! এত দেরী করলি যে? তুই আর কিছুক্ষণ দেরী করলে আমি হয়তো তোর খোঁজে বেরিয়ে কোন গভীর খাদে নিপতিত হতাম।'

যুবতী আমার হাত ছেড়ে বৃদ্ধ লোকটির হাত ধরল। নিয়ে গেল তাকে ঝুপড়ির মধ্যে। এদিকে আমি তখন ঘাসের উপর বসে হাঁপাতে থাকি।

বেশ কিছুক্ষণ পর আধমরা অবস্থায় আমার চোখ খুলে গেলে দেখতে পেলাম-যুবতী আমাকে উঠাতে চেষ্টা করছে। মনে হল-ও আমাকে বসতির ভেতরে নিয়ে যাবে। গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গলে দেখি-একটি কোমল বিছানায় শায়িত আমি। আর ও পট্টি বাঁধছে আমার যখমে। ঝুপড়ির কোনে টিম টিম করে জ্বলছে কুপি। লম্বা

একটি টেবিলে আমার কাছেই শুয়ে আছে আর কেউ। পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুকিয়ে এলে পানি চাইলাম। আশা সারা রাত্রিই বিনিদ্র। পানির কথা শুনতেই সে মটকা ভরে পানি এনে আমার মুখে তুলে দিয়ে বললো, 'তুমি কিছু খাওনি। দুধ গরম করে রেখেছিলাম। ঠান্ডা হয়ে গেছে। আবার গরম করে দেই।'

ও দুধ গরম করতে বসে গেল। লজ্জা শরমে আমার দিল-মন কুঁকড়ে যাচ্ছিল।

বৃদ্ধ আমার বিছানায় এসে ললাটে হাত দিয়ে বললেন, 'তোমার জ্বরের তাপ এখনো কমেনি। তুমি জলদি সেরে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস। যৌবনের যখম চট জলদি চাঙ্গা হয়ে যায়।'

তৃতীয় দিন। আমার জ্বর সেরে উঠল। বলতে পারছিলাম ওদের সাথে প্রাণ ভরে কথা। বৃদ্ধ তখন পর্যন্ত এমন কোন প্রশ্ন করেননি যার জবাব দিতে আমাকে ইতস্ততঃ করতে হয়। এমনকি আমি কবে কি করে যখম হলাম– জিজ্ঞেস করেননি তাও। খুব সম্ভব আশা তাকে বলেছে-আমি নিকৃষ্ট দুশমন ফৌজের এক সেপাই।

আশা নদীতে পানি আনতে গেলে আমার অন্তর লোক ব্যথা ও অসহায়ত্বের দরুন ভেঙ্গে পড়ছিল। মনের জমাট ব্যথা দূর করতে বৃদ্ধকে বললাম, 'জানেন আমি কে?'

তিনি এতমিনানের সাথে বললেন- 'জানি।'

'কালচক্র আমাকে এ পরিস্থিতির সম্মুখীন না করলে আমার তলোয়ার বস্তিবাসীর খুনে রঙিন হতো, তাও জানেন কি?'

'জানি, কিন্তু আমার মন বলছে তুমি অপরাধী নও। তুমি যে সমাজের কোলে চোখ খুলেছিলে সে সমাজ তোমাকে কেবল নিম্ন জাতের রক্ত দিয়ে হোলি খেলতে শিখিয়েছে– মানবতার কান্না শুনে উৎকর্ণ হতে শেখায়নি। তুমি ওইসব দেবতাদের সেপাই-পূজারীদের সীনা হতে হৃৎপিন্ড বের করে সেখানে পাথর বসিয়ে দেন যারা।'

'সেই পাথুরে মনবিশিষ্ট একজন সেপাইকে আপনি জিন্দা রাখতে চাচ্ছেন?'

'না, খোকা না। পাথুরে অন্তর তোমার ঠিক তখনই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে-আশার মত এক অচ্ছুৎ মেয়ের সেবা গ্রহণ করতে তুমি যখন অস্বীকার করোনি। এক্ষণে একজন প্রকৃত মানুষের হৃদকম্পন আমি তোমার সীনা থেকে শুনতে পাচ্ছি। এমনটি না পেলেও এ বসতিতে তোমার সেবার বিন্দুমাত্র হেরফের হত না। এ বিরান বসতিতে দুশমনের বেশে নও বরং একজন আশ্রয়গ্রহীতা হিসাবে এসেছো তুমি। হায়! আমার চোখ দুটি যদি ভালো থাকতো! আহা! আমি যদি তোমার সেবা করতে পারতাম!'

তার কথা দ্বারা অনুধাবন করলাম- বস্তির লোকজন নগরকোটের ফৌজদের অগ্রাভিযান রোধকল্পে দক্ষিণমুখো হয়েছে। ইত্যবসরে তারা শুনতে পায়, উত্তর দিক থেকে ধেয়ে আসা ফৌজের কথা। নারী-শিশু যারা ছিল জঙ্গলে পালিয়েছে। এক্ষণে রয়ে গেছে সে সব বসতিতে লোকজন-যাদের আপনজন দক্ষিণমুখো হয়েছিল। কিন্তু যখন তারা জানতে পেরেছিল যে, উত্তরের ফৌজ নদীতে সাঁকো নির্মাণ করছে, তখন তারা সদলবলে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। বৃদ্ধ আশা কে বুঝিয়েছিলেন, তুমিও ওদের সাথে পলায়ন কর। কিন্তু অন্ধ ঠাকুর দাকে ছেড়ে আশা পালায় নি। এক্ষণে এরা দু'জন আশার ভাইয়ের অপেক্ষা করছে। সাঁকো পার হবার পর যে গেরিলা হামলার শিকার হয়েছিলাম আমরা, তা আদ্যোপান্ত শুনালাম তাকে।

তিনি বললেন, 'জানিনা! সে আক্রমণে আমাদের বসতির কত লোক হিস্যা নিয়েছে। লড়াই করার মত তাগড়া নওজোয়ানরা সকলেই দক্ষিণমুখো হয়েছিল। যারা তোমাদের সাথে টক্কর দিয়েছে তারা সকলেই পূর্ব কিংবা উত্তর জনপদের লোক।'

জনপদের লোকজন পলায়ন কালে তাদের গবাদী পশু-পাখি রেখে গিয়েছিল। সারাদিন বিচরণ করে ওরা ঘাস পাতা খেয়ে বস্তিতে ফিরে আসত। হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আশা রাতের বেলা ওগুলোকে ঘরে আটকে রাখত। ছেড়ে দিত সকালে। এতদসত্ত্বেও বেশ কিছু পশু বাঘের পেটে চলে গেছে। আশার নিরাপত্তা নিয়ে আমিও কম পেরেশান নই। বসতির আশেপাশে শত্রু ছাড়াও হিংস্র পশুর ভয় থাকা সত্ত্বেও পানি আনতে নদীতে যেতে হয় ওর। মটকা ও সোরাহী ভরা পানি শেষ হয়ে যায় পশুর স্নান ও পান কার্যে। আশা একদিন দেরী করায় আমি নেহায়েত ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিলাম। দেরী করার কারণ জিজ্ঞাসিলে ও বললো- 'একটি বাঘ এক ছাগ শিশুর ঘাড় মটকে রক্ত পান করছিল, তাই ওর দেরী হয়েছে।'

আমি তাকে বললাম, 'যে পানি এখানে মজুদ আছে তাতে বোধকরি তিন/চার দিন কেটে যাবে। ফুরিয়ে গেলে আমিই পানি আনবো। তোমাকে আর যেতে হবেনা।'

আশা মুচকি হাসির কোশেশ করে বললো, 'হিংস্র প্রাণী অতি ক্ষুধার্ত হয়ে হামলা করে। কিন্তু এক্ষণে আমাদের পশুগুলোর প্রাত্যহ্যিক দু'একটির রক্ত পান করতে করতে ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই আমার রক্তের প্রতি ওদের তেমন একটা আগ্রহ নেই।'

বৃদ্ধ লোকটি লাঠি ভর করে বাইরে বেরুলেন। খানিকটা পায়চারি করে ফিরে এসে বললেন, 'জল আনতে যাওয়া লাগবে না। কাল নাগাদ বৃষ্টি হবে।'

আমি শুয়ে শুয়ে বললাম, 'আকাশে মেঘের আনাগোনা নেই।'

বৃদ্ধ বললেন, 'বাতাসের আর্দ্রতা বলছে বৃষ্টি হবে।'

সন্ধ্যার দিকে উত্তর গগণে বিভীষিকাময় মেঘ ধারণ করল। অনবরত বজ্রধ্বনি বৃষ্টির আগাম সংবাদ দিচ্ছিল।

আশা বলছিলঃ 'ঠাকুর দাদার কথা কখনোই মিথ্যা হয়না।'

খানিক পর। মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলো। আশাকে আর নদীতে যেতে হবেনা ভেবে বেশ আনন্দ লাভ করছিলাম। রিমঝিম বৃষ্টির ছন্দ পতন আর পুলকিত যৌবনের ঐ সন্ধ্যায় এক কুৎসিত তরুণীর প্রতিও আমার অনুরাগ সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়, আর আশাতো এমন নজর কাড়া সৌন্দর্যের অধিকারিনী- যাকে রাস্তায় এক নজর দেখে আমি নিজেকেই ভুলে গিয়েছিলাম। তার স্মিত হাসি দেখে সেদিন উপলব্ধি করছিলাম-উজার বসতির নিঃসঙ্গতা ওর হাসি কেড়ে নিয়েছে। ওর হাসিতে ছিল বিষাদের একটা মলিন ছাপ। করুণ সেই হাসিকে জীবনের অবলম্বন বানিয়েছিলাম সেদিন। ওর করুণ হাসি যেন মেঘের আড়ালে চাঁদের দীপ্তি। ওর চেহারা প্রায়ই কালো থাকতো। থাকতো ভাই-এর বিরহে খুব পেরেশান। প্রত্যহ সে টিলায় উঠে ভাই-এর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনত। এমনকি সকালে নাস্তা তৈরী করে ভাই-এর জন্য একভাগ রাখত। সন্ধ্যার দিকে বাসী রুটি খেয়ে ভাইয়ের জন্য রাত্রির তাজা খানা রেখে দিত। ভাই এলে যেন বাসী খাবার না খায়-এজন্যই ওর এই সাধনা।

।। চার ।।

অতীতের গর্ভে যতই দিন এবং মাসগুলো হারিয়ে যাচ্ছিল ততই আমার পেরেশানী বাড়ছিল। জগৎনারায়ণ অবশ্যই প্রতিশোধ নিতে এ জনপদে হামলা চালাবে। তার ফৌজ এ বস্তি থেকে খুব একটা দূরে ছিল না। নগরকোটের পরাজিত ফৌজ এখানে এলে নির্জন বস্তিতে যে আগুন ধরিয়ে দিবে, তাতে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। দু'পুত্র হারানোর প্রতিহিংসা তাকে পশু বানানোই স্বাভাবিক। অবশ্য আমার উপস্থিতিতে আশা ও তার ঠাকুর দার উপর জগৎনারায়ণ কোন হামলা চালাবে না বলে আমার বিশ্বাস ছিল। হতে পারে আমি জগৎনারায়ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তার ফৌজ আমার পতাকা তলে সমবেত হবে, যদিও এর পরিণতি সুখকর হবে না। বিদ্রোহের হুমকি দেয়া হলে আশা ও তার ঠাকুর দার প্রতি হামলা না হলেও তাদেরকে রাজা পুরোহিতদের সামনে বন্দী করে পেশ করা হবে। সম্মুখীন হবে ওরা সেক্ষেত্রে নিষ্ঠুর নির্যাতনের। নগরকোটের ফৌজ হারানোর প্রতিহিংসা তাদেরকে পশু বানাবে।

সাত দিন পর। আমি চলাফেরা করার মত সুস্থতা ফিরে পেলাম। আশা দুধ দোহন করছিল। ওর নিকটবর্তী একটি বৃক্ষের নীচে এসে দাঁড়ালাম। দুগ্ধ দোহন শেষে ও উঠে দাঁড়ালে আমি বললাম, 'আশা! তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।'

দুধের পাত্র আমার কাছে রেখে বললো, 'বলো!'

'তোমার এখানে অবস্থান করা সমীচিন নয়। আমার ভয় হচ্ছে, নগরকোটের ফৌজ এখানে আসে কিনা।'

'তোমার কথার মতলব হচ্ছে, অন্ধ ঠাকুর দাকে রেখে আমি পালিয়ে যাব?'

'না আশা! তোমার দাদার সাহায্যার্থে আমি যে কোন ত্যাগ দিতে প্রস্তুত।'

'তুমি এখনও পুরোপুরি সুস্থ নও। তুমি চাঙ্গা হলে সুন্দরের অপেক্ষা করতে হত না।' সুন্দর ওর ভাইয়ের নাম।

'আমি ওয়াদা করছি, তোমাদের একটি নিরাপদ স্থানে পৌছে দেব। ফিরে এসে একাকী অপেক্ষা করবো তোমার ভাইয়ের। সে এলে অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হব।'

আশা বললো, 'তোমার সুস্থতা কিন্তু তা বলছে না। তাছাড়া তুমি তো বলেছিলে, নগরকোটের ফৌজ বরফাচ্ছাদিত পাহাড় মাড়িয়ে এখানে পৌছুতে সক্ষম হবে না। অবশ্য এসে পড়লে তখন পালানো যাবে। আমার ঠাকুর দা অতিশয় দুর্বল। তিনি অনবরত হাঁটার শক্তি রাখেন না। এক্ষণে পালালে আমাদের রক্ষা নেই। দাদার দৈহিক দুর্বলতা আর আমার নারীত্বের দুর্বলতা; দু'টির সমন্বয়ে আমরা নেহায়েত অসহায়। এ মুহূর্তে শত্রু-মিত্র সমান।'

'কেন, আমি আছি না? শোন লক্ষীটি, তোমার এখানে কিছুতেই থাকা হবে না। ভগবানের ইচ্ছা থাকলে, তোমার ভাই অবশ্যই আমাদের সাথে মিলিত হবে। তুমি এক অবলা নারী। দেখনি চিতা বাঘ কি নির্দয়ের সাথে নিরীহ পশুপালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? আমি যতদূর জানি, নগরকোটের ফৌজ চিতা বাঘের চেয়ে নির্দয়। ক্ষুধা নিবারণ হলে চিতা ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের সমাজস্থ চিতাদের রক্ত-ক্ষুধা কভু মিটে না। নিজের জীবন দিয়ে তোমাদের রক্ষা করার নিশ্চয়তা থাকলে আমি তোমাকে এ পরামর্শ দিতাম না। আমার যত ভয় দু'পেয়ে বাঘদের নিয়ে। তোমার ভাইয়া ফিরে এসে বসতি খালি দেখে নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারবে-তুমি ও ঠাকুর দাদা জংগলে পালিয়েছ। আমি ওয়াদা করছি- সে তোমাদের তালাশ করে না পাওয়া পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গ ছাড়ব না। নিজের জীবন বাঁচাও আশা! নিজের জন্য না হলেও কমপক্ষে আমার জন্য।'

আবেগের অতিশয্যে শেষ বাক্যটি বেরুল আমার মুখ থেকে। আশা অর্ধ নিমীলিত কাজল কালো চোখে আমার দিকে তাকালো।

চোখ মুছে ও বললো, 'তুমি আমার জীবনের মূল্য অনেক বাড়িয়ে দিলে। আমি প্রস্তুত! চলো এখুনি! এ মুহূর্তে।'

'এখন না! অতি প্রত্যুষে আমরা বেরুব।'

'তুমি চলতে পারবে তো?'

আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। গোড়ালির ব্যথা উঠলে পালাক্রমে জিরিয়ে নিলেই চলবে। আমি ঠাকুর দার সাথে কথা বলতে যাচ্ছি।'

আমি উঠে অন্দরে যেতে ছিলাম......, অকস্মাৎ আশা 'ভাইয়া! ভাইয়া!!' বলে চিৎকার দিয়ে উঠল। ৩০ গজ দূরে এক নও জোয়ানকে দু'হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে মুখ থুবরে পড়ে যেতে দেখলাম। তার রক্তাক্ত শরীর বলে দিচ্ছিল-সে যখমী। ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত তাকে পাজাকোল করে ঘরে নিয়ে এলাম।

আশার ঠাকুর দা চিৎকার করছিল। 'আশা! আশা!! তুই কোথায়রে খুকী? কোথায় তোর ভাইয়া?'

এদিকে সুন্দর আর্তস্বরে বলছিল, 'আশা দ্রুত পলায়ন কর। আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে সাহায্য করতে হবে না। জলদি তৈরী হও। আশা পালাও। ওরা আমার পশ্চাদ্ধাবন করছে। এখুনি ওরা এসে পড়বে।'

বিকট চিৎকার দিয়ে সুন্দর বললো, 'ওরা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসছে। নদীর তীর দিয়ে পলায়ন কর। আমার বেশ কিছু সঙ্গী সাথী তোমার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। জলদি, সময় নষ্ট কর না। ঠাকুর দাকে বোঝাও।'

একথা বলার সাথে সাথে সুন্দরের মুখ থেকে গল গল করে রক্ত রেরিয়ে এলো। পড়ে গেল সে মুখ থুবড়ে। আমি ঝাঁকুনি দিয়ে ওকে ওঠাতে ব্যপৃত হলাম। কিন্তু ওর জিন্দেগীর সফর ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। পেট ফেড়ে নাড়ী ভূঁড়ি বেরিয়ে আসা ব্যক্তির পক্ষে এখানে পৌছা রীতিমত ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল। আশা স্থানুর মত দাঁড়িয়ে ভাইয়ের মৃত লাশের দিকে তাকিয়েছিল। আমি এক হাতে ঠাকুর দা, আরেক হাতে আশাকে ধরে নদীর দিকে ছুটলাম। ঝটপট করে আশা কিছু দূর গিয়ে থেমে গেল। বললো, 'ভাইয়ের লাশের সৎকার না করে আমি কোথাও যাব না।' বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা বসে পড়লেন জমীনে।

আমি বললাম, 'মহাশয়, আশার জীবন বাঁচানোর এই হচ্ছে শেষ সুযোগ। ভগবানের দিকে তাকিয়ে আপনি আপনার পৌত্রিকে রক্ষা করুন।'

বৃদ্ধ বললেন, 'আশার জীবন বাঁচাতে পারলে তুমি ওকে নিয়ে যাও। আমি তোমাদের সাথে যেতে পারবো না বাপু। পায়ের গোড়ালী আমাকে বহন করতে পারছে না। আশা তুই ওর সাথে যা। আমি হাত জোড় করে বলছি খুকী।'

আশাকে জোর করে নিয়ে চলতে থাকি। খানিক পর জীবনের মহব্বত ওর অতীতকে ভুলিয়ে দিল। সুন্দর এক ভবিষ্যতের আশায় ও আমার সাথে চলতে লাগলো। কিন্তু আধা ক্রোশ যেতে না যেতে আমার চলৎশক্তি রহিত হয়ে গেল।

কোন রকম পা পা করে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করে উপকূলীয় একটি জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। এক্ষণে আশা আমাকে পথ দেখাতে লাগলো।

আচানক পাহাড়ের আড়াল থেকে ক'জন সৈন্য বেরিয়ে এল। আশার ভাই যাদের কথা বলছিল- ওরা তারা। এক নওযোয়ান আমার দিকে ভ্রু-কুঞ্চিত করে কুঠার উঁচিয়ে বললো, 'তুমি কে?'

'আশাকে তোমাদের কাছে পৌছে দিতে এসেছি। এক্ষণে বাক্যালাপের সময় নেই। আশাকে জিজ্ঞেস করে দেখ-আমি তোমাদের দুশমন নই। তোমরা ওকে কোন নিরাপদ ঘাঁটিতে নিয়ে যাও।'

অতঃপর আশার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি এক্ষণে তোমার সাথে আর চলতে পারছি না। ফিরে যাচ্ছি তোমাদের বসতিতে। চেষ্টা করবো তোমার ঠাকুর দাকে বাঁচাতে।

এক নওজোয়ান সুন্দরের কথা জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, 'সুন্দর মারা গেছে। সময় নষ্ট করোনা তো! সম্ভবতঃ এতোক্ষণে উত্তর নগরকোটের সৈন্য সাঁকো পার হয়ে এ জনপদে ঢুকে পড়েছে। তাই দিনের বেলা নদীর কিনারা দিয়ে না চলে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলো, কেমন!'

আশা যেন ঘুমন্ত অবস্থায় আমার কথা শুনছিল। চুপচাপ ও কেবল আমার মুখের দিকে তাকালো। শেষতক ওকে নিয়ে সুন্দরের সাথীরা রওয়ানা হলো। ক্লান্ত শরীরে আমি চললাম বস্তির দিকে।

॥ পাঁচ ॥

চলছিলাম খুব তাড়া করে। ক্লান্ত অবসাদ শরীর। চলায় গতি থাকলেও তা শ্লথ থেকে শ্লথতর হয়ে যায়। আশাদের বসতিতে আমি পৌছার পূর্বেই নগরকোটের ফৌজ প্রবেশ করেছিল। দূর থেকে দেখে কিছু ফৌজ আমার চারপাশে সমবেত হল। জিজ্ঞাসা করলো নিরুদ্দেশের হেতু। কারো কথায় কর্ণপাত না করে প্রবেশ করলাম আশাদের বসতিতে। সুন্দরের লাশের পাশটিতে পড়ে ছিল তার অন্ধ দাদুর লাশও। নগরকোটের দানবরা এ দু'টি লাশের এমন বিকৃতি সাধন করেছিল- যা দেখে প্রথমে ওদের চেনাই মুশকিল হয়েছিল।

এক সর্দার এসে আমাকে জাপটে ধরলো। বললো, 'ভগবানের কৃপায় তুমি এখনো জিন্দা আছ। আমরা তোমার সম্পর্কে হতাশাজনক খবর শুনেছি। তা তুমি এখানে এলে কেমনে? এতদিন কোথায় ছিলে? জগৎনারায়ণ বলেছিলেন দুশমন এই জনপদে সমবেত হচ্ছে। অবশ্য একটি লাশ ও এক অন্ধ বৃদ্ধ ছাড়া আর কাউকে নজরে পড়েনি। বসতিতে হামলার পূর্বে দুশমনদের পালাবার তামাম রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমার ধারণা ওরা জঙ্গলে আত্মগোপন করেছে।

তার এ সব কথার কোন জওয়াব না দিয়ে বললাম, 'এ অন্ধ লোকটিকে মেরে তোমাদের ফায়দা হয়েছে কতটুকু?'

'আরে দোস্ত! অন্ধ হলেও লোকটা বজ্জাতের শিরোমণি। আমরা জনপদবাসীর সন্ধান চাচ্ছিলাম, অথচ সে যাচ্ছে তাই গালি-গালাজ করতে লাগল। মারলাম এক ঘুষি। মুখ থবড়ে পড়লো সে জমীনে। বোধহয় মৃত্যুর প্রহর গুণছিল সে। কিন্তু তুমি এখনো বলোনি-কোথেকে এলে?'

আমি কোন রকমে গোস্বা সংযত করে বললাম, 'যখমী ছিলাম। জনপদেরই এক নির্জন বস্তিতে কাটিয়েছি এ ক'টা দিন।'

'সর্দার জগৎনারায়ণের ফৌজ সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা ছিল না? সেনাপতি এখানে জগৎনারায়ণের অপেক্ষায় আমাদের প্রতীক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা এই কিছুক্ষণ হল এখানে পৌছেছি। সেনাপতি মহাশয়ও এসে পড়বেন বলে আমার বিশ্বাস। আফসোস! তোমার ফৌজ অকস্মাৎ খোয়া যাওয়ায় আমাদের তামাম পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে গেছে।'

ঘৃণা ও ধিক্কার মিশ্রিত কণ্ঠে তাকে বললাম, 'এক অন্ধকে হত্যা করায় তুমি খুশী হওনি?'

সর্দার বললো, 'বসতির লোক আমাদের অসাবধানতার দরুন ভেগেছে-এমন একটা অভিযোগ যদি করতে চাও, তবে সেটা ঠিক নয়। কেননা সেনাপতির নির্দেশ মোতাবেক আমরা চতুর্দিক থেকে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি। আর সর্দার জগৎনারায়ণ পশ্চিম জঙ্গল আর নদী তীরবর্তী তামাম এলাকায় টহল দিয়ে ফিরছেন। এক্ষণে হয় ফেরারী জনগণ সর্দারের হাতে ধরা পড়েছে কিংবা নদী পার হয়ে দূরে কোথাও ভেগেছে। আমরা খেয়াপারের রাস্তা বন্ধ করিনি। অবশ্য ওরা জঙ্গলে পালালে সকলে মিলে জঙ্গল চষে এক একটাকে ধরে যমালয়ে পাঠাব। সেনাপতি জঙ্গলে হামলার ব্যাপারে খুবই সচেতন। তুমি শুনে খুশী হবে-আমরা পাহাড়ের পাদদেশের বসতি সাফ করে নগরকোটের পতাকা উড্ডীন করেছি।

জগৎনারায়ণের পরাজয়ে আমি বিগড়ে না যাই এজন্য সে আমাকে আক্রমণের ফিরিস্তি শুনাচ্ছিল। এদিকে তার কথা আমার মনে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারছিল না। আমার মন আশাকে নিয়ে ব্যকুল। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলাম, 'ভগবান! আশা যেন জগৎনারায়ণের খপ্পরে না পড়ে।' আমি মনে মনে ঐ সব দেবতার কাছেও প্রার্থনা করছিলাম, যাদের কার্যক্ষমতা নিয়ে আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমার প্রার্থনা বিফলে গেল। সন্ধ্যার পূর্বে জগৎনারায়ণের ফৌজ বস্তিতে পৌছুলো। তাদের সাথে বন্দী অবস্থায় ছিল আশা। ওর সামনে যাওয়ার হিম্মত ছিল না তখন। এক্ষণে কোন বোকামি করলে আশার জীবন বাঁচানোর

সম্ভাব্য আশাটুকুও খতম হয়ে যাবে-এই ভেবে চুপচাপ ছিলাম। আশাকে চিনি-এমন কথা বা ভাব কারো সামনে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকি। সঙ্গীদের প্রশ্নের জবাবে স্রেফ এতটুকু বলেছিলাম-নদী সাতরে তীরে ওঠে এক গুহায় এতদিন আত্মগোপন করেছিলাম। জঙ্গলের ফলমূল আর বুনো গরুর দুধ পান করে জীবন ধারণ করেছি। জগৎনারায়ণ আমাকে দেখে যারপর নাই খুশী হলেন। কিন্তু তার একটি নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা আমাকে মুষড়ে দিল। সে প্রতিজ্ঞা করে বলল, 'তোমার প্রতিটি চুলের বদলে আমি এক এক একটি ম্লেচ্ছকে হত্যা করব।'

॥ ছয় ॥

জগৎনারায়ণ রাতে একটি জনপদে আরাম করছিলেন। আমি অকস্মাৎ তার বস্তিতে প্রবেশ করলাম। শুনালাম আমার কাহিনী। আশা আর ঠাকুর দার কথা সযত্নে এড়িয়ে গেলাম। স্রেফ এতটুকু বললাম, নদী সাঁতরে কূলে উঠে এক যুবতীর সাথে দেখা হলে সে আমার প্রতি দয়া পরবশ হয়। ঠাঁই দেয় সে আমাকে এক বিরান ঘরে।

জগৎনারায়ণের চোখ দু'টি ভাটার মত জ্বলে উঠল। তিনি বললেন- 'ঐ যুবতী কোথায়?'

'ফৌজ অনুপ্রবেশের পূর্বেই সে গা ঢাকা দিয়েছে। আমি আপনার কছে বিনীত আরজ করছি, ধরা পড়লে আপনি ওর প্রতি অনুকম্পা দেখাবেন।'

জগৎনারায়ণ কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'সে তোমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করেনি। দেবতাগণ তোমার জান বাঁচিয়েছেন। দেবতাগণ চাইলে বিচ্ছুকে দংশন করা থেকে বিরত রাখতে পারেন। দেবতারা চাচ্ছেন, তুমি ধর্মের ছায়াতলে থেকে কালাতিপাত কর। এজন্য এক ম্লেচ্ছ যুবতীর অন্তরে তোমার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করেছেন। তোমার জীবন রক্ষাকারী যুবতী ধরা পড়লে আমি যথাসম্ভব তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব। পেশ করব তাকে মন্দিরে। এই তো কিছুক্ষণ হল আমাদের ফৌজ জংগল থেকে এক অনিন্দ্য সুন্দরীকে ধরে এনেছে। পুরোহিতের ভাই বলছেন, এ ধরনের যুবতী শিবাজীর মন্দিরে খুব ভালো মানাবে। তুমি ঐ যুবতীকে দেখেছ কি?'

আমি নিশ্চিত ছিলাম-ঐ যুবতী আশা ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু সত্য চেপে বললাম, 'দেখেছি। তবে যার কথা আপনাকে বলছি, এ সে নয়। আমার ভয় হচ্ছে, সে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল কি ।'

'এমনটি হলে সব দোষ তোমার। তুমি হয়ত তাকে বলেছ-নগরকোটের ফৌজ জালেম ও নিষ্ঠুর। তাই সে আত্মহত্যা করতে প্রয়াসী হয়েছে।'

আমি অবজ্ঞাভরে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ! হ্যাঁ!! আমি তাকে আরও বলেছি যে, শিবাজী মন্দিরে পুরোহিতদের ছত্রছায়ায় কি হয়ে থাকে।'

গোস্বা কম্পিত কণ্ঠে জগৎনারায়ণ বললেন, 'চুপ কর! তোমাকে সেপাই করে আমি ভুল করেছিলাম-এ অনুভূতির সুযোগ আমাকে দিওনা। তুমি ক্লান্ত হলে ফিরে যেতে পার। তুমি ঐসব ম্লেচ্ছদের পক্ষপাতিত্ব করছ-যারা আমার দু'পুত্রকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে।'

'আমার স্থলে আপনার পুত্র হলে আপনি কি এ জবাব দিতেন তাকেও?'

'তোমার স্থলে আমার পুত্র হলে সেক্ষেত্রে আমি নদীতে ডুবে মরতাম- তবুও ম্লেচ্ছদের পক্ষপাতিত্ব করতাম না।'

হতাশায় মুষড়ে পড়ে কামরা থেকে বের হয়ে এলাম।

জগৎনারায়ণ আমাকে ডেকে বললেন, 'আমার যা ধারণা, তুমি ঐ যুবতীর অনেক কথাই এড়িয়ে যাচ্ছো।'

'কোন্ কথা?' পেরেশানীর ছটা দূর করে তাকে প্রশ্ন করলাম।

জগৎনারায়ণ গভীর দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, 'আমার কাছে আসার পূর্বে তুমি জানতে ঐ যুবতী কোথায় ছিল। আমার কাছে এসে তুমি ভান ধরেছ, তাও বুঝেছি। আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তবে তোমাকে লক্ষ্য করে বলতে চাই-তুমি আগুন নিয়ে খেলতে চাচ্ছ। যুবতীকে কোথায় রেখে এসেছ, তা আমি জানতে চাই না। তবে প্রমাণ পাওয়া গেলে দেখবে নগরকোটের তামাম সৈন্য তোমার শত্রু হয়ে গেছে। তোমার জন্য তারা এই গেরিলাদের ভুলবে না, যাদের হাতে মারা পড়েছে নগরকোটের হাজার হাজার সেপাই।'

দুর্বিসহ এক কষ্টের বোঝা বুকে আগলে ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম সকাল নাগাদ আশাকে মুক্ত করতে না পারলে বাকী ফৌজ এসে যাবে, সে ক্ষেত্রে ওকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। ভেস্তে যাবে আমার স্বপ্নের ঠিকানা। হাতছাড়া হয়ে যাবে মুক্তির সকল কলা কৌশল। প্রতিটি ক্ষণ আমার বুকে দুঃসহ হাতুড়ি পেটা করছিল। বাড়ছিল মনের ধুকধুকানি। আসমানে ভাদ্রের মেঘ গর্জন চলছিল। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম কয়েদ খানার দিকে। বন্দী আছে যেখানে আমার আশা।

পাহারাদারদের সিংহভাগই ছিল আমার বন্ধু। তন্মধ্যে একজন ছিল অতি অন্তরঙ্গ। আমার বিশ্বাস, কেউ এগিয়ে না এলে কমপক্ষে ও এগিয়ে আসবে। তবে ভয় ছিল, দেবতাদের অখুশী করতে ও পিছপা কি-না? মনোবাঞ্চা পূরণের পূর্বে মনের গোপন কথা কাউকে বলা ঠিক নয়। অবশ্য পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এ নওজোয়ানের নাম বনশ্রী দাস। অল্প বয়সী অফিসার। জানতাম, জগৎনারায়ণের নির্দেশে ও নারী-শিশুদের ধরে এনে মন্দিরের পুরোহিতদের হাতে সমর্পণ করত। পাহারাদারদের কারো সাথে কথা না বলে তাই সর্বাগ্রে ওকে তালাশ করতে

লাগলাম। ওকে পেয়ে শুনালাম আমার কাহিনী। বনশ্রী কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছাড়াই আশাকে মুক্তি দেয়ার প্রতিজ্ঞা করল। খানিকটা শলা পরামর্শের পর আমরা একটি বিষয়ে একমত হলাম। বনশ্রী দাস আমাকে একদল সৈন্যের মাঝে বসিয়ে রেখে চলে গেল। সাথে নিয়ে এল ৮/১০ জন সৈন্য। যাদের সম্পর্কে আমার ধারণা-অঙ্গুলি হেলনে ওরা সাগরে ঝাঁপ দিতে কুণ্ঠিত হবে না।

সৈন্যদের বললাম, 'আমরা গোপনে সংবাদ পেয়েছি-জগৎনারায়ণ কিছু সেপাইর বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা করেছেন। জানি না সেই হতভাগ্য কারা!'

বনশ্রী দাস কয়েদখানার পাহারাদারদের কাছে গেল। তার মধ্যে একজন ছিল জগৎনারায়ণের নিকটাত্মীয়। বনশ্রী দাস তাকে বললো, 'সম্ভাব্য আক্রমণ নিয়ে জগৎনারায়ণ বৈঠকে বসেছেন। তিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।' লোকটি এক পাহারাদারের সাথে জগৎনারায়ণের শিবিরে চলে গেল।

আমরা শিবিরের সন্নিকটে আত্মগোপণ করে রইলাম। শুনতে পেলাম ঐ লোকটি বলছে, 'সর্দার খুব ক্লান্ত। সন্ধ্যার পর পরই তিনি আমাকে ঘুমিয়ে যেতে বলেছেন। জানি না বিরান বসতিতে তার আজ কিসের তাড়া।'

বনশ্রী দাস তাকে বুঝাচ্ছিল, 'এখানে বেশ কয়েকটি বিরান বসতি আছে। সর্দার জগৎনারায়ণ অসিত বাবুর সাথে শলা পরামর্শ করছেন। আপনার ভীতি ভাব আমাকে পীড়া দিচ্ছে। আপনি পেরেশান কেন?' বনশ্রী দাসের শেষের কথাটি বেশ কার্যকর হলো। লোকটি জগৎনারায়ণের তাঁবুর দিকে যেতে যেতে বললো, 'আরে ভাই, ভয় করবো কেন? বাঘ-ভাল্লুক আছে নাকি?'

ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্ন। অন্ধকার রাত্রিতে সকলেই আমাকে জগৎনারায়ণ মনে করেছিল। সেপাইরা আমার নির্দেশ মেনে চলছিল। আমার নির্দেশে কাটতে লাগলো ওরা কয়েদীদের হাতের বাঁধন।

অতঃপর বনশ্রী দাস জংগলে অদৃশ্য হয়ে গেল। খানিক পর দু'পাহারাদারকে বেধে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দিল। নিয়ে গেল তার সমমনা দু'জনকে সাথে করে। সাবধানতাবশতঃ আমরা উক্ত পাহারাদারদের মুখে কাপড় গুঁজে দিলাম। এক্ষণে আমাদের সাথে মোট সাত জন সেপাই। আমাদের পরবর্তী কাজ বনশ্রী দাস ঐ অফিসারের ভূমিকায় সারবে। যে কোন অজুহাতে তিন জন পাহারাদারকে সরিয়ে দিবে। এদিকে শুরু হল তুমুল বৃষ্টি। আমার খেয়াল হয়েছিল, যেসব ফৌজ এখন বাইরে টহল দিচ্ছে, এবার তারা ঝুপড়িতে ঢুকবে। আমি এক সেপাইর থেকে হাতিয়ার নিয়ে বনশ্রীর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মধ্যরাত্রির দিকে সে হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে ছুটে এসে বললো, 'কয়েদীদের পালাবার পথ কন্টকমুক্ত করেছি। কিন্তু আশার সম্পর্কে হতাশাব্যঞ্জক খবর ছাড়া কিছুই নিয়ে আসতে পারিনি।'

আমার দিলের কম্পন বেড়ে গেল। রহিত হয়ে গেল শক্তি। আর্তস্বরে বললাম, 'ভগবানের দিকে তাকিয়ে বলো-ওর কি হয়েছে?'

'পুরোহিতের ভাইয়ের নির্দেশে দু'জন সেপাই আশাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। আমি কোন রকম প্রতিরোধ করলে হিতে বিপরীত হয়ে যেত।'

আমি বললাম, 'যেভাবে হোক আশাকে আমি উদ্ধার করবোই। তুমি সমস্ত কয়েদীদের হাতের বাধন খুলে দাও। ওদের বলো, ওরা দলবদ্ধ না হয়ে একাকী যেন পাহাড়ী এলাকা দিয়ে পালাতে থাকে। আর হ্যাঁ, তোমাকেও পলায়ন করতে হবে। সুযোগ পেলে তোমার প্রতিদান দিব কোন একদিন। এক্ষণে তোমাকে কোন প্রতিদান দিতে না পারলেও কমপক্ষে এতটুকু জেনে রাখ-তুমি ভগবানের অসন্তুষ্টিতে কিছু করছ না। তাঁর দৃষ্টিতে তুমি কথিত দেবতাদের চেয়ে কম নও।'

বনশ্রী জওয়াব দিল, 'জিন্দেগীর আখেরী সময়ও আমি তোমার সাথে থাকব। তুমি পুরোহিতের ভাইয়ের তাঁবুর বাইরে আমার অপেক্ষা করো। কয়েদীদের হাতের বাঁধন খুলে দিয়েই ওখানে পৌছে যাব। ঐ তাঁবু তুমি খুঁজে পাবে কি?'

'চোখ বন্ধ করে আমি ওখানে যেতে পারব। জালেম এক্ষণে সেই ঘরেই অবস্থান করছে, যেখানে আমি ছিলাম এতদিন।'

॥ সাত ॥

কিছুক্ষণ পর আমি আশার ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

শুনলাম পুরোহিতের ভাইয়ের গলা, 'তুমি একটা পাগলিনী। ভাগ্যিস তোমাকে জঙ্গলে পেয়ে গ্রেফতার করেছিলাম। তোমার মত ভূবন মোহিনীকে জীবিত রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তোমাকে আমি এমন স্বচ্ছল জীবন দান করব, যা দেখে নগরকোটের অভিজাত ঘরের যুবতীরা ঈর্ষান্বিত হবে। তোমার চন্দ্রিমা পা দু'খানা জঙ্গলের কন্টক না মাড়িয়ে মন্দিরের নরম তুলতুলে গালিচা মাড়াবে। তালপাতার বস্তির চেয়ে মন্দিরের আলীশান ইমারত অনেক ভালো। তুমি এমন এক মন্দিরে যাচ্ছো, যেখানকার পুরোহিতরা স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসনে খানা খান। আমি একজন পুরোহিতের ভাই। নগরকোটের রাজাগণ আমাকে সমীহ করে। তোমাকে শুদ্ধি করে আমার ঘরে তুলব। তোমাকে ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হল, সাধারণ কয়েদীদের সাথে হাজতবাস তোমার জন্য উপযুক্ত নয়। তোমার অপেক্ষায় আমি রাতের খানা খাইনি, তুমি এলে একসাথে খাব বলে। মনে রেখ, আমাকে নারাজ করলে অন্যান্য বন্দীদের মতো কালীর দুয়ারে বলি দেয়া হবে তোমাকেও।'

আশা বললো, 'নিকৃষ্ট কুত্তা! আমাকে ছুঁয়ো না। আমার জীবন নিতে পার, কিন্তু ইজ্জত হরণ করতে পারবে না। আমাকে ছেড়ে দাও, অন্যথায় চেঁচামেচি করে দুনিয়া মাথায় তুলব।'

পুরোহিতের ভাই বললো, 'বৃথা যাবে তোমার নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। কেউ এগিয়ে আসবে না তোমার সাহায্যার্থে। এমনকি নগরকোটের রাজাও দুঃসাহসী হবে না তোমাকে উদ্ধারে।'

আশা চিৎকার করে বলছিল, 'ছেড়ে দাও! আমি ভাই- এর সাথে এক শশ্মানে পুড়তে চাই।'

আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। ঘরে প্রবেশ করতে উদ্যোগ নিলাম। আচানক একদল সৈন্যের পদধ্বনি শুনতে পেলাম। গা ঢাকা দিলাম একটি গাছের আড়ালে। আশার চিৎকার শুনে সেপাইরা অগ্রসর হল।

এক সেপাই কড়া নেড়ে বললো, 'মহারাজ! মহারাজ!!'

ঘরের ভেতর থেকে পুরোহিতের ভাই চিৎকার দিয়ে বললো, 'গাধা কোথাকার! দুর হও! অন্যথায় তোমার চামড়া ছিলে লবণ দিব।'

সেপাই ভগ্নোৎসাহ হয়ে চলে গেল। আমি অগ্রসর হয়ে দরজা খুলতে চেষ্টা করলাম। দরজা ভেতর থেকে আটকানো ছিল। পুরোহিতের ভাই আশাকে বলছিল, 'দেখলে তো? তোমার চিৎকার হাওয়ায় ভেসে গেল। এখন শান্ত হয়ে বস।'

জানতাম ঐ দরজা খুবই মজবুত। মামুলি ধাক্কায় খুলবে না। কিন্তু কুদরত আমাকে সাহায্য করলেন। আচানক আশে পাশের সেপাইরা যেন কি নিয়ে শোরগোল শুরু করলে, আমি দরজার কড়া নেড়ে বললাম, 'মহারাজ! মহারাজ! দুশমন হামলা করেছে। জলদি পালান।'

আমার তদবীর কার্যকরী হলো। পুরোহিতের ভাই খুলে দিল দরজা। আচমকা কোষ থেকে তলোয়ার বের করে তার বুকে ঠেকিয়ে বললাম, 'টু শব্দটি করলে তোমার উপায় নেই।'

পুরোহিতের ভাই ভয়ে কয়েক পা পিছনে সরলো। কামরায় প্রবেশ করেই তার নাকে বসিয়ে দিলাম প্রচন্ড এক ঘুষি। টাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়লো সে। আশা এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার বুকে। ননীর পুতুল ঐ পুরোহিতের ভ্রাতা আমার এক ঘুষিতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। তাই তাকে বাঁধার প্রয়োজন মনে করলাম না। কামরার কোণে টিম টিম করে জ্বলছিল একটি কুপি। ফু দিয়ে কুপিটি নিভিয়ে আশাকে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম।

বনশ্রী দাস পূর্ব থেকেই আমাদের অপেক্ষা করছিল। সে আমাকে বলল, 'কয়েদীদের ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু টহলদার সেপাইরা তা দেখে শোরগোল শুরু করছিল। এক্ষণে তাই অসংখ্য ফৌজ কয়েদীদের উদ্ধারে জংগল চষে ফিরছে। বাদ বাকী ফৌজ ভয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। সিংহভাগ সেপাইর ধারণা, দুশমন হামলা করেছে।'

আমি আশাকে নিয়ে উপত্যকা দিয়ে ছুটতে শুরু করলাম।

আকাশে বিজলী চমকাচ্ছিল। বিজলীর আলো আমাদের পথ চলায় সাহায্য করছিল। সেপাইরা এতই ভীতু হয়ে পড়ছিল যে, তারা নিজেদের জান বাঁচাতে ব্যস্ত। আমাদের দিকে লক্ষ্য করার সুযোগ কোথায়?

খানিক পর। শুনছিলাম পাহাড়ের গা বেয়ে নামা জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। উপলব্ধি করলাম, এ সেই স্থান- প্রথম যেখানে আশার সাথে মোলাকাত হয়েছিল। বিজলীর চমকে দেখছিলাম সরু পথ। সোজা ঐ পথ দিয়ে না গিয়ে দূর্গম পথ দিয়ে চলতে শুরু করলাম। আশাকে উদ্ধারের নেশা এতক্ষণ আমার দৈহিক দুর্বলতার কথা মনে করতে দেয়নি। কিন্তু দুর্গম পাহাড়ী পথে চলতেই আমার চলৎশক্তি রহিত হয়ে গেল। দিনের বেলায় আশাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দিতে গিয়ে পেয়েছিলাম পায়ের গোড়ালীতে মারাত্মক ব্যথা। রাত্রিবেলা নতুন করে সেই ব্যথা দেখা দিল। ভয় হচ্ছিল, আশা আর বনশ্রীর সাথে আর বুঝি চলতে পারব না। খুড়িয়ে খুড়িয়ে ওদের সাথে চললে সকাল নাগাদ বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যাবে না। সেপাইরা আমাদের তালাশে অতি প্রত্যুষে অবশ্যই বের হবে। সেক্ষেত্রে স্রেফ আমার জন্য আরও দু'দুটি প্রাণ খোয়া যাবে। প্রতি মূহূর্তে আমার গোড়ালীর ব্যথা অবনতির দিকে যাচ্ছিল। এখনই কোন সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। বনশ্রী দাস থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম-সে প্রত্যেকটি কথা ও কাজে যেন আমার হুকুম তামীল করে।

আমি আশাকে লক্ষ্য করে বললাম, 'এখান থেকে তোমার আমার রাস্তা ভিন্ন হয়ে যাবে। আমি তোমাদের সাথে চলতে পারছি না। পরবর্তী পথে বনশ্রীই হবে তোমার সঙ্গী।'

আশা বললো, 'তুমি ছাড়া কারো সঙ্গী হতে আমি প্রস্তুত নই। আমরা এক সাথে জীবন দেব।'

'আশা বুঝতে চেষ্টা কর। আমার কোন চিন্তা নেই। আমি এক সর্দার। সৈন্যরা আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবেনা। আমাকে কেউ কিছু বললে তামাম সৈন্য সর্দার জগৎনারায়ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। কিন্তু তুমি ধরা পড়লে খোদ আমার সেপাইরা পর্যন্ত তলোয়ার কোষাবদ্ধ করে রাখবে আশা! আমি তোমাদের সাথে অবশ্যই মিলিত হব। কিন্তু তুমি ধরা পড়লে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় থাকবে না। আমার কথা শোন, আশা। আমার কোন ভয় নেই।'

এটা ছিল একটি ধোঁকা মাত্র। আমি জানতাম- যা করেছি তাতে কেহই আমার প্রতি দয়ার্দ্র হবে না। যাহোক আশা আমার কথার জালে আটকা পড়ল। বললো, 'তোমার নির্দেশ শিরোধার্য। কিন্তু মনে রেখ! তুমি বিনে আমার জীবন বৃথা।'

আমি বললাম, 'অচিরেই আমি তোমাদের সাথে মিলিত হব। আশা! এখন যাও ওর সাথে।'

বনশ্রী দাসের সাথে আশা রওয়ানা হল। বিজলীর চমকে আমি ওদের চলে যাবার শেষ দৃশ্য অবলোকন করছিলাম। দৃষ্টির আড়ালে ওরা হারিয়ে গেল বসে পড়লাম এটি পাথরের উপর। কিছুক্ষণ পর মেঘলা আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। বেড়িয়ে এলো মেঘের আড়াল থেকে শুক্লা দ্বাদশীর স্নিগ্ধ চাঁদ। অসহায় অনুভূতি আমার দিল-মনকে ন্যুব্জ করে দিয়েছিল। খানিক পর ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীভূত হলে মনের অজান্তে জিন্দেগীর ঐ সোনালী প্রান্তর দেখতে বড় ইচ্ছে হলো-যেখানে আমার প্রেয়সী আশা বিচরণ করছে। জিন্দেগীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ সেই কবে হয়েছিলাম। কিন্তু আমার আলো আঁধারীর মোহনায় শুকতারা হয়ে দেখা দিয়েছিল স্বর্গের ঐ অপ্সরী। ওর বিরহে অন্তরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। সম্বিত ফিরে তাকালাম খরস্রোতা ঝর্ণার দিকে। ডান দিকের জলপ্রপাতটি চিত্তাকর্ষক। কিন্তু সে আকর্ষণের প্রতি আমি অনুরাগী ছিলাম না। জীবনের সুখ-আহলাদ তখন আমার থেকে বিদায় নিয়েছিল। আমার উপরে ঐ বিশাল আসমানে চাঁদ ও তারার লুকোচুরি খেলা দেখে মনে হচ্ছিল, খানিক পূর্বে ছিল জমকালো আঁধার, এক্ষণে কুদরত সেই আঁধারের বুক চিরে আলোর বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানবতার মুখ জুড়ে যে আঁধারের কালো পর্দা ছেয়ে আছে-মানবাধিকারের দীপ্ত মশাল সেই আঁধারপুরীতে কবে আলো উদগীরণ করবে? ভারত ভূমি থেকে কি কথিত দেবতাদের তেলেসমাতি দূর হবে না? এরা তো সেই দেবতা- যারা একে অপরের প্রতি কেবল ঘৃণা ও অবজ্ঞা শিক্ষা দিয়ে আসছে।

আমি পরিণতির কথা ভাবছিলাম। নিশ্চিত ছিলাম-সকাল অবধি গ্রেফতার করা হবে আমাকে। আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার জন্য এতক্ষণে বেশ ক'জন হয়তো তৈরী হয়ে গেছে। হুঁশ ফিরে আসতেই পুরোহিতের ভাই এমন চিৎকার শুরু করবে যার দরুন নগরকোটের সৈন্যরা আমার চামড়া খাবলে লবন দিতে আসবে। খোদ আমার অধীনস্ত সৈন্যরা আমাকে পাগল ভাববে। অবশ্য এরা আমাকে হত্যা না করে জিন্দা গ্রেফতার করবে বলে আমার বিশ্বাস। শেষ পর্যন্ত নগরকোটের কালীর দুয়ারে আমায় বলি দেয়া হবে। ধোয়া হবে আমার রক্ত দিয়ে কালী মাতার নাপাক পদযুগল। জিগির তুলবে ভক্তরা, 'কালী মাতা কি- জয়'।

ভাবছিলাম, মৃত্যু লেখা থাকলে কালী মন্দিরের জন্য কেন অপেক্ষা করব? ঐ নাপাক পদযুগলে বিসর্জিত না হয়ে কেন এ জলপ্রপাতে ঝাঁপিয়ে পড়বো না? কেন ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকব, যার প্রতিটি ক্ষণে মৃত্যু বিভীষিকা আমাকে পেয়ে বসবে?

উঠে দাঁড়ালাম। পাশে গভীর খাদ। যে দুনিয়ায় কিছুক্ষণ পূর্বে আমার সব ছিল, এখন তা নিঃস্ব। কিন্তু একটি সান্ত্বনা এখনও আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছিল। হৃদয়ের স্পন্দন 'আশা! আশা!' বলে চিৎকার করছিল। থির থির কম্পমান আমার চোখ দুটি বন্ধ হয়ে গেল। আনমনে একটি পাথর লাথি মেরে নীচে গড়িয়ে ফেললাম।

আচানক কারো আওয়াজে আমার কর্ণ সচকিত হয়ে উঠল। কণ্ঠটি অতি ক্ষীণ। নারী মূর্তিই মনে হচ্ছিল। চকিত পিছনে ফিরে দেখলাম, আশা আমার নাম ধরে ডেকে আমার দিকে দৌড়ে আসছে। কাছে এসে আমার বাযু টেনে ধরে ও বললো, 'তুমি এ গভীর খাদ পাড়ি দিয়ে ওপারে যেতে চাও? এর গভীরতা জান? এ জলপ্রপাতে প্রকান্ড গাছ ফেললেও পাথর ও পানির স্রোতের বেগে তা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

'আশা! তুমি ফিরে এলে কেন?' পেরেশানীকে যথাসম্ভব সংযত করে ওকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'অসিৎ! তুমি ভাবলে কি করে, মৃত্যুর মুখে তোমাকে ফেলে আমি যাবো। আমাকে মিথ্যা সান্ত্বনা কে দিতে বলেছিল?'

আমি বললাম, 'আমার উপর আস্থা রাখ, আশা? এখনও সময় আছে। তুমি যাও। বনশ্রী দাস কোথায়?'

আশা এতমিনানের সাথে বললো, 'বনশ্রী দাস এতক্ষণে বহু দূর চলে গেছে।'

'ও তোমাকে রেখে যাবে ভাবতেও পারিনি।'

'ও আমাকে ছেড়ে যায়নি, বরং আমিই পালিয়ে এসেছি।'

দরদ মাখা কণ্ঠে বললাম, 'কিন্তু কেন? গর্দভটা তোমায় বলেনি যে, আমার জীবন বিপন্ন।'

'একথা তার বলার দরকার ছিল না। ও কাঁদছিল। ওর চোখের জলই আমার বোধোদয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল।'

হতোদ্যম হয়ে পাথরের উপর ধপাস করে বসে পড়লাম। বললাম, 'আশা! আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। কিন্তু তুমি ফিরে এসে আমার মৃত্যুক আরও ভয়ালো করে দিলে। তোমার আওয়াজ না পেলে আমি এতক্ষণে ঐ খাদে নিপতিত হয়ে শত খন্ডে ছিন্ন ভিন্ন হযে যেতাম। খাদের ওপারে যাওয়ার আশা ছিল না আমার আদৌ। বরং আমার লাশ ঐ দু'পেয়ে হায়েনাদের হাতে না পড়ুক, এ জন্য ছিল এ প্রয়াস।'

আশা আমার ঠিক পাশটিতে বসে বললো, 'আমি চাচ্ছিলাম, তুমি ভগবানের মর্জির বিরুদ্ধে কোন কাজ করো না বস।'

চিৎকার দিয়ে বললাম, 'তুমি চাচ্ছ, আমার চোখের সামনে ওরা তোমায় কয়েদ করুক, এই তো? এর পর তোমার রক্ত দিয়ে কালী দেবীর নাপাক পদযুগল ধোয়া হোক? এটাই কি তোমার ভগবানের মর্জি?'

'না।' ও বললো। 'ভগবান তোমাকে জিন্দা রাখতে চান। তার মর্জি এমনটি না থাকলে সেদিন তোমাকে নদীতে ডুবিয়ে মারতেন। ঠাকুর দা প্রায়ই বলতেন, ভগবান তোমার দ্বারা কোন মহান খেদমত নিবেন।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ, আশা! জিন্দা থাকলে নগরকোটের কয়েদখানা হবে আমার ঠিকানা। তোমার সাথে দ্বিতীয়বার মিলনের ইচ্ছায় বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। কিন্তু নগরকোটের ফৌজ তোমার সাথে যে ব্যবহার করবে, তা ভেবে নিজের হাতে নিজের গলা টিপে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'আমার জীবন থাকতে ওরা আমায় ছুঁতে পারবে না। তুমি ওয়াদা করো আত্মহত্যা করবে না। আমি মারা গেলেও পর জনমে তোমাকে অন্য রূপে তালাশ করবো।'

বহু বুঝালাম ওকে- 'এখনও সময় আছে আশা! তুমি আপনাকে বাঁচাও।'

কিন্তু আমার অনুরোধ বৃথা গেল। আঁধারের বুক চিরে পূর্ব দিগন্তে উঠল আলোর রেখা। ভাবছিলাম আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বন্দী হতে যাচ্ছি। আশা ও আমাকে এক রশিতে বাঁধা হচ্ছে।। পেশ করা হচ্ছে পুরোহিতদের সামনে। তবে একটি সান্ত্বনা আমাকে স্বস্তি দিচ্ছিল, সেনাপতি এ বস্তিতে না এসে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে কোচ করেছেন।

কল্পনা ও বিক্ষিপ্ত ভাবনার একরাশ অজানা আশংকা নিয়ে আশার হাত ধরে ধীর গতিতে একটি সরু পথ দিয়ে চলতে লাগলাম। একটু আগে যেখানে দু'বিঘত পাথর উঁচিয়ে ছিল, জলোচ্ছ্বাসে তা ডুবে গেল। চলতে পারছিলাম না। বসে গেলাম একটি গাছের গুঁড়ির উপর। কমযোরী, ক্লান্তি ও গোড়ালীর ব্যথায় আমার শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল। আমার মাথা আশার বুকে হেলানো। আমি ভাঙ্গা আওয়াজে ওকে বললাম, 'আশা ওরা এদিক আসবে বলে মনে কর?'

ও এতমিনানের সাথে জওয়াব ছিল, 'আমি তোমার মুক্তি ছাড়া বিকল্প কিছু ভাবতে পারি না।'

প্রভাতি উষার কিরণ রশ্মি আছড়ে পড়লো গোটা জনপদে। পাখিরা সব নীড় ছেড়ে চললো অজানার উদ্দেশ্যে। আচানক কারো পায়ের আওয়াজে কান খাড়া করলাম। দাঁড়ালাম তলোয়ার উঁচিয়ে। 'আশা! তুমি এখানে চুপচাপ বসে থাক। মনে হচ্ছে, ওরা আমার লোক, বললাম আশাকে। টিলার উপর উঠে চারিদিকে দৃষ্টি বুলালাম। জনৈক সেপাই পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। চকিতে তলোয়ার

তার বুকে রাখলাম। এ সেই সেপাই, জগৎনারায়ণ যাকে কয়েদ খানার জিম্মা দিয়েছিলেন। আমাকে দেখে ও চিৎকার শুরু করে দিল। খচ্ করে তরবারীর অগ্রভাগ ঢুকিয়ে দিলাম ওর বুকে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। মুখ থুবড়ে পড়লো ও জমীনের উপর। আর একজন সৈন্য ওর মত চিৎকার করতে করতে আমার দিকে তেড়ে আসছিল। লাশটি একপাশে রেখে দ্রুত উপরে উঠতে লাগলাম। আমাকে দেখে ও হামলা করল। বেশ বিক্রমের সাথে লড়ছিল সে। আমার ক্ষিপ্রতা কমযোরীতে রূপান্তরিত হলো। পরিস্থিতি খারাপ দেখে ভাগতে শুরু করলাম। সৈন্যটি জোরে চিৎকার করছিল, চালাচ্ছিল সাধ্যমত তরবারী। সমতল জায়গায় এসে আমি ক্ষিপ্র হয়ে উঠলাম। বাধ্য করলাম তাকে পিছু হঠতে। আচানক পাথরের সাথে পা পিছলে ও পড়ে গেল। আমার তরবারীর চরম আঘাত ওকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিল।

এবার আমার দৃষ্টি আশাকে খুঁজে ফিরল। কিন্তু আশা কোথায় গেল? ওর ওড়না পাথরের উপর পড়ে আছে।

নদীর তীরে শুনলাম ওর আখেরী আওয়াজ, 'অসিৎ! ভগবানের দোহাই! আমার পিছু নিও না। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ওরা আমাকে ছুঁতে পারবে না।'

আশা এগিয়ে যাচ্ছিল জল প্রপাতের দিকে। চোখ বন্ধ করলাম আমি। পরে আবার খুললাম, কিন্তু আমার দৃষ্টি আশাকে খুঁজে পেল না। আমার তামাম ভয় দূরীভূত হলো। জীবন মৃত্যুর তোয়াক্কা ছিল না সে মুহূর্তে। আমার শেষ অনুভূতিটুকু হতাশায় ঘিরে নিল। পাগলের মত চিৎকার দিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। পিছে ফিরে দেখলাম দূর নদীতে আশার চুল দেখা যাচ্ছে। আমার অভিমানী আশা আমায় চিরতরে শোক সাগরে ডুবালো। রাক্ষুসে নদী চিরতরে গিলে নিল আমার আশাকে।

আশা! আশা!! আমার আশা!!! একি করলে তুমি? আরেকটু দেরী করলে না কেন? এক সাথে সলিল সমাধি হতো তোমার-আমার। আশা তুমি বেঁচে গেলে, কিন্তু আমি?

বাধ ভাঙ্গা শোকাশ্রু মুছে মন দিলাম সৈন্যদের দিকে। এগিয়ে এলো একজন। আমার সামান্য প্রতিরোধ ওকে যমালয়ে পাঠালো। গিরিপথে হামলা করে আমার সাথে পেরে উঠতে পারবে না মনে করে বাদবাকী সৈন্যরা পিছু হটলো।

আচানক ৫০ জনের মত সৈন্য আমাকে ঘিরে ফেললো। তন্মধ্যে জগৎনারায়ণও ছিলেন। তিনি উচ্চস্বরে বলছিলেন, 'ওকে জিন্দা গ্রেফতার করো।'

উপায়ান্তর না দেখে এলোপাথারি আঘাত করছিলাম। আক্রমনের তীব্রতায় সৈন্যরা ছুটোছুটি করছিল। পারলাম না নিজেকে ধরে রাখতে। পরে গেলাম ধপাস্ করে জমীনে। ওরা আমাকে হত্যা না করে জীবন্ত সাজা দেয়ার জন্য কয়েদ করলো।

কিছুদিন নগরকোটের জেলে ছিলাম। কয়েক হপ্তা পর জানতে পারলাম, কালী দেবীর বেদীমূলে আমায় বলি দেয়া হবে। অতিবাহিত হলো আরও দু'হপ্তা। একদিন জানতে পারলাম, সুলতান মাহমুদ বিন্ধ্য সাম্রাজ্যে হামলা করেছেন। নগরকোটের ফৌজ বিন্ধ্যের রাজার সাহায্যার্থে কোচ করেছে। তাদের সাথে গেছেন স্বয়ং রাজা মহাশয় ও পুরোহিতগণও। তারা ফিরে এসে আমার বলিদান কার্যকর করবেন।

পরবর্তীতে বিন্ধ্যের রাজা ও নগরকোটের কালী দেবীর পূজারীদের শোচনীয় পরাজয় আমার কানে আশার স্বপ্নের তাবীর শুনাচ্ছিল।

॥ আট ॥

নগরকোট জয় করে সুলতান মাহমুদ আমাকে কারামুক্তি দিলেন। ভারতবর্ষে তাঁকে নয়া যুগের মশালধারী মনে করে আমি তাঁর ফৌজে সামিল হলাম। আমার সাথে এমনও হাজার লোক তার দলে নাম লিখিয়েছিল, নগরকোট পতনের দরুন দেবতাদের বিরুদ্ধে যাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল।

মাহমুদ গজনবী আমার নাম রাখলেন আব্দুল ওয়াহিদ। তিনি আমার ত্রাণকর্তা। তাঁর অনুদান কেবল আমার মধ্যে সীমবদ্ধ থাকলে রণাঙ্গনে যুদ্ধ না করে আমৃত্যু তাঁর পদসেবা করে যেতাম। মুক্তি দেয়ার পর আমাক বলা হয়েছিল, 'তুমি যেখানে মন চায় চলে যেতে পার।'

কিন্তু ভারতভূমিতে ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের জন্য আমি তাঁকে রক্ষাকর্তা বলে মনে করি। কুদরত তাঁকে এক মহান জিম্মাদারী দিয়ে ভারতে প্রেরণ করেছেন। আর এ এমন উদ্দেশ্য-যা চেয়ে আসছিলাম দীর্ঘদিন ধরে মনে মনে।

এ হলো আমার কাহিনী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার স্থলে তুমি হলে তোমার অনুভূতি আমার চেয়ে ভিন্নতর হত না।

রণবীর গর্দান উঁচু করে আব্দুল ওয়াহিদের দিকে তাকালো। ওর চোখ অশ্রুতে ভরপুর। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললো, 'আপনার স্থলে আমি হলে মারা যেতাম। আপনি মানুষ নন। একটা পাষাণ উপল খন্ড।'

আব্দুল ওয়াহিদ মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, 'জিন্দেগীর তামাম উদ্দেশ্য উদার সর্বস্ব হলে সকলেই উপল খন্ড হয়ে যায়।'

রণবীর প্রশ্ন করলোঃ 'মুক্ত হয়ে দ্বিতীয় বার কি ঐ বস্তিতে গিয়েছিলেন?'

আব্দুল ওয়াহিদ জবাব দিলেন, 'কয়েকবার গিয়েছি। বিরান বস্তি পুনর্বাসন হয়েছে। কিন্তু আশাদের বসতি সেই পূর্বেরটি রয়ে গেছে। পাহাড়সম আত্মার লোকজনও ওর ঘরে প্রবেশ করতে সাহস পায় না। ওদের বিশ্বাস, আশার অশরীরী

আত্মা ও ঘরে নাকি বিচরণ করে। আমি ঐ কুসংস্কারে বিশ্বাসী নই। আমি আশাদের ঘরে রাত কাটাতাম। তবে উপলব্ধি করতে পারতাম-ঘরের দরজা যেন গুমরে কাঁদছে। নদীর তীরে গেলে খরস্রোতা ঢেউ থেকে আশার আওয়াজ শুনতে পেতাম। জলপ্রপাত থেকে যেন ভেসে আসতো- 'অসিৎ! আমি এখানে।'

রণবীর জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনার ঐ সব সঙ্গীদের কি হলো,যারা কয়েদীদের মুক্ত করেছিল?'

'ওরা সকলেই আমার সাথে কয়েদ খানায় ছিল। আমার দেখাদেখি সকলেই মাহমুদের ফৌজে নাম লেখাল। বনশ্রী দাস পাহাড়ী জনপদে বসবাস করত। নগরকোট বিজয়ের পর আমি ওকে এখানে নিয়ে আসি। ও এখন মাহমুদের একজন পদস্থ সেনা অফিসার।'

'আশা নতুন কোন রূপে আপনার জিন্দেগীতে আসতে পারে বলে আপনি মনে করেন?'

'না!' আব্দুল ওয়াহিদ জবাব দেন। 'আশা মৃত্যুর পর আমার জন্য একটি গুরুদায়িত্ব রেখে গেছে। তার সেই গুরুদায়িত্ব পরিপূর্ণ করতে গেলে দেখি-সে আমার সাথে কথা বলছে।'

মধ্য রাত্রি পেরিয়ে গেছে। রণবীর আব্দুল ওয়াহিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কামরায় গেল। পরবর্তীতে সে দিনে একবার হলেও আব্দুল ওয়াহিদের সাথে মিলিত হত। এভাবে প্রাত্যহিক মোলাকাতের দরুন তার মধ্যে একটা অনুরাগের সৃষ্টি হলো। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে তার হৃদয় রাজ্যে তোলপাড় শুরু হলো। এতদসত্ত্বেও ওর বাবা-দাদার সনাতন ধর্ম ছেড়ে নতুন ধর্মে প্রবেশ করতে তার একটি জবরদস্ত ঝটকার দরকার ছিল। ওর অবস্থা সাগর বক্ষে ডুবন্ত আরোহীর খড়কুটোর উপর আস্থা রাখার মত। সেই খড়কুটো এক এক করে হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। সে ভাবছিল, এক সময় ক্ষণস্থায়ী এই খড়কুটো ঢেউয়ের প্রচন্ড ঝাপটায় ওকে এমন এক তীরে নিয়ে যাবে, যেখানে থেকে ফিরে আসার কল্পনা করা যায় না। দরিয়ার ওপারে নয়নাভিরাম সবুজ দুনিয়া যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। ওর বাবা, বোন ও বাল্য সাথীরা যেন ডেকে বলছিল, 'রণবীর! ধর্ম বিরূপ মানসিক তোলপাড়কে শান্ত করো। তুমি সমাজচ্যুত হলেও দেবতাদের বেইজ্জত করতে পার না। আমরা তোমার অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। নগরকোটের ভাগ্য বিপর্যয় এক সৈন্যকে সমাজের বৈরী বানিয়ে দিতে পারে, কিন্তু নগরকোট আর কনৌজ এক নয়। তুমি আব্দুল ওয়াহিদ হতে পারো না। তোমার জগৎ তার জগৎ থেকে ভিন্ন। তুমি নিঃস্ব নও। কনৌজে আসতে না পারলে কমপক্ষে তোমার কাছে আমাদের নিয়ে এসো।'

রণবীরের কাছে রাগ-অনুরাগের এ দিনগুলো খুবই ব্যথাতুর ছিল। ওর কাছে আব্দুল ওয়াহিদের বাক্যগুলো গুঞ্জরন করে ফিরতো- 'যুদ্ধের মত তোমার বন্দী জীবনও অনর্থক'। মাঝে মাঝে সে আব্দুল ওয়াহিদের কাছে এসে বলতে চাইত- 'ব্রাহ্মণ সমাজ কিংবা কনৌজের শাসন কর্তাদের উত্থান পতন নিয়ে আমার কোন আকর্ষণ নেই। আমি একবার, শুধু একবার বাবা ও বোনের সাথে দেখা করতে চাই। আমাকে ছেড়ে দিলে আমি কোন দিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হব না।'

রণবীর জানত, আব্দুল ওয়াহিদের কাছে এ খাহেশ করলে তিনি অবশ্যই তাকে ছেড়ে দেবেন। সাথে সাথে একটি কথা ওর খেয়াল হতো-আব্দুল ওয়াহিদ ওর অন্তরের কথা জানেন। দরখাস্ত ছাড়াই তিনি বিন্ধ্যে তার কারামুক্তির সুপারিশনামা প্রেরণ করেছেন। এ অনুভূতিই রণবীরকে মুখ খলতে দেয়নি।

।। নয় ।।

একদিন রণবীর কামরার বাইরে পায়চারী করছিল। এক সেপাই এসে ওকে বললো, কেল্লার নাযেম আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। রণবীর সেপাইকে অনুসরণ করল। আব্দুল ওয়াহিদ দফতরে উপবিষ্ট ছিলেন। রণবীরকে হেসে অভ্যর্থনা জানিয়ে কুরসী দেখিয়ে দিলেন। বললেন, 'বস! তোমাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি।'

মুহূর্তে ওর গোটা শরীরের রক্ত জমা হলো। দিলের কম্পন সংযত করে সে বললো, 'বিন্ধ্য গভর্ণরের ফরমান এসেছে বুঝি?'

'না। তার ফরমান এ যাবত পাইনি। তবে নিশ্চিত রাখ, তুমি শীঘ্রই ঘরে ফিরছো। এক্ষণে তোমাকে আরেকটি অভিপ্রায়ে ডেকে এনেছি।'

রণবীরের অন্তর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো আব্দুল ওয়াহিদের দিকে। রেশমী রুমালে মোড়া একটি পত্র তিনি টেবিলে রাখলেন। বললেন, 'পড়। তোমাদের বাড়ি থেকে এসেছে।'

কম্পিত হস্তে চিঠি গ্রহণ করলো সে। রুমাল খুলে চিঠি পড়তে লাগলো। চিঠিটি লিখেছে ওর বোন শকুন্তলা। চিঠির বিবরণ নিম্নরূপঃ

প্রাণাধিক দাদা! শম্ভুনাথকে আপনার খোঁজে পাঠালাম। ভগবান মুখ তুলে চাইলে তিনি আপনাকে খুঁজে পাবেন। নন্দনার কেল্লা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের কাছ থেকে আপনার সন্ধান পেয়েছি। আপনি বাবাকে মুক্তিপণ দিতে নিষেধ না করলে তিনি নিজেই নন্দনাভিমুখী হতেন। কিন্তু আপনার পয়গাম এক রাজপুতের বাপ হিসেবে তাকে নন্দনায় যেতে দেয়নি। আপনার পত্র পেয়ে তিনি ফুলে ফেঁপেও ওঠেননি। তিনি সকলকে বলেছেন, 'রণবীর থেকে আমি এই-ই আশা করেছিলাম।'

তবে তার মনোবেদনা আমি উপলব্ধি করতে পারি। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলতেন, 'অচিরেই কনৌজ ফৌজের সাথে বেশ কয়েকটি প্রদেশের রাজা-মহারাজারা দুশমনের উপর চড়াও হবেন। তোমার দাদা মুক্তি পেয়ে কনৌজে ফিরে এলে রাজার চেয়ে জনগণ তাকে অধিক বাহবা দিবে।' কিন্তু হায়! এগুলো ছিল অলীক স্বপ্ন। কনৌজ পতনের পর বাবার স্বপ্নের দুনিয়া তছনছ হয়ে গেছে। এক রাজপুতের বাহ্যিক অহমিকাবোধ তাঁকে মুখ খুলতে দিচ্ছে না। কিন্তু তার হৃদয়ের ধুক-ধুকানী আমি সর্বদাই শুনতে পাই। তাঁর অনুমতি ছাড়াই শম্ভুনাথকে পাঠালাম। আমার কাছে যা ছিল তাই দিয়ে দিলাম তার হাতে। এগুলো আপনার মুক্তিপণের জন্য যথেষ্ট হলে কালবিলম্ব না করে ঘরে ফিরে আসুন। আমি ও শম্ভুনাথ ছাড়া আর কেউ আপাততঃ এ কথা জানে না। আপনার কারামুক্তির প্রচেষ্টা বাবা ঘুণাক্ষরেও টের পাবেন না। মুক্তিপণ দিয়ে আপনাকে ছাড়িয়ে আনলে তিনি কষ্ট পাবেন- এজন্য তাকে বলিনি, এমন নয়। বরং তাঁর মনোবেদনার মাত্রা কমানোতেই এ প্রয়াস নিতে হয়েছে আমাকে। তাঁর অবস্থা এক্ষণে এত নাজুক হয়েছে যে, একাকী তিনি যেন কি বিড়বিড় করেন। গভীর রাত্রিতে দরজা খুলে পাহারাদারদের ডেকে বলেন, 'তোমরা প্রধান ফটক খুলে দাও-রণবীর দরজার কড়া নাড়ছে।'

প্রাণপ্রিয় দাদা! আর আমার নিজের কথা কি বলব! আমার প্রতিটি শ্বাস আপনার নামোচ্চারণ করে। মনে করে দেখুন! বাল্যকালে আপনি রাত করে বাড়ি ফিরলে, না ঘুমিয়ে আমি দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। সিঁড়ি বেয়ে না উঠে আপনি বিকল্প সিঁড়ি দিয়ে মহলে প্রবেশ করতেন। আমি জেনে শুনে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতাম। আপনি পেছন দিয়ে আমার চোখ বন্ধ করে বলতেন, 'বলতো আমি কে?' জেনেশুনে দুষ্টুমী করে বলতাম সখীদের নাম। এখনও ঘুমানোর পূর্বে আমি সেই দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আপনার অপেক্ষা করি। হায়! আপনি যদি আসতেন। আহা! আপনি যদি আবার এসে আমার চোখ বন্ধ করে বলতেন-'বলতো আমি কে?' তখন আমি সখীদের নয়, আপনার নামোচ্চারণ করতাম। দুশ্চিন্তা আর হতাশা আমার মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে। সখীদের সাথে খোশ গল্প করতে গিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসির পরিধি বাড়াতে চাইলেও বাড়াতে পারি না। একরাশ বিষন্নতা ছেঁয়ে ফেলে আমাকে। বাল্যকালে 'চোর-চোর খেলাচ্ছলে' আপনাকে বোকা বানানোর জন্য আমি ঘরের কোনে চুপটি মেরে বসে থাকতাম। আপনি খুঁজতেন আমাকে। আর আজ প্রায় সাড়ে চার বছর হয়ে গেল-আমি আপনার আশায় পথ চেয়ে বসে মনে মনে আপনাকে খুঁজে যাচ্ছি।'

-আপনার সহোদরা বোন
শকুন্তলা।

চিঠির প্রতিটি ছত্র রণবীরের চোখে বাধভাঙ্গা অশ্রুর সঞ্চার করছিল। ওর দু'গাল বেয়ে পড়ছিল অশ্রু। ভিজে চাপ চাপ হয়ে গেল জামা। চিঠি শেষ করে সে মাথা নিচু করে বসে রইল। শেষ পর্যন্ত আব্দুল ওয়াহিদের দিকে চিঠি বাড়িয়ে বললো, 'আমার বোনের পত্র। পড়ে দেখতে পারেন।'

আব্দুল ওয়াহিদ পত্র পাঠ করে রণবীরের হাতে দিয়ে এক সেপাইকে ডেকে বললেন, 'দারোয়ানকে বলো, পত্রবাহককে এখানে নিয়ে আসতে।'

একথা বলে তিনি কলম তুলে কিছু লিখলেন। চিঠি ভাঁজ করে সিল মেরে রণবীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রণবীর চিন্তা করোনা। তুমি অচিরেই বোনের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছো।'

শম্ভুনাথ কামরায় প্রবেশ করলো। দেখতে সে এক হাড্ডিসার মধ্য বয়সী লোকের মত। রণবীর তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। শম্ভুনাথ ঝুঁকে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলে রণবীর বাহু ধরে তাকে বুকে তুলে নিল। দীর্ঘদিনের পর আচানক সাক্ষাতের অনুভূতিতে তারা কেবল মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। কথা বেরুল না কারো মুখ থেকে। রণবীরের চোখে অশ্রু উছলে ওঠল। শম্ভুনাথ অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করল।

শম্ভুনাথের মাথার পাগড়ী অসম্ভব বড় ছিল। সে পাগড়ী খুলে আব্দুল ওয়াহিদের পায়ের কাছে রেখে বললো, 'মহারাজ! মহারাজ!! নন্দনার লোকজন বলে, আপনি একজন দেবতা।'

আব্দুল ওয়াহিদ পাগড়ীটা তার হাতে দিয়ে বললেন, 'নন্দনার লোকজনের ধারণা ঠিক নয়। বস, তুমি ক্লান্ত। বসে বসে এতমিনানের সাথে কথা বলো। আমি তোমাদের মত একজন নগন্য লোক মাত্র।'

শম্ভুনাথ কৃতজ্ঞচিত্তে বললো, 'না মহারাজ! সামান্য এক গোলাম আপনার বরাবর কুরসীতে বসতে পারে না।'

'না! তুমি আমাদের মেহমান।' আব্দুল ওয়াহিদ একথা বলে তার বাহু ধরে উঠিয়ে চেয়ারে বসালেন। শম্ভুনাথের মুখ থেকে কোন কথা সড়ে না। তার দৃষ্টি রণবীরের দিকে তাকিয়ে বলছিল, আমি কোন ভুল জায়গায় এলাম না তো!

'শম্ভুনাথ বস!' রণবীর পেরেশান হয়ে বললো। শম্ভুনাথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার পাশটিতে বসে পড়লো। কিন্তু তার চকিত দৃষ্টি বলছিল, মামুলি একটি ইশারায় সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে।

আব্দুল ওয়াহিদ বললেন, 'তুমি রণবীরের বাড়ি থেকে এসেছ?'

'হ্যাঁ মহারাজ! অভয় দিলে আমি একটি আরজ করতাম।'

হাসির ঝিলিক ওষ্ঠপ্রান্তে বিলীন করে আব্দুল ওয়াহিদ বললেন, 'নির্ভয়ে বলো।'

শম্ভুনাথ পাগড়ীর মধ্যস্থ একটি অলংকারের থলে খুলে আব্দুল ওয়াহিদের সামনে রাখলো। বললো, 'মহারাজ সামান্য এ নজরানাটুকু গ্রহণ করে রণবীরকে মুক্তি দিন।'

'ও থলে তোমার কাছে রাখ। ওসবের জরুরত নেই।'

'মহারাজ একবার খুলে দেখুন। ওজনে কম হলেও এর দাম অনেক বেশী।' শম্ভুনাথ থলের মুখ খুলে অলংকার ছাড়াও এক ছড়া মোতির মালা এবং কয়েক গাছি হীরা অংকিত চুড়ি বের করে এক পাশে রাখল।

বোনের ব্যবহৃত অলংকারাদি দেখে রণবীরের প্রাণটা ছ্যাৎ করে উঠল। ফিরিয়ে নিল মুখ অন্যদিকে। আব্দুল ওয়াহিদ শম্ভুনাথের কাছ থেকে খালি থলে নিয়ে অলংকারগুলো তাতে পুরে দিলেন। থলের মুখ বেঁধে শম্ভুনাথকে বললেন, 'অলংকারগুলো আমার কাছে আমানত স্বরূপ থাকবে। বাড়ি যাবার কালে এগুলো নিয়ে যাবে। শহরের কোন সরাইখানায় না গিয়ে এখানে থাকলে অবশ্য এগুলো তোমার কাছে রাখতে পার।'

শম্ভুনাথ দাঁড়িয়ে বিনয়ের সাথে বললো, 'এগুলো মামুলি ও ফালতু অলংকার নয়। এর দ্বারা আপনি বিশাল চারটি হাতি ক্রয় করতে পারবেন। মোতির মালা আর হীরা খচিত চুড়িগুলোতে কোন খাদ নেই। নন্দনার কোন স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ডেকে এর সত্যতা যাচাই করতে পারেন। কথার হের ফের হলে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাবেন। এতদসত্ত্বেও এগুলো রণবীরের মুক্তি পণের জন্য যথেষ্ট না হলে আপনি ওনাকে ছেড়ে দিন। বাড়ি গিয়ে উনি আপনার প্রাপ্য পণ প্রেরণ করবেন। আর জামানত হিসাবে আমি আপনার কাছে বন্দী থাকবো।'

'আমার জানামতে রণবীর তার মুক্তিপণ আদায় করে ফেলেছে।' একথা বলে আব্দুল ওয়াহিদ মেঝে থেকে পত্রটি উঠিয়ে এক মুসলিম অফিসারকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি এ পত্রখানা বুদ্ধিমান এবং ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন একজন সৈন্য দ্বারা বিন্ধ্য গভর্ণরের কাছে পৌছে দিন। আমি তাকে এর পূর্বেও একটি পত্র প্রেরণ করেছিলাম। জওয়াব পাইনি আজো। গভর্ণর সাহেব বোধহয় ফৌজি ঝামেলায় আছেন। আপনার দূতকে বলবেন-চিঠিটি যেন সরাসরি গভর্ণরের হাতে দেয়।'

অফিসার চিঠি নিয়ে বেরিয়ে গেল। আব্দুল ওয়াহিদ রণবীরের দিকে মনোনিবেশ করলেন।

'আজ থেকে তোমরা দু'জনেই আমার মেহমান। চিঠির জওয়াব না আসা পর্যন্ত তোমরা এখানে থাকবে। বিন্ধ্য গভর্ণরকে তোমার মুক্তির ব্যাপারে সবিনয় অনুরোধ করেছি। আশা করি উত্তর খুব জলদি এসে যাবে। এখন তোমরা অন্য কামরায় নিরিবিলিতে কথা বলতে পার।'

আব্দুল ওয়াহিদ তালি বাজালেন। এক নওকর কামরায় প্রবেশ করল। মনিবের নির্দেশ মোতাবেক সে রণবীর ও শম্ভুনাথকে দ্বিতলের একটি প্রশস্ত কামরায় নিয়ে গেল। শম্ভুনাথ এমনিতেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিল। তদুপরি এ মহান সম্মানের দরুন সে হতচকিত হয়ে গেল। নওকর তাদের কামরা দেখিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলে শম্ভুনাথ হাত বেধে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে বললো, 'মহারাজ! আমার অপরাধ মার্জনা করুন। বাঘের মতো বিস্ফোরিত চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি যখন নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন আমি রীতিমত ভড়কে গিয়েছিলাম। জিন্দেগীতে এই প্রথম দূর্ঘটনাবশতঃ আপনার পাশে বসার মতো দুঃসাহস দেখাতে হয়েছে আমায়। আমি না বসে কি করি? তার নির্দেশের খেলাফ করলে আপনার কোন ক্ষতি হতে পারতো। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আমার সাথে এ ধরণের ঠাট্টা বিদ্রুপ করার রহস্য কি? হায়! আপনি যদি তাকে বলতেন-আমি বৈশ্য সম্প্রদায়ের লোক। আহা! যদি তাকে জানাতেন, আমার চার খান্দান আপনাদের পদ সেবা করে আসছে।'

রণবীর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ঘাবড়ে যেও না শম্ভুনাথ। এ কেল্লায় প্রবেশের পর তোমার জীবন বদলে গেছে। আজ থেকে তুমি সারা দুনিয়ার মানুষকে সমান চোখে দেখতে পার। জাত পাত ভেদের যে দেয়াল ঐ পাষাণ মূর্তিগুলো এতদিন দাঁড় করে রেখেছিল, এক্ষণে তা ধ্বসে পড়বে ক্রমশঃ।'

রণবীরের শেষ বাক্যটি চমকে দেয় শম্ভুনাথকে। তার মনে হয়েছিল রণবীর তাকে কেবল সাম্যতার গুনগান শুনাবে। সে বললো, 'না মহারাজ! আপনি অমন কথা থেকে বিরত থাকুন। আমি একজন নগন্য দাস। এত সুখ আমার কপালে সইবে তো?'

আব্দুল ওয়াহিদের নওকর কামরায় প্রবেশ করে শম্ভুনাথের কাছে জানতে চাইলো, 'আপনার ঘোড়া কোথায়?'

'আমার ঘোড়া?' শম্ভুনাথের কণ্ঠে পেরেশানী।

'হ্যাঁ!' নওকর জবাব দিলো। 'মনিব বলেছেন-আপনার ঘোড়া ও জরুরী মালপত্র যেন সংরক্ষণ করি।

শম্ভুননাথ ইতস্ততঃ করে বললো, 'ঘোড়া বিক্রি করে দিয়েছি।' নওকর চলে গেলে সে রণবীরের কানে কানে বললো, 'মহারাজ! আমি গাধায় চড়ে এসেছি। মুসলমানদের জনপদে প্রবেশের পূর্বেই ঘোড়া ছেড়ে ভিখারীর বেশ ধারণ করেছিলাম। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে এলে আমার দেহ তল্লাশীর সম্ভাবনা ছিল। গাধার পিঠে সওয়ার হতে দেখে কেউ ধারণা করতে পারেনি-আমার কাছে কি আছে। গাধাটি বিক্রি করে নন্দনার বাজার থেকে এক জোড়া মূল্যবান কাপড় খরিদ করেছি।'

পাঁচদিন পর। আব্দুল ওয়াহিদের নওকর রণবীর ও শম্ভুনাথের কামরায় প্রবেশ করল। ছোট একটি ঘড়ি ও একখানা তলোয়ার পেশ করে সে বললো, 'আপনারা

সফরের প্রস্তুতি নিন। মনিব নামাজ পড়ে কেল্লার ফটকে আপনাদের সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করবেন। তলোয়ারটি কিছুক্ষণ হলো তিনি আমায় দিয়েছেন। প্রস্তুতি শেষ হলে আমি এসে আপনাদের নিয়ে যাবো।'

রাতের বেলায়ই রণবীর মেজবানের মুখে মুক্তির শুভ সংবাদ শুনতে পেয়েছিল। বিন্ধ্য গভর্ণর তার মুক্তি অনুমোদন দিয়েছেন। শেষ রাত্রিতে সে খুশী আতিশয্যে শম্ভুনাথকে বলল, 'আজকের সকাল কখন হবে রে শম্ভু!'

রণবীর লেবাছ পাল্টালো। নওকর এসে তাদের কেল্লার দরজায় নিয়ে গেল। কেল্লার ফটকে এক সেপাই দু'টি ঘোড়া নিয়ে তাদের অপেক্ষায় ছিল। শম্ভুনাথের প্রতিটি ক্ষণ উৎকণ্ঠায় কাটছিল। ভাঙ্গা আওয়াজে সে বার বার উচ্চারণ করছিল, 'বেশ দেরী করে ফেললাম। সূর্য ঠিক মাথার উপর। ভগবান জানেন এদের মতি গতি পাল্টে যায় কিনা।' রণবীর তাকে বললো, 'ভয় নেই না শম্ভু! যা হবার হবে।'

কেল্লার এক কোন থেকে কথা বলতে বলতে আব্দুল ওয়াহিদ সেনা অফিসারসহ রণবীর ও শম্ভুনাথের সাথে মিলিত হলেন। আব্দুল ওয়াহিদ অলংকারের থলে ও একটি চিঠি হস্তান্তর করে বললেন, 'এ তোমার সেই আমানত বস্তু। পথের তামাম চৌকির অফিসারের কাছে নির্দেশ দেয়া আছে চিঠির মধ্যে। তারা তোমাদের নির্বিঘ্নে যেন সফর করতে দেয়। এ ছাড়া আমার আন্তরিক দোয়া তো তোমাদের সাথে থাকছেই। দেরী করো না। তোমাদের ঘোড়া তৈরী।'

সকৃতজ্ঞচিত্তে রণবীর তার ত্রাণকর্তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমৃত্যু আপনার অনুদানের কথা ভুলবো না। আপনি আমার একটি আরজি রাখবেন কি? আমার মুক্তিপণ আপনার দাবী মোতাবিক একদিন আদায় করে দেব। ততদিন আমার বোনের এ অলংকারগুলো আপনার কাছে আমানত থাক।'

আব্দুল ওয়াহিদ বললেন, 'আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছু করছি না। বিন্ধ্য গভর্ণরের নির্দেশ-মুক্তিপণ ব্যতিরেকে তোমাকে যেন মুক্তি দেয়া হয়। তোমার বোনের অলংকারের কথা আমার দরখাস্তে উল্লেখ ছিল। মহামান্য গভর্ণর কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন-'ঐ অলংকার কিছুতেই যেন রাখা না হয়।'

'কমপক্ষে ঘোড়া দু'টির দাম তো রাখতে পারেন?'

'ঘোড়া দু'টি আমার ব্যক্তিগত। এক দোস্তের সামান্য এ তোহ্ফা গ্রহণ করে কৃতার্থ করবে বলে আশা রাখি।'

আব্দুল ওয়াহিদ মুসাফার জন্য হাত বাড়ালেন। রণবীর ও শম্ভুনাথ জিন কষলো। ঘোড়া ছুটলো কনৌজের উদ্দেশ্যে।

রূপাবতি নদীর তীরে কাপড় ধুতে ছিল। হঠাৎ পাশের কোথা থেকে ভেসে এল গানের গুনগুনানি। কাপড় কাচা বন্ধ করে সে কান খাড়া করল। গানের আওয়াজ ক্রমশঃ নিকটে আসছিল। বাড়ছিল এতে রূপার দিলের কম্পন। গানের মধুর সুরে তার অন্তর জুড়িয়ে গেল। এর পূর্বে সে এ আওয়াজ শুনলে গায়ককে কাছে পেতে দাপাদাপি করত। কিন্তু আজ আর সেই মধু ক্ষণটি নেই। আজ তার অন্তর খুশীর বদলে বিষন্ন থেকে বিষন্নতর হচ্ছিল। এ আওয়াজ তাকে বাসন্তী কোলাহলে পরিপূর্ণ দুনিয়া থেকে বিদায়ের সংবাদ দিচ্ছিল। সে বারবার উচ্চারণ করছিল, 'রামনাথ! তুমি যদি আমার কাছে না আসতে।'

গায়ক আচানক থেমে গেল। রূপাবতি তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখার সাহস সে হারিয়ে ফেলল। কিন্তু সদ্য ফোটা গোলাপ ফুল যখন তার খোঁপায় গুঁজে দেয়া হলো, তখন সে না তাকিয়ে পারল না।

রামনাথ লাল-সুন্দর এক উঠতি যুবকের নাম। রূপাবতির কাছে এসে সে হাসতে লাগল। খর্বকায় হলেও তার সীনা ছিল বিশাল। সে রূপাবতিকে লক্ষ্য করে বললো, 'আজ দেবীকে বেশ সুন্দর লাগছে তো!'

রূপাবতি মাথা উঠিয়ে রামনাথের দিকে তাকাল। তার দু'চোখ অশ্রুতে পরিপূর্ণ।

'রূপা! রূপা!!' রামনাথ ভাঙ্গা আওয়াজে ডাকলো। 'কি হলো! তুমি কাঁদছো যে? কেউ তোমায় বকেছে?'

ওড়নায় আঁসূ মুছে রূপাবতি বললো, 'রামনাথ! তুমি আমার একটি কথা রাখবে?'

রামনাথ বেপরোয়া জওয়াব দিল, 'তোমার অশ্রু আমাকে প্রত্যেকটি কথা মানতে বাধ্য করবে।'

'যদি বলি, আর কোন দিন আমার সাথে দেখা করবেনা, তাও?'

'দেবী তার পূজারীকে মৃত্যুর হুকুম দিতে পারে, কিন্তু তাকে পূজা করতে নিষেধ করতে পারে না।'

রূপাবতি আর্তস্বরে বললো, 'জানি, তুমি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। অবশ্য এর জন্য আমিই দায়ী। হায়! তোমাকে যদি সব খুলে বলতে পারতাম!'

'দুনিয়ার কোন শক্তি তোমাকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

'আমি খুব শীঘ্রই এমন এক স্থানে যাচ্ছি, যেখানে তুমি কিছুতেই প্রবেশ করতে পারবে না। তাই আমাকে ভুলতে চেষ্টা কর!'

রামনাথ মুচকি হাঁসির কোশেশ করে বললো, 'আমার সাথে ঠাট্টা করোনা রূপা! তুমি তারা হয়ে আকাশে চড়লে, আমি চাঁদ হয়ে তোমার পিছু নিব। তুমি আমার! শুধু আমার! কেউ তোমাকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তোমার মামা অন্য কোথাও সম্বন্ধ করতে চাইলে বাবাকে আজই তার কাছে পাঠাব। তিনি তাকে বুঝিয়ে মত পাল্টাতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।'

'আমি আজ তোমাকে যা বলব এর আলোকে অনুধাবন করতে পারবে যে, আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে তোমার বাবা আমার মামু সকলেই অসহায়। আমি সোমনাথ মন্দিরে দাসী নির্বাচিত হয়েছি। মামুজান চেষ্টা করলেও আমাকে রুখতে পারবেন না। জন্মের দ্বিতীয় দিনে আমার মা মারা গিয়েছিলেন। ঐ দিনই সোমনাথের জনৈক পূজারী আমাদের জনপদে এসেছিলেন। মা মানত করেছিলেন- 'ও বাঁচলে সোমনাথ মন্দিরের দাসী হিসাবে ভজন দিব।' এক বছর বয়সে বাবাও আমাকে ছেড়ে পরলোকে চলে যান। মামু ছিলেন নিঃসন্তান। এ জন্য জ্যাঠাদের প্রতিপালন থেকে তিনি আমাকে তার কাছে নিয়ে আসেন। মামুজান জানতেন, বাবাও আমাকে মা'র মত সোমনাথে প্রেরণ করতে রাজী ছিলেন। অবশ্য কোনদিন তারা আমাকে ভুলেও এ কথা জানতে দেননি। গত বছর জ্যাঠা মশাই'র কাছে সর্বপ্রথম জানতে পারি-আমার প্রকৃত ঘর সোমনাথ মন্দির। তোমাকে তখনই না বলে আমি মহা ভুল করে ফেলেছি রামনাথ। আমি প্রকৃতপক্ষে তোমার সাথে প্রবঞ্চনা করিনি বরং আত্ম প্রবঞ্চিত হয়েছি। প্রতি বছরই হাজারো মেয়ে-সন্তানকে সোমনাথে বিসর্জনের মানত করা হয়। কিন্তু বয়স বাড়লে সকলের ভাগ্যে ওখানে যাওয়া হয় না। আমি ভাবছিলাম, অন্যান্য যুবতীদের মত পূজারীরা আমাকেও প্রত্যাখান করবে। সে ক্ষেত্রে তোমার আমার মাঝে বাঁধার দেয়াল থাকবে না। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় ছিল ভিন্ন ধরনের। গত পরশু দিন সোমনাথের পূজারী ট্যাক্স আদায় করতে এলো। তার সাথে ছিলেন খুড়ি (চাচী)। এ বছর জ্যাঠার দু'টি গরু মারা গেছে। তাদের মতে, আমাকে সোমনাথে না পাঠানোর দরুণ দেবতা নাকি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। পূজারী মহাশয় আমাকে দেখেই বলেছেন, 'কয়েকদিনের মধ্যে এসে ওকে নিয়ে যাব।'

রূপার কথায় রামনাথের স্বপ্নের সুন্দর জগৎ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। ঠোঁটের উপর হাসির পরিধি বাড়াতে চাইল, কিন্তু বাড়লনা। বললো, এ কথার মানে, আমি তোমার খবরাখবর না রাখলে তুমি আমার সাথে দেখা না করেই চলে যাবে?'

রূপাবতি জওয়াব দিল ঃ 'হ্যাঁ! আমার ন্যায় অবলা নারীর জন্য শিবাজী মহারাজ তোমার উপর নাখোশ হোক, এটা আমি চাই না। তার গোস্বা পাহাড়কে বিগলিত করে দিতে পারে। রামনাথ! প্রতিজ্ঞা করো, তুমি আমার পিছু নিবে না।'

রামনাথ ঠোঁট কামড়ে বললো, 'রূপা! তুমি সোমনাথ যাওয়ায় আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত নই। ধন সম্পদ সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। শুনেছি, ওখানে অনেক দাসীর বিবাহের অনুমতি দেয়া হয় একটি শর্তে। তা হচ্ছে, স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে পূজারীদের থলে ভরে দিতে হবে। আজ তোমাকে বলতে এসেছি, গোয়ালিয়র ফৌজে যোগ দিতে যাচ্ছি আমি। আগামীতে এক নগণ্য কৃষকপুত্র হিসেবে তোমার সন্মুখে আসব না। বাহুবল আমার জীবনের উজ্জ্বল দিক খুলে দেবে বলে মনে করি। খায়েশ ছিল, হাতির পিঠে চড়ে কোন একদিন তোমার মামুর গৃহে যাব। ভরে দেব স্বর্ণ-রোপ্য দিয়ে তার থলে। তুমি সোমনাথে যাচ্ছ। আফসোস নেই। তবে অচিরেই আমি তোমার সাথে ওখানে মিলিত হব। তোমাকে উদ্ধার করতে দুর্লভ হীরা বিনিময় করা লাগলেও আমি পিছপা হব না।'

'তুমি এমন এক যুবতীর সাথে বাক্য ব্যয় করছো, যে ওখানে সানন্দে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। আর বাবা-মা তাকে এ অভিপ্রায়ে ওখানে প্রেরণ করছে যে, বড় বড় রাজা-মহারাজারা তার পাণি প্রার্থী হবে। আমি শিবাজীর পদতলে বিসর্জিত এক অসহায় নারীমূর্তি। ওখানে যাবার পর আমার তামাম স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হবে। আমার জিন্দেগী মন্দিরের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। পূজারীরা বলতেন- আমার মত যুবতীদের নাকি সোমনাথ মন্দিরে দেবীর মর্যাদা দেয়া হয়। আর তুমি এ কথা নিশ্চয়ই জান- সোমনাথের দেবীদের দিকে রাজা-মহারাজারা পর্যন্ত মুখ তুলে তাকাতে সাহস করেন না। তোমার জীবন থেকে রূপাবতির পাঠ চুকে ফেল রামনাথ। তুমি যে রূপাকে এতদিন দেখে আসছো, সে মারা গেছে।'

রামনাথ আর্তস্বরে বললোঃ 'না, রূপা না! আমি পূজারী হয়ে সোমনাথে তোমার সঙ্গে মিলিত হব। একই অভিপ্রায়ে দু'জনে বাকী জীবন ওখানে কাটাব। আজীবন সোমনাথের দেবতাদের কাছে কীর্তন গাইবো। যাতে তারা খুশি হয়ে আমাকে পূজারীর মর্যাদা দান করেন।'

'রূপ! রূপা!!' ঘন ঝোপের আড়াল থেকে কেউ ডেকে উঠল।

রূপাবতি ঘাবড়ে বলে ওঠলঃ 'রামনাথ যাও! ভগবানের দিকে তাকিয়ে জলদি সরে পড়। মামুর কাছে ওয়াদা করেছিলাম, কোনদিন তোমার সাথে মিলিত হব না।'

'তোমাকে সব কথা এখনো বলা হয়নি। ওয়াদা করছি, তুমি সোমনাথে গেলে অচিরেই তোমার কাছে যাব। যে কথা আমরা লোক সমাজে বলতে পারিনি, দেবতাদের সামনে বলবো তা।' রামনাথ একথা বলে জংগলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রূপাবতি চকিতে একটি কাপড় নিংড়াতে মশগুল হলো। বললো উচ্চস্বরে....

'কি হলো মামু? এইতো আমি এখানে।'

গাছের আড়াল থেকে বয়োবৃদ্ধ একজন বেরিয়ে এসে বললো, 'খুকি! খুব দেরী করছো যে আজ? জলদি ঘরে চলো।'

'এই আসছি মামুজান! একটা কাপড় বাকী আছে। ওটা কেচে আসছি।'

'বেশ! জলদী করো।' রূপার মামু একথা বলে নিকটবর্তী একটি গাছের ছায়ায় বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর। রূপাবতি মামুর সাথে ঘরের দিকে রোখ করছিল। রামনাথ দেখছিল সে দৃশ্য ঘন ঝোপের আড়ালে বসে। ক্ষেত অতিক্রম করে রূপাবতি বস্তিতে ঢুকে পড়লে রামনাথ নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

॥ দুই ॥

রামনাথের বাবা একজন মামুলী জমিদার ছিলেন। নাম গোপী চাঁদ। সোমনাথ মন্দিরের জমীন চাষ করতেন তিনি। স্থানটি ছিল ২০ মাইল লম্বা আর ১০ মাইল চওড়া। তাদের জমীনের পাশ দিয়ে বয়ে চলছে খরস্রোতা নদী। ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজারা এ ধরনের হাজারো বিঘা জমি সোমনাথ মন্দিরের নামে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। গোয়ালিয়র এ সবুজ-শ্যামল ভূমিতে রাজার হুকুমত ছিল নামমাত্র। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল সোমনাথ মন্দিরের ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের হাতে। প্রতি বছর মন্দিরের লোকজন এ সব জায়গীর থেকে ট্যাক্স উসুল করত। ট্যাক্সের ধরাবাঁধা কোন নিয়ম ছিল না। মন্দিরের মুখপাত্ররা দু'হাতে জনগণের মাল-সম্পদ লুট করত। বাজেয়াপ্ত করত ভূ-সম্পত্তি। যদি কেউ ট্যাক্স দিতে গড়িমসি করত- পূজারীদের উপস্থিতিতে এসব লোকের ফসল বরবাদ করে দেয়া হত। মন্দিরের পক্ষ থেকে ৫০/৬০ জনের মত সশস্ত্র লোক এ জনপদে নিয়োজিত ছিল। এসব নীতিভ্রষ্ট সেপাই পূজারীদের অঙ্গুলী হেলনে জনগণের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি, মারধর ও তাদের বেইজ্জত করতে এক পায়ে খাড়া থাকত। মন্দিরের জ্বালাতনে জনপদবাসী কল্পনা করত তাদের বাবা-ঠাকুরদা'দের যুগের কথা। যখন তারা ট্যাক্স দিত রাজা-মহারাজাদের। তাদের সুবিচারে তারা খুশী হয়ে হাজার হাজার টাকা মন্দিরে দান করত।

রামনাথের বাবা গোপীচাঁদ বিশেষ করে এ অতীত কাহিনী জনগণকে শুনাতেন। মন্দিরের আওতায় আসার পূর্বে এ জনপদ স্বচ্ছল ও সুখী-সমৃদ্ধশালী ছিল। মন্দিরের আওতায় আসার পর থেকে এ জনপদে কেবল সুখ-শান্তিই বিনষ্ট

হয়নি, বরং জনপদবাসীর জীবনের প্রতিও হুমকি দেখা দিয়েছিল। বানিয়ে ফেলছিল জনপদটিকে তলাহীন ঝুড়িতে।

গোপীচাঁদ যখন একটু বুঝতে শুরু করেন, তখন তার হাতে সামান্যই ভূ-সম্পত্তি ছিল। বাবা-ঠাকুরদা'দের মত তিনি কেবল বর্গার ভাগ পেতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ফসল চাই। উৎপাদন হোক, চাই না হোক। ওরা জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতেও পিছপা হতনা। মন্দিরের আস্থা অটুট রাখার স্বার্থে গোপীচাঁদ প্রতি বছরই একট-আধটু জমি কবলা দিতেন। তামাম হিন্দুদের মত মন্দিরের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন তিনিও। কিন্তু একটি পীড়া তার মনে তোলপাড় তুলত- হাজার জনতার বুকের তাজা খুন আর ঘামঝরা পরিশ্রমের ফসল কুক্ষিগত করে বিলাসী জীবন কাটাচ্ছে নগণ্য ক'জন পুরোহিত? উনি এসব নীতিজ্ঞানহীন পুরোহিতদের সন্ত্রাসী, বদমাশ ও ডাকু বলে ডাকতেন। যদিও সোমনাথ মন্দিরের পুরোহিতদের সামনে এ নামে ডাকা মৃত্যুর শামিল। জনগণ গোপী চাঁদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তিনি জন্মগতভাবে একটু মিশুক প্রকৃতির। কারো গবাদী পশু মারা গেলে নিজের জমীন কবলা দিয়ে তাকে পশু কিনে দিতেন, দান করতেন অকাতরে। ট্যাক্স অনাদায়ে কোন কৃষক গ্রেফতার হলে জনগণ গোপী চাঁদকেই আখেরী ভরসা মনে করত।

বর্তমানে তার অবস্থা সেই আগের মত নেই। দরিদ্রতার কষাঘাতে তিনি জর্জরিত। উদারতা, আর্থিক দৈন্যতা ও মন্দিরের জ্বালায় তিনি আগেরচে' একটু খিটমিটে মেজাজের হয়ে ওঠেছেন। তবুও জনগণ তাকে ভালো চোখে দেখত। তার দৃষ্টিতে এক্ষণে সবচে' নিকৃষ্ট মানুষ তারা, যারা মন্দিরের নামে ট্যাক্স আদায় করতে আসত। তার চোখে শ্রদ্ধার বস্তু ছিল সোমনাথের মূর্তিগুলি। এমনিভাবে গরু ছিল তার কাছে খুব প্রিয় আর হাতি ছিল সবচে' ধিক্কারের পশু। বিশেষ করে, পূজারীরা যেদিন হাতি দ্বারা তার ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করেছিল, সেদিন থেকেই হাতির প্রতি তার যত ঘৃণা ও ক্ষোভ। পূজারীরা তার ক্ষেতে ৮-টি হাতি ছেড়ে দিয়েছিল। তিন দিনে তার অর্ধেক ক্ষেত বরবাদ করে দিয়েছিল ঐ হাতির বহর। লোকজন অবশ্য হাতিকে দেবতা মনে করত। গোপীচাঁদ বলতেন- 'ফসল নষ্ট করা দেবতাদের কাজ হলে নিশ্চয়ই হাতি বড় মহান দেবতা। কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোকজন মাঝে মাঝে তাকে ঘিরে ধরে বলতো....

'বাবা! আপনি হাতির উপর এত ক্ষ্যাপা কেন?'

গোপীচাঁদ হাতির নামোচ্চারণ হতেই কেটে পড়ে বলতেন, বৎসগণ! ফসল পাকার মৌসুমে হাতি এসে তোমাদের ক্ষেত দলিত মথিত করলে দেখব- হাতিকে কি করে দেবতা বলো! ভগবানের দোহাই! দেবতা তো দূরের কথা, হাতিকে আমি পশুই মনে করি না।'

উত্তর ভারতে সুলতান মাহমুদ গজনবীর কারণে গোটা ভারতের রাজ ফৌজে হাতির আনাগোনা ছিল লক্ষ্যণীয়। এসব হাতির উপর জনগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি বাড়ছিল শনৈঃ শনৈঃ। গোপীচাঁদ গনেশ দেবতার উপর ঘৃনা ও ক্ষোভ সংযত করেছিল বড় কষ্টে। কিন্তু ভারতবর্ষে ক্রমাগত হিন্দুদের পরাজয় সংবাদ শুনে তিনি বলতেন, 'ভগবানের দিব্যি! এ সব দেবতা আমাদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ছে। এসব হাতি-মাতি দিয়ে কাজ হবেনা। ভগবান এগুলোকে স্রেফ একটা লম্বা শুঁড় দিয়েছেন। এক্ষণে দু'টি মুসিবত আমাদের পাশে অক্টোপাশের মত ঘুরছে। একটা হচ্ছে, রাজা-মহারাজাদের লিপ্সা নিবারণ, দ্বিতীয়টা হাতির শুঁড়।

রামনাথের ভবিষ্যৎ নিয়ে গোপীচাঁদের চিন্তার অন্ত নেই। তার সবচে' বড় খায়েশ, রামনাথ একজন সৈন্য হবে। ফৌজে কোন পদ পেলে সে মন্দির শাসিত জায়গীর ছেড়ে অন্য জনপদে চলে যাবে। তদানীন্তনকালে ফৌজি অফিসাররা হুকুমত থেকে বিশাল ভূ-সম্পত্তি ভাতা পেত। এ অভিপ্রায়ে গোপীচাঁদ এক যুদ্ধবাজ পণ্ডিতের কাছে রামনাথকে রণশিক্ষা দিতে প্রেরণ করেছিলেন। রামনাথ তীরন্দাযী, তেগ চালনা ও ঘোড় সওয়ারে তার কাছ থেকে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছিল। পার্শ্ববর্তি বস্তির বহু নওজোয়ান ইতিমধ্যে ফৌজে শামিল হয়েছে। রামনাথ এদের কাছে গিয়ে যুদ্ধনীতি হাসিল করত। প্রথম যৌবনেই রামনাথের খ্যাতি তাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। গোপীচাঁদ পুত্রের বাহাদুরীতে গৌরবান্বিত ছিলেন। তবে রামনাথের একটি খাসলাতকে তিনি যারপরনাই ঘৃণা করতেন। সংগীতের প্রতি রামনাথের একটা দূর্বলতা ছিল। একজন গায়ক হিসেবে ওর খ্যাতি ছড়াক, এটা তার কাছে দুঃসহ মনে হত।

গোপীচাঁদের ক্ষেতের সাথে রূপাবতির মামুর জমীন। রামনাথ কিষাণদের সাহায্যার্থে কখনো ক্ষেতে যেত।

একদা এক কিষাণ অসুখে পড়লে রামনাথ তার স্থলে হাল চালাতে গেল। তার ঠিক পাশের ক্ষেতটিতে রূপার মামু হাল চাষ করছিলেন। রামনাথ কিছুক্ষণ অনুচ্চ স্বরে গান গেয়ে শেষ পর্যন্ত বেপরোয়াভাবে উচ্চস্বরে গাইতে লাগল। রূপার মামুর মত অন্যান্য সকলে ওর গানের সুর মূর্ছনায় অভিভূত হয়ে পড়ল। রূপাবতি তার মামুর জন্য দুপুরের খানা নিয়ে এসেছিল। রামের গান তাকে খাদ্যের কথা ভুলিয়ে দিল। রূপার মামু রামনাথকে আহবান করলো, 'এসো। খানা খাবে।'

রামনাথ মাথা দুলিয়ে বললো, 'খানা খেয়ে এসেছি। তবে লাচ্ছি খেতে পারি।'

'এসো! লাচ্ছি পর্যাপ্ত আছে।'

রামনাথ তার নিকটে এসে বসল। রূপাবতি গ্লাসে করে লাচ্ছি দিল। রামনাথ চুমুকে শেষ করে গ্লাস ফেরত দিলে রূপা বললো, 'আর দেব কি?'

'না।' সে জবাব দিল।

রূপার মামু রামনাথকে লক্ষ্য করে বললো, 'আরে খাওনা। বহুত আছে। তোমার মত তাগড়া জোয়ানের এক গ্রাসে কি হয়?'

'আচ্ছা দিন!'

মুচকি হাসি দিয়ে রূপা আরেক গ্রাস দিল। লাচ্ছি পান করে রূপার মামুর সাথে ক্ষেত সম্পর্কিত কিছু আলাপ করে ও উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তার চোখে ভেসে উঠলো টানা টানা চোখের হাস্যোজ্জ্বল তরুনীর চিত্র। দীর্ঘ দিন ওর সাথে রূপাবতির সাক্ষাৎ হয়নি।

একদিন রামনাথ স্নান করে কাপড় বদলাচ্ছিল। আচানক তার কানে ভেসে এলো নারীকণ্ঠের সুমধুর সুর। গানের ছত্র তার জানা ছিল। এ গানই সেদিন সে রূপা ও তার মামুর সামনে হালচাষ কালে গেয়েছিল। গায়িকা এক ছত্র গেয়ে খামোশ হয়ে গেল। খানিক পর সে দ্বিতীয় ছত্র গাইল। বিকৃতি সাধন করলো বেশ। রামনাথ উচ্চস্বরে গানের সঠিক সংলাপ ধরে গাইতে লাগলো। চুপ করল তখন গায়িকা। গাছের আড়াল থেকে একপাল পশু নিয়ে এক যুবতী বেরিয়ে এল। রামনাথের দু'চোখ প্রাণভরে উপভোগ করলো অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতির রূপসুধা। যুবতীটি রূপাবতি। যুবতী পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে ফিরে যেতে লাগলে রামনাথ অগ্রসর হয়ে বললো, 'দেখুন! আমার গানের সংলাপ বিকৃত করার অধিকার কারো নেই!'

রূপাবতি ঘাড় কাত করে রামনাথের দিকে তাকালো। হাসলো। তারপর 'এই হ্যাস্ হ্যাস্' বলে পশু তাড়িয়ে নিয়ে চললো। খানিকপর সে পুরো গানের সংলাপই বিকৃত করে গাইতে লাগল। রামনাথ রাগে দাঁত কটমট করল। যত্তোসব! কিন্তু এই রাগের মধ্যে একটা অনুরাগ ছিল, যা ওদিন উপলব্ধি করতে পারেনি ও। একটু আধটু এই অনুরাগ একদিন ভালবাসায় রূপান্তরিত হলো। মনের গভীরে স্থান করে নিল তা।

এর ৬ মাস পর নদী তীরে কাপড় কাঁচতে এসে রূপাবতির সাক্ষাৎ হয় রামনাথের।

এ যুগেই শীতলক্ষ্যা অববাহিকায় মাহমুদ গজনবীর বিজয়ি ভেরী উড্ডীন হয়েছিল। ভারতের রাজা-মহারাজারা ভবিষ্যৎ হুমকির সম্ভাবনায় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অগণিত ফৌজ সংগ্রহ করছিল। রামনাথের সমবয়সী হাজারো জোয়ান গোয়ালিয়র ফৌজে ভর্তি হয়। সিপাই হিসেবে তার নাম ছড়িয়ে পড়ুক, এমন একটি আশা দীর্ঘদিন মনে পুষে আসছিল রামনাথ। রূপাবতির ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে লালিত সেই আশার মাত্রাটা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। অবশ্য মায়ের বাৎসল্যে দীর্ঘদিন থাকার দরুন তার পক্ষে ফৌজে শামিল হওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। রামনাথের মা

অশেষ যন্ত্রনা ভোগ করে অবশেষে চার মাস পর মারা যান। মা'র মৃত্যুর তিন মাস পর গোয়ালিয়র ফৌজে শামিল হল রামনাথ। কিন্তু রূপাবতির আখেরী মোলাকাত তার স্বপ্নের জগৎকে ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছে। এখন শুধু বাবার মনোতুষ্টির জন্য সে গোয়ালিয়াভিমুখী হলো।

॥ তিন ॥

দু'বছর পর। এ সময়ে সুলতান মাহমুদ গজনবীর বিজয় সয়লাবের গতি গঙ্গা-যমুনার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। দক্ষিণ পূর্ব ভারতের আওয়াম মনে করেছিল, কনৌজ মহারাজার নেতৃত্বে গোটা ভারতবর্ষের রাজ্যপালরা মাহমুদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু মাহমুদ গজনবীর ক্ষিপ্রতা ও দূরদর্শিতার সামনে রাজা-মহারাজাদের ফৌজ সংগ্রহে ভাটা পড়ল। তারা একের পর এক মাহমুদের দেশ জয়ে ভীত সন্ত্রস্থ হলো। তাঁর বিজয় রথ গজনী থেকে জলন্ধর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো এ দু'বছরে। মথুরার ব্রাহ্মণ সমাজ মনে করেছিলেন, হিন্দু সন্তানরা এ পবিত্র শহরকে জান দিয়ে হলেও রক্ষা করবে। নেড়ে মুসলিমরা তাদের লাশ মাড়িয়ে কেবল মথুরায় প্রবেশ করতে পারে, তবুও মথুরার আজিমুশ্বান মন্দিরে ওদের ঢুকতে দেয়া হবে না।

দক্ষিণাত্য থেকে গোয়ালিয়র ও জলন্ধর পর্যন্ত ব্রাহ্মণ সমাজ একটি শ্লোগান দিয়ে হিন্দুদের উজ্জীবিত করছিল-মথুরা বাঁচাও।

সুলতান মাহমুদ সুরসা প্রশাসনকে শোচনীয় পরাজয় করে ব্রনের দিকে অগ্রসর হলেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণরা নির্বাসিত রাজা-মহারাজাদের সহায়তায় গোটা ভারতবর্ষের আওয়ামের কাছ থেকে মথুরা হেফাজতকল্পে মোটা অংকের চাঁদা তুললো। দেশের অন্যান্য বাসিন্দাদের মত গোয়ালিয়র প্রশাসনও ব্রাহ্মণদের আহবানে সাড়া দিল। কোচ করলো হাজারো সন্তান শ্রীকৃষ্ণের পূণ্যভূমি মথুরা রক্ষাকল্পে। আওয়াম এসব স্বেচ্ছাসেবী ফৌজের খাদ্য ও রসদ জোগাতে সাধ্য মত চাঁদা দিল। ব্রাহ্মণদের একটি দল গোপীচাঁদের কাছে চাঁদা চাইতে এলো। তারা গোপীচাঁদের জনপদের নওজোয়ানদের যুদ্ধে প্রলুব্ধ করলো। ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় উদ্দীপনা ও শ্রীকৃষ্ণের ভাবমুর্তি রক্ষার্তে বেশ কিছু নওজোয়ান স্বেচ্ছাসেবী ফৌজে ভর্তি হলো। কিন্তু ঘোড়া ও অন্যান্য অর্থ জোগানের প্রশ্ন আসতেই জনগণ ওযর পেশ করে বললো, 'কিছুদিনের মধ্যে সোমনাথ মন্দিরের মুখপাত্রগণ ট্যাক্স নিতে আসবেন। তারা কাউকে এক কানা কড়িও মাফ করবেন না। অন্যথায় তারা অত্র জনপদের আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাদের মুখের গ্রাস আপনাদের হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হত না। মথুরার ব্রাহ্মণগণ বুঝালেন, সোমনাথের জায়গীর

প্রত্যেকটি প্রদেশেই আছে। অন্যান্য প্রদেশের জমিদার ও কিষাণরা তাদের সর্বস্ব মথুরা রক্ষার্থে দান করেছে। সোমনাথ মন্দির এখান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। এ জন্য পুরোহিতগণ মাহমুদকে ভয় পান না। কিন্তু মথুরার উপর চড়াও হতে মাহমুদের সময় লাগবে না। মথুরার পবিত্র ভূমিতে দুশমনকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে না পারলে মনে রেখ, সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন মুসলিমদের অশ্ব এ বস্তিতে প্রবেশ করবে।

গোপী চাঁদ ব্রাহ্মণদের কথার সমর্থন করতে গিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন,

'ভাই বন্ধুগণ! মথুরা আমাদের স্বর্গরাজ্য। আশা-ভরসার স্থল। মথুরার পতন মূলতঃ হিন্দুধর্মের পতন। সোমনাথের পুরোহিতগণ এদিকটা খেয়াল না করলে আমাদের কিছু করার নেই। গঙ্গা-যমুনার উপকূলে তারা ট্যাক্স নিতে ঠিকই আসবেন কিন্তু দুশমনের হামলা থেকে এ জনপদকে রক্ষাকল্পে কিছুই করবেন না, এ তো হতে পারে না। এবার ট্যাক্স নিতে এলে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে- যতদিন আমরা দুশমনের শংকামুক্ত না হচ্ছি, ততদিন আপনারা ট্যাক্স পাবেন না। আমরা রাজা মহাশয়ের কাছে ফরিয়াদ করব- পুরোহিতদের জুলুম থেকে আমাদের পরিত্রাণ দিন। ওরা আমাদের বুকের খুন আর ঘামঝরা শ্রমার্জিত ধন সম্পদ কুক্ষিগত করছে। রাজা মহাশয় আমাদের আহবানে সাড়া না দিলে নিজেদের ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করব। মথুরার ব্রাহ্মণগণ ব্যক্তিগত কাজে চাঁদা চাইলে তাদের বলতাম, আমরা সোমনাথের প্রজা। এখানে এক কানা কড়িও আপনাদের দেয়ার মত নেই। এক্ষণে মথুরার জন্য আমাদের তামাম পুঁজি দান করার একটা মাত্র উদ্দেশ্য হলো, হিন্দু ধর্মকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচানো।'

সোমনাথ মন্দিরের ব্যাপারে সিংহভাগ জনতার রায় গোপীচাঁদের চে' ভিন্ন ছিল না। কিন্তু জনাকীর্ণ সমাবেশে এ ধরনের দুঃসাহসিকতা কেবল গোপীচাঁদই দেখাতে পারেন।

গোপীচাঁদের বক্তৃতা শুনে আওয়াম সাধ্যমত চাঁদা দিতে শুরু করল। যাদের কাছে নগদ অর্থ ছিল না, তারা শস্য এনে ব্রাহ্মণদের পায়ের কাছে রাখল। মহিলারা নাক-কানের অলংকার খুলে দিল। গোপীচাঁদ ফসল বিক্রি করে সোমনাথ মন্দিরের জন্য যে নগদ অর্থ পুঁজি করে রেখেছিলেন, তার সবটাই ব্রাহ্মণদের হাতে তুলে দেন। তাছাড়া তার মৃত স্ত্রীর অলংকারাদি এনে ব্রাহ্মণদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এ অলংকারাদি এতদিন সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন ভাবী পুত্রবধুর জন্য। কিন্তু 'মথুরা প্রেম' তাকে সে কথা ভুলিয়ে দেয়। অতঃপর বাড়ী বাড়ী গিয়ে তিনি চাঁদা তোলেন।

মথুরার ব্রাহ্মণগণও সোমনাথের পুরোহিতদের হাতের পুতুল ছিলেন। তারা গোপীচাঁদের ন্যায় মুখ পাতলা লোকের খোদাদাদ কৃতিত্ব থেকে এ সময় বেশ

ফায়দা লুফেন। সোমনাথ মন্দিরে পুরোহিতদের বিরুদ্ধে যে বিষোদগার তারা করতে চাচ্ছিলেন, অপ্রত্যাশিতভাবে তা গোপীচাঁদের মুখ ফস্‌কে বের হওয়ায় তারা স্বস্তির ঢেকুর তোলেন। তারা গোপীচাঁদকে রাতের আঁধারে বলতেন, 'এ পুরোহিতদের কেটে টুকরো করে শকুনদের খাওয়ান দরকার।' গোপী চাঁদের পুরোহিত বিদ্বেষণায় ভয় পেয়ে আওয়াম বলতো- 'মুখ সামলে কথা বললে ভাল হয়।' তিনি তাদের ধিক্কার দিয়ে বলতেন, 'তোমরা সবে কাপুরুষ, আমি নই।'

২০ দিন পর। এক হাজার ফৌজ ও অঢেল সম্পদ নিয়ে ব্রাহ্মণগণ মথুরাভিমুখী হন। এর মাসখানেক পর সোমনাথের মুখপাত্র ট্যাক্স আদায় করতে এসে বিদ্রোহের পদধ্বনী টের পেয়ে রাজার কাছে অভিযোগ করে। তদন্তকল্পে রাজা জনৈক মন্ত্রীকে এখানে প্রেরণ করেন। তদন্ত কমিশন রাজার কাছে রিপোর্ট করেন, জনপদবাসী কাজটা খুব খারাপ করলেও তাদের নিয়ত খারাপ ছিল না। এতদসত্ত্বেও আমি হুঁশিয়ারী দিয়েছি, যেভাবে হোক সোমনাথের ট্যাক্স যেন আদায় করে দেয়া হয়। অন্যথায় প্রশাসন আওয়ামের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে। এ বছর জনগণের হাত খালি। তাই অন্ততঃ এবার ট্যাক্স মাফ করা হোক। রাজা মহাশয় পূজারীদের মনোতুষ্টির জন্য রাজকোষ থেকে নির্দিষ্ট একটি অংক দিলেন। এ অংক ট্যাক্সের তুলনায় কম ছিল না। কিন্তু সোমনাথ মন্দিরের পূজারীদের কাছে আওয়ামের এ দুঃসাহসিকতা মৃত্যুকে হাতছানি দেয়ার শামিল ছিল। তারা সমমনা কিছু লোককে জনপদে রেখে নির্দেশ দিয়ে গেল, 'তোমরা এদের মনের খটকা দূর কর। বিষোদগার তোল মথুরার ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে'।

এর কিছুদিন পর জনপদবাসী শুনতে পেল, ব্রন ও মহাবন বিজয় করে সুলতান মাহমুদ মথুরা অবরোধ করেছেন। আচানক একদিন সংবাদ এলো-সুলতান মাহমুদের হাতে মথুরার পতন ঘটেছে। সবচে' বেশী চোট লাগলো গোপীচাঁদের। সোমনাথের যে সব মুখপাত্র জনপদে বিষোদগার তুলছিল, তারা বললো, 'মথুরার ব্রাহ্মণগণ সোমনাথের দেবতাদের রোষানলে পড়েছেন। এগুলো দেবতাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়ার সাজা। দেবতাগণ কাউকে ছাড়বেন না। মুসলমানরা এক্ষণে তামাম মন্দির ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিবে। ভাঙ্গবে মূর্তিগুলো। এদের পরিণতি ভাল হবে না। সুতরাং এক্ষণে পরিত্রাণ পেতে হলে ভারতবর্ষের তামাম রাজা-মহারাজা, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের সোমনাথের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া বিকল্প পথ নেই।'

মুখপাত্রদের বিষোদগারে গোপীচাঁদের লোকজন প্রভাবিত হলো। সকলে দেবতাদের সন্তুষ্টিকল্পে গবাদীপশু বিক্রি করে সোমনাথের ট্যাক্স আদায় করতে লাগলো। অথচ এরাই ছিল সবচে' জেদী মনোভাবসম্পন্ন। এতকিছুর পরও গোপীচাঁদ তার সিদ্ধান্তে অটল। একটি পয়সাও ট্যাক্স দেয়া হবে না। কিন্তু তার

সমমনা তখন কেউ ছিল না। যারা তার দুঃসাহসিকতায় এতদিন পঞ্চমুখ ছিল, এক্ষণে তার সাথে কথা বলতেও তারা ঘৃণাবোধ করতে লাগল। তিনি আওয়ামাকে বুঝাতেন, 'মানুষ একে অপরের দুশমন হতে পারে, কিন্তু ভগবানের অবতার একে অপরের দুশমন হতে পারেন না। সোমনাথের পূজারীরা আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন কেন? সোমনাথ দেবতার মূর্তি মথুরা, মহাবন, ব্রন ও কাশীর মন্দিরে আছে। মথুরার মূর্তি রক্ষা করা কি সোমনাথ মূর্তি রক্ষা করার মত নয়? আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিনা-সোমনাথের দেবতাগণ আমাদের উপর গোস্বান্বিত। আমাদের পরাজয়ের একমাত্র কারণ হচ্ছে, প্রশাসনের কাপুরুষতা ও পূজারীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব।

কিন্তু গোপীচাঁদের কথায় সাড়া দেয়ার কেউ জরুরত মনে করল না। গ্রাম্য মহিলারা গোপীচাঁদের সাথে কথা বলতে তাদের স্বামী-দেবরদের নিষেধ করল। নাবালেগ শিশুরা তাকে টিপ্পনী কাটত। বয়োবৃদ্ধ লোকজন তাকে বুঝাতো- 'ভাই! জিহবা সংযত কর। তোমার বিরুদ্ধে সোমনাথে অভিযোগ উঠেছে। আমাদের ভয় হচ্ছে, তোমার কারণে এলাকাবাসী পুরোহিতদের ক্রোধানলে নিপতিত না হয়।'

মথুরা রক্ষাকল্পে যারা ঘরদোর ছেড়ে গিয়েছিল, তাদের সিংহভাগই গ্রেফতার হয়েছিল। তাদের যাবতীয় শ্লেষ, অভিযোগ ও দায়-দায়িত্ব গোপীচাঁদের কাঁধে চাপলো। যারা পালিয়ে আসলো, গোপীচাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেল তারাও।

এসময় জনপদবাসী সকলেই গোপীচাঁদকে নিন্দা মন্দ বলতে লাগলো। দেখতে লাগলো ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে। এদিকে রামনাথের চিন্তায় গোপীচাঁদের পেরেশানীর শেষ নেই। তার সকাল-সন্ধ্যার চিন্তা কেবল রামনাথকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীভূত।

রামনাথ ফৌজে শামিল হতেই তার তীরন্দাযী দেখে রাজা মহাশয় একটি দলের নেতৃত্ব তাকে দিয়েছিলেন। পরের বছর রামনাথ ছুটি নিয়ে দেশে ফিরল। সে সওয়ার ছিলো একটি খুবছুরত অশ্বপৃষ্ঠে। রূপাবতি ততদিনে সোমনাথে চলে গেছে। রূপার অনুপস্থিতি রামনাথকে উদাসীন করে দেয়। তার বাড়ীতে সবকিছুই আছে। তবুও যেন কিসের অভাব। একটা শূন্যতা খাঁ খাঁ করছে। তার জীবন যৌবনের রঙ্গমঞ্চের সে স্রোতধারায় ভাটা পড়লো-রূপার রূপের ঝিলিকে যা ছিল হাস্যে লাস্যে কোলাহল মুখর। যে ঠোঁটের কোনে বিশাল পরিধি নিয়ে সর্বদা স্মিত হাসি উপচে পড়ত, এক্ষণে তা আর পড়ে না। তার উদভ্রান্ত উদাস দৃষ্টি স্মৃতিচারণ করত রূপার সান্নিধ্যে কাটানো সোনালী দিনগুলো।

গোপীচাঁদ তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'খোকা! তোর কি হলো?'

'কিছু না বাবা!' চকিতে জবাব দিত রামনাথ। 'আমি অন্য একটা বিষয় নিয়ে ভাবছি।'

'কি ভাবছ?'

'তেমন কিছু না।'

রামনাথ বাহানা করে উঠে দাঁড়িয়ে চলে যেত অন্যদিকে।

এক সন্ধ্যায় রামনাথ নদীর তীরে বসে দেখছিল খরস্রোতা নদীর তোলপাড়। এ সেই স্থান রূপার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল যেখানে। সে গাইতে চেষ্টা করলো, কিন্তু হৃদয় বীণার সূক্ষ্ম তার ঝংকার দিল না। গোপীচাঁদ তার তালাশে এখানে এলেন।

'খোকা! এখানে কি করছিস?' গোপীচাঁদের কণ্ঠে পেরেশানী।

'কিছুনা বাবা। এমনিতে এদিকটায় এসে নদীর সান্ধ্য বাতাস সেবন করছিলাম।'

গোপীচাঁদ বাৎসল্য ভরে পুত্রের পাশটিতে বসে পড়লেন। কারো মুখ দিয়ে কথা সরেনা। নীরবতা ভঙ্গ করে গোপীচাঁদ বললেন, জনপদবাসী বলছে, তুই নাকি গান-বাদ্য ছেড়ে দিয়েছিস!'

রামনাথ জওয়াব দিল, 'হ্যাঁ বাবা! আপনি গান-বাদ্য ঘৃণা করতেন বলে।'

'তুই সেপাই হবার পূর্বে গানের প্রতি আমার অনাস্থা ছিল। এক্ষণে আমিই তোর গান শুনতে চাই।'

'বাবা! আমার যে গান গাওয়া হবে না। কোনদিন গাইতে পারব না। 'চলুন! ঘরে ফেরা যাক।' রামনাথ দাঁড়িয়ে গেল।

রামনাথের ছুটি ফুরিয়ে এলো। গঙ্গা-যমুনার তীরে মাহমুদ গজনবীর সৈন্য সমাবেশ শুনতেই সে বাড়ী ছাড়লো। এরপর কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছে-গোপীচাঁদ জানেনা তার খবর। মাহমুদ গজনবী ওয়াপস হলে গোয়ালিয়র রাজধানীতে তার সাথে দেখা করতে যান। কিন্তু দেখা হলোনা। তিনি জানতে পারলেন, তার পুত্র গোয়ালিয়র ফৌজের সাথে গুরুত্বপূর্ণ এক অভিযানে গেছে। কেউ তার সন্ধান জানে না। জনৈক অফিসার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আপনার খোকা জিন্দা আছে। তবে এক্ষণে সে কোথায়, তা ঠিক বলতে পারব না। তার কাছে কিছু বলতে হলে আমায় বলতে পারেন কিংবা লিখে রেখে যেতে পারেন।

গোপীচাঁদ একটি চিরকুট লিখে অফিসারের হাতে দিলেন। চিরকুটে লেখা ছিলঃ

'আমার চোখের মণি! দীর্ঘদিন তোমার খোঁজখবর না পেয়ে উৎকণ্ঠায় আছি। জনপদে থাকতে পারলাম না। ভগবানের দিকে চেয়ে কিছু দিন ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে এসো। আমি দেশে থাকব না। হয় তুমি এসে নিয়ে যাও কিংবা খবর দাও, আমি চলে আসব।

-তোমার বাবা
গোপীচাঁদ।

গোপীচাঁদ দেশে ফিরে বড় উৎকণ্ঠার সাথে পুত্রের অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি লোকমুখে শুনতে পেলেন যে, সুলতান মাহমুদের বিগত হামলায় কনৌজ প্রশাসনের অপ্রত্যাশিত পিছু হটায় অন্যান্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীগণের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এসব মুখ্যমন্ত্রীগণ গেণ্ডা মহারাজার আহবানে জলন্ধরে সমবেত হয়েছেন। তারা এখানে এসে কনৌজ প্রশাসনের কাছে লিখেন, 'মুসলিম হামলাবাজদের ভয়ে পিছপা হওয়া প্রশাসনের ক্ষমতায় থাকা রাজপুত জাতির কলংক ছাড়া কিছু নয়। তোমরা পদত্যাগ করলেই ভাল। অন্যথায় তোমাদের গদী থেকে নামিয়েই ছাড়বো।'

অতঃপর আরেকটি খবর রাষ্ট্র হলো, গোয়ালিয়র ও অন্য কয়েকটি প্রদেশের ফৌজ কনৌজাভিমুখী হচ্ছে। একমাস পর রাজপুত ও প্রশাসনের লোকদের গাদ্দারীর দরুণ কনৌজ প্রশাসন চরম মার খেল। মারা পড়ল এতে অসংখ্য সৈন্য। হামলাবাজ ফৌজ কনৌজের রাজধানী রাচী কব্জা করে নিল। ক্ষমতায় বসাল তারালোচন পালকে।

গোপীচাঁদ ধারণা করেছিলেন, তার পুত্র বুঝি গোয়ালিয়র ফৌজের সাথে আছে। এজন্য তার উৎকণ্ঠা পূর্বেরচে' বেড়ে গেল।

॥ চার ॥

গণগণে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ছে। এক বৃদ্ধ নদীর তীরে গরু চরাচ্ছিল। দৃষ্টির শেষ সীমায় সে সওয়ারের একটা ক্ষীণ রেখা দেখতে পেল। সওয়ার ক্রমে নিকটবর্তী হলে বৃদ্ধ সরু পথে দাঁড়িয়ে গেল। দু'হাত উঁচু করে বললো, 'থামো! থামো!!' সওয়ার লাগাম কষে ঘোড়ার গতি স্তিমিত করতে চেষ্টা করল, কিন্তু ঘোড়া দ্রুতগামী থাকায় গতি কমল না। বৃদ্ধ আত্মরক্ষার্থে একপাশে সরে দাঁড়াল।

এ ছিল রামনাথ। লাগাম কষে সে রাখালের কাছে এলো। বৃদ্ধ রাখাল ঘোড়ার লাগাম ধরে বললো, 'রামনাথ! ভগবানের দিকে চেয়ে এখান থেকে ফিরে যাও! অগ্রসর হয়োনা আর!'

রামনাথ ফ্যাল ফ্যাল করে বৃদ্ধের দিকে তাকালো, সাহস করে তাকে বললো, 'কি হয়েছে জ্যাঠা মশাই? আপনি আমাকে ফিরে যেতে বলছেন কেন?'

রাখাল ভাঙ্গা আওয়াজে বললো, 'গাঁয়ে সোমনাথের পুজারীরা এসেছে এবং......'

'ভগবানের দিকে তাকিয়ে বলুন! থামলেন কেন?' রামনাথের কণ্ঠে পেরেশানী।

'ওরা তোমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'কি বলছেন আপনি!'

'মিথ্যা বলিনি এক শব্দও। সোমনাথের মুখপাত্ররা ট্যাক্স নিতে এসেছিল। তারা তোমাদের যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি নিলাম ডেকেছে। পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে

তোমাদের ঘরদোর। তোমার বাবা এক পুরোহিতের গলা রুদ্ধ করতে কোশেশ করেছিলেন। সিপাইরা তাকে তখন গ্রেফতার করে। তোমার বৃদ্ধ বাবাকে ওরা বেদম প্রহার করেছে। তিনি কয়েকবার মূর্ছা গেছেন। হুঁশ আসতেই সোমনাথের পুরোহিতদের গালি দিতেন। ভগবান তোমায় রক্ষা করুন! তুমি ওদিকে যেওনা খোকা! ওদের সাথে বেশ কিছু সৈনিক আছে।'

রামনাথের শক্তি ফুরিয়ে এলো। রাগে দাঁত কটমট করছিল সে। মুহূর্তে লাগাম ঢিল করে অশ্বের নিম্নদেশে পদাঘাত করল ও। লম্ফন-কুর্দন করতে করতে ঘোড়া ছুটলো উর্ধ্বশ্বাসে।

গোপীচাঁদ উঠানে মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন। তার মাথার কাছে মোটা একটি বেতের ছড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক সেপাই। পার্শ্বে পূজারীদের কয়েকজন চেয়ারে উপবিষ্ট। মাটিতে বসা জনা চল্লিশের মত সশস্ত্র সেপাই। গাঁয়ের লোকজন এ দৃশ্য অবলোকন করছিল নীরব দর্শকের ভূমিকায়। চেয়ার ছেড়ে এক পূজারী উঠে গোপীচাঁদের গায়ে লাথি মেরে ঝুঁকে নাড়ী পরীক্ষা করে বললো, 'ও মরে গেছে।'

গাঁয়ের লোকজন এতক্ষণ চুপ ছিলো। এবার তারা ভয়ে ভয়ে গোপীচাঁদের লাশের কাছে এগিয়ে গেলে পূজারী বললো,' খবরদার! অগ্রসর হয়োনা। ওখানে দাঁড়িয়ে থাক।'

লোকজন ভয়ে পিছু হটলো। এক নওজোয়ান সাহস করে বললো, 'মহারাজ! রাত আসন্ন। আপনি এজাযত দিলে লাশটার সৎকার করতাম।'

পূজারী জবাব দিলো, 'গাঁয়ের সমস্ত লোক না দেখা পর্যন্ত লাশ এখানেই থাকবে'। নওজোয়ান পিছু হটলো। গাঁয়ের লোকজনও যে যার বাড়ী ফিরলো। সেপাইরা ঘোড়া ও হাতি দেখার জন্য গেল যথাক্রমে ঘোড়াশাল ও হাতিশালে।

উঠানে প্রবেশ করে রামনাথ ঘোড়ার লাগাম কষলো। থামল ঘোড়া। 'রামনাথ আসছে, রামনাথ আসছে' বলে জনপদবাসী আকাশ মাথায় তুলছিল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সোজা বাবার লাশের সামনে এসে দাঁড়াল ও। ওর লেবাছ এবং শাহী ঘোড়া উপস্থিত সেপাইদের ঘাবড়ে দিল। গাঁয়ের এক নওজোয়ান লাগাম হাতে নিলো। হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল রামনাথ। পরক্ষণে আছড়ে পড়ল মৃত বাবার বুকে। 'বাবা! বাবা!!' তুমি কথা বলছো না কেন? এই দেখ! তোমার চিঠি পেয়ে তোমাকে নিতে এসেছি।'

'এ কে?' এক পূজারী চেয়ার ছেড়ে উঠে গাঁয়ের লোকদের জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু গ্রাম্য লোকজন তার কথার উত্তর না দিয়ে পেরেশানী ও ভয়কাতুরে দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকালো শুধু। পূজারী রামনাথের কাছে এসে বললো, 'তুমি কেগা বাপু?'

রামনাথ গর্দান উঠিয়ে পূজারীর দিকে তাকালো। জবাব না দিয়ে দাঁত কটমট করলো। শক্ত হয়ে উঠলো ওর চোয়াল দু'টি।

পূজারী প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। তার কণ্ঠে বজ্রধ্বনি। রামনাথ লাশ সঠিকভাবে জমীনে শুইয়ে উঠে দাঁড়ালো। কম্পিত আওয়াজে বললো, 'কে আমার বাবাকে মেরেছে?' রামনাথের অগ্নিদৃষ্টি। সে দৃষ্টির সামনে পূজারী থতমত খেয়ে যায়। তবুও সাহস করে বললো, 'প্রশ্নের জবাব এখুনি পেয়ে যাবে। তার পূর্বে বলো, তুমি কে? এক ম্লেচ্ছের উপর সহমর্মিতার দুঃসাহস কোত্থেকে পেলে তুমি?'

'ম্লেচ্ছ তোমরা।' একথা বলে চকিতে রামনাথ এক ঘুষি লাগিয়ে দিলো পূজারীর নাকে। মুখ থুবড়ে পড়লো পূজারী ঘুষির চোটে টাল সামলাতে না পেরে। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র সেপাইরা 'ধর্, ধর্- মার্, মার্' রবে উঠান কাঁপিয়ে তুললো। রামনাথ ততক্ষণে তলোয়ার কোষমুক্ত করে ফেলেছে। এ সিপাইরা এতদিন হাত জোড় করা লোকের সামনে তলোয়ার বের করেছে, এই প্রথম তারা এক বীর বাহাদুর যোদ্ধার তলোয়ারের দীপ্তি দেখলো। পিছু না হটে রামনাথকে অগ্রসর হয়ে হামলা করতে দেখে ওরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো। এক পূজারী সেপাইদের লক্ষ্য করে চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'যতসব কাপুরুষ! তামাশা দেখছো?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেপাইরা রামনাথকে ঘিরে ধরার কোশেশ করলো। কিন্তু রামনাথের ঝটিকা আঘাত দু'সেপাইকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিল। তৃতীয় এক সেপাই উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করল। কিন্তু পারল না বেশী দূর যেতে। মুখ থুবড়ে পড়লো। উঠতে চেষ্টা করলো। রামনাথের তরবারীর চরম এক আঘাত তাকে উঠতে দিল না। বাকী সেপাইরা পালালো। সেপাই জড়ো করতে ওরা বাঁশী বাজালো। ব্যর্থ হয়ে পূজারীরা আত্মরক্ষার্থে পালালো যেদিক পারলো সেদিক।

গ্রামের লোকজন চিৎকার দিয়ে বললো, 'রামনাথ! পালাও! জলদি। ঘোড়া আনতে গেছে সশস্ত্র সেপাইরা। ওরা এলে তোমাকে আস্ত রাখবে না।'

রামনাথ নিপতিত পূজারীর বুকের উপর তলোয়ার রাখলে সে হাউ মাউ করে বললো, 'দয়া করুন মহারাজ! আমি সোমনাথের পূজারী। মহারাজ! মহারাজ!!'

রামনাথ ভারী বুট দিয়ে পূজারীর তলপেটে আঘাত করে বললো, 'কাপুরুষ! উনি আমার বাবা!!'

গ্রাম্য লোকজন অগ্রসর হয়ে পূজারীকে বাঁচাতে চাইলো। পারল না। রামনাথের সুতীক্ষ্ণ তরবারী তার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। চাপ চাপ হয়ে গেল উঠান। রামনাথ পূজারীর ধুতিতে তলোয়ারের রক্ত মুছে অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হলো।

খানিক পর। পূজারীর দেহরক্ষীরা যখন রামনাথকে খুঁজতে জনপদে চষে ফিরছিল তখন সে দু'ক্রোশ অতিক্রম করে চলে গেছে। এরপর প্রতিটি সুহাসিনী ভোর তার কানে গুঞ্জন করতো- মৃত্যু তোমাকে আলেয়ার আলোর মত খুঁজছে। দেবতাদের সরেজমীনে সোমনাথ পূজারীহন্তার ঠাঁই নেই।

দেশের বাড়ী

দুপুর রাত। রণবীর ও শম্ভুনাথ চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে দেখছিলো তাদের মহল। শ্রান্ত ঘোড়া গর্দান ঝুঁকিয়ে চলছিলো। সরু পথের দু'পাশে ব্যাঙ ও ঝিঁঝিঁ পোকার অনবরত ডাক পরিবেশকে ভাব গাম্ভীর্যময় করে তুলছিলো। জন্মভূমির ঘ্রাণে রণবীরের নাক মোহিত হচ্ছিলো। ঘোড়ার গর্দানে স্নেহ পরশ বুলিয়ে সে বললো, 'দোস্ত আমার! তোমার ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত শরীরের কথা আমার মালুম আছে। এইতো আমাদের মহল। আরেকটু চলো। আমি না খেয়ে তোমাকে আগে খাইয়ে নেব।'

ফসলী ক্ষেত মাড়িয়ে তারা একটি বাগানে প্রবেশ করলো। ভাসতে লাগলো রণবীরের চোখে নিকট অতীতের সোনালী দৃশ্যগুলো। এ সেই বাগান। যেখানে সে হাস্যে লাস্যে কাটিয়েছিলো বাল্যজীবনের ক্ষণগুলো। সেই হাস্যলাস্যের প্রতিধ্বনি তার কানে যেন পুনঃগুঞ্জন তোলে। বাগান পেরিয়ে ওরা মহলের চৌহদ্দীতে পৌঁছুলো। ঠোঁটের কোনে জাগলো মুচকি হাসির রেখা। চোখের কোন ভরে গেল অব্যক্ত আনন্দের আঁসুতে।

দ্বিতলের মহল। মাধবী লতা জড়িয়ে আছে মহলের গায়ে। যেন যুগ যুগ ধরে মহলের সাথে ওদের চিরন্তন প্রেম। একটি কামরার জানালা থেকে ঠিক্‌রে পড়ছে পিলসুজে বাতির মিটির মিটির আলো। শম্ভুনাথ ঐ জানালার দিকে তাকিয়ে বললো, 'মহারাজ! এদিকে তাকান! শকুন্তলার কামরায় আলো জ্বলছে। ও বোধ হয় জাগ্রত। আপনার অনুপস্থিতিতে ও একদিন স্বপ্ন দেখেছিলো, আপনি খিড়কী পথে তার কামরায় প্রবেশ করছেন। এর পর কোনদিনও বাতি নেভায়নি।'

ঘোড়া থামিয়ে রণবীর বললো, 'দাঁড়াও শম্ভু! আমি এখান থেকে আওয়াজ দিলে নওকররা শোরগোল করে গোটা মহল মাথায় তুলবে। সর্বপ্রথম আমি শকুন্তলা ও বাবাকে দেখতে চাই। দেখব শকুন্তলা আজ আমাকে চিনতে পারো কিনা?'

শম্ভুনাথ বললো, 'আপনার চুল পেকে সাদা হয়ে গেলেও শকুন্তলার চিনতে এতটুকু কষ্ট হবে না।'

দেয়ালের কাছে ঘোড়া নিয়ে গেল রণবীর। ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের উপর উঠলো। লাফ দিয়ে টুপ্‌ করে উঠানে পড়লো। প্রশস্ত উঠান পেরিয়ে পাইন গাছের নীচে এসে দাঁড়ালো ও। বুলালো সন্ধানী দৃষ্টি চারিদিকে। দ্বিতলের কামরা থেকে তখনও বাতির মিটমিটে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। রণবীরের হৃদয়ের ধুক্

ধুকানী ক্রমান্বয়ে বাড়ছিলো। ভাবছিলো, শকুন্তলা প্রথমে আমাকে চোর ভাববে। পরে 'দাদা! দাদা!' বলে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকে। বলবো, 'পাগলী! তুই স্বপ্ন দেখছিস!'

রণবীর আবার ভাবলো, না! ওভাবে না। বরং লঘু পায়ে কামরায় প্রবেশ করে পিছন দিয়ে ওঠে চোখ চেপে ধরবো। ধ্যাৎ! এটাও যুৎসই মনে হচ্ছে না। এমনটি করলে ও ভয়ে চিৎকার দিবে। তারচে' আমি জানালায় উঁকি দিয়ে দেখি গে। ও সজাগ থাকলে অনুচ্চস্বরে ডাকব। এদিক ওদিক তাকাবে আমার ডাক শুনে। এ সময় আমি হাসি চেপে রাখতে পারবো না। আমাকে দেখে ও গায়ে চিমটি কাটবে, স্বপ্ন দেখছে কিনা তা পরখ করতে। পরে দু'ভাই-বোন গলাগলি করে বাবার কাছে যাব।'

পিতার কথা ভেবে রণবীরের মনে নানান প্রশ্নের উদ্রেক হলো। জন্মভূমি কনৌজে প্রবেশের পূর্বে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কথা শুনেছিলো সে। যদিও শম্ভুনাথের কাছ থেকে শুনেছিলো, সুলতান মাহমুদের হাতে কনৌজ পতনের পর তার বাবার মনে স্রেফ পার্শ্ববর্তী মুখ্যমন্ত্রীদের উপর নয় বরং খোদ কনৌজ প্রশাসনের উপরও তাঁর একটা ঘৃণা জন্মেছিলো। এ জন্য তিনি যুদ্ধে কোন প্রকার সাহায্যও করেন নি।

মহলের কোণে এক পাহারাদারকে দেখা গেল। রণবীর গাছের আড়ালে আত্মগোপন করলো। ডাকতে চাইলো পাহারদারকে। কিন্তু কি ভেবে আবার থেমে গেল। পাহারদার চলে গেল প্রবেশ দ্বারে। পাহারা দীর্ঘায়িত না করে সে চেয়ারে বসে ঝিমুতে লাগল।

গাছের মগডালে উঠে রণবীর উঁকি মেরে দেখল-খিড়কির কয়েক কদম দূরে পালংকের উপর সুখ নিদ্রায় বিভোর সফেদ চাদরাচ্ছাদিত এক নারী মূর্তি, তার মাথা চাদরের বাইরে ছিলো। কিন্তু চেহারার সিংহভাগই দু'বাযুর মধ্যে ঢাকা। তার খুবছুরত হাত চেহারার উপর ছড়ানো। গলায় সোনার সরু হার মিট মিট আলোতে চমকাচ্ছিল।

'শকুন্তলা!' রণবীর দিলের কম্পন সংযত করে মৃদুস্বরে ডাক দিলো। নারী মূর্তি থেকে কোন প্রকার সাড়া না পেয়ে ও কামরায় প্রবেশ করল। দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ স্থানুর মত। শকুন্তলাকে ডেকে তোলার জন্য হাত বাড়াল। কিন্তু কি ভেবে হাত ফিরিয়ে নিল। তার ঠোঁটে খেলে গেল দুষ্টুমির হাসি। কোমরে গোঁজা অলংকারের পুঁটলি বের করে নিদ্রাদেবীর পার্শ্বস্থ টিপয়ের উপর রাখল। সেখান থেকে একটি চুড়ি তুলে নিয়ে নিদ্রামগ্ন নারীর হাতে পড়িয়ে দিল। আরেকটি চুড়ি উঠিয়ে তার খুবছুরত হাতে পড়িয়ে দিতেই সে হাত সরিয়ে নিল। ভয় বিহবল চিত্তে নারী মূর্তি আড়মোড়া দিয়ে জেগে উঠল। নারীমূর্তি চিৎকার দিতে চাইল। কিন্তু ভয় বিহবল হৃদয়ের ভড়পানি আটকে গেল শুষ্ক কণ্ঠনালীতে।

রণবীর বিস্ময় বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে নারীমুর্তির দিকে তাকাল। একি! এতো শকুন্তলা নয়। তবে শকুন্তলার পালংকে ও কে? উভয়ে উভয়ের কাছে অপরিচিত। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করল রণবীর- শকুন্তলার বান্ধবী নাকি? হয়তো বেড়াতে এসেছে। এ ভেবে তার পেরেশানী দূর হলো। ফুটে ওঠল ওষ্ঠ প্রান্তে এক চিলতে হাসি।

'ভয় নেই।' রণবীর শান্ত গলায় যুবতীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললো, 'আমি চোর কিংবা ডাকাত নই। আপনি কে? পূর্বে তো কোনদিন আপনাকে দেখিনি। আমার বোনের সখীদের কারো চেহারাতো আপনার মত নয়।'

যুবতীর ভয় ও শংকা পেরেশানীতে পরিণত হলো। সে ভাঙ্গা আওয়াজে বললো,

'চোর ডাকাত না হলে এখানে কোন অভিপ্রায়ে এসেছ? চলে যাও এখান থেকে, অন্যথায় আমি চিৎকার দিয়ে সকলকে জাগিয়ে তুলব।'

আমি সানন্দে আপনাকে চিৎকারের অনুমতি দিচ্ছি। অবশ্য চিৎকার দিয়ে সকলের ঘুমের ব্যঘাত না ঘটিয়ে আমার বোনকে ডেকে আনলে ভালো হয়।'

যুবতীর পেরেশানী এবার গোস্বায় পরিণত হলো। বললো, 'চোর না হলেও তুমি পাগল বটে, বদনামীর ভয় না থাকলে এক চিৎকারে সকলকে জাগিয়ে তুলতাম।'

'ভালো! খুব ভালো! সবাইকে ডাকো! চিৎকার দিয়ে ডাকো!' রণবীর শান্ত স্থির কণ্ঠে যুবতীর দিকে তাকাল।

যুবতীর শংকা ও পেরেশানী দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সে বললো, 'তোমার কি প্রাণের মায়া নেই?'

'বিলকুল না।'

'কি চাও? কে তুমি, এ গভীর রাত্রিতে আমার ঘরে.....?'

'আপনার পরিচয় যতক্ষণ না দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমার পরিচয় পাচ্ছেন না!'

'মৃত্যু আলিঙ্গনের জন্য আমার কামরা ছাড়া অন্য কোন জায়গা খুঁজে পেলে না তুমি?'

'না! জীবন মৃত্যুর জন্য এ কামরা ছাড়া আর কোন জায়গা আপাততঃ তালাশ করে পাচ্ছি না।!'

ঘৃণা ও ক্ষোভে যুবতী ঠোঁট কামড়াচ্ছিলো। গোস্বা কম্পিত চেহারায় কোন যুবতীকে এত সুন্দর ও আকর্ষণীয় এর পূর্বে আর কাউকে সে দেখেনি। আচানক যুবতী তার হাতে দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। ছুড়ি দেখে তার গোস্বা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়লো সে। শেষ পর্যন্ত আর্তস্বরে বললো, 'মৃত্যু আলিঙ্গন করতে এক কুমারীর সতীত্বের উপর কাদা ছোঁড়ার দুঃসাহস করলে কেমনে? আমি তোমার কোন ক্ষতি করেছি কি?'

যুবতীর চোখ অশ্রু বন্যায় প্লাবিত হলো। রণবীর খানিকটা প্রভাবিত হয়ে বললো, 'মাফ করুন! আমি ভুল ক্রমে আপনার কামরায় প্রবেশ করেছি। জানতাম না, আমার এ ছেলেখেলা এক মেহমানের পেরেশানীর কারণ হবে।'

'মেহমান! কার মেহমান? এটা আমাদের নিজস্ব বাড়ী।'

'বুঝলাম! এটা আপনাদের বাড়ী। তা বলবেন কি, আমার বোন শকুন্তলা কোথায়? কাউকে জাগানোর পূর্বে তার সাথে দেখা করতে চাই।'

'তুমি মোহন চাঁদের মেয়ের কথা বলছো?'

'হ্যাঁ! আমি ওর ভাই।'

যুবতীর চেহারার রং আচানক পরিবর্তন হয়ে গেল। ভাঙ্গা আওয়াজে বললো, 'তুমি এতদিন মুসলিমদের কয়েদখানায় ছিলে?'

'হ্যাঁ, আমি এইমাত্র পৌঁছেছি। গাছে চড়ে আপনার কামরায় ঢুকেছি। আমার খেয়াল ছিলো, শকুন্তলার সাথে ইয়ার্কি করবো। কিন্তু শকুন্তলার ভাগের ইয়ার্কি ভগবান আপনার ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। আমি জোড় হাত করে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি দয়া করে আমাকে শকুন্তলার কামরা দেখিয়ে দিন। আপনার মত আর কোন মেহমানকে আমি তকলীফ দেব না।'

যুবতীর অন্তর প্রথমে ঘৃণা, পরে গোস্বা, সবশেষে সহমর্মিতায় পরিপূর্ণ হলো। চোর-ডাকুর পরিবর্তে যে যুবরাজ এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে, সে এক দেবতাতুল্য মহামানব। রণবীর সম্পর্কে সে জেনেছিলো, ৫ বছর ধরে ও জেলে। দীর্ঘ কারাবাস শেষে আজ সে বাবা ও বোনের সাথে দেখা করতে এসেছে। নিশ্চয়ই ও বিগত দিনগুলোতে অসহনীয় জ্বালা ভোগ করেছে। রণবীরের দিকে তাকিয়ে তার অন্তর বারবার কেবল এ বাক্য উচ্চারণ করছিলো, হায়! তুমি যদি এখানে না আসতে! আহা! আমি যদি এখানে না থাকতাম!

রণবীর তার চেহারায় পেরেশানীর কালো রেখা দেখে বললো, 'বাবা ও শকুন্তলা কেমন আছে?'

যুবতী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জওয়াব দিলো, 'তারা এখানে নেই। জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া থাকলে, দোহাই তোমার! জলদি কেটে পড়!'

মুচকি হাসির কোশেশ করে রণবীর বললো, 'আমি নেহায়েত ক্লান্ত! নতুবা আপনার নির্দেশ ফেলতাম না।'

'সত্যি বলছি, তোমার বাবা ও বোনের সংবাদ জানি না।'

'তারা কোথায়?'

'ভগবানের দিকে তাকিয়ে আস্তে কথা বলো! আমি ওদের সম্পর্কে বিলকুল কিছু জানিনে। মোহন চাঁদের পুত্র হয়ে থাকলে এ ঘর তোমার জন্য নিরাপদ নয়, শুধু এতটুকু জানি।'

দরজার কাছে গিয়ে ছিটকানিতে হাত রেখে যুবতীর দিকে তাকিয়ে রণবীর বললো, 'আপনার ভাও-ভনিতা আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে। আপনি ধারণা করলেন কি করে, এ মহলের বাইরে আমার জিন্দেগীর কোন মূল্য নেই?'

'থাম! ভগবানের দিকে চেয়ে থাম! ওদিকে যেওনা।' যুবতী দৌড়ে এসে রণবীরের হাত ধরলো।

যুবতীর এ সহানুভূতি রণবীরকে দোটানায় ফেললো। তবুও সে ঠোঁটের কোনে হাসির পরিধি বাড়ানোর কোশেশ করে বললো, 'আপনার পেরেশানির কারণ না বোঝার মতো অবুঝ ছোট্ট শিশুটি নই আমি। দয়া করে আর নতুন কোন ঠাট্টা করবেন না।'

যুবতী আহত স্বরে বললো, 'ভগবানের দিব্যি, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। আমার কথা শোন! চলে যাও যে পথে এসেছ, সে পথে! এ মহল নন্দনার কেল্লারচে' কম ভয়ালো নয় তোমার জন্য। যাও। জলদী!' সে রণবীরকে খিড়কি পথের দিকে টানতে লাগলো। রণবীর দেখছিলো যুবতীর নারীসুলভ পেরেশানী। ইতিমধ্যে বাইরের থেকে দরজা ধাক্কা দিয়ে কেউ আওয়াজ দিলো...

'নির্মলা! নির্মলা!! দরজা খোল!'

যুবতী রণবীরের আপাদমস্তকের দিকে তাকিয়ে নিল এক নজর। তার চেহারা ততক্ষণে পাংশু বর্ণ হয়ে গেছে।

'নির্মলা দরজা খোল!' দেরী হওয়ায় আওয়াজকারীর কণ্ঠে ধৈর্যচ্যুতির ঝাঁঝালো সুর সুস্পষ্ট।

যুবতী ভাঙ্গা আওয়াজে বললো, 'কি হয়েছে বাবা?'

পূর্ণ শক্তিতে চিৎকার দিয়ে আগন্তুক বললো, 'দরজা খোল, খুকী!'

'এই খুলছি বাবা!' যুবতী তাকালো রণবীরের দিকে। রণবীরও তাকালো তার দিকে। কিন্তু তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে ততক্ষণে। সে অগ্রসর হয়ে জলদি করে ছিটকানী খুলে দিল। দরাম করে কপাট খুলে গেল। তার সামনে দৃশ্যায়িত হলো উলঙ্গ তরবারী উঠানো বিশাল বপুধারী একজন। পিছনে তার সশস্ত্র ক'জন সেপাই। 'বাবা! বাবা!' বলে যুবতী লোকটির বিশাল বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রণবীর কয়েক কদম পিছু সরে বের করলো তার তরবারী।

'বাবা! ও আমার কিছু করেনি। ও চোর নয়। মোহন চাঁদের পুত্র ও। বোনের তালাশে এসেছে।'

চোখের পলকে বয়োবৃদ্ধ লোকটি যুবতীকে বাহুমুক্ত করে চিৎকার করে উঠলো'

'চুপ কর! আমি জানি ও কে। ওর গলাবাজী শুনেই এসেছি।' অতঃপর নওকরদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কাপুরুষ! তোরা কি দেখছিস! ধর ওকে!'

জনা চারে'ক সশস্ত্র লোক মহলের অপর প্রান্ত হতে 'ধর ধর' রবে এগিয়ে আসছিলো। যুবতী উপায়ান্তর না দেখে মায়ের বুকে আশ্রয় নিয়ে বললো, 'মা! মা! তুমি বাবাকে শান্ত করো! ও বেকসুর। ও আমার কোন অনিষ্ট করেনি।' এসব নিয়ে চিন্তা করার সময় হাতে নেই রণবীরের। কামরার কোণে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সে তরবারীর ধার পরীক্ষা করতে লাগলো।

বিশাল বপুধারী লোকটি ক্রমে রণবীরের কাছে এগিয়ে এলো। সাহস করে বললো, 'তলোয়ার মাটিতে ফেলে দাও! লড়াই করে জান বাঁচাতে পারবে না।' রণবীর জন্মগতভাবে নির্ভীক। এমন দু'চারজন লোক তার তলোয়ারের সামনে টিকতে পারবে না, তা সে জানে। কিন্তু এক্ষণে তার হিম্মত উবে গেল।

ফেলে দিল তরবারী। ঝন্ করে একটা শব্দ হলো।

তলোয়ারের খেল্ আমার জীবনে নতুন নয়। আমি জানি কে আমার দোস্ত, কে দুশমন!' বপুধারী লোকটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, 'ভগবানকে ধন্যবাদ! তুমি কানে হেঁটে চলে এসেছো। অন্যথায় আজীবন তোমায় খুঁজে ফিরতাম।'

খানিক পর। রণবীরকে খোলা তরবারীর পাহারায় সমুদ্র পার্শ্বস্থ কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো। দরজার কাছে এসে পাহারাদাররা ওকে পিঠমোড়া করে বাঁধলো। বয়োবৃদ্ধ লোকটি বললো, 'জলদি তাকে দরিয়ার ওপারে নিয়ে যাও। ভোরের আলো ফুটে ওঠার পূর্বেই জনপদ ত্যাগ করতে হবে। গেঁয়ো লোকজন ঘুর্ণাক্ষরেও যেন টের না পায়। পথে কারো সাথে দেখা হলে বলবে, 'ও চোর। গাফিলতি করলে ফাঁসিই হবে তার একমাত্র শাস্তি।'

নির্মলা মায়ের কাছটিতে দাঁড়িয়ে শুনছিলো বাবার কথাগুলো। সেপাইরা বেরিয়ে গেলে সে দৌড়ে বাবার কাছে এলো। বললো কাঁদতে কাঁদতে,

'বাবা! মহাপাপ করতে যাচ্ছেন আপনি। সেপাইদের ফিরান!'

নির্মলার বাবা বললো, 'বেকুফ! সাপের বাচ্চার মাথা চূর্ণ করা পাপকার্য নয়। মোহন চাঁদের পুত্রের জীবদ্দশায় আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব না। শোকর কর! কই মাছের মতো কানে হেঁটে এসে ও ধরা দিয়েছে'।

'না বাবা না! এ পাপ আপনি কিছুতেই করবেন না!'

'খামোশ! দুশমন পুত্রের জন্য তোমার অশ্রু আমি বরদাশত করতে পারছি না। চলো মা! কামরায় চলো!'

॥ দুই ॥

আটজন সশস্ত্র সেপাই'র দুশ্ছেদ্য পাহারায় মহল থেকে রণবীর ঝোপঝাড় পেরিয়ে নদীর কিনারে এলো। নিকট তীরে একটি ছিপি নৌকা ভেড়া। নদীর তীরে এসে রণবীরের পায়ে ওরা শক্ত রশির বাঁধন দিল। ওর কাছে রইলো জনা তিনে'ক। বাকি পাঁচজন ডোবা নৌকার পানি সেচতে ব্যপৃত হলো। সকলেই অপরিচিত। সর্দার কিসিমের একজন পানি সেচকারীদের কাছে এসে বললো, 'তাড়া করে পানি সেচ। সময় খুব একটা হাতে নেই।'

এক সেপাই বললো,' নৌকায় জল উঠে। আমার মতে, সকলে একসাথে সওয়ার হওয়া সমীচিন নয়। তারচে' পালা করে দু'বারে পার হলে ভালো হয়। তাছাড়া নৌকাটি খুব ছোট। বড় জোর পাঁচজন ধরে এতে।'

সর্দার বললো, ' তোমরা পাঁচজন আগে পার হও। চারজনকে ওপারে রেখে নৌকা নিয়ে তুমি জলদি ফিরো। পরের বার কয়েদীকে নিয়ে আমরা পার হব।'

বৈঠা হাতে একজন বললো, 'যাবো আর আসব।'

পাঁচজন নিয়ে নৌকা ছুটলো। রয়ে গেল অন্য তিনজন রণবীরের সাথে। পাহারাদার কম দেখেও রণবীরের পেরেশানীতে কমতি নেই। অসহায়ভাবে সে জমীনে বসে রইল। চারদিকে সে দেখছিল মৃত্যু বিভীষিকা। ভাবছিল, কুদরতের ঠাট্টা কি নিঠুর! কি দুঃখের সাথেই না পাঁচ-পাঁচটি বছর নন্দনার কয়েদখানায় প্রিয়জনের মিলনের অপেক্ষায় কাটালাম। আবার সেই কয়েদী এখানে। পুনঃমিলনের শুভক্ষণটির জন্য দেবতাদের কাছে কত মিনতিই না করলাম! হায়রে নিয়তি! একি খেল খেললে আমার সাথে! মওতকে বগলদাবা করেই তো নন্দনার রণে গিয়েছিলাম। সেই মওত শেষ পর্যন্ত দেশের বাড়ীতে ওঁৎপেতে ছিলো? যে সুখের নীড়কে দুনিয়ার সবচে' সুরক্ষিত মনে করেছিলাম, নন্দনারচে' তা ভয়ালো হয়ে দাঁড়ালো? নন্দনায়তো লড়ছিলাম মুসলমানদের সাথে। আর এখানে এমন এক দুশমনের কয়েদী, যার নামটি পর্যন্ত জানা নেই আমার। শকুন্তলা কোথায়? কোথায় বাবা? স্বপ্ন দেখছি নাতো? শরীরে চিমটি কাটলো ও।'

আচানক ও পাহারদারকে লক্ষ্য করে বললো, 'তোমাদের কাছে মিনতি করে বলি, জানি, তোমরা আমায় হত্যা করতে আদিষ্ট। সর্দারের হুকুম তোমাদের শিরোধার্য। আমি শুধু জানতে চাই, তোমাদের সর্দারটির পরিচয় কি?

পাহারাদাররা একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বললো, 'সর্দারের নাম জয়কৃষ্ণ। গভীর রাত্রে তার মহলে চোরের মত প্রবেশ করায় এরচে' আর কি ভাল ব্যবহার তুমি আশা করতে পার?'

জয় কৃষ্ণের নাম শুনে রণবীরে তামাম প্রশ্নের জওয়াব মিলে গেল। পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। খানিক থেমে সে আহত স্বরে বললো, 'আমি সর্দার মোহন চাঁদের পুত্র। আমার বাবা ও বোনের সন্ধান তোমরা জান কি?'

এক পাহারাদার বললো, 'তারা মারা গেছে।'

বন্ধ হয়ে গেলো রণবীরের বাকশক্তি। জীবন-মৃত্যু এক্ষণে তার কাছে অর্থহীন হয়ে উঠলো।

'তোমার বাবার ব্যাপারে সুনিশ্চিত বলতে পারি, তিনি এ জগতের সফর শেষ করেছেন। বোনের ব্যাপারে ভগবানই ভালো জানেন। লোকমুখে শুনেছি, সে দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়েছে। অবশ্য লাশের সন্ধান মিলেনি আজতক।'

রণবীর কম্পিত আওয়াজে জিজ্ঞেস করলো, 'জয়কৃষ্ণ আমার বাবাকে কতল করেছে?'

'এসব বাক্যব্যয় এক্ষণে অবান্তর নয় কি? তারচে' তুমি যতক্ষণ বেঁচে আছ ভগবানের নাম জপ!'

রণবীরকে উদাসীনতা ও হতাশা ছেয়ে ফেললো। তাকালো ফ্যাল ফ্যাল করে মুক্ত আকাশ পানে। তার অন্তরে অসহায় দেবতাদের প্রতি ঘৃণার স্তর সুস্পষ্ট হচ্ছিলো। যে মহান দেবতাদের সম্মানকে সবার উপর তুলে ধরতে বছর পাঁচেক পূর্বে সে জন্মভূমি ছেড়ে নন্দনা গিয়েছিলো, সে দেবতার ভোজবাজী তো থাকলই না, উপরন্তু আজ হারাতে হলো বোন, বাবাকে। তার পৌরুষবহুল পেশী জয় কৃষ্ণকে শায়েস্তাকল্পে টান টান হয়ে ওঠলো। আহত দিল আওড়ালো,

'রণবীর! তুমি নিঃস্ব নও। ভারতবর্ষের কোটি কোটি আওয়াম তোমারচে'ও মজলুম। জয়কৃষ্ণ ও একা নয়। এদেশের প্রতিটি মানুষের ডানা পগাড় গজালে জয় কৃষ্ণ হয়ে যায়। সমুদ্র বক্ষের বিশাল মাছের পেটে ছোট চুনোপুঁটিগুলোই যায়। এ সমাজ স্রেফ অচ্ছুৎদেরই দুশমন নয়, বরং অন্যের শক্তির সামনে মাথা নত করা ব্যক্তি মাত্রই এর দুশমন। এ সমাজের দেবতারা ঐ সব জালেম ও স্বৈরাচারদের পিঠ চাপড়ায়, যারা দুর্বল মানুষের ঘাড় মটকে দিতে পারে। এতদিন পূজারীরা ট্যাক্স নিতে আসত। এখন থেকে আসবে জয়কৃষ্ণ। তোমার যুদ্ধ ও হাজত বাস যেমন অনর্থক ছিলো, এক্ষণে তোমার মওতও তেমন অনর্থক। তোমার খুন এখন ঐ মাটিতে পড়তে যাচ্ছে, যে মাটি শতাব্দীকাল ধরে মজলুম জনতার খুনে চাপ চাপ হয়ে আছে।'

আচানক তার ধ্যান ভঙ্গ হলো ৩০ কদম দূরে জঙ্গলের মধ্যে কিছু নড়াচড়া হতে দেখে। বেশ কিছুক্ষণ ভেবে সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো, জঙ্গল থেকে কেউ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। তার হতাশার আকাশে ফুটে ওঠলো আশার একটা ক্ষীণ রেখা। আগন্তুকরা হামাগুড়ি শেষে মাথা উঁচিয়ে রণবীরের দিকে

তাকালো। ওরা দৃষ্টি বুলালো চারদিক। পরক্ষণে আবার মাথা নিচু করলো। পাহারাদাররা ধৈর্যহারা হয়ে নদীর ওপার তাকাচ্ছিলো ঘন ঘন। আগন্তুক অতি সন্তর্পনে এগুচ্ছিলো রণবীরের দিকে। ওর পিছনে ঠিক একই কায়দায় এগিয়ে আসছে জনা আষ্টেক সশস্ত্র লোক। রণবীরের জমাট খুন এবার শিরা-উপশিরায় বিদ্যুৎগতিতে সঞ্চালিত হতে লাগলো। বেঁচে যাবার অদম্য স্পৃহা তাকে হাতছানী দিয়ে ডাকছিল।

আচানক সর্দার উঠে দাঁড়ালো। টিকটিকির মতো তাকালো নদী বক্ষের দিকে। বললো, 'রাবিশগুলো এখনো ফিরছে না কেন? সকাল হয়ে আসছে। জয়কৃষ্ণ আমাদের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। আহা! আমরা কয়েদীকে নিয়ে যদি আগে পার করতাম!

এক পাহারাদার বললো, 'আপনার অসন্তুষ্টির ভয় ছিলো। নতুবা আমার খেয়াল ছিলো, কয়েদীকে কেটে দু'টুকরা করে ওপার পাঠানো হোক'।

সর্দার অট্টহাসি দিয়ে বললো, ' বাহবা! বুদ্ধির ঢেঁকি। ওকে এপারে কতল করতে পারলে লোকজন নিয়ে ওপারে যাওয়ার দরকারটা কি শুনি? জয়কৃষ্ণ বলেছিলেন, ওপার নিয়ে তাকে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিতে।' সর্দার খুব দূরদর্শী, জানো না? এ কথা বলে সে বিক্ষিপ্ত পায়চারী করতে লাগলো।

হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসরমান আগন্তুকদের সারি খুব কাছে এসে পৌঁছুলো। থামলো পাহারাদারদের পারস্পারিক কথোপকথন। বাড়লো রণবীরের পেরেশানী। একীন করলো, কুদরত তার উদ্ধারকল্পে আসমানী বাহিনী প্রেরণ করছেন। এতদসত্ত্বেও তার একটা শংকা, পাহারদাররা ওদের আগমন বার্তা পেলে সর্বাগ্রে তাকে হত্যা করবে। সুতরাং মদদগারদের হামলা যুৎসই করতে সে পাহাদারদের কথার মধ্যে মশগুল রাখার ফন্দি আঁটলো।

রণবীর আপনার প্রতি ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বললো, 'তোমরা জান, মুসলিম ফৌজ পল্টা হামলা করার জন্য পাঁয়তারা করছে। ওরা এক্ষণে তোমাদের নাস্তানাবুদ না করে ফিরবে না।'

পাহারাদাররা তার কথার কোন জবাব না দিয়ে পেরেশান হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো।

রণবীরের কণ্ঠে পুনরায় বেজে উঠলো, 'ওরা এ জনপদে এলে জয়কৃষ্ণের মতো জালেম ওদের সামনে কেবল বুযদিলই প্রমাণিত হবে।'

সর্দার এবার বলে উঠলো, 'মৃত্যুর ফাঁদ তোমাকে ডাকছে আর তুমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে খামোকা দেশ দরদীর বুলি কপচাচ্ছো! আশ্চর্য তো! সর্দার জয়কৃষ্ণের শানে পুনরায় গোস্তাকমূলক কোন কথা বেরুলে তোমার জিহবা কেটে ফেলব কিন্তু।'

'তোমাদের সর্দারতো হাঁদারাম নন। তিনি ভাবলেন কি করে, তার মহলে আমি একাকী এসেছি। অধীনস্ত ৫০ জন লোক মহলের প্রধান ফটকে আমার অপেক্ষায় ছিল। আমার যা ধারনা, ওরা এতোক্ষণে জয়কৃষ্ণকে ধরে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। আর তোমরা তো সর্দারেরচে' বেকুফ। দৃষ্টি ফেরাও। চোখে ঠুলি না থাকলে ভালো করে তাকাও। আমার লোকজন তোমাদের ঘিরে নিয়েছে।'

পাহারাদাররা ভূত দেখার মত চমকে উঠলো। তাদের চারপাশে ৮/১০ জনের মতো সশস্ত্র লোক তীর-বল্লম উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রণবীর আঁচ করেছে ওরা গেঁয়ো লোক। এ নিশ্চয় শম্ভু নাথের মনিব প্রীতির বহিঃপ্রকাশ।

রণবীর হামলাকারীদের লক্ষ্য করে বললো, 'এদের কিছু বলো না। এরা স্রেফ হুকুমের দাস।'

রণবীরের চালবাজী ফলপ্রসু হলো। পাহারাদারদের অভয় দেয়ায় ওরা সংকুচিত হলো। ফেলে দিলো তরবারী। একজন অগ্রসর হয়ে রণবীরের বাঁধন কেটে দিলো। রণবীর একখানা তরবারী তুলে নিলো। বললো অসহায় পাহারাদারদের লক্ষ্য করে, 'জান বাঁচাতে চাইলে চুপচাপ আমাদের সাথে চলো।'

সর্দার হাতজোড় করে বললো, 'মহারাজ! দয়া করুন মহারাজ!'

রণবীর আগন্তুকদের বললো, 'জংগলে নিয়ে ওদের হাত পা বেঁধে ফেল। ওদের কথায় কর্ণপাত করো না। চিৎকার করলে গর্দান কেটে ফেল।'

রণবীরের কথামত ওরা পাহারাদারত্রয়কে জংগলে নিয়ে গেল। এদের পাহারার জিম্মা দু'জনকে দিয়ে রণবীর বললো, 'তোমরা সাবধান থেকো।'

বাকী ক'জনকে নিয়ে নদীর তীরে চললো ও। বললো, 'আমার ভয় হচ্ছে, ওরা তোমাদের চিনে ফেললো কিনা! এ জন্য ওদের সামনে তোমাদের সাথে কোন প্রকার বাক্যব্যয় করিনি। আমি কিন্তু তোমাদের চেহারা না দেখেও ঠিকই চিনেছিলাম।'

অতঃপর রণবীর গাঁয়ে এসে আত্মীয়দের নাম ধরে ডেকে ডেকে তাদের সাথে নিয়ে চললো। স্রেফ চারজন লোকের নাম ধরে সে ডাকলো না। সবশেষে সে শম্ভুনাথকে ডাকল। শম্ভুনাথ হাতজোড় করে বললো, 'মহারাজ! এখন কথা বলার সময় নয়। সূর্যোদয়ের পূর্বে আমাদের কয়েক ক্রোশ অতিক্রম করতে হবে। অনতিদূরে ঘোড়া রেখে এসেছি। চলুন!'

'এখন নয় কাজ বাকী আছে কিছু। তোমরা সকলে এখানে থেকো। এসো আমার সাথে জনা তিনে'ক। শম্ভুনাথ! তুমি গিয়ে কয়েদীদের সাথে এভাবে কথা বলো, যাতে ওরা বুঝতে না পারে- ওরা এ গ্রামের লোক- বরং নন্দনার থেকে আমার সাথে এসেছে। তোমরা একজনে গিয়ে আমাদের ঘোড়া নিয়ে এসো।'

॥ তিন ॥

খানিক পর। ওপারের নৌকার অপেক্ষায় রণবীর ও তার তিন সাথী প্রহর গুনছিলো। নৌকা ভিড়লো। রণবীরের ইশারায় তার সঙ্গীরা অন্যদিকে মুখ ঘুরালো। অগ্রসর হলো রণবীর। দাঁড়ালো এসে নৌকার কাছে। মাঝি বৈঠা মাটিতে পুঁতে নৌকা বাঁধলো। মুখ ধোঁয়ার ভানে রণবীর মাথা নীচু করে চোখে পানি ছিটাতে ব্যপৃত হলো। নৌকায় স্রেফ একজন লোক। নৌকার পাশে এসে দাঁড়ালো ও। মাঝি চিনলো ওকে। বিপদ দেখে নৌকার দড়ি খুলতে লাগলো। রণবীর ততক্ষণে এক লাফে নৌকায় চড়ে বসলো। ওর দু'হাত চেপে ধরলো মাঝির গলা। রণবীরের সাথীরা এগিয়ে এসে দড়ি দিয়ে বাঁধলো তার হাত। মুখে ঢুকালো এক টুকরো কাপড়। এরপর নেমে এসে তারা নৌকা গভীর পানিতে ঠেলে দিলো।

রণবীর সঙ্গীদের বললো, 'এক্ষণে মহলে সেপাইদের আনাগোনা কেমন?'

রণবীরের বাবার বয়সী এক নওকর জবাব দিলো, 'পনের বিশজনের বেশী হবেনা। অবশ্য গাঁওয়ে জয়কৃষ্ণের ১৫০ জন বিশেষ সেপাই আছে। মহল কব্জা করে জয়কৃষ্ণ তামাম লোকজন ভাগিয়ে দিয়েছে। শূন্য ঘরে থাকতে দিয়েছে সেপাইদের। আমরা কেবল আপনার খাতিরে এতদূর অগ্রসর হয়েছি। ভগবানের দিকে চেয়ে আপনি মহল আক্রমণের চিন্তা পরিহার করুন। জয়কৃষ্ণ ভোরের আলো ফুটে উঠতেই গোটা জনপদে কিয়ামতের বিভীষিকা সৃষ্টি করবে।'

'তোমাদেরকে আমি মরণের মুখে ঠেলে দেবনা। তবে ওয়াদা করছি, অচিরেই ফিরে আসব। শকুন্তলা ও বাবার কোন সংবাদ জানলে বলো!'

গেঁয়ো লোকজন মলিন চেহারায় একে অপরের দিকে তাকালো। রণবীর তাদের অন্তরের খবর অনুভব করে বললো, 'তোমরা পেরেশান হয়োনা। জয়কৃষ্ণের লোকজন বলেছে, বাবা বেঁচে নেই। অবশ্য শকুন্তলার সংবাদ তারা দিতে পারেনি।'

বৃদ্ধ লোকটি বললো, 'সন্ধ্যার দিকে জয়কৃষ্ণের লোকজন যখন মহলে আক্রমণ করেছিলো, তখন বেশ কিছু অপরিচিত সেপাই দেয়াল থেকে তীর পাথর বর্ষন করছিলো। নাঙ্গা তরবারী হাতে নিয়ে শকুন্তলা মহলের চৌহদ্দীর মাঝে থেকে দেহরক্ষীদের উৎসাহিত করছিলো। সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুষ্টিমেয় দেহরক্ষীরা কোন মতে হামলাবাজদের ঠেকিয়ে রেখেছিলো। আমরা ধারনা করেছিলাম, গাঁয়ের লোকজন আমাদের মদদে ছুটে আসবে। কিন্তু জয়কৃষ্ণের একদল ফৌজ গ্রামের সাধারণ লোকদের উপর চড়াও হয়েছিল। আপনার বাবার মৃত্যুতে গাঁয়ের লোকদের বাযু ঢিল হয়ে যায়। ফেলে দেয় হাতিয়ার সামান্য প্রতিরোধে। সন্ধ্যার কালো ছায়া পড়তেই হামলাবাজ সেপাইরা 'হরিবল' দিয়ে মহলে ঝটিকা আক্রমণ চালায়।

প্রথমেই তাদের বেশ ক'জন দেয়াল টপকে অন্দরে প্রবেশ করে। খুলে দেয় আমাদের প্রধান ফটক। সিংহভাগ মহল রক্ষাকারী হাতিয়ার সমর্পন করলেও বেশ কিছু আত্মবিশ্বাসী দেহরক্ষী পুরাদমে প্রতিরোধ করছিলো তখনও। ক্রমবর্দ্ধমান অন্ধকারের অমানিশায় শকুন্তলার উৎসাহব্যঞ্জক আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো। যারা ছাদে তীর বৃষ্টি বর্ষণ করছিলো, আমাদের সাথে এসে মিশলো ওরা। চালালাম মরণপণ যুদ্ধ। কিন্তু ক্রমেই ফুরিয়ে আসছিলো তূণীরের তীর। পারলাম না বেশীক্ষণ টিকতে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলাম হাতিয়ার ফেলে দিতে। যখমী হয়ে আত্মরক্ষার্থে পূর্ব ফটকে এগিয়ে গেলাম। ওখানে বেশ কিছু জানবায দেহরক্ষী শত্রু মনে বিভীষিকা তুলে লড়াই করছিলো। শুনতে পাচ্ছিলাম ওদের 'হরিবল ধ্বনি'। জমকালো অন্ধকার ভেদ করে সাথীদের সাথে মিলিত হলাম। খানিকপর বড় আম গাছের তলে এসে পৌছলো শকুন্তলাও। ওর হাত ধরে বললাম, 'শীঘ্র পালাও মাইজি! আমরা হেরে গেছি। ঐ একটি মাত্র এলাকা ছাড়া তামাম মহল ততক্ষণে দুশমনের কব্জায় চলে গেছে। ইত্যবসরে দুশমনের মধ্যে থেকে কেউ বুলন্দ আওয়াজে বলে উঠলো, "তোমাদের মত হাতে গোনা ৮/১০ জন লোক হামলা প্রতিরোধ করতে পারবেনা। জান বাঁচাতে চাইলে হাতিয়ার ফেলে ধরা দাও।" আমরা ওদের কথায় কান না দিয়ে ফটক খুলে পালালাম'।

ফটকের বাইরে তীর ধনুক তাক করে বসেছিলো দুশমনের একটা দল। তীর বৃষ্টি শুরু হলো। হারালাম আমাদের ক'জনকে। এরপর দুশমনরা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করার প্রয়োজন মনে করল না। আমার মনে আছে, শকুন্তলা আমার সাথে ছিলো। পরে আর জানতে পারিনি, কোথায় গেল ও। লছমন এক নারীকে দরিয়ায় ঝাঁপ দিতে দেখেছিলো। কিন্তু সুনিশ্চিত বলতে পারেনি, সে শকুন্তলা কি-না। আপনি জানেন, ও একজন দক্ষ সাঁতারু। বোধহয় দরিয়া সাঁতরে ওপার গেছে। যখমের জ্বালায় দরিয়া তীরবর্তী একটি ঝোপের আড়ালে পড়েছিলাম। আমাকে বেঁধে নিয়ে গেল জয়কৃষ্ণের লোকজন ওখান থেকে। ওরা আমাকে হত্যা করতেই চাইলে তার বিবি ও মেয়ের বদান্যতায় সে যাত্রা বেঁচে যাই।'

রণবীর প্রশ্ন ছুড়লো, 'লছমন কোথায়?'

'গ্রাম ছেড়ে ভেগেছে।'

'মহলে হামলা হবার পূর্বেই কি বাবা নিহত হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ দরিয়া উপকূলে অনুপ চাঁদের বস্তিতে তাঁকে কতল করা হয়। অনুপচাঁদ স্বয়ং তাঁকে আহবান করে বলেছিলো, 'কাশীর পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণ জনপদে আগমণ করেছে। তারা আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। তিনি ক'জন নওকর সাথে করে অতিপ্রত্যুষে ঐ এলাকায় যাত্রা করেন। নওকরদের মধ্যে জয় দয়াল নামী আমার

ভাতিজাও ছিলো। অনুপচাঁদের কাচারীতে পুরোহিত, নামী-দামী সর্দার ও জয়কৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন।'

অনুপচাঁদ বললো, 'পুরোহিত ও জনপদের সর্দার মহোদয়গণ আপনাকে মহারাজার বিরুদ্ধে রাজকুমারের সাজসে যোগদান করতে বলছেন'।

তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, 'মুসলমানদের সাথে সম্মুখ সমরে কনৌজ প্রশাসন যে কাপুরুষতা প্রদর্শন করেছে, তাতে আমার আফসোস নেই। কিন্তু বাবার বিরুদ্ধে পুত্রকে লেলিয়ে দিতে আমি রাজী নই। জলন্ধর ও গোয়ালিয়র ফৌজ আমাদের জনপদে হামলা চালাক, তা আমি কিছুতেই বরদাশ্ত করবো না। রাজকুমার ষড়যন্ত্র করে গদী দখল করলে, এতে তার কোন কৃতিত্ব নেই। এতে ফায়দা জলন্ধরের রাজা মহাশয়ের। রাজকুমার এক্ষণে তার হাতের ক্রীড়নক। আপনারা রাজা মহাশয়কে ধিক্কার দিতে পারেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, মুসলমানদের হামলাকালে জলন্ধর ও গোয়ালিয়র ফৌজ কোথায় আত্মগোপন করেছিলো? আত্মসম্ভ্রমবোধ থাকলে তারা ঘরে বসে তামাশা দেখত না, লড়তো জানবাযী করে।'

থামলেন আপনার বাবা। শ্বাস নিয়ে আবার বলতে লাগলেন, 'জয়কৃষ্ণের মত বিদগ্ধ লোক এক্ষণে আপনাদের সাথে আছে। তাকে দেখে আমার বার বার খেয়াল হচ্ছে, আমাদের ভিটেমাটি বুঝি বিক্রি হয়ে গেছে। মহাবনের রাজার বিরুদ্ধে জনপদে তিনিই সর্বপ্রথম বিদ্রোহের ধুয়া তুলেছিলেন। আর এখন গোয়ালিয়র ও জলন্ধরের রাজার গোলাম বানাতে চাচ্ছেন জনপদবাসীদের'।

একথা শুনে জয়কৃষ্ণ গর্জে ওঠলেন। তিনি আপনার বাবাকে কাপুরুষ বলে আখ্যা দিলেন। আপনার পিতার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে তিনি তরবারী কোষমুক্ত করেন। জয়কৃষ্ণ পূর্ব হতেই তৈরী ছিলো। সামান্য লড়াই করে আপনার বাবা জমীনে লুটিয়ে পড়লেন। জয়কৃষ্ণের আখেরী হামলা তাকে আর উঠতে দিল না। অনুপচাঁদের ইশারায় তার লোকজন আমাদের নওকরদের উপর হামলা চালালো। জয় দয়াল কোনমতে পালিয়ে আসলো।

এর আঠার দিন পর আমরা মহারাজার হত্যা এবং পরে রাজকুমারের গদী দখলের খবর পাই। দশদিন পর নয়া রাজার নির্দেশে জয়কৃষ্ণ তার পুরানো জায়গীর উদ্ধারে আমাদের জনপদে চড়াও হন।'

রণবীর বললো, 'তোমার একীন আছে, জয়কৃষ্ণের লোকজন শকুন্তলাকে গ্রেফতার করেছে?'

জয়কৃষ্ণ শকুন্তলার খোঁজ না পেয়ে সন্ধান দাতার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলো। কিন্তু তারা খুঁজে পায়নি ওকে।'

গেঁয়ো একজন বলে উঠলো, 'মহারাজ! আঁধার কেটে আলোর রেখা ফুটে ওঠছে। জলদি স্থান ত্যাগ করতে হবে।'

রণবীর বললো, 'কয়েদীদের সাথে নিয়ে যেতে চাই। ওদের কোথাও গায়েব করে রাখতে হবে। যাতে সহজে তালাশ করে না পাওয়া যায়। ততোক্ষণে আমরা বেশ কয়েক ক্রোশ অতিক্রম করতে পারবো। এক্ষণে তোমাদের চিন্তা আমায় পেয়ে বসেছে। কয়েদীদের সামনে আমি এমনভাবে কথা বলবো যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে, তোমরা আমার সাথে নন্দনা থেকে এসেছ এবং আমার সাথেই প্রত্যাবর্তন করছো। অবশ্য আমি রওয়ানা দেবার পূর্বে তোমরা সরাসরি নিজ নিজ ঘরে পৌছুবে। চলো ঘোড়া প্রস্তুত।'

রণবীর কয়েদীদের কাছে গিয়ে তাদের বাঁধন আরো কষে দিলো। অতঃপর এক এক কয়েদীকে ভিন্ন ঘোড়ার চড়িয়ে জিনের সাথে বাঁধলো। তারপর গেঁয়ো লোকদের লক্ষ্য করে বললো, 'তোমরা এবার যেতে পার। আমরা বাকী ফৌজের সাথে গিয়ে মিলবো। সীমান্ত এলাকা অতিক্রম করার আগে কিষাণের লেবাছই তোমাদের জন্য প্রযোজ্য। যাও! ভগবান তোমাদের সহায় হোন।'

গেঁয়ো লোকজন ঝোপের আড়ালে গায়েব হয়ে গেলো। ঘোড়ার পিঠে চাপলো রণবীর ও শম্ভুনাথ। কয়েক ক্রোশ অতিক্রম করার পর ঘোড়পৃষ্ঠ থেকে রণবীর নামলো। ঘোড়া থেকে নামিয়ে কয়েদীদের বাঁধলো কয়েকটি গাছের সাথে।

দ্বিতীয় বার ঘোড়পৃষ্ঠে সওয়ার হলো রণবীর। উদ্দেশ্যহীন তার যাত্রা। গন্তব্য জানা নেই। কোথায় যাবে সে। ভাবছিলো, যথাশ্রীঘ্র জংগল ছাড়তে হবে। শম্ভুনাথ জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদের গন্তব্য কোথায়?'

রণবীর তার কথার জবাব না দিয়ে বললো, 'শকুন্তলা ও বাবার সম্পর্কে কিছু শুনেছ কি?'

'হ্যাঁ! সবই শুনেছি।'

'শকুন্তলার খোঁজ আমার জিন্দেগীর মূল গন্তব্য। পাহাড়, সাগর, অরণ্য, মাঠ তন্ন-তন্ন করে ফেলবো। তালাশ করবো তাকে ঝোপঝাড় থেকে শুরু করে মন্দিরের অলিন্দ পর্যন্ত। আমি সর্বদা শুনতে পাই ওর সকরুণ কান্নার সুর। সে সুর আমাকে স্থীর থাকতে দেয় না।'

'আমার একটা কথা রাখবেন?'

'কি কথা?'

'দেখুন! জনপদের কোথাও থাকলে জনপদবাসী ওকে খুঁজে বের করত। দূরে কোথাও চলে গেছে হয়ত। আপনি প্রতিবেশী রাজাদের সহায়তা নিতে পারেন।

পরামর্শ করতে পারেন রাজপুত ও সর্দারদের সাথে। আপনার বাবাকে কেইবা না চিনে। তদুপরি দীর্ঘ পাঁচটি বছর আপনি মুসলিমদের কয়েদখানায় ছিলেন। এতে পার্শ্ববর্তী রাজমহলে আপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। তারা নিশ্চয়ই আপনার মদদ করবেন। হতে পারে শকুন্তলা এদের কারো আশ্রয়ে আছে। কনৌজ ও রাচী আপনার জন্য নিরাপদ নয়। জয়কৃষ্ণের টিকটিকিরা সর্বদা আপনার পিছু লেগে আছে। তারচে' আমি এক সাধু সন্যাসীর বেশে শকুন্তলাকে তালাশ করবো। আমাকে কেউ সন্দেহ করবেনা। সামনের বস্তিতে আমার এক মামাত ভাই আছে। শকুন্তলার সন্ধান পেলে ওর ওখানে চলে যাবো।'

রণবীর আবেগ ভরা কণ্ঠে বললো, 'শম্ভুনাথ! আমার মাথা ঠিক নেই।'

জংগল পেরিয়ে রণবীর ও শম্ভুনাথ ছোট্ট একটি বস্তিতে উপনীত হলো।। শম্ভুনাথ বললো, 'এটা আমার মামার বস্তি।'

রণবীর ঘোড়ার জিন কষে বললো, 'শম্ভু! বস্তিতে ঘোড়া না নিয়ে জংগলে রেখে গেলে ভালো হয়। ভালো হয় বস্তিবাসীর নজর থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখলে। আমার একীন, জয়কৃষ্ণের লোক আমাদের তালাশে গোটা জংগল ও জনপদ চষে ফিরবে।'

শম্ভুনাথ বললো, 'আপনি শান্ত হোন। ছদ্মবেশ ধারণ করে আমি ওদের সহজেই ধোঁকা দিতে পারবো। আমার যত ভয় আপনাকে নিয়ে।'

'আমি সরদার পুরান চাঁদের কাছে যাচ্ছি। বাবার পুরানো দোস্ত উনি। আমার কোন মদদ করতে না পারলে কমপক্ষে তাজাদম ঘোড়া দিতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। পরে গোয়ালিয়র যাবো। ওখানকার এক সর্দারপূত আমার সাথে নন্দনার কেল্লায় বন্দী ছিলো। ওর সহায়তায় গোয়ালিয়র রাজার সাহায্য নিতে পারবো।' বললো রণবীর।

'তাহলে তো সময় নষ্ট না করে জলদি রওয়ানা হওয়া উচিত।'

'আপনার ঘোড়া খুবই ক্লান্ত।'

রণবীর ও শম্ভুনাথের যাত্রার রোখ পরিবর্তন হলো। দু'জনে চললো দু'দিকে। দূর হলো শংকা উভয়ের।

বিশাল এক উঠানের কোলে দাঁড়িয়ে আছে জয়কৃষ্ণের সুডৌল সুঠাম মহল। মহলের একটি প্রশস্ত কামরা। জয়কৃষ্ণের হাতে মোটা বেতের ছড়ি। কয়েকজন নওকর জোড় হাতে তার সম্মুখে দন্ডায়মান। তার গোস্বা কম্পিত কণ্ঠ পাষাণ গাত্রে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করলো।

'তোমরা গোটা জনপদে তাকে তালাশ করেছ কি?'

'হ্যাঁ! মহারাজ! জনপদের কেউ তাকে দেখেনি।'

'নৌকা ওপার থাকলে গর্দভটা বোধহয় এখনও এপারে আছে।'

'কিন্তু মহারাজ! নদীর ওপারও নৌকা দেখিনি।'

'নৌকা তাহলে গেলো কোথায়?'

'মহারাজ! আমার খেয়াল, ওপার গিয়ে বোধহয় নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। ভেসে গিয়েছে তা ভাটিতে। গ্রামের একজনকে একটি ছিপি নৌকা দিয়ে পাঠিয়েছি, অল্পক্ষণেই সে ফিরে আসবে।'

তোমরা গেঁয়ো লোকজনকে এ কথা বলোনি তো যে, 'আমার নওকররা এক লোককে হত্যা করতে ওপার গেছে?'

জ্বি-না! মহারাজ!

'সত্যি?

'হ্যাঁ, মহারাজ! আমি এক বর্ণও মিথ্যা বলছি না।'

'তুমি নদী পার হলে না কেন?'

'মহারাজ! আপনার নির্দেশ ছিলো, আমি নদীর তীরে গিয়েই যেন চলে আসি।'

'নৌকাডুবি হয়নি তো?'

'মহারাজ! আমিও এ শংকা করছি, নৌকাটি ফুটো। ৮/১০জন লোক সওয়ার হলে তা ডুবে যাওয়াই স্বাভাবিক।'

'মেরামত করে নিলে না কেন? পেয়ার লালকে বলেছিলাম নৌকাটি মেরামত করে দিতে।'

'মহারাজ! বড়াল মহাশয়কে আমার সামনে পেয়ার লাল নৌকা মেরামতের কথা বলেছিল। কিন্তু বড়ালের উদাসীনতায় মেরামত হয়নি।'

'ডাকো নরাধমকে!' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল জয়কৃষ্ণ।

নওকর কুর্নিশ করতে করতে করতে বেরিয়ে গেল। অধর দংশন করে জয়কৃষ্ণ বিক্ষিপ্ত পায়চারী করতে লাগলো। খানিক পর মহলে প্রবেশ করলো জনা চারেক নওকর। জয়কৃষ্ণের পার্শ্বস্থ এক নওকর বলে উঠলো, 'মহরাজ! সে এসে গেছে।'

'মহারাজ! আমরা নৌকা করে ওপারে............।'

জয়কৃষ্ণ তার কথা কেটে বললো, 'বদমাশ! জানি, তুমি নৌকায় ছিলে। জিজ্ঞেস করছি, দেরী করলে কেন? আর তোমার সঙ্গীদের দেখছি না কেন?'

'জানিনা মহারাজ! নদীর ওপার গিয়েই আমরা নৌকা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

'কোথায়?'

'এপার মহারাজ!'

'এপার! এপার!! প্যান প্যানানী রাখতো!'

সেপাই ভগ্নোৎসাহ হয়ে বললো, 'মহারাজ নৌকা পাঠিয়ে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। ভগবানই ভালো জানেন, ওরা এলো না কেন? আর নৌকাই বা গেল কোথায়?'

জয়কৃষ্ণ তার কথার জওয়াব না দিয়ে অগ্রসর হয়ে সপাং সপাং দু'ঘা লাগিয়ে দিলো। বললো তার সঙ্গীদের দিকে নজর করে, 'তোমরা চক্ষু বিস্ফোরিত করে কি দেখছো?' 'ওপার! এপার' প্যান প্যানানী থামালে কেন? কার অপেক্ষা করেছিলে তোমরা ? আর কে এলো না? বলো!'

নিরুৎসাহিত হয়ে এক সেপাই শুকনো আওয়াজে বললো, 'নদীর তীরে গিয়ে পেয়ারলাল ভেবেছিলেন, সবাই এক সাথে পার হতে পারবো না। এ জন্য তিনি ভগৎরামের সাথে জনা চারেক সেপাইকে প্রথমে পার হতে নির্দেশ দেন। ওপার গিয়ে ভগৎরামকে পাঠালাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম কয়েদী ও বাকী তিন সাথীর। ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করলাম। কিন্তু ওপার থেকে নৌকা আর এলো না। ভাবছিলাম, স্রোতের তোড়ে নৌকা ভাটিতে নেমে গেল কি-না। সাথীরা বললো, 'না! নৌকাডুবি হয়েছে বোধ হয়।'

জয়কৃষ্ণ বললো, 'আচ্ছা! কয়েদীকে তোমরা হত্যা করেছ কি?'

'মহারাজ! কয়েদী জয়চাঁদ ও সীতারামের সাথে এপারে ছিলো।'

'আমি জানতে চাই, কোন্ সাহসে তোমরা মাত্র তিনজন সেপাই রেখে ওপার গেলে?'

'পেয়ার লালের হুকুম ছিলো এ রকম। কয়েদী বাঁধা ছিলো মজবুত রশি দিয়ে। তার থেকে আমাদের কোনই শংকা ছিল না।'

গোস্বায় কাঁপতে জয়কৃষ্ণ ছড়ি ঘুরিয়ে বললো, 'মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। গর্দভ কোথাকার। ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলার জন্য প্রস্তুত হও। একটারও রেহাই নেই। এখানে হা করে কি দেখছো? যাও! নদীর তীর চষে ফেলো। তালাশ কর ওকে।'

নওকর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়া হিংস্র শার্দুলের মত অধর দংশন করছিলো জয়কৃষ্ণ। রণবীরের অপ্রত্যাশিত পলায়নে তার পেরেশানী শংকায় রূপ নিলো। খানিক পর মহলের দরজা ঠেলে ভগৎরাম প্রবেশ করলো। তাকে দেখে জয়কৃষ্ণ বলে উঠলো, 'কোথায় ছিলে এতোক্ষণ? গোপাল গেল কৈ?'

'মহারাজ!' বুকে হাত বেঁধে সে বললো, 'আমাকে নৌকায় বেঁধে রেখে যায় সে। ভাটিতে নৌকা বেশ দূরে গিয়েছিলো। এক জেলের নৌকা আমাকে উদ্ধার করে।'

'কে তোমায় বেঁধেছিলো?'

'কয়েদী মহারাজ!'

'কোথায়! কখন?'

'মহারাজ! প্রথমে চারজনকে পার করে ওপার নিয়ে গিয়েছিলাম।'

জয়কৃষ্ণ কথার মাঝখানে বললো, 'এ প্যান প্যানানি শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'আমি আপনার প্রশ্নের জবাবই দিচ্ছি মহারাজ! পেয়ার লাল আমাকে বলেছিলো, নৌকা ফুটো। এজন্য প্রথমে........'

জয়কৃষ্ণ ক্ষোভে-দুঃখে চুল ছিড়তে ছিড়তে বললো, 'ভগবান তোমাদের মুখ ধূলি ধূসরিত করুক। আবার সেই প্যান প্যানানি?'

ভৎগরাম বললো, 'মহারাজ! আমি চারজনকে প্রথমে পার করি। পরের বার জয়চাঁদ, পেয়ার লাল ও সীতারামসহ কয়েদীকে পার করতে আসতেই চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। অকস্মাৎ আমাকে চিৎ করে বেঁধে ফেলে নৌকার গলুই'র সাথে। ভাসিয়ে দেয় নৌকা।'

'ওরা কারা?'

'মহারাজ। কয়েদী সর্বপ্রথম আমার উপর চড়াও হয়েছিলো। আমাদের লোকজন মাথা নীচু করে ছিলো তখন।'

'কে! পেয়ার লাল ও তার সাথীরা?'

'হ্যাঁ মহারাজ! ওখানে আর কাউকে দেখেছি বলে মনে হয় না। কয়েদী শান্তভাবে পানিতে মুখ ধুচ্ছিলো। আর ওরা ছিলো শুকনো তীরে। কয়েদী আমার উপর হামলা করলো। এগিয়ে এলো কোত্থেকে যেন অপরিচিত ক'জন ওর সাহায্যার্থে। আমি ওদের চিনতে পারিনি। মহারাজ আপনিই বলুন, জনশূন্য শেষ রাতে সীতারাম, পেয়ার লাল আর জয়চাঁদ ছাড়া ওর মদদগার আর কে হতে পারে?'

'পাজি, নেমকহারাম কোথাকার। আমি সকলকে ক্ষুধার্ত সিংহের খাঁচায় ফেলবো। আমার ঘোড়া প্রস্তুত করো। খবর দাও আমার তামাম সেপাইকে এখানে সমবেত হতে।'

।। দুই ।।

মহলের বাইরে জয়কৃষ্ণ ছোট ছোট সেনাদল ভাগ করে ত্রিশোর্ধ সৈন্য বহর নিয়ে উত্তরাভিমুখী হলো। গাঁয়ের অনতিদূরে পেয়ার লাল ও তার দু'সাথীকে মহলের দিকে রোখ করতে দেখে সে হাতের ইশারায় ওদের থামাল। 'কয়েদী কোথায়?' ঘোড়ার জিন কষে জয়কৃষ্ণ জলদ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়লো।

'মহারাজ! কয়েদী ফেরার হয়েছে।'

'কোথায়?'

'যেখানে তার ফৌজ ছিলো।'

ঘোড়া শান্ত করে জয়কৃষ্ণ পেয়ার লালকে নির্মমভাবে পিটুনি দিতে লাগলো। ব্যথা ও যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল সে।

'মহারাজ! দয়া করুন মহারাজ! আমরা বেকসুর। এক দল তাজাদম ফৌজ তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। সংখ্যায় ওরা ঢের ছিলো। এসেছিলো জনপদের উপর চড়াও হতে। ভগবানের দোহাই! রাগ সম্বরণ করুন মহারাজ! জয়চাঁদ, সীতারামকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।'

এবার জয়কৃষ্ণ জয়চাঁদ ও সীতারামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

জয়কৃষ্ণের রাগ ঠাণ্ডা হলে পেয়ারলাল তার পায়ে পড়ে বললো, 'ওরা অকস্মাৎ হামলা চালায় যে, আমরা তরবারী কোষমুক্ত করার অবকাশ পাইনি। আমাদের বেঁধে ওরা গহীন অরণ্যে নিয়ে গেলো। বাঁধলো গাছের সাথে। এইমাত্র এক বাওয়ালী কাঠ কাটতে এসে আমাদের মুক্ত করে।'

'তোমরা মিথ্যা বলছো। ওটা তোমাদের একটা চাল। আমাকে হাঁদারাম মনে করছো? তোমাদের সকলকে জিন্দা কবর দেব। সত্যি করে বলো-কয়েদীকে কোথায় রেখে এসেছো?'

'মহারাজ! ভগবানের দোহাই, আমরা এক বর্ণও মিথ্যা বলছি না। বাওয়ালীকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। উনি কাঠ কাটছেন এখনও।'

জয়কৃষ্ণ কিছুটা নম্রস্বরে বললো, 'তোমাদের কথা সত্যি হলে, কয়েদী কোনদিকে রোখ করেছে বলে মনে কর?'

'তার সাথে ঘোড়া ছিলো মহারাজ! দ্রুত গতিতে ঘোড়া চেপে সে জংগলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ফৌজকে লক্ষ্য করে সে বলেছিলো, 'তোমরা বাকী সৈন্যদের সাথে গিয়ে একত্রিত হও। আমি আসছি। এরপর সে ও অন্য একজন আমাদের নিয়ে জংগলে প্রবেশ করে। মহারাজ! তার ফৌজ বোধহয় জংগল অতিক্রম করতে পারেনি এখনও। ওদের শরীরে ছিলো কিষাণের লেবাছ। আমার ভয় হচ্ছে, দলবল নিয়ে ওরা জনপদে হামলা করে বসে কিনা।'

'আচ্ছা ওর সাথে ক'জন সেপাই ছিলো বলে তোমাদের ধারণা?'

'৮/১০ জনের মত। তার কথায় বোঝা গেছে আরো বেশী।'

'তুমি একটা পাগলা গাধা! তোমাদের বোকা বানানোর জন্য সে এ চালবাজি করেছে। নন্দনার থেকে সে বিশাল এক সৈন্য বহর নিয়ে আসবে, আর আমরা জানতে পারবো না, তা হয় কি করে? তার সাথে বিপুল সৈন্য থাকলে মহলে হামলা করলো না কেন? আমার মনে হয়, 'ওর সাথে স্রেফ একজন লোক ছিলো।'

'মহারাজ! আপনি শান্ত হোন! আমরা কাউকে ছাড়বো না।'

জয়কৃষ্ণ যৎকিঞ্চিত শক্তি নিয়ে জংগলে ঢুকতে সাহস করল না। সুতরাং পার্শ্ববর্তী কয়েক বস্তির সর্দারদেরকে পত্র মারফত অবহিত করলো, 'মাহমুদ গজনবীর ফৌজ জংগলে আত্মগোপন করে আছে। তোমরা সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে এসো।' অতঃপর অন্যান্য সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললো, 'তোমরা জংগলের বাইরে থেকে পাহারা দেবে। জংগল অতিক্রম না করে থাকলে এখন বেরুতে হবে। ওদিকে ততোক্ষণে আমি জনপদের তামাম ফৌজ জমা করে ফেলবো। তোমাদের গাফিলতির কারণে ওদের একজন লোকও পালিয়ে বাঁচলে কাউকে আমি রেহাই দিব না। জংগল সংলগ্ন বস্তিগুলির রাখাল ও বাওয়ালীদের কাছে ওদের সন্ধান চেয়ো। মহল প্রতিরক্ষাকল্পে কিছু ফৌজ নিযুক্ত করে আমি ফিরে আসছি। পেয়ার লাল! ভালো করে শুনে রাখ। এবার ভুল করলে তোমার আর রক্ষা নেই। কয়েকজন ফৌজ নিয়ে তুমি জংগলের অপর দিকে চলে যাও। ঘোষণা করো, রণবীর ও তার সাথীদের কেউ জীবন্ত কিংবা মৃত ধরে দিতে পারলে সোনার মোহর দিয়ে তার ঝুলি ভরে দেয়া হবে।'

॥ তিন ॥

সূর্যের তাপ কমে আসছে। কমছে দাবদাহ গরম। পেয়ার লাল ও ভগৎরাম জংগলের অতি নিকটে বসে গল্প করছিলো। তাদের চারপাশে গেঁয়ো লোকজন ঝুড়ি নিয়ে ঘুরছিল খড়কুটো ও শুকনো কাঠের অন্বেষায়।

পেয়ারলাল ভগৎরামকে বললো, 'ভগৎরাম! আমাদের মুসিবতের দ্বিতীয় রাত্রী শুরু হতে যাচ্ছে।'

'রাত তার নিজস্ব গতিতে চলে যাবে। কিন্তু সকাল নাগাদ রণবীরকে খুঁজে না পেলে তোমার পরিণতি কি হবে।?'

'বলো, আমার কসুর কতটুকু! কয়েদী জংগলে বসে থাকবে? খেয়ে বসে তার তো কোন কাজ নেই!'

'হতে পারে, মেষ রাখালদের বেশে জংগল ছেড়ে পালিয়েছে ও। রাতে এ এলাকা পাহারা দেয়া কি চাট্টিখানি কথা?'

'তোমার কথার মতলব হচ্ছে, এলাকার লোকের গলতির দরুণ পুরো সাজাটা আমি পাবো?'

'দোস্ত! রণবীরের ফৌজের বিবরণ সর্দারের সামনে প্রকাশ করা ঠিক হয়নি। এক্ষণে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, রণবীরের সাথে স্রেফ একজন ছিলো।'

পেয়ারলাল জয়কৃষ্ণের তামাম নওকরের মধ্যে সবচে' বিশ্বস্ত।

অন্য সময় হলে এ ধরনের কথা শুনে সে বের হয়ে যেত। কিন্তু গতকালের ঘটনার পর তার মেজাজ বিগড়ে গেছে। ভগৎরামের ফালাফালি দেখে গোস্বা ভরে সে বললো, 'ভগৎ! বেশী ফালাফালি করনা তো! ভুলে গেছ, সরদার যদি দৈনিক আমাকে সাতবার নিন্দামন্দ বলেন- তাহলে সাতবার তোমাকে গালি দিয়ে থাকেন।'

ভগৎরাম খামোশ হয়ে গেল। খানিকপর সে এক গেঁয়ো লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, 'ভাই! এখানে জলপানের ব্যবস্থা আছে? আমার তৃষ্ণা পেয়েছে।'

গেঁয়ো লোকটি জওয়াব দিলো, 'জলপান করতে হলে আপনাকে নদীতে যেতে হবে।'

'নদী কত দূর?' সে প্রশ্ন ছুঁড়লো।

'কাছে। এই আধা ক্রোশের মত হবে আর কি।'

পেয়ার লাল দাঁড়িয়ে বললো, 'দোস্ত! পিপাসা লেগেছে আমারও। চলো, ঘোড়ায় চড়ে যাব আর আসবো। এখনও সময় আছে। অন্যথায় সারা রাত পিপাসায় কষ্ট পেতে হবে।

ভগৎরাম উঠে ঘোড়া প্রস্তুত করে গেঁয়ো লোকটিকে বললো, 'তোমাকে খুব চৌকস মনে হচ্ছে। আমাদের কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে বলো, 'আমরা জংগলে টহল দিচ্ছি।'

নদীর তীর। কুল বেয়ে গড়ে উঠেছে দীর্ঘ বন-বাদাড়। পেয়ারলাল ও ভগৎরাম নদীর তীরে এসে দাঁড়াল। পানি পান করে ঘোড়ার পিঠে ওঠতে গিয়ে জংগলের সামনে অপরিচিত একজনকে দেখে ওরা সচকিত হয়ে উঠলো। লোকটির একহাতে লাগাম। পেয়ারলাল কৌতুহলী হয়ে তাকিয়ে রইলো লোকটির প্রতি। তার ঘোড়া

পিপাসায় বিঘত খানেক জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছিলো। চকিতে সে ঘোড়া নিয়ে পানিতে নামলো। ঘোড়া এবং সে নিজে পানি পান করলো তৃপ্তিমত।

পেয়ারলাল ভগৎরামকে ডাকলো। আগন্তুকের কাছে এসে বললো, 'তুমি কোত্থেকে এসেছো?'

'মহারাজ, অনেক দূর থেকে এসেছি।'

ভগৎরাম বললো, 'তোমার ঘোড়া নেহায়েত ক্লান্ত।'

আগন্তুক বললো, 'এ ঘোড়া আমার নয়। কুড়িয়ে পেয়েছি এটি। বোধ হয় মালিক একে ছেড়ে চলে গেছে কিংবা দড়ি ছিঁড়ে প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে ও। ভাবছিলাম, বনে জংগলে ওকে বাঘে খেয়ে ফেলবে। তাই সাথে করে নিয়ে এসেছি। আমি সামনে আরো দু'ক্রোশ অতিক্রম করতে চাই।'

'ঘোড়াটি এখান থেকে কত দূরে পেয়েছিলে?'

'মহারাজ। আট ক্রোশ দূরে। সেখানে ছিলো আকাশচুমো পাহাড়ের সারি। আমি নামছিলাম নীচে। আমার ঘোড়ার পা পিছলে যায়। মাত্র একটি আর্তনাদ। গভীর খাদে তাকিয়ে দেখলাম-থেতলে গেছে ওর মাথা। চূর্ণ হয়ে গেছে ওর দেহ। একাকী চলছিলাম। খানিক চলার পর ক্লান্ত এক সওয়ারের সাথে সাক্ষাৎ হলো, ওর ঘোড়াটি খুবই পরিশ্রান্ত। চলতে পারছিলো না। বাধ্য হয়ে সওয়ার নেমে পড়লো। 'কোথায় যাচ্ছেন? কে আপনি? জিজ্ঞাসা করলে সে কোন উত্তর না দিয়ে ঘোড়া হাঁটিয়ে চলে গেল।'

'সওয়ারের অবয়ব-আকৃতি বলতে পারবে কি?

'সে এক নজরকাড়া সৌন্দর্যের অধিকারী যুবরাজ। দুধে আলতা মিশানো চেহারা। লম্বায় আমারচে' একটু বড়। প্রশস্ত বক্ষ। মনে হচ্ছিলো, সে কারো সাথে লড়াই করে ক্লান্ত হয়েছে। গোলাপী তার পাগড়ীর রং।'

'তার সাথে আর কাউকে দেখলে?'

'না!'

'কখন দেখছিলে তাকে?'

'দুপুরের কিছু আগে!'

'মুখোশ পড়া আর কাউকে পথিমধ্যে দেখলে কি?'

'না!'

'তুমি তার লোক নও, এ কথা প্রমাণ করতে পারবে?'

আগন্তুক ভগৎরামের প্রশ্নে হতবাক গেল।

পেয়ার লাল গর্জে ওঠলো, 'দেখ! জান বাঁচাতে চাইলে বলো, রণবীর কোথায়?'

'রণবীর? সে আবার কে?' আগন্তুকের কণ্ঠে হতাশা ও বিস্ময়।

'রাতে তুমি তার সাথে ছিলে। তোমার মুখে ছিলো গালপাট্টা। এক্ষণে আমাদের ধোঁকা দিতে চালবাজি করছো। কিন্তু মনে রেখ! রণবীরকে না পেলে তোমাকে জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করবো।'

আগন্তুক ভাবছিলো, সে দুই পাগলের সামনে দাঁড়ান। তাই ওদের সাথে কথা বলে তেমন একটা যুৎ করা যাবে না।

ভগৎরাম ও পেয়ারলাল রশি দ্বারা মজবুত করে বাঁধলে আগন্তুক হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে বললো, 'ভগবানের দোহাই! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের কোন অনিষ্ট সাধন করিনি। বলিনি কোন মিথ্যা কথা। ফিরছি শ্বশুরালয় থেকে। বিশ্বাস না হলে আমার শ্বশুর বাড়ি চলো। গেঁয়ো লোকজন সাক্ষী- আমি অতি প্রত্যুষে সেখান থেকে রওয়ানা করেছি। আমার অপরাধ আমি শুধু কুড়িয়ে পাওয়া ঘোড়াটি ব্যবহার করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। ছেড়ে দাও। আমার কথা বিশ্বাস না হলে, ঠিক আছে যেখানে মন চায় আমাকে নিয়ে চলো। চোরের মতো পিঠ মোড়া করে বাঁধার জরুরত নেই।'

আগন্তুকের কাকুতি-মিনতি বৃথা গেলো। শেষ পর্যন্ত ভাল করে বেঁধে ফেলা হলো তাকে। ভগৎরাম নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হলো আর পেয়ারলাল আগন্তুককে তুলে নিল তার ঘোড়ার পিছে।

॥ চার ॥

জংগল অবরোধকারীদের সংখ্যা শনৈঃ শনৈঃ বাড়ছিলো। আত্মীয়-অনাত্মীয় ও জমিদার শ্রেণীর আশ্রিত লাঠিয়ালরা যোগ দিলো। মহল হেফাজত করে জয়কৃষ্ণ অবরোধ গাহে এলো। কিছু সর্দার খেয়াল পেশ করলো- কালবিলম্ব না করে জংগল চষে ফেলা দরকার। কিন্তু জয়কৃষ্ণ উপকূলীয় সর্দার ও তাদের লোকজনকে অপেক্ষা করতে বললো। বেশ কিছু সর্দার টহল দিয়ে গেঁয়ো লোকদের হুঁশিয়ার করে বললো, 'তোমারা সতর্ক থেকো।'

আচানক ভগৎরাম ও পেয়ারলালকে দেখে জয়কৃষ্ণ চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'তোমরা এতক্ষণ কৈ ছিলে?'

পেয়ার লাল ঘোড়া থেকে হ্যাঁচকা টানে কয়েদীকে নামিয়ে জয়কৃষ্ণের সামনে ফেলে বললো, 'মহারাজ! আমরা এক টিকটিকিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু ও বলছে, রণবীরকে নাকি চিনে না।'

'ওকে পেলে কোথায়?'

'নদীর তীরে।'

জয়কৃষ্ণ চিৎকার দিয়ে বললো, 'স্থানচ্যুত হতে নিষেধ করেছিলাম না?'

ভগৎরাম অগ্রসর হয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললো, 'মহারাজ! কৃত অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে চাইলে পরে দিবেন, কিন্তু নরাধম বলছে- রণবীরকে নাকি আট নয় ক্রোশ দূরে দেখেছে ও। বোধ হয় এর কথা সর্বৈব মিথ্যা। সত্যি হলে পিছু নেয়া দরকার।'

পেয়ারলাল সাহস করে বললো, 'সত্য বলতে বাধ্য করার জন্য ওকে পাকড়াও করে নিয়ে এসেছি। আপনার ছড়ির দু'ঘা খেলে বাছাধন সত্যি কথা না বলে যায় কোথা দেখব!'

জয়কৃষ্ণ বললো, 'থাম! ভগৎরামকে বলতে দাও!'

ভগৎরাম সংক্ষেপে গতকালের কাহিনী বলে গেল। জয়কৃষ্ণ এবার কয়েদীর দিকে নজর দিলো-

'বলো! রণবীর ও তার সঙ্গীরা কোথায়? সত্য কথা বললে তোমাকে ছেড়ে দেব। অন্যথায় সূর্যাস্তের পূর্বেই তোমাকে জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করবো।'

কয়েদী ভগ্নোৎসাহ হয়ে বললো, 'মহারাজ! রণবীর কে আমি জানি না, চিনি না!'

কয়েদী বলতে লাগলো, 'বেশ কিছু সওয়ার পাহাড়ের পাদদেশে জমা হয়েছিলো। সেখানে কথিত রণবীরকে এক ঝলক দেখেছিলাম। আমার ঘোড়া মারা যাবার পর কুড়িয়ে পাওয়া ঘোড়ায় চেপে বাড়ীভিমুখী হচ্ছিলাম। এ ছাড়া আমি কিছু বলতে পারব না।'

জয়কৃষ্ণের সাহায্য করতে আসা কিছু সর্দার বলে উঠলো, 'আরে! এতো দেখছি আমাদের পাড়ার লোক।'

জয়কৃষ্ণ অগ্নিদৃষ্টিতে ভগৎরাম ও পেয়ার লালের দিকে তাকালো। তার দু'চোখ যেন গিলে ফেলতে চাচ্ছিল ওদের।

ভগৎরাম বললো, 'মহারাজ! এক বে-গোনাহকে শাস্তি দিতে আমরা ধরে আনিনি। এ কথা একীন করে বলতে পারি- রণবীর জংগল ত্যাগ করে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।'

কয়েদীকে কিছু প্রশ্ন করার পর জয়কৃষ্ণ একদল লোককে রণবীরের পিছু নিতে প্রেরণ করলো। বাদবাকীরা ঢুকলো কন্টকাকীর্ণ জংগলে। পেয়ারলাল ও ভগৎরামের নেতৃত্বে জনা দশে'ক লোক পশ্চিমমুখী হলো। কয়েদী দেখাচ্ছিলো পথ। সে মনে মনে বললো, 'ভগবান! ঘোড়াটি ছুঁয়ে কি পাপই না করেছিলাম।'

॥ পাঁচ ॥

সরদার পুরান চাঁদ এক শান্তি প্রিয় লোক। গোধূলী লগ্নে ঘরের বারান্দায় তিনি পালিত তোতা পাখির সাথে বাক্যালাপ করছিলেন। আচানক এক নওকর তার কাছে

এসে বললো, 'জনৈক মেহমান আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। তিনি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ছটফট করছেন। খানিকটা বিরক্তি ভরে উঠে মেহমানখানায় রোখ করেন তিনি। তাকে বিরক্ত করার জন্য এতোটুকু যথেষ্ঠ ছিল যে, মেহমান সাক্ষাতের জন্যে ছটফট করছে।

রণবীরকে দেখে তিনি ভূমিকা ছাড়া সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে গো বাছাধন?'

রণবীর জওয়ার দিলো, 'আপনি আমায় চিনবেন না। আমি সর্দার মোহন চাঁদের পুত্র।'

একথা শুনেই তিনি ভ্রু-কুঞ্চিত করে রণবীরের চেহারা পানে তাকালেন। মনের পেরেশানী চাপা দিয়ে বললেন, 'আরে এসো, এসো! আমি তোমাকে প্রথমে চিনতেই পারিনি। তুমি এ মুহূর্তে নেহায়েত কমজোর। কোত্থেকে এলে?'

গত দু'দিনের ঘটনা তাকে মুষড়ে দিয়েছিলো। বুড়ো সর্দারের পেরেশানী দেখে মুচকি হেসে সে বললো, 'আমি নন্দনা থেকে এসেছি। আপনার গাঁয়ের কাছ থেকে অতিক্রম কালে চিন্তা করলাম-দেখা করে গেলে মন্দ হত না।'

'ভালো। ভালো কাজ করেছ, কিন্তু.....।' সর্দার কথা শেষ না করে পুনরায় রণবীরের চেহারার দিকে তাকান।

রণবীর কেমন এতটা থতমত খেয়ে বলে, 'মাফ করুন! আমি অসময় আপনাকে জ্বালাতন করেছি। এখান থেকে ক্রোশ খানেক দূরে আমার ঘোড়া চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলে। এক্ষণে একটি তাজাদম ঘোড়া আমার খুব প্রয়োজন।'

সরদার খানিক চিন্তা করে বলেন, 'ঘোড়া তুমি ঠিকই পাবে। কিন্তু গাঁয়ে এ মুহূর্তে যাওয়া বোধহয় সমীচিন হবে না।'

আমার খেয়ালও কতকটা তাই। গাঁয়ে না গিয়ে শেষ প্রহরে নন্দনা রওয়ানা করব। দুর্গম পথ পাড়ি দিতে গিয়ে আমি নেহায়েত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

সর্দার কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু রণবীরের ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত মুখ দেখে কথা মুলতবী রাখলেন। নওকরকে বললেন খানা দিতে।

খানিক পর। রণবীর খানা খেয়ে বিছানায় আশ্রয় নেয়। ওদিকে দ্বিতলের এক প্রশস্ত কামরায় পুরান চাঁদ তার বিবির সাথে আলাপ করছিলেন, 'ভগবানের অশেষ কৃপা, নওকররা কেউ ওকে চিনেনি। জয়কৃষ্ণ একটা আস্ত পাঁজি। মোহন চাঁদের পুত্র আমার আশ্রয়ে জানলে সে আমার চিরশত্রু হয়ে যাবে। সকালে ওকে কি করে বলব- তোমাদের বাড়ী দখল করে নিয়েছে জয়কৃষ্ণ। খানার টেবিলে একথা বলতে গিয়েও যেন কেন বলতে পারিনি। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, একথা ওকে ওর গ্রামে

যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে না। হায়! আমি যদি ওর মদদ করতে পারতাম। কিন্তু জয়কৃষ্ণের মত লোকের সাথে দুশমনী রাখা প্রকান্ড পাহাড়ের সাথে টক্কর দেয়ার নামান্তর।'

বিবি বললো, 'আপনি কোন চিন্তা করবেন না। এখান থেকে চুপিসারে চলে যেতে ওকে অনুরোধ করব আমি।'

অতি প্রত্যুষে পুরান চাঁদ বিবিসহ রণবীরের কামরায় প্রবেশ করলেন। রণবীর গভীর ঘুমে অচেতন। সর্দারের বিবি বললো, 'আপনি ওর জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করুন, জাগ্রত হলে ওকে আমি পরিস্থিতি অবহিত করাব।

দ্বিতল থেকে নীচে নেমে পুরান চাঁদ প্রশস্ত উঠানে এসে দাঁড়ালেন। এক নওকর আদবের সাথে বললো, 'মহারাজ! রাতে এক সওয়ার এসে আমাকে বললো, 'তোমাদের বাড়ী যে মেহমান রাত কাটাচ্ছে, সে কে? 'জানি না'- বলে তাকে বিদায় করে দিয়েছি। সওয়ার আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর দুঃসাহস হয়নি আমার। সে বলেছিলো, মেহমানের সাথে জরুরী কাজ আছে। আমি বললাম, মেহমান দ্বিতলে আছেন। এক্ষণে যাওয়া যাবে না। রাতটা এখানে কাটালে আপনি তার সাক্ষাৎ করতে পারবেন। আগন্তুক বেরিয়ে গেলে ঝুঁকে দেখলাম- বস্তির অনতিদূরে দু'সওয়ার তার অপেক্ষায় দাঁড়ানো। তারা অনুচ্চ স্বরে কথা বলে অন্তর্ধান হয়ে গেল। লোকটার গতিবিধি কেমন সন্দেহজনক মনে হওয়ায় বাড়ীর নওকরদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছি। দিয়েছি হুঁশিয়ার করে গ্রামের সব আওয়ামকেও। গেঁয়ো এক লোক বললো, একদল ঘোড় সওয়ার তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলো, তোমরা কোন মুসাফিরকে এ গ্রামে প্রবেশ করতে দেখেছ কি?'

'কাজটা তুমি ভাল করোনি। আমাকে তৎক্ষণাৎ খবর দিলে না কেন? চটজলদি আস্তাবল থেকে একটি ঘোড়া নিয়ে এসো। নওকরকে নির্দেশ দিয়েই পুরান চাঁদ দৌড়ে রণবীরের কামরায় প্রবেশ করলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন-

'রণবীর, তুমি জলদী এখান থেকে চলে যাও। গভীর রাত্রে বেশ ক'জন সওয়ার তোমার তালাশে এসেছিলো। ওরা তোমার পশ্চাদ্ধাবন করছে, এ কথা আমাকে আগে বলোনি কেন?'

বিবি অগ্রসর হয়ে বললো, 'রণবীর আমাকে কিছু বলেছে। জয়কৃষ্ণের লোকজন ওর পিছু নিয়েছে। ওর জান বাঁচানো আমাদের কর্তব্য।

রণবীরের দিকে তাকিয়ে পুরান চাঁদ বললেন, 'তুমি বাড়ী গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ! মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এসেছি। কিন্তু জয়কৃষ্ণের লোকজন আমার খোঁজে এ সুদূরে এসেছে?

'জয়কৃষ্ণের হাত থেকে বেঁচে এলে মনে রেখ- পুরো গ্রাম এতক্ষণে ওরা অবরোধ করে ফেলেছে। তুমি কাল এসেই যদি আমাকে পুরো ঘটনা খুলে বলতে, তাহলে আমি ক্রোশ দু'য়েক তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসতাম। যাক যা হবার হয়েছে। এখন আমার সাথে এসো।'

॥ ছয় ॥

রণবীর তাঁর পিছু নিলো। জনৈক নওকর ঘোড়া প্রস্তুত করে আস্তাবলের সামনে দণ্ডায়মান। রণবীর তার হাত থেকে লাগাম তুলে নিলো। বললো মেজবানকে লক্ষ্য করে, 'আমৃত্যু আমি আপনাকে স্মরণ করবো।'

'আমি এক রাজপূতের দায়িত্ব আদায় করেছি মাত্র। ভগবানের দোহাই, জলদি যাও! এখন কথা বলার সময় নয় রণবীর! পথিমধ্যে কেউ পিছু নিলে দক্ষিণ-পূর্বের জংগলে আশ্রয় নিও।

ঘোড়ার রেকাবে পা রাখলো রণবীর। আচানক ভেসে এলো গেঁয়ো কুকুরদের বিচিত্র ঘেউ ঘেউ ডাক। তার সাথে শোনা গেল সমবেত অশ্ব খুর ধ্বনী। এক লোক রণবীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, 'মহারাজ! ওরা মহলের পার্শ্বে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করছে। কয়েকজন দরজায় করছে করাঘাত। আমি অবশ্য দরজা খুলিনি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ওরা মহলের ওপর চড়াও হবে।

'ওরা বোধহয় এসে পড়েছে' বললেন পুরান চাঁদ শুকনো মুখে।

চকিতে চলে গেল রণবীরের হাত কোষাবদ্ধ তরবারীর উপর। ঘোড়া পদাঘাত করে অগ্রসর হলো ও। হাবেলীর বাইরে সরু গলির মোড়ে দেখা গেল কিছু সওয়ার। রণবীর পথ পরিবর্তন করে ডান দিকে মোড় নিলো। সওয়াররা শোরগোল করে ওর পিছু নিলো। সামনে ছিলো দু'টি সরু পথ। রণবীর তার একটি থেকে শুনতে পেল খুর ধ্বনী। লাগাম টেনে ঘোড়াকে অন্য গলির মধ্যে যেতে বাধ্য করলো। সরু গলি পেরিয়ে সমতল ভূমিতে পৌঁছুলে ওর সামনে উদয় হলো জনা তিনেক তীরন্দায-ধনুকে জ্যা সংযোজন করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। জিনের সাথে একাকার হয়ে তীর বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে চাইলো ও। সাঁ সাঁ করে এক পশলা তীর ওর মাথার উপর দিয়ে চলে গেলো। অবশ্য একটি তীর বিধলো ওর বাম বাহুতে। এগিয়ে এলো এক সওয়ার ঠিক ঐ মুহূর্তে। রণবীরের মামুলী আঘাত তাকে নীচে ফেলে দিলো। অনতিদূরে দু'সওয়ার তরবারী উঁচিয়ে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। রণবীর সন্তর্পণে এগিয়ে গেলো সামনে। ঝোঁপের আড়াল থেকে বেড়িয়ে এলো পঞ্চাশোর্ধ সওয়ার। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছিলো রণবীরের ঘোড়া। অতিক্রম করলো নিমিষে ক্রোশ খানেক রাস্তা। দেখলো তার ডানে বামে ছোট ছোট বস্তি। সামনে বিশাল ঘন অরণ্য দেখে তার ঠোঁটে ফুটে উঠলো এক চিলতে হাসি। এটিই তার আখেরী ভরসা।

ছোট্ট একটি বস্তির পাশ দিয়ে চলছিলো রণবীরের ঘোড়া। আচানক বেরিয়ে এলো ৮ জন সওয়ার। রণবীর পথ পরিবর্তন করার মনস্থ করলো। ততোক্ষণে সওয়াররা ঘিরে নিলো ওকে। সওয়ারদের নতুন দল তখনো বেশ পিছে। রণবীর পড়ে গেলো মহাফাঁপরে। না পারছে পালাতে, না পারছে হামলা করতে। সুতরাং অসম মনোবল দেখিয়ে অকস্মাৎ ঘোড়া পিছু হটিয়ে বস্তিতে প্রবেশ করলো। পরে ঢুকলো ঘন অরণ্যের মাঝে। দু'সওয়ার চক্কর লাগিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। রণবীরের প্রথম আঘাতে একজনের ভবলীলা সাঙ্গ হলো। অপর এক আঘাতে অন্য সওয়ার পিছু হটতে বাধ্য হলো। ততোক্ষণে ৭ জন সওয়ার চক্রাকারে ওকে হামলা করতে লাগলো।

তন্মধ্যে এক সওয়ার বললো, 'এবার কোথায় যাবে বাছাধন? তলোয়ার ফেলে দাও!'

'তোমাদের মধ্যে এমন লোক খুব কম আছে, যারা আমাকে তরবারী ফেলতে দেখবে।' একথা বলে রণবীর ঘোড়া পদাঘাত করে আক্রমণ শানালো। ওর আঘাতের তীব্রতায় সওয়াররা পিছু হটতে বাধ্য হলো। রণবীর ওদের পশ্চাদ্ধাবন করে যাচ্ছে তাই গালি দিচ্ছিলো। এক সওয়ার ওকে নেযা মারতে উদ্যোগ নিতেই জংগল থেকে সাঁ করে একটি তীর এসে তার বুকে বিঁধলো। একটি আর্তচিৎকার দিয়ে সওয়ার লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। দু'একটা ঝাঁকুনি দিতেই ওর নেযা মারার সাধ চিরতরে মিটে গেল। এরপর পর্যায়ক্রমে তিনজন সওয়ার অদৃশ্য তীরের আঘাতে মারা গেল।

এদিকে জয়কৃষ্ণের বাকি সৈন্যরা জংগলের কাছে এসে পড়লো। পেয়ার লাল বলল, 'দুশমন নিঃস্ব ও একাকী নয়। জংগলের প্রতিটি বৃক্ষের মগডালে দুশমনের তীরন্দায রয়েছে।'

ঘোড়ার জীন কষে রণবীর বিস্ময়াভিভূত হয়ে চারিদিক সন্ধানী দৃষ্টি বুলালো। গাছের আড়াল থেকে ধনুক নিয়ে এক নওজোয়ান বেরিয়ে এলো।

'আপনার পিছনে এমন আর কতজন আছে?' আগন্তুকের আচমকা প্রশ্ন।

ত্রিশ-চল্লিশের মত, রণবীর জওয়াব দিলো।

'আমার খেয়াল, অবশিষ্ট লোকজন চিন্তা ভাবনা করেই জংগলে প্রবেশ করবে। আপনি আমার অনুসরণ করুন।' আগন্তুক চলতে শুরু করলো। রণবীর তাকে অনুসরণ করলো মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়। গাছে বাঁধা ছিল একটি ঘোড়া। আগন্তুক এক লাফে উঠে বসলো তার পিঠে।

আধা ক্রোশ চলার পর আগন্তুক ঘোড়ার গতি স্তিমিত করলো। ঘাড় ফিরিয়ে রণবীরকে বললো, 'আপনার ঘোড়া নেহাৎ ক্লান্ত। ওকে একটু তাজাদম করে নিন।'

নতুন সাথী

দুপুরের সময় একটি খরস্রোতা নদীর তীরে বসে আলাপ করছিলো রণবীর ও তার সাথী। তাদের ক্লান্ত ঘোড়া প্রভুদের পার্শ্বস্থ কচি ঘাস খেয়ে উদরপূর্তি করছিলো। রণবীরের কাহিনী শোনার পর আগন্তুক প্রশ্ন করলো ঃ 'এখন আপনার গন্তব্য কোথায়?'

'গন্তব্য জানা নেই। বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহা আমাকে দূর-বহুদূর নিয়ে যেতে চাচ্ছে। আপনার পেরেশানী দেখে বেমালুম ভুলে গেছি- আমি কোথায় যাচ্ছি! আপনি প্রশ্ন না করলে আমার দিলে এ খেয়াল আসতো কিনা সন্দেহ। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, কুদরত আপনার হাতে আমার হাত জুড়ে দিয়েছেন। অতএব দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার অনুসরণ আমার একান্ত কর্তব্য।'

আগন্তুক বিস্ময় বিস্ফোরিত লোচনে রণবীরের পাংশু মুখের দিকে তাকালো। বললে, 'আশ্চর্য তো। দুনিয়াতে এমনও মানুষ আছে, যার গন্তব্য জানা নেই? যার মনোবাঞ্ছা স্রেফ বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামরত? মৃত্যু বিভীষিকা অক্টোপাশের মতো আমায় ঘিরে নিয়েছে। ভাবছিলাম, উদভ্রান্ত উদাস জীবন চলার পথে কাউকে বুঝি আমার মতো খুঁজে পাব না। দুশমনকে পিছু হটিয়ে আপনি যখন আমার পদাংক অনুসরণ করছিলেন, তখন প্রতিটি মুহূর্তে কল্পনা করেছি- আপনি ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে বলবেন, আমি অমুক শহর কিংবা বস্তিভিমুখী হচ্ছি। আপনার চেহারা নেহায়েত পেরেশানী ও ঝড়ে ভাঙ্গা দেখা সত্ত্বেও ভেবেছি, আপনার জগৎ ও আমার জগৎ ভিন্ন। আপনি নিশ্চয়ই কোন অভিজাত ঘরের সন্তান। কোন আলীশান মহলে কেউ আপনার অপেক্ষা করছে। এতো বিশাল সৈন্য বহর মামুলী এক লোকের দুশমন হতে পারে না। দুশমনের মতো আপনার দোস্তও হবে অনেক। যাহোক, আপনার এ উদাসীনতা ও অসহায়ত্বে আমি বিশেষ এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করছি। এ জন্য পথিমধ্যে জিজ্ঞাসা করিনি, আপনার গন্তব্য কোথায়? আপনি আমার সাথে চলতে থাকুন। আপনার আত্মজীবনী শোনার পর উপলব্ধি করছি- আপনার দিশারী হবার যোগ্যতা আমার নেই। অবশ্য উদভ্রান্ত জীবনের পিছল পথে কোন সাথীর দরকার হলে আমি আছি।'

'আপনার আমার মিলন কোন ভৌতিক ব্যাপার নয়। কোন মহান উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে কুদরত বোধহয় আমাদেরকে জীবন নদীর মোহনায় এক করে দিয়েছেন। গন্তব্য নির্ধারণের জন্য কিছুদিন আমাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হবে।

আচ্ছা, আপনার পরিচয় জানতে পারি কি? আপনি কে, কোত্থেকে এসেছেন? সে কোন দুর্ঘটনা, যা আপনাকে আমার সাথী বানিয়েছে?

আগন্তুক রণবীরের প্রশ্নের জবাবে তার কাহিনী শোনাল।

॥ দুই ॥

এ আগন্তুকের নাম রামনাথ। মৃত পিতার বদলা নিতে সে এক পুরোহিতকে খতম করেছিলো। সে এমন এক লোকের উপর আঘাত করেছিলো- সোমনাথের পূজারী হবার দরুন রাজা-মহারাজারা যার সামনে মাথা নিচু করে থাকত। গ্রাম থেকে পলায়নকালে রামনাথ ভেবেছিলো- সোমনাথ পূজারীর গায়ে হাত দেয়ার অপরাধ তাকে দেবতাদের পবিত্র ভূমিতে সুস্থ্য থাকতে দেয়া হবে না।

সোমনাথের শ্রদ্ধা আওয়ামের অন্তরে টইটুম্বর ছিলো। কিন্তু সুলতান মাহমুদ গজনবীর ক্রমাগত মন্দির ভাঙ্গা ও মূর্তি বিনাশের দরুন ভারতবর্ষে এ খবর রাষ্ট্র হয়েছিলো- মন্দির ও মূর্তি বিনাশের দরুন সোমনাথের দেবতাগণ পূজারীদের উপর নারাজ হয়েছেন। অতএব তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করে ভারতের রাজা-মহারাজারা মাহমুদকে পরাভূত করতে পারবে না।

গোয়ালিয়রের আওয়ামের কাছে এ সংবাদ দুঃসহ ছিলো যে, জনৈক পাষাণ সেপাই এক পূজারীকে হত্যা করেছে। দুঃসহ ছিলো খোদ রাজা মহাশয়ের কাছেও। এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবিধানের জন্য তিনি অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে পুরস্কার ঘোষণা করেন। এলান করেন- সোমনাথ পূজারী হত্যাকারীকে ধরিয়ে দিতে পারলে স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে তার ঝুলি পুরে দেয়া হবে।

জনপদ ত্যাগের ৮ দিন পর রামনাথ কয়েক ক্রোশ দূরে গিয়ে জানতে পারল- সোমনাথ পূজারীর হত্যা খবর বিদ্যুতের মতো গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। এক্ষণে তাকে জলদি গোয়ালিয়র সীমান্ত অতিক্রম করতে হবে। কোন বস্তি অতিক্রম কালে একটি শংকা তাকে পেয়ে বসতো, তাকে দেখে হয়ত কেউ চিৎকার করে উঠবে- এই যে রামনাথ! আমি ওকে চিনি! গ্রেফতার করো ওকে।

এক রাতে সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে রাত্রি যাপনের জন্য সে একটি ধর্মশালায় প্রবেশ করলে জনৈক সৈন্য তাকে চিনে বলে উঠে, 'আপনি এখানে এলেন কি করে?' সৈন্যের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

রামনাথ তার পেরেশানী সংযত করে বললো, 'আমি মথুরা যাচ্ছিলাম। ওখানকার হনুমানজীর মন্দিরে রামযাত্রার আয়োজন চলছে।'

'আশ্চর্য মিল দেখছি! আমিও তো ওখানে যাচ্ছি। ওখানে আমার কুটুম আছে। মুসলিম হামলার পর ওদের কোন খবরাখবর নিতে পারিনি। আপনাদের জায়গীর সোমনাথের অধীনে নাকি?'

'হ্যাঁ।' রামনাথ থতমত খেয়ে জওয়ব দিলো।

'নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন- ওখানাকার এক সৈন্য সোমনাথের পূজারীকে হত্যা করেছে।' রামনাথের পেরেশানীর মাত্রাটা আরো বেড়ে গেল। সে বললো, 'পথিমধ্যে আমি এ খবর জানতে পেরেছি।'

নওজোয়ান মুচকি হাসির কোশেশ করে বললো, 'আপনাকে কেউ সন্দেহ করেনি তো? আমি এক গাঁয়ে প্রায় ফেঁসেই গিয়েছিলাম।'

'তোমার কথার মতলব বোধগম্য হলো না!'

'আমি একটি বস্তি অতিক্রম করছিলাম। আচানক শোরগোল করে উঠলো ক'জন- ধর! ওকে ধর! ও সোমনাথ পূজারী হন্তা। ভাগ্যিস ওখানে আমার পরিচিত এক সৈন্য ছিলো। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে সে আমাকে উদ্ধার করলো। দেখলাম- সীমান্ত অতিক্রমকারী সন্দেহভাজন লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সীমান্তবর্তী চৌকিদারদের কাছে হত্যাকারীর যে হুলিয়া দেয়া হয়েছিলো- আমার অবয়বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল তা। অবশ্য আমার গায়ের রং শ্যমলা থাকায় বেঁচে গেলাম সে যাত্রা!'

রামনাথ বললো, 'তোমার কথার মতলব হচ্ছে, ওরা আমাকে দেখলে গভীর ভাবে সন্দেহ করার অবকাশ পেত। কেননা, আমি দুধের মতো সাদা। তাই না?'

নওজোয়ান গভীরভাবে রামনাথের দিকে তাকালো, 'হ্যাঁ। আপনাকে দেখে ওরা আরো সন্দেহ করতো। আপনার বক্ষও বেশ প্রশস্ত। উচ্চতায় আপনি আমার চে' বেশী, আর....।'

'আর আমার নামও হত্যাকারীর সাথে মিলে যায়, তাই?' রামনাথ এ কথা বলেই ঘোড়ার জিন কষলো।

রাতটা কাটলো গভীর অরণ্যে ওর। পরের দিন যমুনা পাড়ি দিয়ে কনৌজ সাম্রাজ্যে প্রবেশ করলো। কমলো ওর নিরাপত্তাহীনতা। কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছিলো না। রাত কাটাত কিষাণ ও রাখালদের বস্তিতে। যাযাবরী জীবনে রূপাবতি ছিল ওর শেষ সান্ত্বনা। ইটের বালিশে মাথা রেখে ভাবতো- জিন্দেগীর কন্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আমি কখনও কি ওর কাছে যেতে পারবো? সরাসরি সোমনাথ মন্দিরে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পূজারী হত্যা প্রতিশোধ একদিন ওরা ভুলে যাবে। সে ক্ষেত্রে যেতে তেমন একটা বেগ পেতে হবে না।'

বিপর্যস্ত হিমালয় ক্রোড়ে আশ্রয় নিতে রামনাথ উত্তর-পূর্ব ভারতে রোখ করলো। একদিন ঘন অরণ্যের কাছে এসে রাত হয়ে গেলো। মাথা গোঁজার জন্য আশ্রয় নিলো ও একটি ছোট ঝুপড়িতে। পরের দিন পূর্ব দিকে চলছিলো। আচানক দু'সেপাই ওর অনুসরন করলো।। চকিতে রামনাথ লুকালো ঘন অরণ্যের মাঝে।

রণবীরের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। রামনাথ যেখানে আত্মগোপন করেছিলো রণবীরও এগিয়ে আসছিলো সেদিকটায়। রণবীরকে যখন দুশমনরা নেযা মারতে উদ্যোগ নিয়েছিল, তখন রামনাথ চুপ করে থাকতে পারেনি। তীর ধনুক এস্তেমাল করতে সে ব্যপৃত হলো। গোড়ার দিকে রামনাথ হামলাবাজ ও রণবীরের যুদ্ধ দৃশ্যের তামাশা অবলোকন করতে চাচ্ছিলো। কিন্তু লড়াই চূড়ান্ত রূপ নিলে ও ভাবলো- আমার একটু সাহায্য এক শরীফ নওজোয়ানের জান বাঁচাতে পারে। সুতরাং পরিণতি না ভেবে সে তীর চালাতে শুরু করে।

রামনাথের আদ্যোপান্ত কাহিনী শোনার পর রণবীর বললোঃ 'আমি একা আর ওরা অগণিত ছিলো বলে তুমি আমায় সাহায্য করেছ?

'হ্যাঁ। তবে তারচে' আপনার হিম্মত ও অসম দুঃসাহস আমাকে প্রভাবিত করেছে। দুশমনের কথা মতো আপনি হাতিয়ার সমর্পণ করলে আমি সাহায্য না করে জান বাঁচানোর কোশেশ করতাম। কিন্তু ঘোরতম বিপদ মুহূর্তে জীবন মৃত্যুর পরোয়া না করে যেখানে আপনি বীরদর্পে যুদ্ধকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে নিশ্চুপ বসে থাকা আমাকে কাপুরুষতার পীড়া দিয়েছিলো।'

'তুমি এমন এক অসহায় লোকের সাহায্য করেছো, যে তোমার এহসান কোনদিন ভুলবে না। তুমি আজ থেকে আমার ভাই, রণবীর হাত বাড়ালো। রামনাথ ওর হাতের উপর হাত রাখলো। রামনাথ বললো, 'আমি আপনার ছোট ভাই।'

কনৌজের উত্তর সীমান্ত অতিক্রম করে রণবীর ও রামনাথ বিক্ষিপ্ত বিচরণ করে বেড়াল। গেঁয়ো লোকজন বহিঃশত্রুর আক্রমণে প্রভাবিত হয়ে উৎকণ্ঠায় কালাতিপাত করছিলো। এ জন্য ওরা যে বস্তিতেই যেত, পেত প্রাণঢালা অভ্যর্থনা। জনপদ ত্যাগ করার পূর্বে রামনাথ বেশ কিছু স্বর্ণ-মুদ্রা নিয়ে এসেছিলো। সেগুলো ছিলো ওর পকেটে। অন্যদিকে শকুন্তলার অলংকারাদি জয়কৃষ্ণের মেয়ের শয্যাপার্শ্বে রেখে এসে নিঃস্ব হয়েছিলো রণবীর।

॥ তিন ॥

শয়নে স্বপনে রণবীরের মানসপটে ভেসে ওঠতো শকুন্তলার প্রতিচ্ছবি। এক রাতে ওরা চৌধুরী বাড়ির মেহমান হয়েছিলো। রাতের খানা খেয়ে একটি খাটে ওরা বিশ্রাম করছিলো। রামনাথ বললো, 'বিভীষিকাময় দুস্তর পথ পাড়ি দিয়ে আমরা স্বস্তির তটে উপনীত হয়েছি। আগামী কাল কোথায় রোখ করবেন?'

রণবীর খানিক ভেবে উঠে বসে বললো, 'রামনাথ! হালত আমাদেরকে এক নৌকায় উঠিয়ে দিয়েছে। তুমি যার সন্ধানে বেরিয়েছ- সে এখান থেকে হাজার মাইল দূরে সোমনাথ মন্দিরে তোমার অপেক্ষা করছে। যতদিন ওরা 'পূজারী হত্যা

প্রতিশোধ' ভুলে না যাচ্ছে, ততদিন তুমি ওদিকটায় যেতে পারছ না। তবে হতাশ হলেও হতোদ্যম হয়ো না কভু। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি- তোমার স্থলে খোদ আমিই সোমনাথ যাব। চেষ্টা করব রূপাবতিকে উদ্ধার করতে। যদি কামিয়াব না হই তবে এতোটুকু কমপক্ষে উপলব্ধি করা যাবে- তোমার সফলতা বিফলতার খতিয়ান কতটুকু হতে পারে। অবশ্য আমার পরিস্থিতি ভিন্ন ধরনের। আমার চারপাশে অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। আমি এমন এক মনজিলের পথযাত্রী, যার গন্তব্য জানা নেই। হায়! যদি জানতে পারতাম- শকুন্তলা কোথায়? জয়কৃষ্ণের ভয়ে ও কনৌজ সীমান্ত পাড়ি দিলো কিনা, কে জানে? ও যেখানেই থাকুক না কেন সেখান থেকে উপলব্ধি করছে- জনপদের পরিস্থিতি। আমি কোনক্রমে হৃত মহল পুনরুদ্ধার করতে পারলে ওর সন্ধান পাব। আমার যদ্দুর বিশ্বাস- জীবিত থাকলে ও অবশ্যই জনপদে ফিরে আসবে। অবশ্য স্বার্থোদ্ধারে জয়কৃষ্ণের মিত্র ও কায়েমী সর্দারদের সূক্ষ্ম চালে পরাভূত করতে হবে। আমার এ কল্পনা এক পাগলের ভ্রান্তি বিলাস মাত্র। কনৌজের নতুন প্রশাসন জয়কৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষক। এ মুহূর্তে সেই শক্তিই কেবল জয়কৃষ্ণকে পরাভূত করতে পারে, যে শক্তি পারবে নয়া প্রশাসনকে পরাভূত করতে। তোমাকে আজ একটি বিশেষ কথা বলতে চাই, যা আমার আত্মার চিৎকার ও অনুভূতির আওয়াজ। কথাটি শুনলে উপলব্ধি করতে পারবে, আমার মত লোককে বন্ধু ও ভাই হিসাবে গ্রহণ করে তুমি ভুল করেছ। আমার জিন্দেগীর শেষ ভরসা মাহমুদ গজনবী।'

রণবীর এ পর্যন্ত বলে থামলো। ভাবলো, রামনাথ গোস্বাভরে উঠে তার গলা টিপে দিতে আসবে। কিন্তু রামনাথকে এত মিনানের সাথে শুয়ে থাকতে দেখে সে বললো, 'আমি কিছুদিন ধরে ভাবছি- তিনি অবশ্যই তার মিশন নিয়ে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বেন। কুদরত যে মহান উদ্দেশ্যে তাকে ভারত বর্ষে প্রেরণ করেছেন- তা পরিপূর্ণ হবেই। জলন্ধরের রাজা যে হালত সৃষ্টি করেছেন, তাতে আমি একীন করে বলতে পারছি না যে, আমার ফরিয়াদ তাকে প্রভাবিত করবে। কিন্তু তার ফৌজে আব্দুল ওয়াহিদের মত মহান লোক এখনও আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস- তিনি আমাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। বলতে পার, আমি জন্মভূমির সাথে গাদ্দারী করছি, কিন্তু আমার অন্তর পরিশীলিত। জন্মভূমির খেদমত এরচে' বড় আর কি হতে পারে যে, জয়কৃষ্ণের মত কুলাঙ্গার থেকে ভারত ভূমি পবিত্র হবে? বলতে পার, আমি সমাজের দুশমন। কিন্তু সমাজের ভোজভাজি, জারিজুরি ও খোলস আমার কাছে এ মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সমাজের কর্ণধাররা সমাজটাকে উত্তরাধিকার সম্পত্তি মনে করছে। তাই একে ভাগ করে নিয়েছে- নীতিজ্ঞানহীন হরিজন ও ব্রাহ্মণগণ।'

'রামনাথ! আমি মাহমুদ গজনবীর পথে চলতে চাই। এ পথে চললে শকুন্তলাকে অবশ্যই খুঁজে পাব। এরপর সোমনাথে গিয়ে তোমার রূপাকে উদ্ধার করব। শকুন্তলার সন্ধান আমাকে নিরাশ করলেও সোমনাথের পথ আমি ভুলব না। অবশ্য এক্ষণে আমাকে তোমার সঙ্গ না দিলেও চলবে।'

রামনাথ শুয়ে থাকতে পারলো না। রণবীরের হৃদয়স্পর্শী কথা শোনার পর সে উঠে বসে বললো, 'হায়! তুমি যদি জানতে তোমার জবান আমার অন্তরের কথা বলছে! মাহমুদ শুধু তোমার নয় বরং আখেরী ভরসা আমারও। মৃত্যু বিভীষিকায় আমি আপাততঃ সোমনাথ যাওয়া মুলতবি রেখেছি। জীবনের প্রতি আমার আকর্ষণ বেশ পূর্বেই ফুরিয়ে গেছে। সোমনাথের যে সব পূজারী আমাকে একবার দেখেছে, দ্বিতীয়বার দেখেই তারা আমায় চিনে ফেলবে। আমার শংকা অন্য একটা। ভাবছি, রূপাবতি সে মেয়ে নয় যে, সানন্দে সোমনাথবাসিনী হয়েছে। ও স্বেচ্ছায় ফিরে আসতে পারছে না। জন্মের পূর্বে তাকে সোমনাথের জন্য মানত করা হয়েছিলো। পূজারীদের অনুমতি ছাড়া ভারতবর্ষের তামাম মহারাজারা মিলে ওকে বের করতে চাইলেও সফলকাম হবে বলে মনে হয় না। রূপাবতি ও আমার মাঝে সোমনাথের পাষাণ প্রাচীর আর নিষ্ঠুর পুরোহিতদের অনুমতি বাঁধার দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বপ্ন দেখেছিলাম- কোনদিন সেনাপতি হয়ে পুরোহিতদের সামনে স্বর্ণ রৌপ্যের স্তূপ রেখে বিনিময়ে রূপাকে চাইব। কিন্তু এক্ষণে আমার আখেরী ভরসা হচ্ছে, কুদরতের অজানা হস্তক্ষেপ আর তার অলৌকিক শক্তি। তুমি যেদিন অসিতের কাহিনী শুনাচ্ছিলে, সেদিন ভেবেছিলাম- দিগ্বীজয়ী সুলতান মাহমুদকে সৎপথ প্রদর্শনকারী কুদরতের রোখ অবশ্যই সোমনাথমুখী হবে। সোমনাথমুখী হবে তার বিজয়ী অশ্ব বহর। রণবীর! জীবন চলার রাস্তায় তুমি নিঃস্ব মুসাফির নও। তোমার সহযাত্রী আমিও।'

ভাগীরথির তীরে

নন্দনা পতনের পর তারালোচন পাল তার অবশিষ্ট বিধ্বস্ত ফৌজ নিয়ে শ্যলক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলো। সুলতান মাহমুদের ফৌজ কনৌজের নয়া প্রশাসনের খবর শুনে জলন্ধর ও গোলালিয়র মহারাজাদের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করতে দক্ষিণমুখী হলো। ঝড়ের বেগে উপনীত হলেন দিগ্বীজয়ী সুলতান ভাগীরথির তীরে। সুলতানের পূর্বেই তারালোচন পাল* নদীর তীরে উপনীত হয়েছিলো।

শ্যলক পাহাড় থেকে ভাগীরথির দূরপাল্লার পথে বেশ কিছু সর্দার সদলবলে তারালোচন পালের সাথে সঙ্গ দিয়েছিলো। এতদসত্ত্বেও এ সৈন্যবলে সে সুলতানের সাথে টক্কর দিতে স্বস্তি পাচ্ছিল না। এক্ষণে দুশমন ও তাদের মাঝে বাঁধা ছিল খরস্রোতা ভাগীরথি নদী। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো, কোন রকম সমস্যার মুখে না পড়ে দীর্ঘদিন আটকে রাখা যাবে সুলতানের গতি। দরিয়ার অনতি দূরে এ অভিপ্রায়ে সে ছাউনী ফেললো। তারালোচন পাল তার মিত্র শক্তিদের কাছে ফরমান পাঠালো- দুশমনের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার এটাই সবচে' উন্নত জায়গা। নদী পাড়ি দেয়ার হিম্মত করলে আমাদের সুচতুর তীরন্দাজ ও হস্তি বাহিনী রয়েছে। ভগ্নোৎসাহ হয়ে ওরা পিছু হটলে সে ক্ষেত্রে বিজয় আমাদের। সুলতানের পরাজয়ে গোটা দেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যাবে। বাড়বে আমাদের প্রতি সকলের আত্মবিশ্বাস। তারালোচন পালের অসম আত্মবিশ্বাসের আরেকটি কারণ, সুলতান মাহমুদের ফৌজ দেশে বিদেশে বিক্ষিপ্ত ছিল। তার ধারণায় সুলতান ঐসব ফৌজের আগমনের অপেক্ষা করবেন। তারালোচন পালের সাথে বিশ হাজার সৈন্য ও শ' তিনে'ক হাতি ছিলো। এ সৈন্যরাই সুলতানের অগ্রযাত্রা রোধ করতে যথেষ্ঠ।

সফেদ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সুলতান মাহমুদ একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে ভাগীরথির ওপারে নযর করছিলেন। টিলার পাদদেশে তাঁর সৈন্য বহর কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়ানো ছিল। সুলতানের ফৌজ ডানে, বামে ও পিছনে দূরত্ব বজায় রেখে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। সুলতান তাদের সমর নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। সুলতানের যে কোন নির্দেশ ফৌজী অফিসাররা মুহূর্তেই প্রতিটি সৈন্যের কানে পৌছে দিচ্ছিলেন। জানবায আট হাজার সৈন্য খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিতে সুলতানের নির্দেশের অপেক্ষা করছিলো।

তারালোচন পালের ফৌজ কখনও কখনও নদী পার হয়ে মুসলিম সেপাইদের দরিয়া পার হবার আহবান জানিয়ে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যেত। সুলতান মাহমুদের

দীপ্তিময় মুখে ফুটে উঠতো মুচকি হাসি। উপলব্ধি করত সৈন্যরা- এটা বিজয়ের পূর্বাভাস। শান্ত, স্থির তাঁর চেহারা। দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস ছড়ানো সে চেহারায়।

খরস্রোতা নদীর রাগ, যে তরঙ্গের সৃষ্টি করতো- আত্মবিশ্বাসী সুলতানের প্রশান্ত চেহারা দর্শনে তা স্থির হয়ে যেত। পাহাড়সম দৃঢ়তা, সাগরসম হিম্মত আর জলপ্রপাতের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ মঞ্জুরীর মত ছিল তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বা।

বিগত তিন বছরের যুদ্ধে নদীর গভীরতা, পাহাড়ের উচ্চতা আর বিস্তীর্ণ মরুর মত তিনি দুশমনের সামনে এক লৌহ মানবের পরিচয় দিয়েছেন। পঞ্চাশোর্ধ এ মহা মানবের চেহারায় ছিলো সমুদ্রের ভাব গাম্ভীর্যতা, যার সামনে এসে স্তিমিত হয়ে যেত পাহাড়সম ঢেউঝুটি। তাঁর গতি আর দৃষ্টির প্রখরতায় ছিলো বাঘের ক্ষিপ্রতা ও তীক্ষ্ণতা।

তারালোচন পাল জানতে পারলো, অনাগত কোন এক রাতে সুলতানের ফৌজ ভাগীরথি পাড়ি দিবে।

সুলতান মাহমুদ এক অফিসারকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'আমরা জোহর পড়ে নদী পাড়ি দিব।' বিদ্যুৎ বেগে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সৈন্যদের মাঝে।

॥ দুই ॥

দুশমনের উপর হামলা কল্পে সুলতানের নির্দেশের তোয়াক্কা না করে তীরন্দাজ বাহিনীর জনা আষ্টেক লোক বয়ার সাহায্যে নদী পাড়ি দিলো। তারালোচন পালের টহলদার সৈন্যরা তীর বৃষ্টি শুরু করলো। এদের প্রতি সুলতান মাহমুদের বীরত্বের যতটা সমীহ ছিল, ততটা ছিলো তার কঠোরতা নির্দেশ অমান্যের। কিন্তু এক্ষণে তিনি নিজকে সংযত করলেন। নিকটস্থ অফিসারদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'অগ্রসর হও! বয়ার সাহায্যে তোমরা নদী পাড়ি দাও। অন্যদের বলো, ঘোড়া পার করতে, সুলতান টিলা থেকে নেমে লাইফবয় নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিজেও।

যে আটজন সর্বপ্রথম লাইফবয় নিয়ে নদীতে নেমেছিলো, তারা পড়ে গেল দুশমনের তীরের আওতায়। আচানক ওপারের টিলা থেকে বেড়িয়ে এলো দু'সওয়ার। বেশভূষায় তাদের মনে হচ্ছিল হিন্দু ফৌজ। মুসলিম সৈন্যের উপর তীর বর্ষণ না করে আগন্তুকদ্বয় হিন্দু সৈন্যদের লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগলো। ওদের তীরের আঘাতে পাঁচ হিন্দু মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে গেল। পিছু হটলো বাদ বাকীরা। নিরস্ত্র যারা ঘোরাফেরা করছিলো, সাথীদের করুণ পরিণতি দেখে তারা উর্ধ্বশ্বাসে শিবিরের দিকে পালালো। নদী সাঁতরে ঐ আট তীরন্দাজ তীরে উঠে হিন্দী মদদগারদের কাছে এসে দাঁড়ালো। তন্মধ্যে একজন তার টুপি এক আগন্তুকের হাতে দিয়ে ভাঙ্গা ফারসী ও হিন্দী ভাষায় বললো, 'তোমরা কারা জানি না। তবে

আমরা তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমাদের ফৌজ তোমাদের দেখে ভুল করে না বসে সে জন্যে পাগড়ী না দিয়ে তোমাকে টুপি দিলাম।'

এক তীরন্দাজ তার কথার সমর্থন করলো। সেও দিলো তার টুপি দ্বিতীয় সওয়ারকে।

দু'সওয়ারের একজন রণবীর, অন্যজন রামনাথ। টুপি পড়ে ওরা নদী সাঁতরে আসা ফৌজদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। রামনাথ তার সাথীর প্রতি লক্ষ্য করে বললো, 'ভগবানের দোহাই! এরা মানুষ নয়, অবতার। আজ থেকে কেউ যদি আমাকে বলে, খেয়া ছাড়া বিশাল এক সৈন্য বহর নদী পার হয়েছে. তাতে আমি আশ্চর্যান্বিত হব না।'

উপকূলে ঘন বৃক্ষের আড়ালে ঘোড়ার খুর ধ্বনি, হাতির গর্জন আর সৈন্যদের আর্তচিৎকার এ সংবাদ বহন করছিলো- অগ্রবর্তী তীরন্দাজদের পাল্লায় পড়েছে হিন্দু ফৌজ। বেশ কিছু সেপাই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো। পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে শিকারের আশায় রইলো কেউ কেউ। লম্ফন কুর্দন করে তিনটি হাতি অগ্রসর হলো। একটি হাতি পাথরের আড়ালে বসা তীরন্দাজের কাছে পৌঁছালো। মুসলিম সেপাইরা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পিছু হটলো। কিন্তু অগ্রবর্তী তিনজন স্থানচ্যুত হবার সুযোগ পেল না। এদের তীরে যখম হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো কালো রংয়ের একটি হাতি। পাগলের মত শুঁড় উঁচিয়ে তেড়ে আসলো হাতিটি। পাথরের আড়াল থেকে এক সৈন্য তলোয়ার উঁচিয়ে হাতির সামনে এসে দাঁড়ালো। তার মৃত্যু অবধারিত দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে রণবীর অগ্রসর হলো। হামলা করলো বীর বিক্রমে। রণবীরের নিক্ষিপ্ত নেযা গেঁথে গেলো হাতির শুঁড়ে। গগন বিদারী চিৎকার দিয়ে আহত হাতি রণবীরের দিকে তেড়ে এলো। চকিতে ঘোড়ার মোড় ঘুরানোর কোশেশ করলো ও। পারল না। ঘোড়া মুখ থুবড়ে পড়লো পাথুরে জমীনে। রণবীর পাথরের আড়ালে চলে গেল। স্থানটি অবশ্য নিরাপদ নয়। ফোঁস ফোঁস করতে করতে হাতিটি এগিয়ে এলো। রামনাথ তার সাহায্যে অগ্রসর হতে চাইলো। কিন্তু তার পূর্বেই এক মুসলিম সৈন্য তরবারী দ্বারা হাতির শুঁড় কেটে ফেললো। রামনাথের একটি তীর তার সাথে সাথে সাঁ করে এসে আহত হাতির চোখে বিঁধলো। উর্দ্ধশ্বাসে পালালো দৈত্যাকৃতির হাতিটি। দেখাদেখি অপর দু'টি হাতিও অনুসরণ করলো প্রথমটির।

তারালোচন পালের ফৌজে তিন শ'র মত হাতি ছিলো। কিন্তু সর্বপ্রথম সে সারিবদ্ধ সৈন্যের মাধ্যমে আক্রমণ শানাল। সুলতানের গোটা ফৌজ নদী পার হলো। হাতির পাল দূরত্ব বজায় রেখে বিক্ষিপ্ত করে রেখেছিলো হিন্দু বাহিনী।

সুলতানের ফৌজ ঝটিকা আক্রমণ করলো। সুলতানের নেতৃত্বে আফগান ও তুর্কী ফৌজ টর্নেডো গতিতে দুশমনের কাতার ছিন্নভিন্ন করে একেবারে পিছে গেলেন।

কাতারের পর কাতারে পাকা আমের মত টুস্‌টাস্‌ করে পড়ছিলো হিন্দু সৈন্যদের মাথা। প্রতিটি হাতির হাওদায় দু'জন তীরন্দাজ বসা ছিল। রণবীর ও রামনাথ হিন্দী ভাষাভাষী মুসলিম ফৌজদের সাথে থেকে যুদ্ধ করতে লাগলো। দূর্ভেদ্য প্রাচীরের মত এগুচ্ছিল হিন্দু ফৌজের হাতি বহর। তাদেরকে সহজে পশ্চাৎমুখী করা সম্ভবপর ছিল না। মুসলিম সৈন্যরা তীর বর্ষণ করতে করতে নদীর তীরে পিছু হটলো। সিপাহসালার ডান বামের সৈন্যদের নদীর তীর ছাফ করে দিতে বললেন। হাতির মাহুতরা এ দৃশ্য অবলোকন করে হাতির মোড় ওদিকে ঘোরাল। আচানক সুলতান বেশ কিছু সৈন্য নিয়ে ঝটিকা বেগে পাশ দিয়ে হস্তি বাহিনীর উপর আক্রমণ শানালেন। মামুলি প্রতিরোধে তারা হস্তি বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দিলেন। এরপর হিন্দী ফৌজদের তিন দিক দিয়ে ঘিরে হাতিগুলোকে নদীর তীরে হাঁকিয়ে দিলেন।

রণবীর তাকালো সালারের দিকে। খুশিতে তার চেহারা ঝিলিক দিয়ে উঠল। সালারের নাম আব্দুল ওয়াহিদ। ঘোড়ায় পদাঘাত করে রণবীর সালারের কাছে ছুটে এলো। ধনুকের তীর তূণীরে ঢুকিয়ে আব্দুল ওয়াহিদ রণবীরের পিছু চাপড়ে বললেন, 'দোস্ত আমার। আমি তোমাকে পূর্বেই দেখেছি।'

ময়দান লাশে লাশে স্তূপ হয়ে গেল। তারালোচন পাল মারাত্মক যখম হয়ে রণে ভঙ্গ দিল। দখল করলো সুলতানের ফৌজ তারালোচনের ব্যূহ। এ যুদ্ধে যুদ্ধলব্ধ মালের ফিরিস্তিতে ছিলো দু'শ' হাতি।

॥ তিন ॥

রণাঙ্গন ফাঁকা। দূরে চিল শকুন ছেঁড়া-কাটা লাশ নিয়ে কামড়া কামড়ি করছিলো। যুদ্ধ শেষে সুলতান মাহমুদের ইমামতিতে মুসলিম ফৌজ আছরের নামায আদায় করলো। অনতিদূরে এক বৃক্ষের নীচে বসে এ স্বর্গীয় দৃশ্য উপভোগ করছিলো রণবীর ও রামনাথ। নামায শেষে আব্দুল ওয়াহিদ তাদের কাছে আসলেন। রণবীর রামনাথের পরিচয় করালো। রামনাথ সংক্ষেপে তার কাহিনী বলে গেল। আব্দুল ওয়াহিদ রণবীরকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। আব্দুল ওয়াহিদ বিঘত খানেক স্থান সাফ্‌ করে তরবারীর অগ্রভাগ দিয়ে কয়েকটা রেখা টেনে বললেন, 'এ হচ্ছে কনৌজের নকশা। এখন বলো, তোমরা বাড়ি কোন গ্রামে?'

রণবীর নকশার উপর আঙ্গুল রেখে বললো, 'ঠিক এখানে।'

আব্দুল ওয়াহিদ বললেন, 'স্থানটি চলার পথ থেকে দূরে নয়। সন্ধ্যার পূর্বে মহামান্য সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলে তোমাদের কোন সুসংবাদ হয়তো শোনাতে পারব। মোট কথা তোমরা নিশ্চিত হতে পার। এ অভিযান শেষে আমাদের পরবর্তী গতিপথ তোমাদের জনপদ।'

আব্দুল ওয়াহিদের একনিষ্ঠ দরদমাখা বুদ্ধিদীপ্ত কণ্ঠ রণবীরকে প্রভাবিত করলো। এরপর আব্দুল ওয়াহিদ রামনাথকে লক্ষ্য করে বললেন, 'সুলতান মাহমুদ তোমার দ্বারা কাজ নিতে চেষ্টা করবেন। কনৌজ, জলন্ধর ও গোয়ালিয়রের ফৌজী কুওৎ নিয়ে তিনি প্রশ্ন করবেন। তার প্রশ্নের উত্তর দেয়া নীতি বিরুদ্ধ মনে করলে দিবে না। আর হ্যাঁ, সুলতান এমন লোক নন, যিনি তোমাকে উত্তর দিতে বাধ্য করবেন। খোদার দোহাই, তুমি তাঁকে কোন গলদ জওয়াব দিও না। কেননা সুলতানের দূরদর্শীতা তোমার চে' বেশি। রণবীরের দোস্ত বলে তোমার কাছে এ অনুরোধ রাখছি।'

'রণবীরের দোস্ত হিসাবে আপনাদের ভাগ্য তরীতে সওয়ার হয়েছি আমিও। তবে একটি শংকা আমাকে পীড়া দিচ্ছে, আমার স্পষ্টবাদীতায় সুলতান না আবার মনোক্ষুণ্ন হন। মনে করুন! যদি তাকে বলি, আপনাদের এক সৈন্যের মোকাবেলায় জলন্ধরের রাজা দশজন সৈন্য সমবেত করতে পারেন। সুলতান যদি কনৌজ অভিমুখে মার্চ করেন, তাহলে জয়ের বদলে পরাজয়ের তিলক ললাটে এঁকে ফিরতে হবে। এমন কথা বললে না জানি কতক্ষণ জিন্দা থাকতে পারব।'

আব্দুল ওয়াহিদ হাসলেন। খানিক থেমে বললেন, 'এ ব্যাপারে পেরেশান হয়ো না। তোমাকে বলেছি, তোমার দূরদর্শিতার চে' তাঁর দূরদর্শিতা অনেক বেশি। 'একের স্থলে দশ' সুলতানকে ভগ্নোৎসাহ করবে না। শিকারের আশায় বাজপাখী পেখম মেললে কবুতর ও চড়ুই পাখির সংখ্যাধিক্যে সে ভয় পায় না। মাফ কর! হিন্দু ফৌজদের আমি তুচ্ছ মনে করছি না। দেখছি না রাজপুতদের বীরত্বকে খাটো করে। আমাদের বিজয় রহস্য এ যুগের তামাম সমরনীতির চেয়ে ভিন্নতর। তলোয়ারের ক্ষিপ্রতা আর বাযুর শক্তির স্থলে আমরা আত্মিক শক্তিকে বিজয়ের পূর্বশর্ত মনে করি। ইসলাম আমাদের বিজয়ের সূতিকাগার। শক্তির প্রাণবিন্দু। যতক্ষণ আমাদের মাকছাদ চক্ষুস্খলিত না হচ্ছে, ততোক্ষণ বিজয় আমাদের পিছু ছাড়বে না। গতকাল যারা আমাদের পথে বাঁধার দেয়াল হয়ে দাঁড়াত- আজ তারা আমাদের জানবাজ সেপাই। কে বলেছে, আগামীকাল জলন্ধর ও গোয়ালিয়র ফৌজ আমাদের পতাকাতলে সমবেত হবে না?'

আব্দুল ওয়াহিদের আলাপচারিতার মাঝে বেশ কিছু ফৌজী অফিসার এসে জড়ো হয়েছিলেন। এক তুর্কী জেনারেল কয়েকজন অফিসারের সাথে কথা বলতে বলতে এগিয়ে এলেন। আব্দুল ওয়াহিদ তাঁকে আসতে দেখে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন। তুর্কী জেনারেল ভূমিকা ছাড়াই বলে উঠলেন, 'আপনাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে তালাশ করছি। জানতে পারলাম, দু'জন হিন্দী সওয়ার আমাদের আগে নদী সাঁতরানো আট সেপাইকে শত্রুর তীর থেকে বাঁচিয়েছে। তন্মধ্যে একজন আমাকে

হাতির পদতলে পিষ্ঠ হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে। আপনি নিশ্চয় ওদের সংবাদ জেনে থাকবেন! আমি ওদের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।' আচানক রণবীরের প্রতি তার দৃষ্টি পড়লে তিনি বললেন, 'আমার দৃষ্টি ভুল করে না থাকলে তুমিই সেই নওজোয়ান।'

তুর্কী জেনারেল রণবীরের জবাবের অপেক্ষা না করে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবেগভরে মুসাফাহা করে বললেন, 'তোমার সঙ্গী ইনিও?' অফিসার বললেন, 'আমি ধারণা করেছিলাম, আমাদের আসার পূর্বে আপনি ওদের নদী পার করে দিয়েছেন।'

আব্দুল ওয়াহিদ জবাব দিলেন, 'এরা আমার ফৌজি সেনা নয়। ওদের একজন এসেছে কনৌজ থেকে। আরেকজন গোয়ালিয়রের। পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার হয়ে ওরা দু'জন আমাদের বন্ধুত্ব গ্রহণ করেছে।'

'তাইলে তো কৃতজ্ঞতার মাত্রাটা আরো বাড়াতে হবে।' তুর্কী জেনারেল রামনাথের সাথে পূনরায় মুসাফাহা করে শিবিরে চলে যান।

'আমি আসছি' বলে আব্দুল ওয়াহিদ জেনারেলের পিছু নিলেন।

॥ চার ॥

পরের দিন। রামনাথ ও রণবীর সুলতান মাহমুদের তাঁবুর সামনে দন্ডায়মান। গত রাতে আব্দুল ওয়াহিদ ওদের বলেছিলেন, প্রত্যুষে পদস্থ অফিসারদের সাথে বৈঠক করার পর সুলতানে মোয়াজ্জম তোমাদের ডেকে পাঠাবেন। করবেন মত বিনিময়।

রণবীর ও রামনাথ দীর্ঘক্ষণ তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো। বৈঠক শেষ হলে অফিসারগণ যে যার তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এক অফিসার ওদের কাছে এসে বললেন- সুলতান তোমাদের কিছুক্ষণের মধ্যে ডেকে পাঠালেন। আব্দুল ওয়াহিদ তাঁর সাথে কথা বলছেন এখনও।

রণবীর তুর্কি জেনারেলের সাথে কথা বলছিলো। ইত্যবসরে আব্দুল ওয়াহিদ বের হয়ে বললেন, 'তোমরা এবার আসতে পার।'

আব্দুল ওয়াহিদের সাথে রামনাথ ও রণবীর সুলতানের তাঁবুতে প্রবেশ করলো। সুলতান মাহমুদ তাঁবুর মধ্যে দাঁড়ানো ছিলেন। লিখছিলো এক মুন্সী তাঁর নির্দেশ মত লাভ-লোকসানের খতিয়ান। হিন্দুস্তানী নিয়মনীতি মাফিক ওরা দু'জন মাথা নীচু করে দাঁড়ালো। আব্দুল ওয়াহিদ ফারসী ভাষায় বললেন, 'আলীজাহ! ওদের দু'জন যথাক্রমে রণবীর ও রামনাথ। ওদের কথা আপনার কাছে পূর্বে আরজ করেছিলাম।'

সুলতান মাহমুদ রণবীরের দিকে ইশারা করে বললেন, 'এ বুঝি সেই নওজোয়ান, নন্দনার কেল্লায় বন্দি ছিল যে?'

'হ্যাঁ! আলীজাহ!' আব্দুল ওয়াহিদ জবাব দিলেন। 'বন্দীদশায় ও ফারসী ভাষা রপ্ত করেছে।'

সুলতান এবার সরাসরি রণবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নওজোয়ান! আমি তোমার আদ্যোপান্ত কাহিনী শুনেছি। তোমার বোনের অন্বেষা এক্ষণে আমার জিম্মায় ফরয।'

সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে রণবীর তাকালো মহামান্য সুলতানের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার দিকে। অতঃপর মাথা নীচু করে অনুচ্চ স্বরে বললো, 'আলীজাহ! আপনার থেকে এই-ই আশা করেছিলাম।'

আব্দুল ওয়াহিদকে লক্ষ্য করে মাহমুদ গজনবী বলেন, 'আব্দুল ওয়াহিদ! অভিযান শেষ করে জলদি আমাদের সাথে মিলিত হবার একীন থাকলে তুমি আজই রওয়ানা হয়ে যাও। বাদবাকী ফৌজ অচিরেই পৌছে যাবে। এবার আমাদের টার্গেট হবে কনৌজ।'

'আলীজাহ! আপনার অপেক্ষায় আমি পথ চেয়ে থাকব।' সবিনয় বললো আব্দুল ওয়াহিদ।

রামনাথকে লক্ষ্য করে সুলতান বললেন, 'কিন্তু তোমার সমস্যার সমাধান কি?'

রামনাথকে নিশ্চুপ দেখে আব্দুল ওয়াহিদ দোভাষী হয়ে সুলতানকে বললেন, 'আলীজাহ! এখানে উপনীত হবার পূর্বে এ নওজোয়ান গোয়ালিয়র ফৌজের পদস্থ অফিসার ছিল। সোমনাথের পূজারীরা ওর বাবাকে কতল করেছে। প্রতিশোধবশতঃ ও এক পূজারীকে হত্যা করেছিলো। দেবতাদের সরেজমীনে এক পূজারীকে কতল করার দরুন তামাম হিন্দু ওর দুশমন হয়ে গেছে।'

'সোমনাথ' শব্দটি শুনে সুলতান মাহমুদ ভ্রু-কুঞ্চিত করে রামনাথের দিকে তাকান। খানিক ভেবে ওকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি সোমনাথ মন্দির দেখেছ কি?'

'না মহারাজ, আমাদের জনপদ গোয়ালিয়রের রাজার আওতাধীন। সোমনাথ মন্দিরের ট্যাক্স অনাদায়ে পূজারীরা আমার বাবাকে হত্যা করেছে।'

'শুনেছি, তামাম মহারাজদেরও একটা হারে ঐ মন্দিরে ট্যাক্স দিতে হয়। মন্দিরের জায়গীর কি গোটা ভারত জুড়ে?'

'হ্যাঁ মহারাজ! সোমনাথ শুধু একটা মন্দির নয়। একটি সালতানাৎ। হিন্দুস্থানের সবচেয়ে বিশাল সালতানাৎ। সোমনাথ পূজারীরা তামাম রাজা-মহারাজাদের থেকে ট্যাক্স উসূল করে থাকে। মাথা নীচু করে থাকে রাজা- মহারাজাগণ তাদের সম্মুখে।'

'তার কারণ?' সুলতান প্রশ্ন করেন।

'কারণ, সোমনাথ পুরোহিতদের ধনবল, জনবল আছে। আর ধন-জনকে পূজা করতে শিখিয়েছেন তারা।'

সুলতান মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, 'শুনেছি, সোমনাথ মন্দিরের দেবতাগণ অন্যান্য রাজা মহারাজাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন বিধায় আমি দেশের পর দেশ জয় করে ফিরছি?'

'হ্যাঁ আলীজাহ! সোমনাথ রোখ করলে বিজয়ের বদলে পরাজয়ের শ্লাঘা নিয়ে আপনাকে ফিরতে হবে, শুনেছেন বোধহয় তাও।'

'এমনও একটি গুজব শুনেছি। অবশ্য এটা ওদের ভীতির লক্ষণ। এমন তো নয়, আমার থেকে ওরা দূরে থাকতে চায়?'

'আলীজাহ! যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটি কথা বলি।'

'বলো।'

'পুরোহিতদের আত্মবিশ্বাসের কারণ শুধু এটা নয়। তারা আত্মশক্তিতে অন্ধ হয়ে সোমনাথকে দুর্ভেদ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য মনে করে। তাদের বিশ্বাস, সোমনাথ আক্রান্ত হলে গঙ্গা-যমুনার অববাহিকা থেকে দক্ষিণ হিন্দুস্থানের গোটা রাজা-রাজপুত ও সর্দারগণ মন্দির রক্ষাকল্পে সমবেত হবে। দেবতাদের বদৌলতে সোমনাথের চার দেয়ালের মাঝে থেকে লাখো হিন্দু সন্তান জীবনপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।'

'সেদিন হবে নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তির ওপর ওদের আস্থাভাজনের শেষ দিন। সেদিন সোমনাথের পাষাণ গাত্র থেকে ওরা এক ও অদ্বিতীয় খোদাকে চিনে 'হরিবলের' স্থলে 'নারায়ে তাকবীর' ধ্বনি দিবে। সোমনাথ মন্দির পৌত্তলিক তমসার আখেরী ঠিকানা। সে তমসাকে বগলদাবা করে আমার বিরুদ্ধে আদা নুন খেয়ে নামবে ওরা। কিন্তু স্তব্ধ করতে পারবে না আমার গতি। আমি সেদিনটির জন্য জিন্দা থাকতে চাই। সেদিনটি সম্ভবতঃ খুব দূরে নয়।'

সুলতান কথা বলছিলেন রামনাথকে লক্ষ্য করে, কিন্তু তাঁর বিড়বিড় স্বগোতক্তি শুনে মনে হচ্ছিলো, তিনি বুঝি আত্মার সাথে কথা বলছেন। তাই এক্ষণে ভাষান্তরের জরুরত মনে করলেন না আব্দুল ওয়াহিদ।

'সোমনাথ মন্দির পৌত্তলিক সমাজের আশা ভরসার স্থল। সোমনাথ কুফর শিরকের শেষ ঘাঁটি।'

সুলতান আনমনে বারবার আওড়াচ্ছিলেন কথাটি।

আব্দুল ওয়াহিদকে লক্ষ্য করে সুলতান বলেন, 'আব্দুল ওয়াহিদ! তোমরা যেতে পার। আর হ্যাঁ। নওজোয়ানদের প্রতি খেয়াল রেখ। ওরা আমাদের রাজকীয় মেহমান।'

খিমা থেকে বেরিয়ে রণবীর বললো, 'আপনি কোন্ অভিযানে যাচ্ছেন?'

'কেন তুমি জান না। ন্যাকামি করছ তুমি?' আব্দুল ওয়াহিদ মুচকি হেসে বলেন।

'আপনার কথার মতলব হচ্ছে, আপনি ......?'

'হ্যাঁ।' আব্দুল ওয়াহিদ ওর কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'তোমাদের জনপদে যাচ্ছি।'

রণবীরের প্রত্যাবর্তন

সূর্যোদয়ের সময় রাখাল তার পশুপাল আর কৃষকরা হাল ছেড়ে দিয়ে পলায়ন করতে লাগলো। ওরা শুনতে পেল- জংগলের দিক থেকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে বিশাল এক ফৌজ।

খানিক পর। রণবীর, আব্দুল ওয়াহিদ ও শ'পাঁচে'ক সৈন্য গাঁয়ে প্রবেশ করলো। লড়াই না করে পলায়নের সিদ্ধান্ত নিলো জয়কৃষ্ণের বুযদিল ফৌজ। রক্তপাত ছাড়া রণবীর দখল করে নিলো জনপদ। জনপদের কৃষক ও দিন মজুররা দরজায় খিল এঁটে কাঁপছিলো। ভাগছিলো কেউ কেউ যেদিক পারলো সেদিক। রণবীরকে তন্মধ্যে অনেকে চিনতে পারলো। রণবীর ওদের সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'তোমাদের কোন ভয় নেই। জয়কৃষ্ণের মত জালিমকে শায়েস্তা করতে এসেছি। তোমরা গিয়ে আওয়ামকে পলায়ন থেকে বিরত রাখ্।'

হামলাবাজ ফৌজ এবার মহলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হোল। মহলের পাহারাদাররা 'মাহমুদ গজনবীর ফৌজ আসছে' শুনে সিংহভাগই গা ঢাকা দিল। প্রভুভক্ত বেশ কিছু পাহারাদার মহল রক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু দেয়াল টপকে মুসলিম ফৌজ উঠানে প্রবেশ করতেই লড়াই বৃথা ভেবে তারা অস্ত্র সমর্পণ করলো। আব্দুল ওয়াহিদ অন্য ফৌজদের চৌহদ্দীর বাইরে রেখে রণবীর ও রামনাথসহ অন্দরে প্রবেশ করলেন। ভীত সন্ত্রস্থ পাহারাদারদের লক্ষ্য করে বললেন, 'অস্ত্র সমর্পনের পর তোমরা আমাদের আশ্রয়ে। ওয়াদা করছি- তোমাদের ওপর কঠোরতা করা হবে না। বলো, তোমাদের সর্দার কৈ? আমরা শুধু তাকে দেখতে চাই।'

'সর্দার নেই। এখান থেকে ৮/১০ ক্রোশ দূরে তিনি জমি দেখতে গিয়েছেন।

আব্দুল ওয়াহিদ রণবীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পেরেশান হয়ো না।'

রণবীর পাহারাদারদের লক্ষ্য করে বললো, 'মহলে কে কে আছে?'

'সর্দারের মেয়ে ও স্ত্রী ছাড়া স্রেফ দু'নওকর।'

'আমি আসছি' বলে রণবীর খাস কামরার দিকে চলে গেল। আব্দুল ওয়াহিদ হাতের ইশারায় রামনাথ ও সেপাইকে ওর পিছু নিতে বললো।

নীচতলায় লোকজনের টিকিটি নেই। দ্বিতলে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ। রণবীর কড়া নাড়লো। ওপাশ থেকে কোন শব্দ পাওয়া গেল না। বাধ্য হলো দরজা ভাঙ্গতে। সেপাইরা দরাম দরাম করে দরজার ওপর আঘাত করতে লাগল। আচানক ছিটকিনি

খোলার আওয়াজ কানে এলো। খুলে গেল চন্দন কাঠের বিশাল কপাট। রণবীর দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। ওকে অনুসরণ করলো রামনাথসহ বাকি তিন সৈন্য। দ্বিতলের সুদৃশ্য ডান পার্শ্বস্থ কক্ষটি বন্ধ। রণবীর কপাট থাবড়াতে থাবড়াতে বললো, 'দরজা খোল! অন্যথায় ভাঙ্গতে বাধ্য হব।'

আচানক ওপাশে শোনা গেল নারী কণ্ঠের চিৎকার, 'কি করছো নির্মলা? ভগবানের দোহাই, এমনটি করো না খুকি! হামলাবাজদের কাছে লাঞ্ছিত হতে চাও?'

'না, না!' অন্য এক নারীকণ্ঠে ঝংকৃত হলো এ কথা। 'ওরা স্রেফ আমার লাশ ছুঁতে পারবে। আমাকে ছাড়ো! মরতে দাও!'

'নির্মলা! হুঁশ রেখে কাজ কর খুকি! ভগবানের দিকে তাকিয়ে অমন মহাপাপ করতে যাসনে।'

রণবীরের নির্দেশে সেপাইরা দরজা ভেঙ্গে ফেললো। প্রবেশ করলো সকলে ঝড়ের বেগে। উপলব্ধি করতে পারলো, চিৎকার ও দরজা না খোলার কারণ। দরজার অনতিদূরে এক যুবতীকে টানা হেঁচড়া করছিলো তিন মহিলা। রণবীর প্রবেশ করতেই যুবতী তার একটি বাহু ছাড়িয়ে নিল। কামরায় নেমে এলো রাজ্যের নিস্তব্ধতা। যুবতী নীচে লাফ দিতে চেষ্টা করছিলো। রণবীরের পেশীবহুল হাতের চাপে সে হার মানলো।

রণবীর বললো, 'মহলের চার দেয়ালের মধ্যে নারীদের কোন ভয় নেই। তোমরা সকলকে জয়কৃষ্ণ মনে করো না।'

যুবতী মাথা উঁচিয়ে রণবীরের দিতে তাকালো। বললো, 'তুমি?' আহত কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর। 'রণবীর?'

'হ্যাঁ!' রণবীর ওকে ছেড়ে দিয়ে জবাব দিলো।

বৃদ্ধা এক মহিলা এসে বললো, ভগবানের দোহাই! আমাদের উপর রহম কর। আমার খুকি তোমাদের কোন ক্ষতি করেনি। মাফ করতে না পারলে আমাদের কচুকাটা কর। তবুও নেড়ে মুসলমানদের হাতে সমর্পন করো না।

'তোমরা আমার আশ্রয়ে। তোমাদের ভয় নেই। আমার অনুমতি ছাড়া নারী মহলে কেউ প্রবেশ করবে না।' রণবীর একথা বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

ভাগীরথির যুদ্ধে তারালোচন পালের শোচনীয় পরাজয় ও কনৌজে পানে সুলতান মাহমুদের অগ্রযাত্রার খবর বিদ্যুৎ বেগে ভারতের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ল। জয়কৃষ্ণের জায়গীর থেকে ৮ ক্রোশ দূরে জনপদের সর্দার ও পুরোহিতগণ বৈঠকে বসলো। তারা আত্মরক্ষার জন্য রাজা মহাশয়ের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাল।

সর্দার-পুরোহিতদের এ বৈঠক মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। পুরোহিতগণ বললেন, 'সর্দারগণ তাদের অধীনস্থ সেপাইদের তিন ভাগে ভাগ করবেন। একাংশ মন্দির রক্ষায় পাঠাবেন। একাংশ জনপদ হেফাজতের কাজে নিয়োজিত রাখবেন। রাজমহলে পাঠাবেন বাকি অংশ।'

জয়কৃষ্ণ এ সিদ্ধান্তে ভেটো দিয়ে বললো, 'এভাবে বিক্ষিপ্ত করায় আমাদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। ক'জন সৈন্য রাজমহলে পাঠালে চলবে। বাদবাকি সৈন্যদের উত্তর সীমান্ত রক্ষা করতে জলদি অগ্রসর হতে হবে। মন্দির ও জনপদ নিয়ে কাউকে চিন্তা করতে হবে না। সীমান্ত রক্ষা করতে পারলে জনপদ ও মন্দির রক্ষা পাবে। ঈশ্বর না করুন! সীমান্ত পেরিয়ে দুশমন জনপদে প্রবেশ করলে উপায় নেই। দুশমন অনুপ্রবেশের একমাত্র পথ হচ্ছে উত্তর সীমান্ত।'

এক বৃদ্ধ সর্দার দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার জায়গীর সীমান্ত কাছাকাছি বলে আপনি এ পরামর্শ দিচ্ছেন। আপনার খায়েশ হচ্ছে, মন্দির ও আমাদের ঘরদোর ছেড়ে কেবল আপনার জনপদ রক্ষার্থে এগিয়ে যাই, এই তো? আমরা জানি, দুশমনের লক্ষ্য হচ্ছে কনৌজ ও রাচীর এলাকা। আমাদের জনপদ ওদের ছাউনী থেকে বহু দূরে। কনৌজ ও রাচী হেফাজতের জন্য আমাদের তামাম ফৌজ রাজার সাহায্যে পাঠানো হোক। রাজা মহাশয়ের রাজ্য ঠিক থাকলে আমাদের মন্দির ও জনপদের কোনই ক্ষতি হবে না। তার পরাজয় ঘটলে কারো রক্ষা নেই। অতএব, কালবিলম্ব না করে গোটা ফৌজ রাজধানীতে পাঠানো হোক।'

জয়কৃষ্ণ গোস্বা কম্পিত কণ্ঠে বললো, 'তোমরা কেউ আমাকে কাপুরুষত্বের ধিক্কার দিতে পার না। ভাবতে পার না আমার চেয়ে কাউকে রাজার ওফাদার। গোটা ফৌজ রাজধানীতে প্রেরণের পূর্বে আমি জানতে চাই, দুশমনের রোখ কোথায়? যদি জানতে পার- দুশমন ফৌজ কনৌজ ও রাচীর দিকে ধাবিত হচ্ছে তখন উত্তর সীমান্তে ফৌজ জড়ো করার যৌক্তিকতা নেই। সেমতাবস্থায় ঐ রাজ্য দু'টিতে সৈন্য পাঠাতে হবে। আমার যদ্দুর ধারণা, দুশমন কনৌজাভিমুখী হয়ে থাকলে রাজা মহাশয় চুপচাপ বসে নেই। গোয়ালিয়র ও জলন্ধরে ফৌজ এতোক্ষণে তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে এসে থাকবে।'

বৃদ্ধ সর্দার দাঁড়িয়ে বললেন, 'অপেক্ষা করার কি আছে? কেন ভাবছেন, দুশমন এদিকে রোখ করবে? সর্দার মোহন চাঁদ পুত্রের ভয় আপনার অন্তর থেকে এখনো মুছেনি?'

কয়েকজন সর্দার এ কথায় হেসে লুটোপুটি খেলেন। বৈঠকে সিংহভাগ লোক এমন ছিলো- যারা জয়কৃষ্ণের হয়ে এ কুটিল হাসির প্রতিশোধ নিতে পারত। অন্য সময় হলে জয়কৃষ্ণ ঠিকই প্রতিহিংসায় পিশাচ হয়ে যেতো, কিন্তু এক্ষণে পরিবেশ

পরিস্থিতি ভিন্ন থাকায় নিজকে বড্ড কষ্ট করে সংযত করলো। কারো ওপর প্রতিশোধ নেয়ার পূর্বে সে প্রতিপক্ষের গালি গালাজ হজম করত। বৃদ্ধ সর্দার এমন এক প্রভাবশালী লোক, গোটা জনপদবাসী যার ইশারায় সাগরে ঝাঁপ দিতেও ইতস্ততঃ করে না। সুতরাং নীরবে তার কথা হজম করা ছাড়া জয়কৃষ্ণের আর কোন পথ রইলো না।

শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে সে বললো, 'বয়সে আপনি আমার চেয়ে বড়। এজন্য আপনার দেয়া গালি হজম করছি। কিন্তু গোটা ফৌজ নিয়ে রাজার সাহায্যে রাজধানীভিমুখী হলে আমাকে আপনাদের চেয়ে অগ্রগামীই পাবেন।

আচানক পাশের কোথাও থেকে সমবেত অশ্বের খুরধ্বনি ভেসে এলো। সচকিত কর্ণ খাড়া হলো সকলের। ভয়কাতুরে দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকালো। দরজা পেরিয়ে ৮ সওয়ার মন্দির চত্বরে এসে দাঁড়ালো। জয়কৃষ্ণের চিনতে ভুল হলো না। এরা সবাই তার নওকর। পেয়ার লাল সর্বাগ্রে। ঘোড়ার জিন কষে অগ্রসর হয়ে সে বললো, 'মহারাজ! মহারাজ! দুঃসংবাদ! মুসলিম ফৌজ আমাদের জনপদ কব্জা করে নিয়েছে। রণবীর তাদের পথ প্রদর্শক।'

বৈঠকে পীন্ পতন নীরবতা। শুরুহলো খানিক পর মৃদু গুঞ্জরণ। সকলে সওয়ারদের কাছে জমায়েত হলো। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠ মন্দির চত্বরে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করলো- ওরা কখন এসেছে? সংখ্যায় কত? তোমরা নিজ চোখে দেখে এসেছে ওদের? কেউ তোমাদেরকে বোধহয় ভুয়া খবর দিয়েছে। এটা সম্ভব নয়।

এদিকে পেয়ার লাল এদের জওয়াব না দিয়ে বুলন্দ আওয়াজে বললো, 'আপনারা আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন? ওরা কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে এসে পৌছুবে। কাউকে জিন্দা ছাড়বে না। ওদের ফৌজ অগণিত। পার্শ্ববর্তী গোটা বস্তি খালি হয়ে গেছে। এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলও ওদের দখলে চলে যাবে।'

স্থানুর মত দাঁড়িয়ে ছিলো জয়কৃষ্ণ। পাংশু বর্ণ হয়ে গেল তার চেহারা। বৈঠক ভঙ্গ দিয়ে সর্দারগণ কেটে পড়লো। ঘোড়া থেকে নেমে পেয়ার লাল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। প্রভুর বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'মহারাজ! আপনার জান বাঁচান! রণবীর ওদের সাথে আছে। স্বচক্ষে ওকে দেখেছি। মহল ওর কব্জায় চলে গেছে। মহারাজ! জলদি। সময় নেই।'

॥ তিন ॥

দিবাভাগের তৃতীয় প্রহর। শ'দেড়েক সেপাই মহলের দেউড়িতে এসে দাঁড়ালো। জনপদের কৃষকরা রণবীরকে এক নজর দেখতে মহলে এসে ভীড় জমালো। আব্দুল ওয়াহিদের সাথে রণবীর দেউড়ী থেকে বের হলো। ওকে দেখা

মাত্রই পুরানো ভৃত্যরা এসে ওর পায়ে পড়লো সে। এদের মধ্যে ঐ নওজোয়ানও ছিল, যে ক'দিন পূর্বে ওর জান বাঁচিয়ে ছিলো। দৌড়ে রণবীরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মোহন চাঁদের অন্তরঙ্গ ক'জন বন্ধু শকুন্তলার প্রতিশোধ জয়কৃষ্ণের মেয়ে ও স্ত্রীর ওপর নিতে বললো।

'জয়কৃষ্ণের প্রতিশোধ তার অবলা স্ত্রী ও মেয়ের উপর নিতে পারি না' বলে রণবীর তাদের নিবারণ করলো। 'অসহায় নারীর উপর হাত উঠাতে পরামর্শ দানকারীদের আমি বন্ধু মনে করি না। ওরা এক্ষণে আমার আশ্রয়ে। ওদের ইজ্জত আবরু রক্ষা করা আমার নৈতিক দায়িত্ব।'

আব্দুল ওয়াহিদ বললেন, 'দোস্ত আমার। আমার কাজ শেষ। কালবিলম্ব না করে আমি ফিরে যেতে চাই। ভাবছিলাম, দেহরক্ষী হিসাবে বেশ কিছু সৈন্য রেখে যাব। কিন্তু এর প্রয়োজন দেখছি না। পার্শ্ববর্তী সর্দারগণ তোমার পতাকাতলে সমবেত হবে বলে আমার বিশ্বাস। তাদের বলো, অভিযান শেষে সুলতান মাহমুদ সদলবলে চলে গেছেন। যারা আমাদের সাথে মিত্রসুলভ আচরণ করবে, তারা আমাদের মিত্র। যাবার পূর্বক্ষণে নছিহত ছলে বলি- ঘাতক শত্রুকে ক্ষমা করো। ক্ষমা ও উদারতা প্রতিশোধ নেয়ার চেয়ে উত্তম। তোমার সাথে পুনরায় মিলিত হবার খায়েশ রেখে বিদায় নিচ্ছি।'

রণবীরের সাথে মোসাফাহা শেষ করে আব্দুল ওয়াহিদ রামনাথের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন; 'রামনাথ! তোমাদের বাড়ী এখান থেকে বেশ দূরে। আমি ভুলিনি তোমার সফলতা পথের অন্তরায়গুলো। নিরাশ হয়ো না। সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষা করতে থাক।

খানিক পর। আব্দুল ওয়াহিদ ও তার সঙ্গীরা দক্ষিণের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। দেখলো রণবীর ও রামনাথ সওয়ারদের ঘোড়ার খুর থেকে জন্ম নেয়া দিগন্ত প্রসারী ধূলি মেঘ। গাঁয়ের লোকজন কানাকানি করছিল, 'উনি মানুষ নন, বোধহয় কোন অবতার হবেন।'

॥ চার ॥

আব্দুল ওয়াহিদের ধারণা ফলপ্রসূ হলো। কিছুদিনের মধ্যে জনপদের সর্দার ও রাখালেরা রণবীরের পতাকাতলে সমবেত হলো। জনপদে ছড়িয়ে পড়লো- সুলতান মাহমুদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে রণবীর। এখন সে সব লোক নিরাপদ থাকবে, যারা রণবীরের কাছে ভালো বলে পরিগণিত হবে। এ জন্য রণবীরকে নিরাপত্তার চাবিকাঠি ভেবে তার বন্ধুত্ব গ্রহণের জন্য জনতার মাঝে প্রতিযোগিতা লেগে গেল। ধিক্কার দিতে লাগলো সকলে জয়কৃষ্ণকে। রণবীরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে বেশ কিছু সর্দার জয়কৃষ্ণকে ধরিয়ে দিতে পুরস্কার ঘোষণা করলো। নেমে পড়লো অনেকে শকুন্তলার খোঁজে।

জয়কৃষ্ণের সাথে বন্ধুত্বের দরুন যাদের কুখ্যাতি ছিলো, তারা রণবীরের থেকে কোন প্রকার ফায়দা লাভের আকাংখী ছিলো না। ওরা জীবনের মায়ায় সীমান্ত পাড়ি দিয়ে অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিলো। রণবীরের দবরারে যারা আসতো সকলকেই সে হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানাত। কিন্তু রামনাথের সাথে নিভৃতে মিলিত হলে সে বলতো, 'রামনাথ! কারো ওপর আমার আক্রোশ নেই। এরা সকলে সূর্য দেবতার পূজারী। বাবাকে আমার হত্যা করেছে এরাই। আমার মুসিবতের দিনে ওরা আমার সন্ধানে গোটা জংগল আঁতি-পাতি করে ফিরেছে। অথচ ওরা আজ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। জয়কৃষ্ণ তার চালে মার খেয়েছে। বিজয়ের সোনার হরিণ আমার পদচুম্বন করছে।'

শকুন্তলার চিন্তায় রণবীরের জীবন হতাশায় ভরে যায়। প্রতি ভোরে কিছু সওয়ার নিয়ে সে দূর-বহুদূরে বিচরণ করে শকুন্তলার খোঁজ করতো। সন্ধ্যার দিকে নিরাশ হয়ে ফিরে মনকে সান্ত্বনা দিত- শকুন্তলা আমার বিজয় কাহিনী শুনে অবশ্যই ফিরে আসবে। হতে পারে আজ ফিরে দেখব- দরজায় অভ্যর্থনা জানাতে ও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মহলে প্রবেশ করে ওর দিল ব্যথায় মুষড়ে পড়তো। প্রত্যহ ওর মহলে দু'চারজন মেহমান হয়ে আসত। মেহমানরা সমবেদনা জানাতে ভুল করতো না। সাহস দিত- আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব, যাতে আপনি শকুন্তলাকে খুঁজে পান।

জয়কৃষ্ণের মেয়ের সাথে ওর ব্যবহার জনপদবাসীর ধারণার বিপরীত ছিলো। হামলার দিন ছাড়া নির্মলার সাথে রণবীর আর দেখা করেনি। বসবাসের জন্য দ্বিতলটি ওদের জন্য ছেড়ে দিয়েছিল। কোন নওকরের জন্য উপরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। নীচতলায় দু'টি কামরায় রণবীর ও রামনাথ বাস করত। কামরায় আসা যাওয়ার জন্য ওরা প্রশস্ত উঠানের পথে না এসে খিড়কী পথে আসত। উঠানের সদর দরজা সচরাচর বন্ধ থাকত। ওদের ব্যবহারের দু'টি কামরা ছাড়া নির্মলা ও তার মায়ের জন্য মহলের বাকি কামরা সোপর্দ করেছিলো। ছেড়ে দিয়েছিল মেহমান খানাও।

আট দিন পর। দিনভর বিচরণ শেষে রণবীর ক্লান্ত নাশিতে মহলে ফিরে এলো। দেখলো প্রধান ফটকে এক সন্যাসী দাঁড়ানো। সন্যাসীটি শম্ভুনাথ। রণবীর কম্পিত হৃদয়ের অনুভূতি সংযত করে বললো, 'শকুন্তলার কোন সংবাদ মিললো?'

করুণ মুখে শম্ভুনাথ রণবীরের দিকে তাকালো। জবাব না দিয়ে সে মাথা নীচু করলো।

॥ পাঁচ ॥

'আমার বাবা কোথায়? মা ও আমার পরিণতি কি হবে?' নির্মলা সর্বদা এ প্রশ্নের জবাব খুঁজত। ওর সামনে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে আসত। রণবীরের পৌরুষদীপ্ত চেহারা ওর কল্পনায় ভেসে ওঠলে আশার ঝলক দেখত। নারীসুলভ

অনুভূতিতে রণবীরকে প্রথম দিন দেখেই সে অনুমান করেছিলো-এটা কোন চোরের চেহারা নয়। রণবীরের পরিচয় পেয়ে সেদিন ওর পেরেশানী শংকায় রূপ নিয়েছিলো। নেহায়েৎ পেরেশানীর হালতেও সে চিন্তা করেছিলো- তার বাবা ওর বাবাকে কতল করলে প্রতিশোধটা আমার উপর এসে পড়বে। আজ সে অনুধাবন করতে পারল-এটা প্রতিহিংসার অনলে দগ্ধ মানুষের প্রতিচ্ছবি নয়। জীবন যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত সওয়া বিপর্যস্ত এ মনুষ্যমূর্তি এক অসহায় নারীর ওপর হাত উঠাতে পারে না। রণবীর তার দৃষ্টিতে এক অভিজাত ও আত্মসম্ভ্রমবোধ সম্পন্ন প্রিয় শত্রু।

ও যখন গ্রেপ্তার হয়েছিলো, তখন সে বাবার কাছে ওর জীবন ভিক্ষা চেয়ে ছিলো। আর যখন ওকে কতল করতে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, জিন্দেগীতে সেই প্রথম ওড়না মুখে দিয়ে ফোঁপানো ক্রন্দন থামাতে ব্যপৃত হয়েছিলো। পিতার দুশমন হিসেবে নয় বরং একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে কাছ থেকে রণবীরকে দেখতে নির্মলার মন আকুলি বিকুলি করত। বধ্যভূমি থেকে রণবীর ফেরার হওয়ায় পিতার নেহাৎ পেরেশানী সত্ত্বেও খুশী হয়েছিলো সে। জয়কৃষ্ণের লোকজন যখন ওর সন্ধানে পাগলের মত ঘুরে বেড়াত, তখন মহলের কোণায় বসে ভগবানের মূর্তির সামনে জোড়হাত করে ওর নিরাপত্তার দোয়া করত। পরের দিন জানতে পেরেছিলো, তার প্রার্থনা ভগবান কবুল করেছেন। রণবীর ফেরার হয়েছে। চিরতরে চলে গেছে ও। আর ফিরবে না কোন দিন জনপদে। নির্মলা চাইত, ও আর না আসুক। এতদসত্ত্বেও অসম্ভব একটা মায়াবী রেখা তার হৃদয় রাজ্যে যে অংকিত হয়েছিলো, তা এতোদিন উপলব্ধি হয়নি। ঐ রেখা কখনও হৃদয়ের গভীর খাদে তোলপাড় করে ফিরত। কেমন একটা মায়া, একটা টান সৃষ্টি হয় ওর উপর। একে বুঝি ভালবাসা বলে? ও ভাবত, হায়! রণবীর যদি মোহন চাঁদের পুত্র না হত। আহা! ওর জীবনে যদি ঘাত-প্রতিঘাত না আসত। তাহলে ওকে একান্ত নিজের করে পেতাম।

ওর মা বলতেন-

'বোনের প্রতিশোধে রণবীর সর্বদা আমাদের বন্দী রাখবে। রণবীর জানে, আমাদের উদ্ধারে তোমার বাবা ওর কাছে আসবে। সে ক্ষেত্রে তোমার বাবার উপর পিতৃ হত্যার বদলা নিতে ভুল করবেনা।'

কিন্তু নির্মলার অনুভূতি মায়ের চেয়ে ভিন্নতর। ও একথা মানতে রাজী ছিলো- জয়কৃষ্ণকে রণবীর কোনদিন ক্ষমা করবে না। কিন্তু এ কথা মানতে আদৌ রাজী ছিলো না-পিতৃহত্যার আক্রোশে তার অসহায় মেয়ে ও স্ত্রীর উপর বদলা নিবে ও। ও ভাবত- রণবীরের দৃষ্টিতে তারা ইজ্জতের বস্তু না হলেও কমপক্ষে অনুকম্পার বস্তু। স্রেফ দু'টি কামরা ছাড়া গোটা মহল তাদেরকে সোপর্দ করা হয়েছে। প্রয়োজন মত নওকর পাঠিয়ে খবরাখবর নিয়েছে। দু'চারদিন পর দ্বিতলে এসে চাকরানীর মাধ্যমে

জানতে চেয়েছে, কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? খানা পিনার জন্য যে সব আইটেম পাঠাত, তা তাদের ধারণাতীত ছিলো। মহলের এক কোণে জয়কৃষ্ণের খাজানা রক্ষিত ছিলো। সেদিকে এ যাবত নযর দেয়নি ও।

পরিবেশ পরিস্থিতি নির্মলাকে অনুধাবন করাত-তার সাথে রণবীরের সম্পর্ক দুশমনীর। কিন্তু নেহায়েৎ প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলা সত্ত্বেও রণবীর তার আভিজাত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে বিমুখ হবে না। কোমল হৃদয়ের অধিকারী হিসেবে রণবীরের দয়ার্দ্র হৃদয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলো নির্মলা। কিন্তু জয়কৃষ্ণের মেয়ে হিসেবে দুশমনের বিজয় তার কাম্য নয়। এ ধরনের লোকের নৈকট্য অর্জনে নেহায়েৎ বীতশ্রদ্ধ ভাবের উদয় হত, বাবার চরম আঘাতে দুঃসহ হয়ে সে পালাতে চাইতো। গোয়ালিয়রে ওর মামা বাড়ি। ওর বাবা সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন হয়ত। কখনও কখনও ভাবত-মাকে নিয়ে মামা বাড়ী চলে যাবে। রণবীর তাতে বাধ সাধবে বলে মনে হয় না। বাবার অন্তর্ধানে ও বোধ হয় আমাদের দুধ-কলা দিয়ে পুষছে।

একরাতে নির্মলা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলো। প্রত্যুষে চাকরাণীর মাধ্যমে অলংকারের একটি থলি রণবীরের কাছে পাঠিয়ে দিল। এ সেই অলংকারাদি ক'দিন পূর্বে গভীর রাতে রণবীর যা তার কাছে রেখে গিয়েছিলো।

চাকরাণী রণবীরের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রত্যাবর্তন করার পর নির্মলাকে বললো-

'রণবীর বাবু অলংকার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন উপহার দেয়া বস্তু ফিরিয়ে নেয়ার অভ্যাস নেই আমার। পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন-'ভগবানের দিকে তাকিয়ে আমায় আর জ্বালাতন করোনা তো!'

এই প্রথম নির্মলা অনুভব করলো রণবীর তার ধারণার চেয়েও মহান। সেই মানুষটির জন্য ওর হৃদয় নদীর মহীসোপানে প্রেমের বান উছলে ওঠলো। ওকি মানুষ, না অবতার?'

নির্মলার মা স্বামীর বিরহ আর মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তায় আধমরা হয়ে গেলেন। রণবীরের নিকট থেকে তিনি কোন প্রকার ভালো ব্যবহারের আশাবাদী ছিলেন না। তার দৃষ্টিতে রণবীর কেবল স্বামীর রক্তপিপাসু দুশমন নয় বরং হিন্দু সমাজের কুলাঙ্গার ও। তাঁর আখেরী ভরসা ছিলো- স্বামী দেবতা অবশ্যই পরাজয়ের ধকল কাটিয়ে ওঠে পার্শ্ববর্তী রাজার সাহায্যে মহল উদ্ধার করবেন। এ জন্য তিনি জিন্দেগীর প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় মুসলিম ফৌজের পরাজয় কামনায় দেবতার সামনে নতজানু থাকতেন। আস্তে আস্তে মায়ের সমমনা হয়ে গেল নির্মলাও। রণবীর স্বধর্মের দুশমন, বিদ্রোহী, কুলাঙ্গার। ভারত মাতার দুশমন হিসেবে ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরযোগ্য।

একদিন নির্মলার মা কঠিন জ্বরে বিছানায় পড়ে যান। মেয়ের মাথায় স্নেহার্দ্র হাত বুলিয়ে বলেন-'খুকী! আমি নিশ্চিত, মুসলিমদের পরাজয় অনিবার্য। তোমার বাবা রাজার সাহায্য নিয়ে মহলের দরজায় করাঘাত করবেন। কিন্তু হায়! মোহন চাঁদের পুত্রের শোচনীয় পরিণাম দেখার জন্য সেদিন আমি বেঁচে থাকবো কি?'

'না মা, না!' নির্মলা মায়ের তপ্ত ললাটে হাত রেখে বললো, 'অমন কথা মুখে আনবেন না। আপনি জলদি সেরে উঠবেন!

মা বললেন, 'খুকি! ভেবে দেখেছ, তোমার বাবা দুশমনের কব্জায় রেখে গিয়ে কেমন আত্মসম্ভ্রমবোধহীনতার পরিচয় দিয়েছেন, তবে তিনি একা এত লোকের সাথে লড়াই করতে সক্ষম নন। আমাদের এক্ষণে ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া উপায় নেই।'

জনৈকা চাকরানী হন্ত দন্ত হয়ে কামরায় দাখেল হয়ে বললো-'গেঁয়ো লোকজন মহলের বাইরে সমবেত হচ্ছে। জিন কষছে রণবীরের সেপাইরা। এক নওকর বলেছে, ওরা দূরে কোথাও কোচ করছে। তাদের সাথে যথাসাধ্য রণসাজে সজ্জিত হয়ে যাচ্ছে জনপদের সর্দারগণও। সকালে বলেছিলাম- বেশ কিছু সর্দার রণবীর বাবুর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।'

'মাগো! ভগবান বুঝি আপনার প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন! আমার যদ্দুর বিশ্বাস, মুসলিম ফৌজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। রণবীরের দাপট ধুলোয় মিশতে যাচ্ছে। ও পলায়নপর। এতোদিন যারা ওর তল্পীবাহক ছিলো, ভাগছে ওরাও।'

দ্বিতীয় চাকরানী ডাক্তার নিয়ে এসে পাগলের মত দৌড়ে প্রবেশ করে বললো, 'শুনেছেন কি, মুসলমানরা রাচী দখল করে নিয়েছে! রাচীর রাজা নিখোঁজ। মুসলিম ফৌজের পরবর্তী টার্গেট জলন্ধর। রণবীর বাবুর সাথে জনপদের সর্দারগণ মুসলিমদের সাহায্যার্থে জলন্ধর যাচ্ছেন।'

নির্মলা ও তার মা ভুত দেখার মতো চমকে উঠলো। আচানক এক চাকরানী চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'নির্মলা! নির্মলা! তোমার মা কেমন যেন করছেন।'

'মা! মা!' নির্মলা মায়ের বাযু ধরে ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু চোখ দু'টি ছাড়া তার গোটা শরীরের উপর জিন্দেগীর কোন ক্রিয়া অনুভূত হলো না। শম্ভুনাথ বিজ্ঞ ডাক্তার নিয়ে এলো। ডাক্তার বললেন- 'তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছেন।'

দশদিন পর। নির্মলার মা জিন্দেগীর আখেরী শ্বাস টানছিলেন। মুমূর্ষু মায়ের ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি অবলা মেয়ের চেহারায় নিবদ্ধ। তার উদাস চাহনি নির্মলার জন্য এক দুঃসংবাদ নিয়ে আসছিল। একটি মাত্র ঝাঁকুনি। ঠান্ডা হয়ে গেল ওর মা। মা! মা!! বলে আছড়ে পড়ল নির্মলা মৃতা মায়ের বুকে।

'মা! মা!! আমি তোমার অকাল মৃত্যুর প্রতিশোধ নিব। তোমার দুশমনদের কোন দিন ক্ষমা করবো না। ভগবানের দোহাই, দোহাই অবতারগণের।'

আরেকটি বিজয়

জলন্ধরের শাহীমহল। রাজা গেন্ডা ময়ূর সিংহাসনে উপবিষ্ট। চন্দন কাঠের বিশাল টেবিল। দু'পাশে সারিবদ্ধ চেয়ার। পার্শ্ববর্তী রাজা ও সর্দারগণের সাথে মত বিনিময় করবেন জলন্ধরের রাজা গেন্ডা। সাধারণ সর্দারদের চেয়ারে বসার সুযোগ নেই। আব্দুল ওয়াহিদ ও জনা চারেক পদস্থ অফিসার সিংহাসনের সামনে দন্ডায়মান।

দীর্ঘক্ষণ খামোশ থেকে রাজা মহাশয় দরবারে আগত লোকজনের দিকে তাকালেন। আচানক তিনি ভারী গলায় বলে উঠলেন, 'সভাসদগণ! আমি জানতে চাই, শত্রুর সাথে সন্ধির ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি?'

প্রতিবেশী রাজাদের মুখপাত্র হিসেবে গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন মত ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ! ঐ সন্ধির চেয়ে মৃত্যু আমাদের জন্য শ্রেয়। দুশমন স্রেফ আমাদের লাশ মাড়িয়ে অগ্রসর হতে পারবে। জীবন থাকতে নয়।'

আরেক রাজা বললেন, 'অন্নদাতা! দুশমন গোষ্ঠী এমন কিছু শর্তারোপ করেছে, যাতে ভারতবর্ষের কোটি মানুষকে অপমান করা হয়েছে। সেই অপমানের প্রতিশোধে আমরা গোটা দেশে দুশমন বিরোধী প্রচারণা করে সৈন্য সংগ্রহ করব। লড়ব জীবন পণ। ওদেরকে এবার শোচনীয়ভাবে পরাভূত করব, যাতে পোতাশ্রয়ের দিকে কোনদিন চোখ তুলে তাকাতে না পারে।'

এভাবে প্রত্যেক রাজা-ই যুদ্ধের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন।

এরপর এলো সর্দারদের পালা। যুদ্ধের জন্য আদানুন খেয়ে নামার প্রতিজ্ঞা করল তারাও।

জলন্ধর রাজ্যের সবচে' প্রভাবশালী সর্দার দাঁড়িয়ে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। বললেন–

'অন্নদাতা! দুশমনদের এই দুঃসাহসিকতার জবাব তলোয়ার দিয়ে দিতে হবে আমাদের। প্রয়োজন শুধু আপনার তর্জনী হেলানোর। জলন্ধরের আবাল বৃদ্ধ-বণিতা আপনার ইশারায় সাগরে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। জলন্ধরের যুদ্ধে আমরা প্রমাণ করবো-রাজপূতদের শিরার খুন এখনো ঠান্ডা হয়ে যায়নি এবং তারা উত্তর ভারতের মহারাজাদের মত আত্মসম্ভ্রমবোধহীনও নয়। যারা আমাদের জাতীয়তাবোধ ও বংশীয় কৌলিন্যকে জলাঞ্জলি দিতে চায়, হিন্দু সন্তানদের তলোয়ার তাদের জন্য একমাত্র মহৌষধ।'

রাজা গেন্ডা বলেন, 'দুশমনের সন্ধি মেনে নেয়ার পক্ষে তাহলে কেউ নেই?'

'না মহারাজ! কেউ নেই।' উপস্থিত কেউ বলে উঠলেন।

রাজা মহাশয় মুসলিম প্রতিনিধিদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা আমাদের মতামত সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবগত হয়েছ। ভারতবর্ষের দেবতাগণ তোমাদের পাপের প্রতিবিধানের জন্য যে সময়ের অপেক্ষা করছিলেন, এসে গেছে সে সময়। এক্ষণে দেবতাদের রোষানল থেকে রেহাই নেই সুলতান মাহমুদের। আমাদের পক্ষ থেকে তাকে এ সংবাদ দিও-মৃত্যু তার জন্য জলন্ধরে অপেক্ষা করছে। উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে আমাদের অসিগুলো দেবতা অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।'

আব্দুল ওয়াহিদ ফারসী ভাষায় রাজার কথা তরজমা করে সাথীদের শুনিয়ে রাজাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, 'আমি জলন্ধরের রাজাকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই-কনৌজরাজ ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিলে অগণিত আওয়াম মৃত্যুর হতে থেকে বেঁচে যেতে পারে। বালির বাঁধ পাহাড়সম জলোচ্ছাসকে রুখতে পারবে না। অচিরেই আপনারা সে জলোচ্ছাস দেখতে পাবেন, যার তোড়ে ভেসে যাবেন তুচ্ছ খড়কুটোর মত। কথার ফুলঝুড়ি দিয়ে ঐ মহান ব্যক্তিত্বের অগ্রযাত্রা রোধ করা যাবে না, যিনি দাম্ভিকের দর্পচূর্ণ করার জন্য ভারতবর্ষে আগমণ করছেন। নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তির নীচে চাপা পড়ে ইনসানিয়াত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আর্তনাদ করছে। এ সব পাথর তাঁর পদচারণায় ভূলুণ্ঠিত হবে। তিনি আসবেন, স্বাগত জানাবে তাঁকে মজলুম ও মাসুম ভারতবাসী। তাঁর চলার পথের সাহায্যকারীগণ গর্দান উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে আর বাঁধাদানকারী উড়ে যাবে মামুলি ফুঁৎকারে।'

উপস্থিত রাজাদের শোরগোল আব্দুল ওয়াহিদের বক্তৃতার উপসংহার টানতে দিল না। বেশ কয়েকজন সৈন্য তরবারী কোষ মুক্ত করে তাকে ঘিরে নিলো। রাজা মহাশয় চিৎকার দিয়ে বললেনঃ 'থাম!'

মাহফিলের পীন পতন নীরবতা ছেয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে রাজা মহাশয় আব্দুল ওয়াহিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি একজন দূত হওয়া সত্ত্বেও লাগামহীনভাবে কথা বলছো। দূতকে হত্যা করার উপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা না থাকলে তোমার দম্ভ এখনই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতাম। জলদি প্রাণ নিয়ে পলায়ন করো।'

আব্দুল ওয়াহিদ নিশ্চুপ হয়ে সঙ্গীদের নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন।

॥ দুই ॥

সম্মুখ সমরে মুসলিম বাহিনীর সাথে মুকাবিলার জন্য রাজা গেন্ডা রাজধানী ছেড়ে কয়েক ক্রোশ দূরে ছাউনি ফেললেন। তার সৈন্য সংখ্যা এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজারের মত। সওয়ার বিশ হাজার। ছয়শ' চল্লিশটি হাতি। এদিকে সুলতান মাহমুদ যমুনা পাড়ি দিয়ে দুশমনের দু'ক্রোশ দূরে তাঁবু ফেললেন।

গুপ্তচর মারফত হিন্দু সৈন্যের অসম শক্তির কথা শুনে লেবাছ পরিবর্তন করে সুলতান মাহমুদ ছদ্মবেশে কয়েকজন সর্দারের সাথে শত্রু শিবির পরিদর্শন করতে যান। সূর্যাস্তের খানিক পূর্বে অনতি দূরে একটি টিলায় দাঁড়িয়ে শত্রু শিবির অবলোকন করেন।

বিশাল সৈন্য বহরের সারি সারি তাঁবু। বিভিন্ন তাঁবুতে ঢুকে রাজা গেন্ডাকে উৎসাহিত করতে দেখলেন তিনি।

সুলতান মাহমুদ এত বিশাল ফৌজ এর পূর্বে কখনো দেখেননি। এই প্রথম তিনি অনুভব করলেন- 'গজনী থেকে আমরা বহু দূরে। চরম পরিস্থিতিতে কোন প্রকার সাহায্যের আশা করা যায় না। খোদা না করুক! পরাজয় বরণ করলে গোটা ফৌজ ধ্বংস হয়ে যাবে।'

সূর্যাস্তের পর দিক চক্রবাল হতে ভেসে আসছিল হাতির তর্জন-গর্জন, ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি, সৈন্যদের হাঁক ডাক, কাস্ ও সিঙ্গা ধ্বনি। সুলতান সঙ্গীদের নিয়ে ছাউনির দিকে রোখ করেন। কদ্দুর এসে তারা মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে ঘোড়ায় চেপে চললেন ছাউনি পানে।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে সুলতান মাহমুদ সেজদা নিপতিত হয়ে কাতর স্বরে দোয়া করছিলেন-

'প্রভু হে! আমাকে দৃঢ়পদ করো তোমার রাস্তায়। পঙ্গপাল মাফিক ফৌজ আর অগণিত দেবতা ওদের ভরসা, কিন্তু আমার ভরসা কেবল তুমিই। তোমার অসীম রহমতের উপর ভরসা করে আমি ও আমার সেপাইরা এ সুদূরে ছুটে এসেছি। দুশমনের তীর নেযার সামনে সীনা টান করে দাঁড়ানোর শক্তি দাও। তওফিক দাও তোমার গাজী ও শহীদানের রাস্তায় চলতে। জীবন মরনের রঙ্গমঞ্চে তুমিই আশা, হে মাওলায়ে কারীম!

যে কপাল সর্বদা তোমার দরবারে নিপতিত থাকে, সেই কপালকে তুমি দেবপূজারীদের সামনে নত করো না। আমরা স্রেফ সে জিন্দেগী চাই, যে জিন্দেগী কাটিয়েছেন তোমার হাবীব। আমরা কেবল সে মওত চাই, যার তামান্না করতেন তোমার নবী।'

দোয়া শেষে সুলতানের মুখ থেকে কোন কথা শোনা গেল না। শোনা গেল শুধু ফোঁপানো কান্নার করুণ সুর।

আচানক সেনা ছাউনির অনতিদূরে পাহারাদারদের শোরগোল শোনা গেলে তার কর্ণ সচকিত হয়ে ওঠে। শুনতে পান গোটা ছাউনিতে ঘুম ভাঙ্গা সৈন্যদের সম্মিলিত পদচারণ। দোয়া শেষ করে তাঁবু থেকে বেরুলেন তিনি। কিছু ফৌজী অফিসার তার তাঁবুর সম্মুখে দন্ডায়মান ছিলেন। অন্যরা সামাল দিচ্ছিলেন সমূহ পরিস্থিতি।

সুলতান মাহমুদ হুলুস্থুলের কারণ জিজ্ঞেস করলে এক অফিসার বললেন ঃ 'আচানক উত্তর ছাউনিতে মুহাফেজরা চিৎকার দেয়। সৈন্যরা ধরফর করে উঠে দাঁড়ায়। রণসঙ্গীতের নিঠুর রাগ বলছে-এক্ষণে দুশমনদের থেকে ভয় নেই। হয়তো কোন গুপ্তচর ধরা পড়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাকে সবকিছু জানানো হবে।'

সুলতান বললেন, 'আমার ঘোড়া প্রস্তুত করো।'

সুলতান মাহমুদ অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে হুলুস্থুল কেন্দ্রে ছুটলেন। কিছু দূর যেয়ে তার দৃষ্টিতে ভেসে উঠলো মশালধারী ক'জন পাহারাদার। সুলতানের এক অফিসার হাতের ইশারায় ওদের গতিরোধ করেন।

পাহারাদারদের একজন বললো, 'সুলতানে মোয়াজ্জমের কাছে যাচ্ছি।'

'সুলতান এখানে আছেন।' এক অফিসার শান্ত গলায় আওয়াজ দিলেন।

পাহারাদার বেষ্টিত হয়ে সুঠামদেহী এক বন্দী সুলতানের দিকে যেতে যেতে বললো, 'সুলতানে মোয়াজ্জম! রণবীর আমার নাম। আপনার হিন্দি অফিসার আমাকে চিনেন। ভাগীরথির যুদ্ধে আমি আপনার সকাশে হাজির হয়েছিলাম।'

'পরিচয় দিতে হবে না। কি বলতে চাও বলো।'

'আলীজাহ! আমার জনপদ থেকে পনের শ' জানবায সেপাই নিয়ে আপনার সাহায্যে ছুটে এসেছি। সন্ধ্যার দিকে আমরা একটি জঙ্গল অতিক্রমকালে অকস্মাৎ হ্রেষা ধ্বনি শুনতে পাই। সঙ্গীদের চকিত হুকুম দেই উত্তরমুখী হতে। ঘন ঝোঁপের আড়ালে জলন্ধরের একদল ফৌজ ওঁৎ পেতে ছিল। আমার ঘোড়াটি গাছে বেঁধে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ওদের দলে ভিড়লাম। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে ওরা আপনার ছাউনির পিছন দিয়ে হামলা করার ফন্দি আঁটছিল। সুদীর্ঘ জঙ্গল মাড়িয়ে নিদ্রামগ্ন আপনার ফৌজের উপর হামলা করা ছিল ওদের অভিপ্রায়। বাদবাকী ফৌজ পদব্রজে চলে আসবে সকাল নাগাদ। প্রত্যুষে চারদিক থেকে হামলা চালানো হবে। সওয়ারদের মদদ করবে পদব্রজী ফৌজ। হাতি থাকবে ওদের অগ্রে। আমি এ কথা শুনতেই আপনাকে তা জানানোর অভিপ্রায়ে ছুটে এলে দুশমন ভেবে আপনার ফৌজ

আমাকে নাজেহাল করে। আপনার পাহারাদারের বোধোদয় ঘটাতে বেশ কিছু সময় অপচয় হয়েছে। বিশ্বাস করুন মহারাজ! আমি আপনার দুশমনের গুপ্তচর নই।'

সুলতান প্রশ্ন করলেন, 'ওদের সংখ্যা কত?'

'অন্ততঃ বিশ হাজার। সওয়ার তন্মধ্যে হাজার চারে'ক। বাদবাকী পদব্রজী।' রণবীর জওয়াব দিলো।

সুলতান মাহমুদ ও রণবীরের আলাপচারিতার মধ্যে ফৌজী অফিসারগণ সমবেত হলেন। আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদকে লক্ষ্য করে সুলতান বললেন, 'হাজার আষ্টেক সৈন্য জঙ্গলে পাঠিয়ে দাও।'

বাকী ফৌজী অফিসাদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'সকাল নাগাদ শুনতে পাবেন হিন্দু রাজা তার এরাদা পরিবর্তন করেছে। এতদসত্ত্বেও আমরা তাদের শায়েস্তা না করে ফিরছি না। দুশমনরা হামলা না করলেও আবু আবদুল্লাহর সফল ঝটিকা হামলা থেকে জন্ম নেয়া বিধর্মীদের হতোদ্যম থেকে আমরা ফায়দা লুফতে পারি। আব্দুল ওয়াহিদ! কিছু সৈন্য নিয়ে তুমি দুশমনদের ছাউনি পানে রোখ করো এবং আমার আগমন বার্তা দিয়ে ওদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করো।'

খানিকপর। আবু আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার এবং তিন হাজার পদব্রজী সৈন্য পূর্বমুখী হলো। রণবীর ওদের রাহবার। কদ্দুর যাওয়ার পর রণবীর আবু আবদুল্লাহকে বললো, 'আমার যা ধারণা, দুশমনের ছাউনি এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়।'

আবু আব্দুল্লাহ তামাম ফৌজকে জড়ো হতে নির্দেশ দেন। সালারকে খেতাব করে বলেন, 'সতর্কতার সাথে অগ্রসর হও! ডান, বাম ও অগ্রে হামলা করে আমরা ওদের পশ্চাতে পৌছাতে চাই। রণবীরের কথা যথার্থ হলে ভোরের আলো ফোটার পূর্বে দুশমন তোমাদের তীরের আওতায় এসে যাবে। তীর ও বল্লমের আচমকা আক্রমণে সে ক্ষেত্রে দিশেহারা হয়ে পড়বে ওরা। পিছু না হটে দুশমনরা তেড়ে আসলে এক দল তাদের রুখতে অগ্রসর হবে।'

॥ তিন ॥

পূর্ব দিগন্তে সুবহে সাদিকের সিতারা উদিত হলো। রাজা গেন্ডা সোনা ও মণি-মানিক্য খচিত হাওদায় বসে দেখছিলেন হিন্দু ফৌজের শান-শওকত। তার অগ্র-পশ্চাৎ ও ডান-বামে ছিল ঘোড়া- হাতির বিশাল সারি। ছিল পদব্রজী সৈন্যের সমরনীতি মাফিক দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ানো প্রলম্বিত কাতার। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে রণ সঙ্গিত বাজাতে ব্যপৃত ছিল ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতের একদল।

'ভগবান কি জয়', 'দেবতা কি জয়', 'জয় মহারাজ কি'- রবে মহাশূন্য প্রকম্পিত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল হিন্দুস্তানের তামাম কুওৎ নিয়ে ওরা এবার এসেছে। রাজা মহাশয় মুচকি হাসির পরিধি বাড়িয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর দিয়ে তাকাচ্ছিলেন বিশাল হাতি ও ঘোড়া বহরের দিকে। আচমকা তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, 'ভগবানের দোহাই, এ সৈন্য বলে বলিয়ান হয়ে নেড়ে দুশমনদের হালাক করতে পৃথিবীর অপর প্রান্তে পৌঁছতে পারবো।'

'মহারাজ কি জয়'- হিন্দু সন্তানদের গলাফাটা রব পাথুরে জমীনে ধ্বণিত প্রতিধ্বনিত হলো।

জনৈক সর্দার ঘোড়া ছুটিয়ে রাজা মহাশয়ের সন্নিকটে এসে বললো, 'মহারাজ! অগ্রসর হোন। আঁধার কেটে আলোর ছটা বেড়িয়ে আসতে খুব একটা দেরী নেই।'

'না! রাজকুমার যাবত না আসছে তাবৎ আমরা অগ্রসর হবো না। চূড়ান্ত হামলার পূর্বে সাঁপের লেজে হামলা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সাঁপকে সচকিত করার পূর্বে ঘাড় মটকে দিতে চাই। মনে রেখো, আমরা আচমকা হামলা চালাবো। ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে পারবে না দুশমন।'

হাতির হাওদায় চড়া এক তীরন্দাজ চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'মহারাজ দেখুন। রাজকুমারের পয়গাম নিয়ে বোধহয় কেউ এদিকে আসছে।'

রুদ্ধশ্বাসে রাজা তাকিয়ে রইলেন আগন্তুকের দিকে। ভোরের আলোয় বেশ কিছু সওয়ারের ক্ষীণ রেখা তার সম্মুখে প্রতিভাত হলো।

খানিক পর এক সওয়ার হস্তি বাহিনীর কাতার পেরিয়ে রাজা মহাশয়ের কাছে এসে দাঁড়ালো। এ সওয়ার ছিল জলন্ধরের ভাবী রাজা। আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে রাজার কলিজা ধক্ করে উঠলো।'

'কি হলো? তুমি একা কেন? তোমার ফৌজ কোথায়? ভগবানের দোহাই চুপ থেকো না।'

'মহারাজ!' রাজকুমার বাবার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে মুখ খুললো, জঙ্গল পেরুতেই দুশমন ফৌজ আমাদের ঘিরে নিয়েছিল। আমি উপলব্ধি করতে পারিনি-গোটা জনপদে ওদের লোকজন জালের মত বিছানো। আমার ফৌজ বুঝি একজনও জানে বাঁচেনি। ডান-বাম দিয়ে দুশমন সর্বপ্রথম আমাদের উপর চড়াও হয়। গেরিলা হামলা চালিয়ে অন্তর্ধান হয়ে যায় ঝোপের আড়ালে। আমরা ওদের তাড়া করতে জঙ্গলে প্রবেশ করলে গাছের মগডালে বসা তীরন্দাযের আওতায় পড়ি। খবরটা আপনাকে দেয়া জরুরী মনে না করলে মরণপণ লড়াই করে জীবন

উৎসর্গ দিতাম। এক্ষণে ওদের তীরন্দায বাহিনী আমাদের ঘিরে নিয়েছে। ভোরের আলো ফোটার পূর্বেই ওরা হামলা করে বসবে। এখন বোধ হয়..........।'

রাজা মশাই ভাবী রাজার কথা অসম্পূর্ণ রেখে বললেন, 'তোমার মতলব হচ্ছে, দুশমন্‌দের ছাউনি এখন খালি- তাই কাল বিলম্ব না করে হামলা করতে হবে, এই তো?'

'না! আমি দুশমনদের তীর বৃষ্টি উপেক্ষা করে ওদের ছাউনি পর্যন্ত পৌছেছিলাম। ছাউনির সামনে ওরা কাতার ঠিক করছে। আমার যদ্দুর ধারণা, ওরা সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় আছে। আর ওদের তীরন্দায বাহিনী আচমকা হামলায় আমাদের নাজেহাল করতে চাচ্ছে। এরা অগ্রবর্তী বাহিনী কি-না, তা নিয়ে বেশ সন্দেহ আছে। হতে পারে নগন্য এক দল সৈন্যের উপর হামলা করে আমাদের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করা, সব শেষে ঝটিকা বেগে সামগ্রিকভাবে হামলা চালিয়ে আমাদের পর্যুদস্ত করা ওদের মূল অভিপ্রায়। আর হ্যাঁ, ওদের ফৌজ আমাদের থেকে ঢের বেশী বলে অনুমিত হলো।'

রাজা গেন্ডার আশার বেলুন চুপসে গেল। খানিক পূর্বে সেনাগর্বে যে মনে আনন্দের তুফান উছলে উঠছিল সে মন এখন হতাশায় ভরে গেল। কিছুক্ষণ পূর্বে যিনি বিজয় আশে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন এক্ষণে তা আত্মশ্লাঘায় রূপ নিল। তার স্বপ্নের জগৎ দুমড়ে মুচড়ে গেল। শত্রু বিভিষীকায় কাঁপছিল আপাদমস্তক।

'উহ্! আমি এখন কি করবো ভগবান!' ক্ষোভ দুঃখে কপাল চাপড়ে উচ্চারণ করছিলেন তিনি।

রাজকুমার বললো, 'মহারাজ! অগ্রসর না হয়ে এক্ষণে আত্মরক্ষা করা দরকার।'

হাতির পিঠ থেকে এক তীরন্দায নেমে হাতজোর করে বললো, 'মহারাজ! আমরা পিছু হঠলে পঙ্গপালেরর মত ওরা ধেয়ে আসবে। ঝড়ের বেগে প্রবেশ করবে রাজধানীতে। এ জন্য রাজধানী রক্ষার চিন্তা করা দরকার।'

ইত্যবসরে প্রাদেশিক রাজা ও কায়েমী সর্দারগণ রাজা মাহাশয়ের কাছে এসে জড়ো হলেন। তম্মধ্যে অনেকে টর্নেডো গতিতে দুশমনের উপর ঝাপিয়ে পড়তে রায় দিলেন।। অনেকে বললেন, না-না। ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে।

ঝোপের আড়াল থেকে জনা পঞ্চাশেক তীরন্দায মাথা উঁচু করে আবার ঝোপের মধ্যে লুকালো। এক সর্দার এ দেখে রাজাকে বললেন, 'মহারাজ! দুশমনের হামলা আসন্ন। বোধহয় ওদের সৈন্য অনতিদূরে অবস্থান নিয়েছে। হাতি ছেড়ে আপনি ঘোড়ায় চড়ুন।'

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে রাজা হাতি ফেলে ঘোড়ার সওয়ার হলেন। বেশ কিছু ফৌজি অফিসারও রাজার দেখাদেখি হাতির পিঠ থেকে নেমে ঘোড়ার পিঠে

চাপলেন। ছড়িয়ে পড়লো মুহূর্তের মধ্যে গোটা ফৌজের মাঝে হতাশা। পালা বদলে গেলো সঙ্গীত ও ভজন গীতের। বংশী বাদকদের উৎসাহমুখর সুর হারিয়ে গেল হিন্দু ফৌজদের ভয়ালো চিৎকারে। হতাশাগ্রস্থ রাজার ফৌজ হতোদ্যম হয়ে গেল। তলোয়ারের ঝন্ ঝন্ আর তীরের শন্ শন্ আওয়াজের বদলে তাদের মন ধুক ধুক করছিল অদৃশ্য দুশমনের মানসিক ভীতিতে।

সূর্যের প্রভাত রশ্মিতে রণাঙ্গন থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে সুলতান মাহমুদ এই অপ্রত্যাশিত বিজয় খবর শুনেছিলেন। শুনছিলেন, বীর মুসলিম বাহিনীর একটা তীরও খরচা করতে হয়নি। তার আগেই ময়দান শূন্য। তাঁর ঠোটে দোয়া এবং চোখে কৃতজ্ঞতার আঁসু উছলে উঠছিল আল্লাহর স্মরণে। ঝংকার তুলছিল একত্ববাদীদের নারা ধ্বনি রণাঙ্গনের সর্বত্রই।

সুলতান মাহমুদ দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করতে নির্দেশ দিলেন। দুপুর পর্যন্ত জারী রইলো পলায়নরত দুশমনের পিছু তাড়া। এরপর তারা ফিরে এলেন সদলবলে ছাউনিতে। সন্ধ্যার দিকে মালে গনিমতে পাঁচশ' হাতি জমা হলো। এ বিজয়ের কিছুক্ষণ পর সুলতান মাহমুদের লশকর গজনীমুখো হলো। সুলতানের কাফেলা বন্দী হলো রণবীর ও তার জনপদ থেকে আগত সর্দারগণ। তিনি আব্দুল ওয়াহিদকে নির্দেশ দিলেন, 'হিন্দী সেপাইদের নিয়ে তুমি কনৌজাভিমুখী হও। অপেক্ষা করো ততদিন, যতদিন আমরা না আসছি।'

মায়ের মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ মহলে নির্মলার দম আটকে আসছিল। ঘৃণা ও বিদ্বেষ যত তার রণবীরের উপর। রণবীরের অনুপস্থিতিতে তার দেখা শোনার ভার ন্যস্ত ছিল শম্ভুনাথের উপর। শম্ভুনাথের আচার-আচারণ তার কানে ঝংকার তুলেছে-'তুমি এক অসহায় কয়েদী'। এক মাত্র মায়ের শেষ কৃত্যের জন্য শশ্মাণঘাটে যাওয়ার অনুমতি তাকে দেয়া হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও শম্ভুনাথ ও ক'জন নওকর তার সাথে থাকত অষ্টোপাশের মত। পরবর্তীতে নওকরদের কড়া পাহারায় কদাচ অনুমতি মিলতো মায়ের চিতায় পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে। শম্ভুনাথ যেন তার পিছে জোঁকের মতো লেগে থাকতো। এসব উটকো ঝামেলা এবং কয়েদী আচরণ তাকে ফেরারী হতে উৎসাহ দেয়।

একদিন নির্মলা চাকরানীর পোষাকে ঝুমুর পায়ে রুমঝুম করে মহল থেকে বেরুচ্ছিল। কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে শম্ভুনাথ তাকে ঠিকই চিনে ফেললো। শম্ভুনাথ হাত উঠিয়ে বললো,

'এ পোষাকে আপনি কোথ্রায় যাচ্ছেন? মতলব ভালো নয় দেখছি।'

ঘাবড়ে গেল নির্মলা। শুকনো ঠোঁট দু'টি চেটে সাহস সঞ্চার করে বললো, 'নির্মলার জন্য ওষুধ আনতে যাচ্ছি। তার প্রচন্ড জ্বর।'

শম্ভুনাথ জওয়াব দিলো, 'আপনাকে তকলিফ করতে হবেনা। ওষুধ আমি এনে দিচ্ছি।'

'গাঁয়ে আমার আর একটি কাজ আছে।'

'আমাকে গোস্তাক হতে বাধ্য করবেন না, বলে দিচ্ছি। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি, মনে করছেন কি?

নির্মলা ভয়ে কাঁপছিল বেতসপত্রের মত। ঢোক গিলে সংযত হয়ে বললোঃ 'আমি কি তোমাদের কয়েদী?'

'সরদার ফিরে না আসা পর্যন্ত অন্ততঃ তাই। আপনাকে রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব আমার উপর।'

'আমার রক্ষণাবেক্ষণ?' নির্মলা ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠে বললো,'কেন বলছ না, মৃত্যু ছাড়া আমি এ মহল থেকে বেরুতে পারব না? মনে রেখ, তোমাদের সরদারের পদস্খলনে বেশী একটা দেরী নেই।'

'উনি মহল দখল করার পর আপনি অন্য কোথাও চলে যাবার খায়েশ কখনো করেছেন কি? সরদার অনুমান করছেন-আপনি নিঃশংক আছেন। মহল ত্যাগের

মনোভাব তাকে জানালে বাধা দিতেন না তিনি কখনো। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে আমি আপনাকে যেতে দিতে পারি না।'

'বাবার দুশমন, মাতৃহন্তা, দেশ ও জাতির কুলাঙ্গারদেরকে মিত্র ভাবারচে' মৃত্যুকে ভালো মনে করি আমি।'

'আপনার এসব তেঁতো কথা আমাকে মুখ বুজে হজম করতে হবে। তিনি সর্বাবস্থায় আপনাকে সমীহ করতে বলেছেন।'

নির্মলা আর কিছু না বলে মহলে ফিরে এলো। কিন্তু তার অন্তর বলছিল-তুমি পস্তাবে। রণবীরের উপর প্রতিশোধ নিতে যেওনা।

কিন্তু মনকে প্রবোধ দিয়ে সে বললো, 'অবুঝ মন। তুমি যাই বলো না কেন, আমি ওকে দেখে নেব।'

॥ দুই ॥

একদিন চাকরানীর মাধ্যমে নির্মলা খবর পেল, রণবীর ও জনপদের সর্দারগণ প্রত্যাবর্তন করছেন। এখান থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে সুলতান মাহমুদের ফৌজ ছাউনি ফেলেছে। আরো শুনতে পেল, মাহমুদ গজনীর দলভূক্ত হয়ে রণবীর জলন্ধরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। জনপদের সর্দারগণ এক বাক্যে ওকে সর্দার মেনে নিয়েছে। আগামীকাল মুসলিম ফৌজ রওয়ানা করবে। তাদের বিদায় জানিয়ে আসবে রণবীর।

পরের দিন। চাকরানীদের সাথে ছাদে দাঁড়িয়ে নির্মলা মুসলিম সৈন্য বহরের প্রত্যাগমনের দৃশ্য অবলোকন করলো।

দুপুরের দিকে শম্ভুনাথ নির্মলার কাছে এসে বললো, 'সর্দার আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার মায়ের মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাহত। তিনি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। আপনি এজাযত দিলে তিনি দেখা করতে আসবেন।'

নির্মলা বললো, 'এক কয়েদীর সাথে দেখা করার জন্য তাকে এজাযত নিতে হবে না।'

শম্ভুনাথ চলে গেল। নির্মলা চিৎকার দিয়ে চাকরানীকে লক্ষ্য করে বললো, 'উনি এলে সরাসরি আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমার অনুমতি ছাড়া তোমরা কেউ আলাপে বিঘ্ন ঘটাবে না।'

নির্মলা কামরায় কোণে বসানো আলমারী থেকে একটি ছোরা বের করে কামিজের ভেতর লুকালো। পায়চারী করতে লাগলো বিক্ষিপ্তভাবে।

খানিক পর। আগুয়ান কারো পদশব্দে তার কর্ণ সচকিত হয়ে উঠলো। গিয়ে দাঁড়ালো পালঙ্কের গা ঘেষে। রণবীর কামরায় প্রবেশ করতেই নির্মলার আপাদমস্তকে একটা শিহরণের ঝড় সৃষ্টি হলো। রণবীর থমকে দাঁড়ালো কামরার ঠিক মাঝখানে। নির্মলার অনিন্দ্য সুন্দর চেহারার দিকে এক পলক তাকিয়ে সে মাথা নীচু করে বললো, 'আপনার মার মৃত্যু সংবাদ এই মাত্র পেলাম। আফসোস! তার শেষকৃত্যে শরীক হতে পারলাম না।'

নিরুত্তর নির্মলা। রণবীর ওর পেরেশান চেহারার দিকে তাকিয়ে খোলা জানালার কাছে এসে বাইরের প্রকৃতি দেখতে লাগলো। আচমকা ওর দিকে তাকিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বললো, 'আপনি হয়তো আমার কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না। আমি এখানে থাকলে তার জান বাঁচানোর সম্ভাব্য চেষ্টা চালাতে পিছপা হতাম না। যদিও আপনার বাবা ক্ষমার যোগ্য নয়, তাই বলে এক নারীর উপর আমার কোন ক্ষোভ ছিল বলে আপনি অভিযোগ করতে পারবেন না।'

'আপনার উপর আমার কোনই অভিযোগ নেই।' নির্মলা অশ্রুসজল নয়নে ওর দিকে তাকিয়ে বললো।

রণবীর ওর দিকে না তাকিয়েই বললো, 'এ মহল আমার দৃষ্টিতে মন্দিরসম। তাই এখানে যে কারো মৃত্যুতে আমি পীড়িত হই।'

'এ কামরায় আপনার বোন থাকতেন?'

'হ্যাঁ!' রণবীর গদ গদ কণ্ঠে উত্তর দিলো। 'সেই রাতে একথা মনে করেই এ কামরায় প্রবেশ করেছিলাম। নন্দনায় বসে ভাবছিলাম, শকুন্তলা বুঝি আমার অপেক্ষায় প্রদীপ জ্বেলে পথ চেয়ে বসে থাকে। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, শকুন্তলার প্রদীপ জ্বালানোর ভূমিকায় আপনি অবতীর্ণ হলেন কি করে? শুনেছি, শকুন্তলার অন্তর্ধানের পরও এ কামরায় দিবারাত্র প্রদীপ জ্বলে। আপনি হয়তো ওকে দেখেননি। ওর অন্তর্ধানই আমাকে সমাজের বিরুদ্ধে তলোয়ার উঠাতে বাধ্য করেছে। হায়! যদি বলতেন-ও কোথায়!'

নির্মলার দিকে না তাকিয়ে রণবীর বলে যায়। ওর দৃষ্টি আটকে ছিল ঐ বৃক্ষের উপর- শৈশবের সোনালী দিনগুলোতে বিকল্প সিঁড়ি বানিয়ে কামরায় প্রবেশ করতো যদ্দারা ও। নির্মলা ক্রমশঃ যে তার কাছে এগুচ্ছে-তা ওর অবোধগম্য ছিল না। মোহন চাঁদের পুত্র আর শকুন্তলার ভাই-এ অনুভূতি তাকে ইস্পাত কঠিন করে তোলে। এ অনুভূতিই নির্মলা ও তার মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। আত্মসম্ভ্রমবোধ সজাগ হয়ে ওঠে ওর। শকুন্তলাকে প্রাপ্তির একটা ক্ষীণ আশা ওর বুকে দানা বেধে ওঠে। তার মন বলছিল-নির্মলা অবশ্যই ওর সংবাদ

জানে। আজ কেবল এ নিয়তেই এসেছে যে, নির্মলার মন গলবে। ও বলে দিবে শকুন্তলার সংবাদ।

কথোপকথনকালে নির্মলা বুকে লুকানো ছুরির বাটে বার দুয়ে'ক হাত দিয়েছে। কিন্তু তা ঐ পর্যন্তই। যেখানের ছোরা সেখানেই রয়ে গেছে। বের করে খচ্ করে ওর পিঠে ঢুকানোর হিম্মত হয়নি। তৃতীয়বার কঠিন মনোভাব নিয়ে ছুরিতে হাত রাখতেই চকিত ঘুরে রণবীর ওর হাত ধরে ফেলে। ঠন্ করে পাষাণ মেঝেতে ছিটকে পড়ে সুতীক্ষ্ণ লৌহ পদার্থটি।

ঝুকে ছুরি উঠিয়ে ওর হাতে দিয়ে রণবীর বললো, 'আপনার হাতে আমার মৃত্যু লেখা নেই।'

নির্মলা দু'হাতে মুখ ঢেকে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো। বললো, 'হায়! আপনাকে যদি ঘাতক দুশমন ভাবতে পারতাম।'

মন্ত্রমুগ্ধ রণবীর এগিয়ে যায় পালঙ্কের কাছে। বাযু ধরে ওঠাতে চায় ওকে। কিন্তু কম্পিত হাত সংযত করে আলগোছে। সম্বিত ফিরে পেয়ে রণবীর ক'কদম দূরে সরে বলে,

'শম্ভুনাথ আমাকে বলেছিল, আপনি কোথাও যাবার মনস্থ করছেন। আপনার ভুল ধারণা ভাঙ্গাতে এতটুকু বলতে পারি-আপনি আমার কয়েদী নন। যেখানে মন চায় চলে যেতে পারেন। বাধা দেবনা। শুনেছি গোয়ালিয়ায় আপনার কুটুম আছে। ওখানে যেতে চাইলে বলুন। যাওয়ার বন্দোবস্ত করি। শকুন্তলার ভাই কোন যুবতীর চোখের জল সহ্য করতে পারে না। সেই প্রথম আর আজকের এই রাতে শেষ বারের মত জানতে চাই-শকুন্তলার সন্ধান দিবেন কি? ক্ষণিকের তরে বোন-পাগল এ ভাইটির প্রতি আপনার সহানুভূতি জাগলে বলুন-আমার শকুন্তলা কোথায়? অবশ্য আপনাকে বলতে বাধ্য করবো না। একবার, শুধু একবার বলুন দয়া করে। আমার এতিম বোনটি কোথায়? ও জীবিত, না ....', আটকে আসে ওর গলা।

উঠে বসলো নির্মলা। রণবীরের হৃদয়স্পর্শী কথার জবাব দিতে গিয়ে বললো, 'বিশ্বাস করুন। আমি কিছু জানিনা। জানলে আপনার জিজ্ঞাসা ছাড়াই অকপটে বলে দিতাম। ভগবান সবজান্তা, আমি এরচে' বেশী কিছু বলতে পারবো না। এমনকি জানেন না আমার বাবাও। বাবা ওকে হন্যে হয়ে খুঁজেছেন, পাননি।'

'হ্যাঁ! নির্মলা দেবী। আপনি মিথ্যা বলছেন না। আপনাকে আর কোনদিন এ বিষয়ে প্রশ্ন করবো না। কিন্তু শকুন্তলার অন্তর্ধানের পরও এ কামরায় রাতভর প্রদীপ জ্বালার হেতুটা কি? মহলে প্রবেশ করেই সরাসরি এ কামরায় চলে আসবেন-এমন

কোন অভিপ্রায় ছিল কি আপনার? এক চাকরানী বলছে-মহলে আসার পর আপনি এ কামরায় সর্বদা বাতি জ্বেলে রাখতে তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।'

'গেয়ো মহিলারা বলেছিলেন-সারা রাত কামরায় বাতি জ্বেলে রেখ। শকুন্তলার ঘরে 'মা-লক্ষী'র আনাগোনা আছে। দেবী লক্ষীর অপেক্ষায় শকুন্তলা বাতি জ্বেলে রাখতো। আমি ওদের কথা মত একাজ করে আসছিলাম। কিন্তু এই বাতি আপনাকে ধোঁকা দেবে- তা ভাবিনি আদৌ। দেখুন শকুন্তলার খবর আপনারচে' আমি বেশী জানি না। ওর সন্ধান জানলে বাবার তোয়াক্কা না করে নিশ্চয় ওকে সাহায্য করতাম। আফসোস! হতভাগীর কোন কাজে আসলাম না। আপনাকে প্রভাবিত করার জন্য নয়। বরং বিপদগ্রস্থা এক নারীর জন্য আরেক নারীর সহমর্মিতা অপরিহার্য, নিছক তাই বলতে প্রয়াস পাচ্ছি। বাবার দুশমনের কাছে নির্মলা কৃপা ভিক্ষা করবে না। বোন হারানোর বদলা আমার উপর দিয়ে নিতে চাইলে নিতে পারেন।

আমরা একে অপরের দুশমন। আমি জয় কৃষ্ণের মেয়ে। মোহন চাঁদের পুত্র আপনি। আমি হিম্মত না হারালে আপনি এতক্ষণে ধুলোয় গড়াগড়ি খেতেন। নিভে যেত আপনার জীবন প্রদীপ। কিন্তু সে শখ আমার মিটলো না। শকুন্তলার উপর দয়াদ্রসিক্ত হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে হত্যা করা অপরিহার্য মনে করি। আপনার প্রতিহিংসা মিটাতে পারেন আপনিও।'

স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইল রণবীর। নির্মলার দিকে তাকানোর হিম্মত হারিয়ে ফেললো সে। ও এমন এক যুবতী, যার মুচকি হাসির ঝলক নির্জন প্রান্তরে সুখের ডংকা বাজাতে পারে।

রণবীর বললো, 'পরস্পরে আমরা দুশমন- এ ধারণাটি জন্ম-জন্মান্তরের তরে আমাদের মাঝে দুষ্টক্ষত হয়ে থাকবে। এ রাতই আমাদের জীবনের বিদায়ী রাত। তবে কোথায়, কখন যাবেন, তা আপনার মর্জির উপর নির্ভরশীল।'

'আমি এক্ষণে যেতে চাই।'

'কোথায়?'

'গোয়ালিয়ায়। মামা বাড়ী।'

'আপনার বাবা বুঝি ওখানে?'

'কেন? তাকে হত্যা করবেন কি ওখানে গিয়ে?

'না।'

'তবে?'

'এমনি বলছিলাম।'

'উনি ওখানে থাকতে পারেন। তবে একীন দিতে পারি না।'

'সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আগামী কাল অতি প্রত্যুষে আপনাকে রওয়ানা করে দেব। শম্ভুনাথ আপনাকে পৌছে দিবে।'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল রণবীর।

॥ তিন ॥

গভীর রাত। খোলা উঠানে রণবীর বিক্ষিপ্ত পায়চারী করছিল। শেষ রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে চেষ্ট করলো। ঘুম এলোনা। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল নির্মলার নির্মল মুখশ্রী। ভোরের পাখি ডাকতেই সে রামনাথের বাযু ধরে ঝাঁকুনি দিলো। জাগালো তাকে। নিয়ে চললো সাথে করে। সন্ধ্যায় ওকে বলেছিল, 'নির্মলা গোয়ালিয়ায় যাচ্ছে। ওর বিদায় কালে আমি মহল থেকে দূরে থাকতে চাই।'

রামনাথ অনুধাবন করতে পেরেছিলো ওর হৃদয়ের তোলপাড়। দু'জনে নীরবে উপকূল দিয়ে চলছিলো। বসে পড়লো এক জায়গায়। রামনাথ বললো, 'শুনেছি, নির্মলা খুব সুন্দরী।'

'জানিনা। আমি ওর দিকে কখনো মুখ তুলে গভীর ভাবে তাকাইনি। নির্মলা নিছক এক নারী মূর্তির নাম নয়, বরং সাগর বক্ষে তোলপাড় করা এক ব্যতা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের নাম। পর্যটক ওর চেহারায় তাকালে ঝলসে যাবে। রামনাথ! তুমি কাব্য জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।আমার কথা উপলব্ধি করতে তোমার কষ্ট হবে না নিশ্চয়ই।'

'নির্মলা জয়কৃষ্ণের মেয়ে না হলে আপনার ভূমিকা কি হতো?'

'জানিনা। খুব সম্ভব দুঃসহ একটা যন্ত্রণা পীড়া দিত।'

'বলতে পারেন কি, ওর এভাবে চলে যাওয়ায় আপনার কষ্ট হচ্ছেনা? সারা রাত এপাশ ওপাশ করেছেন। চোখ বুজেননি। তদুপরি এখন মহল ছেড়ে আসায় একটা রহস্য উন্মোচিত হলো-দুঃসহ বাস্তবের মুখোমুখি হতে আপনি অপারগ।'

'গত কালই ঠিক করে রেখেছিলাম-যাবার প্রাক্কালে আমরা একে অপরকে যেন না দেখি।'

'আপনার সিদ্ধান্তের উপর তাহলে অটল থাকতে চাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ! অপারগতা স্বীকার করলেও আমাদের জীবনের মোহনায় সম্মিলিত হবার আশা নেই।'

'আচ্ছা! আপনার সম্পর্কে ওর অনুভূতি কি?'

'বলতে পারবো না। আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল ও।'

'বাহ্। খাপের খাপ, নাটক জমছে তো বেশ।'

'তার মানে?'

'সে আপনার প্রেমে গলা অবধি ডুবে গেছে।'

'ফাজলামো রাখো। অন্য কিছু বলো।'

সূর্য তখন মাথার উপর উঠছে। মহলে ফিরে রণবীর জানলো-নির্মলা চলে গেছে। নীচতলার কামরায় বসে ভাবছিল কিছু। আচমকা দরজায় কারো অনবরত করাঘাত অনুমিত হলো।

'কে?' রণবীর জিজ্ঞাসা করলো।

'আমি!' নির্মলার এক চাকরানী প্রবেশ করলো। হাতে তার ছোট একটি থলে।

'যাবার প্রাক্কালে এটি আমার হাতে দিয়ে নির্মলা দেবী বলেছেন-আপনার কাছে পৌঁছে দিতে। এর মধ্যে রয়েছে সে সব অলংকারাদি, যা আপনি সেদিন ফিরিয়ে দেয়া সত্ত্বেও গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।'

'তুমি রাখলে কেন?'

'তাকে বলেছিলাম-আপনি রাগ করবেন। কিন্তু ঠাস্ করে আমার সামনে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। আমরা কোথায় যাবো মহারাজ?'

'কেন, তোমরা মহলে থাকবে। এতে আমি খুশী হবো।'

চাকরানী আর্শীবাদ করতে করতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

স্বপ্নের ঠিকানা

মহল সংলগ্ন প্রশস্ত উঠান। ছায়াদার বৃক্ষের নীচে বসে আলাপ করছিল রণবীর ও রামনাথ। রামনাথের কণ্ঠে ঝংকৃত হচ্ছিল গানের মৃদুমন্দ সুর লহরী।

রণবীর তাকে বললো, 'রামনাথ উচ্চস্বরে গাইতে পার না?'

রামনাথ জবাব দিলো, 'কেমনে গাইবো? গলায় সুর আসছে না যে!'

খামোশ হয়ে গেল উভয়ে। রণবীর শেষ পর্যন্ত বললো, 'রামনাথ। আমি চাচ্ছি, তুমি এখানে থাকো, আমি সোমনাথ থেকে ঘুরে আসি।'

'আপনি একাকী গিয়ে কি করতে পারবেন?'

'রূপাবতির সাথে সাক্ষাতের কোন সুরাহা করতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস।'

'বলা যতটা সহজ, করা ততটা নয়। আপনি যদি অসাধ্যকে সাধ্য করতে পারেন-তবুও আমি আমার জন্য আপনাকে এহেন বিভীষিকাময় ঘাঁটিতে যেতে অনুমতি দিতে পারি না। বর্তমানে শকুন্তলার খোঁজে লেগে থাকা আপনার জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।'

রণবীর আর্তস্বরে বললো, 'কনৌজ সীমান্তের ধারে থাকলে অবশ্যই ওর খোঁজ পেতাম। অদ্যাবধি জানতে পারিনি ও জীবিত, না মৃত।'

দেউড়ির দিকে তাকিয়ে রামনাথ বললো, 'দেখুন! শম্ভুনাথ আসছে।'

চকিত রণবীর দেউড়ির দিকে তাকালো। দেখলো শম্ভু ঢুকছে শম্বুক গতিতে।

শম্ভুনাথ তখনো বেশ দূরে। রণবীর সেমতাবস্থায় প্রশ্ন ছুঁড়লো, 'শম্ভু! ওকে পৌছে দিয়েছো তো?'

'হ্যাঁ মহারাজ।' হাত বেঁধে মাথা নীচু করে শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো ও।

'পথিমধ্যে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি তো?'

'না মহারাজ।'

'জয়কৃষ্ণের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে কি?'

'না। তিনি তখন বাড়ি ছিলেন না।। নির্মলার মামা ছিলেন। তিনি বললেন- আমার অসুখ না হলে তোমার সর্দারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যেতাম। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, তিনি জয়কৃষ্ণের উপর বীতশ্রদ্ধ। নির্মলা আপনাকে একটি পত্র দিয়েছে। পকেটে আঙ্গুল দিয়ে শম্ভুনাথ পত্র বের করে রণবীরকে দিলো। রণবীর পড়তে লাগলো। তাতে লেখা ছিলো–

'পত্র দিয়ে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে মামুজান নির্দেশ দিয়েছেন। বাবা এখানে থাকলে তিনিই লিখতেন। আপনি আমার উপর যে সদয় ব্যবহার করেছেন-এর প্রতিদান একমাত্র ভগবানই দিতে পারেন। যেভাবে আমি মামুর কাছে পৌঁছে গেছি, একদিন এভাবে হয়তো পৌঁছে যাবে শকুন্তলাও। আপনি ওর সন্ধান করতে থাকুন। আপনার কাছে আরেকবার করজোড়ে নিবেদন করে বলছি-বিশ্বাস করুন। আপনার বোনের অন্তর্ধানে বাবা ও আমার কোন ভূমিকা নেই। আপনার আমার মধ্যে যে অহমিকাবোধ ও মান-অভিমানের সৃষ্টি হয়েছে, তা মিটছে না সহজে। এতদসত্ত্বেও ভগবানের কাছে আমার সকাল-সন্ধ্যার প্রার্থনা-আপনি যেন শকুন্তলাকে পেয়ে যান।'

–নির্মলা।

পত্র পাঠ করে রামনাথের হাতে তুলে দিলো তা। ডুবে গেলো গভীর চিন্তায়। রামনাথ পত্র পাঠ করে রণবীরের হাতে দিয়ে বললো, 'দোস্ত আমার। পত্রের প্রতিটি শব্দ স্বাক্ষ্য দিচ্ছে, তার অন্তর তোমার মুহাব্বতে বে-কারার।'

রণবীর একটু খুশির আমেজে বললো, 'না রামনাথ। কথার মারপ্যাচে ফেলে ও আমাকে ওর বাবার হত্যা পরিকল্পনা ভুলাতে চাচ্ছে। জয়কৃষ্ণের মত পাথুরে দিল বিশিষ্ট লোক আমার হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পাবে না। শকুন্তলাকে আমার হাতে তুলে দিলে আমার গোস্বা সে সম্বরণ করাতে পারত। তার কথা কি করে ভুলি-যার হাত আমার শাহ্‌রগ পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। জয়কৃষ্ণ কাঁটাদার বৃক্ষ রোপন করেছে। আমি তার থেকে ফুলের আশা করতে পারি কি? আমার সামনে কোনদিন তার মেয়ের প্রেম নিবেদনের কথা বলবে না। এতে আমার সম্ভ্রমবোধে আঘাত লাগে। নির্মলার সাথে সৎ ব্যবহারের মানে এই নয়- আমি তার বাবার দিকে দোস্তীর হাত বাড়াতে চাই।'

রামনাথ লজ্জানম্র দৃষ্টিতে বললো, 'মাফ করুন! আমি ভুল করে ফেলেছি।'

রণবীর শম্ভুনাথকে বললো, 'জ্যাঠা শম্ভুনাথ! যাও আরাম করো গিয়ে।'

শম্ভুনাথ চলে গেল। নীরবতার সাথে অতিক্রান্ত হলো কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত রামনাথ নীরবতা ভঙ্গ করে বললো, 'এক্ষণে আপনার এরাদা কি?'

'এক্ষণে আমার এরাদা হচ্ছে, পূর্ব ও দক্ষিণ কনৌজের গোটা জনপদ চষে ফেলা। বাড়ী-বাড়ী, বন-বাদাড়ে তালাশ করা শকুন্তলাকে। বিফল হলে জলন্ধরাভিমুখী হওয়া। হতে পারে ওখানকার কোন আশ্রম কিংবা মন্দিরে ওকে খুঁজে পাব।'

॥ দুই ॥

পরের দিন। রণবীর ও রামনাথ কিছু নওকর সমভিব্যহারে পূর্ব কনৌজাভিমুখী হলো। তিন সপ্তাহ ধরে তারা কয়েকটি লোকালয় ও ঝোপঝাড়ে পাতা পাতা করে খুঁজলো। কিন্তু মিললো না শকুন্তলার সন্ধান। চতুর্থ হপ্তায় দক্ষিণ কনৌজমুখো হলো রণবীরের মিশন। সফরের ধকল সইতে না পেরে রামনাথ জ্বরে আক্রান্ত হলো। শম্ভুনাথকে ওর সেবায় রেখে রণবীর একাকী অগ্রসর হলো।

পক্ষকালব্যাপী বিভিন্ন জনপদ ঘুরে রণবীর বিফল মনোরথে ফিরে এলো। রামনাথ চাঙ্গা হয়ে গেলো ততোদিনে। যেতে চাইলো জলন্ধরের সফরে রণবীরের সাথে। কিন্তু রণবীর বাধ সেধে বললো, 'তুমি নেহাৎ কমযোর। আমার সফর খুব ঝুঁকিপূর্ণ। যাচ্ছি এক সন্যাসীর বেশে। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ক্রোশের পর ক্রোশ পায়দল চলতে হবে। একমাত্র শম্ভু ছাড়া কেউ-ই আমার সাথে চলতে পারবে না। বাকি নওকরদের সাথে তুমি মহলে ফিরে যাও। আরাম করো গিয়ে। জলন্ধর থেকে ফিরে আমি সরাসরি সোমনাথাভিমুখী হব।'

রামনাথ পীড়াপীড়ি করলো। কিন্তু রণবীরের নির্দেশ অমান্য করার শক্তি হল না তার। অনন্তর ফিরে এলো মহলে।

প্রায় দেড় মাসাধিকাল ধরে রণবীর ও শম্ভুনাথ সন্যাসীর ছদ্মবেশে জলন্ধরের বিভিন্ন শহরে ঘোরাফেরা করলো। খোঁজ নিলো শহরের প্রধান মন্দির ও আশ্রমগুলোয়। কিন্তু ফলাফল সেই শূন্যের কোঠায়। শকুন্তলা নেই, কোথাও নেই।

রণবীর ফিরে এলো মহলে। নওকররা বললো, '২০ দিন পূর্বে রামনাথ মহল ছেড়ে চলে গেছে। রেখে গেছে আপনার জন্য এ পত্র।'

রণবীর পত্র খুললো। রামনাথ লিখেছেঃ

'আপনার অনুমতি ছাড়া চলে যাচ্ছি। বোধকরি খুলে বলতে হবে না- আমার গন্তব্য কোথায়? বোনকে বাদ দিয়ে আমার প্রিয়ার অন্বেষণে বের হন আপনি- এটা আমার কাছে দুঃসহ মনে হচ্ছে। মিনতি করে বলি- আপনি আমার পিছু নিবেন না। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, আমারচে' আপনার সনাক্তকারীরা সোমনাথে সংখ্যায় অনেক বেশি। কে বলতে পারে, আপনার জনপদের লোকজন ওখানে থাকবে না? আপনার ছদ্মবেশ ওদের ধোঁকা দিতে পারবে, তার নিশ্চয়তা কি? আমি এক সাধারণ মানুষ। অগণিত ভক্তের মাঝে ঢুকে পড়বো। ঠাহর করতে পারবে না কেউ। এতদসত্ত্বেও কেউ আমাকে চিনে ফেললে রূপাবতীর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারব। ও জানুক, রামনাথ তার তালাশে এসে জীবন দিয়েছে। জীবিত থাকলে একদিন না একদিন আপনার সাথে মিলিত হবোই।'

-আপনার অবাধ্য রামনাথ।

॥ তিন ॥

কনৌজের কেল্লা। থাকছেন এখানে আব্দুল ওয়াহিদ। একদিন তিনি দফতরে ফাইল ও নথিপত্র ঘাটছিলেন। হেন কালে এক সেপাই সালাম করে বললো, 'হুজুর। সর্দার রণবীর আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

আব্দুল ওয়াহিদ চকিতে জওয়ার দিলেন, 'কৈ? জলদি তাকে নিয়ে এসো।'

রণবীর প্রবেশ করলো। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে আব্দুল ওয়াহিদ তার সাথে মুসাফাহা করলেন। নিকটস্থ চেয়ারে উপবেশন করতে বলে বললেন, 'ভালোই হলো তুমি এসেছ। অন্যথায় আজ আমি নিজেই তোমাদের জনপদে যেতাম। তা যাক গে, বোনের কোন সংবাদ পেলে?'

'না।' রণবীর ম্লান মুখে মাথা উঁচু করে উচ্চারণ করলো। 'গোটা কনৌজ রাজ্য চষে ফেলছি, কিন্তু শকুন্তলাকে পাইনি কোথাও।'

'আমিও যথাসাধ্য তালাশ করেছি। কিন্তু আফসোস ছাড়া তোমাকে কিছু শোনানোর মত নেই আমার কাছে। কনৌজের সর্দার ও সিপাইরা আমাকে সহায়তা করেছে এ ব্যাপারে। বোধহয় তোমার বোন কনৌজে নেই।'

'সন্যাসীর ছদ্মাবরণে জলন্ধর গিয়েছিলাম। মাসখানেক সম্ভাব্য এলাকায় ঘুরলাম। পেলাম না ওকে সেখানেও। স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া প্রতিটি ঘরে তল্লাশী করা আমার সাধ্যের বাইরে।'

'হতাশ হয়ো না রণবীর। সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন ঐ সব প্রশাসন তোমার বোনের অন্বেষাকে ফরয মনে করবে। খোদার রহমতের উপর আস্থা রেখ। জিন্দা থাকলে শকুন্তলাকে তুমি ফিরে পাবে। আর হ্যাঁ, তোমার দোস্ত রামনাথ কোথায়?'

'ও সোমনাথ চলে গেছে। যেতে চাচ্ছি আমিও। কখনো কখনো খেয়াল হয়- শকুন্তলা বুঝি ওখানে আছে। বেশ কিছুদিন এ দেশের আওয়াম তাদের বর্তমান ভবিষ্যৎ সোমনাথের সাথে জুড়ে দিয়েছে। আপনারা যেদিন কনৌজের উপর চড়াও হলেন, সেদিন থেকে কনৌজবাসী তাদের যুবতী মেয়েদের ধরে ধরে সোমনাথে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সম্ভবতঃ কিছুদিন এদিকে ওদিক বিচরণ করে শকুন্তলা ঐ কাফেলাবন্দী হয়ে সোমনাথে গেছে। শৈশব কালে ওর বড্ড আশা ছিল- সোমনাথ দেখার।

আমাদের জনপদের জনৈক সর্দারকন্যাকে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য সোমনাথ পাঠানো হয়েছিলো। এক বছর পরে সে ফিরে এলে তার নাচ গানে গোটা জনপদের যুবতীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। একদিন ঐ যুবতী আমার কাছে এসে বললো- আপনার বোন সোমনাথের প্রতি অনুরাগিনী। সম্ভব হলে ওকে পাঠাবেন। বাবা নাকি আমার বন্দীদশায় বলেছিলেন- রণবীর ফিরলে আমরা এক সাথে সোমনাথ যাত্রা করবো। সম্ভবতঃ শকুন্তলা সোমনাথাভিমুখী তীর্থ কাফেলার সহযাত্রী হয়েছে।'

'শকুন্তলা সোমনাথ যায়নি। ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ পিয়াসী এক বোন হাজার হাজার মাইল দূরে যেতে পারে না।'

'আমারও ধারণা কতকটা তাই। হায়! আমি বারবার আত্মপ্রবঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু এ ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনাই তো আমাকে আজো বাঁচিয়ে রেখেছে। আমার সোমনাথ যাত্রা অবধারিত। বিশেষ করে রামনাথের জন্য। হয়তো শুনেছেন- ও এক সোমনাথ পূজারীকে হত্যা করেছিলো। এ জন্য আমার খেয়াল ছিলো- ওর স্থলে আমি যাব সোমনাথে। কিন্তু অভিমানী আমাকে ছেড়ে ভেগেছে। চার মাস হয়ে গেলো। ওর কোন পাত্তা নেই। আমার ভয় হচ্ছে, ও কোনো মুসিবতে পড়লো না তো! আমাকে যথাশীঘ্র পৌছুতে হবে। শকুন্তলার অন্বেষণ মনকে প্রবোধ দেয়ার একটা বাহানা মাত্র।'

'রণবীর। কুদরত কখনও কখনও উদ্দেশ্যবিহীন কাউকে কোন কাজে লাগিয়ে দেন। সোমনাথ তুমি স্বেচ্ছায় যাচ্ছ না, তোমাকে পাঠানো হচ্ছে। সোমনাথ সেই অমানিশার শেষ আশ্রয় স্থল, যার বিভীষিকা দূর করতে আমরা এক পায়ে খাড়া। ওখানে গিয়ে তুমি উপলব্ধি করতে পারবে-গোটা ভারতবর্ষ বিজয়ের চেয়ে এ মন্দির দখল করা সুলতান মাহমুদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সোমনাথ দখল করার জন্য ব্রাহ্মণ জাতির এ জিগিরই যথেষ্ট যে, সোমনাথ এক সীসাঢালা প্রাচীরের নাম। সুলতান কবে নাগাদ সোমনাথের ওপর চড়াও হবেন, তার একীন তোমায় এ মুহূর্তে দিতে পারছি না। জেনে রেখ! সুযোগ পেলে তার বিজয়ী অশ্ব অবশ্যই সোমনাথমুখী হবে। আমরা এক্ষণে ঐ তীর্থ মন্দিরের উপর গভীর নজর রাখছি। এমনও লোক ওখানে পাবে, যুগ যুগ ধরে যারা সুলতানের পথ চেয়ে বসে আছে। তোমার এই ঝটিকা সফর তাদের সুদিনের মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

গুজরাটে মুসলিম বণিক কাফেলার নামমাত্র ক'টি বস্তি ছিল। কিন্তু সোমনাথ পূজারীদের সীমাহীন জুলুমের শিকার হয়ে ঘরদোর ছেড়ে তারা সাগাকা ও সিন্ধুতে উপনীত হয়েছে। এক্ষণে যারা সোমনাথের আশে পাশে আছে নিকৃষ্ট, অচ্ছুৎ, অস্পৃশ্য ও ছুৎমার্গের অভিশাপ নিয়ে তারা কালাতিপাত করছে। সুলতান শুনেছেন এসব ভাগ্য বিড়ম্বিত আওয়ামের করুণ উপাখ্যান। গত মাসে এক প্রতিনিধিবর্গ তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এদের পথ দেখিয়েছেন, গুজরাটের রহস্যভেদী এক সরদার। সাধু বেশে তিনি সোমনাথের বাইরে থাকতেন। আব্দুল্লাহ তার প্রকৃত নাম। কিন্তু আওয়াম তাকে 'ভগবান দাস' বলে ডাকতো। থানেশ্বর অবরোধ কালে তিনি সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। জিন্দেগীতে সেই প্রথম তাকে দেখলাম। তার প্রতিনিধিবর্গের বেশ ক'জন ফিরে না গিয়ে সুলতানের ফৌজে নাম লিখিয়ে ছিলো। তাদের একজন ধর্ম প্রচারক হিসেবে এখানে অবস্থান করছেন। আব্দুল্লাহর বিশদ রহস্য ও অবস্থান সম্পর্কে তিনি তোমাকে হেদায়েত করতে পারেন। বিপদের কালে আব্দুল্লাহর সাহায্য তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে বলে মনে করি। শুধু

তোমার নয়, তার সাহায্য লাগতে পারে রামনাথেরও। সোমনাথে থাকাকালীন সময়ে সেখানকার প্রতিরক্ষা ও সৈন্য সংখ্যার একটা সম্যক ধারণা নিতে পারলে আমাদের বেশ উপকার হবে। আব্দুল্লাহর মাধ্যমে তোমার সাথে আমার যোগাযোগ থাকবে। তোমার অনুপস্থিতিতে শকুন্তলার খোঁজের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। আমার ধারণা, উত্তর ভারতের অভিযান থেকে ফারেগ হয়েই সুলতান মাহমুদ জলন্ধর ও গোয়ালিয়র মুখো হবেন। উক্ত রাজ্যদ্বয়ের পতন হলে স্থানীয় সর্দার ও আওয়ামের সহায়তায় তোমার বোনের সন্ধান মিলে যেতে পারে।'

'আপনি আমার সফরের স্পৃহাকে আরো অদম্য করে দিলেন। দীর্ঘদিনের জমাট কথা আমার বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে আছে। আমার সেই বোঝা একটু হালকা করে যেতে চাই।'

'করো দেখি। তোমার বোঝা কেমন ভারী- বুঝতে পারব।'

'বলতে কষ্ট হচ্ছে, সুলতান মাহমুদের বিজয় এখনও সেই ফল আনতে সক্ষম হয়নি- যার আশাবাদী ছিলাম আমি। জুলুম নিপীড়নের আলীশান প্রাসাদকে তিনি ঠিকই ধ্বসে দিয়েছেন, কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর এমন প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে- যার মধ্যে ইনসাফের সুবিমল সমীরণ বইছে না এখনও। কন্টকময় বৃক্ষ তিনি দলন করেছেন ঠিকই, কিন্তু দলিত মথিত বৃক্ষচ্যুত পুষ্পকলি সুখস্নানে স্নাত হয়নি আজো। দেশ জয় করে চলেছেন ঠিকই, কিন্তু তার থেকে ফায়দা লুফতে পারছে না ভারতবাসী।

ভারত ভূমিতে তাঁর কালজয়ী বিপ্লব নিঃসন্দেহে রক্তাভ ও দ্বন্দ্বাত্মক। তামসি ছায়ায় ঘেরা ক্লেদাক্ত ও পঙ্কিলগ্রস্ত এ সরেজমীনে তিনি ভোরের জ্বাজ্জ্বল্যমান সূর্য নন, বরং এমন এক উজ্জ্বল তারকার ন্যায় উদিত হয়েছেন, যা কৌতূহলী দর্শকদের আবছা আলোর রেখা দেখিয়ে আচমকা হারিয়ে যায় মহাশূন্যে।

আপনার অজানা নয়- কনৌজ পতনের পরও রাজার সনাতন সংবিধান খাবলে তুলে নিচ্ছে মজলুম মানবতার অস্থিমজ্জা। সুলতানের আশ্রয়ে আওয়াম যতটা আশাবাদী, ততোটা ভীত সন্ত্রস্থ পরাজিত শকুনের রক্ত চক্ষুর ভয়ে। নির্যাতিত আওয়ামদের আপনারা যে ইনসাফের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তা হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। ব্রাহ্মণদের পৈতায় আবারও পেঁচিয়ে যাচ্ছে মজলুম আওয়ামের শাহরগ। কনৌজের যেসব সর্দার আপনাদের দলভুক্ত হয়েছিলো, তারা নেমকহারামী করে রাজা গেন্ডার পতাকাতলে পুনরায় সমবেত হয়েছে।'

আব্দুল ওয়াহিদ জওয়াব দেন, 'আমি সব জানি। কিন্তু এতে উৎকণ্ঠার কি আছে? যে মহান দায়িত্ব কুদরত সুলতানের স্কন্ধে অর্পণ করেছেন, তা পুরা হবেই। সনাতন বিশ্বাসের সৌধ চূড়া ভেঙ্গে এক নতুন সংবিধানের দিশা দিতে যাচ্ছেন আমাদের গর্বিত মহানায়ক।

সেই সংবিধান আকড়ে জীবন গঠন করা তোমার আমার নৈতিক দায়িত্ব নয় কি, রণবীর? তিনি তাগুতের কালো প্রাসাদ মিসমার করে দিয়ে স্থাপন করবেন হকের আকাশ চুমো মহল। জুলুম-নিপীড়নের অসার ঝান্ডা ভূলুণ্ঠিত করে প্রোথিত করবেন ইনসাফের সবুজ নিশান। পাষাণ মূর্তির স্থলে একত্ববাদী খোদার মুহাব্বত অন্তরে সঞ্চার করতে তার সংগ্রাম প্রতিনিয়ত। তার বিজয় সয়লাবের গতির সামনে খড়কুটোর মত ভেসে যাবে স্বৈরাচারের সূর্য মহল। তার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ না করলেও কমপক্ষে কন্টকাকীর্ণ করবে না ভারতবাসী। দেবতার ভজনগীত না গেয়ে ভারতবাসী এখুনি তার স্তুতি গান বর্ণনা করছে। না জানি ভবিষ্যতে তার মূর্তিকেই পুজা করতে শুরু করে কি-না। তুমি দেখবে, তাগুতের ঘাড় মটকে দিতে তাঁর সুকঠিন হাত কেমন ক্ষিপ্র থেকে ক্ষিপ্রতর হয়। তাঁর বিজয়ের সমতল ভূমিতে আগামী বংশধর সুখ আহলাদ লাভ করবে। গজনী ও হিন্দুস্তানের মাঝে তাঁর পদচারণ একদিন এমন এক কাজ দিবে, ভবিষ্যৎ বংশধর খুঁজে পাবে যা থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছু। থাকবে আগামী বংশধরের সন্তানদের হাতে তলোয়ারের বদলে হেদায়েতের দ্বীপ্ত মশাল। তোমার সাথে থেকে ওরা-ই সারবে সুলতানের অসম্পূর্ণ কাজটুকু। গড়বে স্বপ্নের ঠিকানা। যার ভিত্তি স্থাপন করা তাঁর আজীবনের অভিলাস।

এক্ষণে আফগানের দুর্গম পাহাড় এবং গাঙ্গেয় উপকূলে লাখো মুবাল্লিগ দ্বীন-ইসলাম প্রচারে নিমগ্ন। তাঁরা ভারতবাসীর হৃদয় মিনারকে কব্জা করছেন ইসলামের জীয়ন কাঠির ছোঁয়ায়। তলোয়ারের জোরে সুলতান যে বিজয় উপাখ্যানের জন্ম দিচ্ছেন, মুবাল্লিগদের হৃদ্যিক জয় তার চেয়ে অনেক বেশী ফলদায়ক ও স্থিতিশীল।

বাইরের ঐতিহাসিকগণ সুলতান মাহমুদকে চিত্রিত করবেন এক দিগ্বিজয়ী বীর হিসাবে, কিন্তু তাঁদের চিত্রিত করবেন যুগের নকীব ও নতুন আলোর সন্ধানদাতা হিসেবে। মহান সুলতান মূর্তির তেলেসমাতি কেবল দূরীভূতই করেননি বরং ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন দাম্ভিক হিন্দুশাহীর সৌধ চূড়াও। তোমার আপত্তি ফালতু নয় যে,সুলতান কেবল দেশ জয়ই করছেন, কায়েম করছেন না দেশ শাসনের প্রক্রিয়া, করছেন না সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা। কিন্তু তোমার অজানা নয়- জিন্দেগীর সিংহভাগ সময় তিনি কাটিয়েছেন ঘোড়ার পিঠে। তাঁর রাজকীয় জীবনে বিশ্রাম জিনিসটি দেখা যায় না। নাই তাঁর অভিধানে ও শব্দটি। তাঁর মনজিল বন্ধুর। উপল খন্ড ছড়িয়ে থাকে যেখানে এবড়ো থেবড়ো। হাতে গনা যে ক'জন সৈন্য নিয়ে তিনি অভিযান চালান- যেখানে দরকার তার চেয়ে অনেক বেশী। হিন্দুস্তানের বাইরে তাঁর স্বজাতি যারা আছে- তারা ক্ষমতা লোভ ও উত্তরাধিকার সম্পত্তি নিয়ে কলহে লিপ্ত। ওরা তাঁকে কোনদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেয়নি। হিন্দুস্তানে তাঁর সংঘর্ষ এমন এক জাতির সাথে, যারা বসিয়েছে নিজদিগকে খোদার আসনে। তোমার কথা মতো ক্ষুদ্র একটি রাজ্য জয় করে সেখানে জিন্দেগীর বাকি দিনগুলো কাটিয়ে সুন্দর

ব্যবস্থাপনা করে দেশ চালনা করা, এই তো? কিন্তু ভেবে দেখ রণবীর, এমনটি করলে তোমার মতো হাজারো রণবীর আজ পথে কাঁদতো। হাজারো শকুন্তলা ভাইহারা শোকে মাথাকুটে মরতো। হাজারো রূপাবতী সোমনাথে পুরোহিতদের দেবলীলার শিকার হতো। তুমি খুশি হতে তাতে? এরপরও কি অভিযোগ থাকতে পারে তোমার- সুলতান সুশৃঙ্খলভাবে দেশ পরিচালনায় নামছেন না কেন?

কুদরত তাকে শাসক হিসাবে নয়- দেখতে চেয়েছেন সৈনিক বেশে। সেপাই বেশে তার এক জয়, হাজারো অলস রাজার তর্জনি হেলনে বিপুল বিজয়ের চেয়ে শ্রেয় নয় কি?

মনে কর, লমগান ও সিন্ধু কব্জা করে যদি তিনি মসনদে আসীন হয়ে যেতেন। তাহলে তাঁর ফৌজদের খামোকা পালতে হতো না। এতে রাজকোষ দুর্বল হয়ে পড়তো। ভেঙ্গে পড়তো সৈন্যদের মনোবল। অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যেত গজনীর হিমেল উপত্যকা থেকে জন্ম নেয়া সুলতানের ক্ষুদ্র রাজ্য। একদিকে উত্তর জনপদের স্বজাতি কলহ, আরেক দিকে এ বিপর্যয় সুলতানকে কি আর সুলতান রাখতো?

সুতরাং এ সমূহ বিপর্যয় আঁচ করতে পেরে তিনি যুগ যুগ ধরে কেবল দেশ জয় করে ফিরেছেন। বসেননি মসনদে। দুশমনরা উপলব্ধি করতে পারছে- দিগ্বীজয়ী সুলতানের শক্তি ঢিল হয়ে যায়নি। তাই তো তার বিজয়ী এলাকার কেউ আজতক মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর মুষ্টিমেয় লোকজন উত্তর জনপদে নিশ্চিন্তে মসনদ চালাতে পারছে। কুদরত তাঁকে অবকাশ দিলে গোটা ভারত একদিন তাঁর কব্জায় চলে আসবে। সেদিন তোমার মত লোকদের তিনি কোনই অভিযোগ করার সুযোগ দিবেন না।

আজো যদি আমি মুষ্টিমেয় এ ক'জন সেপাই নিয়ে কনৌজের মসনদে বসি, তাহলে বিদ্রোহ করতে বুকের পাটা টান করতে কোন দুশমন হিম্মৎ দেখাবে না? জনপদবাসীর একটা ভয় আছে, গজনীর সুলতানের শক্তিতে আমরা শক্তিশালী। গভর্নর আব্দুল ওয়াহিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মানে হলো গোটা গজনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

আমি ঐ সব সর্দাদের নিয়ে মাথা ঘামাই না, যারা আমাদের দলভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও গেন্ডার দলে ভিড়েছে। রাজা গেন্ডার ক্ষমতার দিন ফুরিয়ে আসছে। তার পতনের সাথে সাথে নীতিজ্ঞানহীন ঐসব সর্দারদেরও স্বপ্নের ঠিকানা ভেঙ্গে যাবে। ধুলোয় মিশে যাবে ওদের আশা ভরসা।

সুলতান মাহমুদের পরিপূর্ণ বিজয়ের অন্তরায় থাকলে এক্ষণে তা হচ্ছে- সোমনাথ মন্দির। সোমনাথের পতন পৌত্তলিক সমাজের আখেরী বিপর্যয়। সোমনাথের মূর্তি ভারত বর্ষের সবচেয়ে বড় মূর্তি। ওগুলো চূর্ণ করতে পারলেই সুলতানের ভারত আগমন সার্থক হবে।'

গাঁয়ের নয়া পরিস্থিতি ও ভাইয়ের অন্তর্ধানের পর শকুন্তলা গোয়ালিয়রের এক কৃষকের বাড়ীতে কালাতিপাত করছিলো। জয়কৃষ্ণের হাতে তাদের মহলের পতন ঘটলে সে চকিত সাঁতরে নদী পার হয়। কিন্তু এরপর গন্তব্য কোথায়, তা ওর জানা ছিল না। রাত ভর নদীর তীর ধরে চলতে থাকলো। শেষ রাতে ওর পা অসার হলে ক্লান্তিতে বসে পড়লো। সূর্যোদয়ের খানিক পর পার্শ্ববর্তী বস্তির এক বৃদ্ধলোক ও তার স্ত্রী ওকে দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে- 'তুমি কে গো মা? এ হালে এখানে কেন? কি তোমার নাম? বাড়ী কোথায়.....' ইত্যাদি।

বয়োবৃদ্ধ লোকটির নাম কেদারনাথ। গোয়ালিয়রের বাসিন্দা। শ্যলকের বিবাহ নিমন্ত্রণে সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে গিয়েছিলো। বিবাহ শেষে বাড়ী ফেরার পথে শকুন্তলার সাথে নদীর তীরে সাক্ষাৎ। কেদারনাথের স্ত্রী অনিন্দ্য সুন্দরী এক যুবতীর চেহারায় পরিস্থিতির শিকার হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়তার ছাপ দেখে প্রভাবিত হয়েছিল। কানে কানে স্বামীকে বললো, 'যুবতী বোধহয় মুসিবতগ্রস্থ। চেহারা বলছে- ও কোন অভিজাত ঘরের মেয়ে। দেখুন! কেমন মায়াবী চাহনী। টানা টানা চোখ।'

কেদারনাথ জবার দিলো, 'যাও! তুমি গিয়ে আলাপ করো।'

কেদারনাথের বউ শকুন্তলার পাশটিতে এসে বসলো। বললো, 'খুকি! একাকী এখানে কি করছো?'

'কিছু না।' শকুন্তলা জবাব দেয়।

'তোমাদের বাড়ী কোথায়?'

ফুপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো শকুন্তলা, 'জানি না।'

কেদারনাথের বউ পোটলা থেকে একটা চাদর বের করে ওর গায়ে জড়িয়ে বললো, 'তুমি শীতে ঠক ঠক করছো।'

কেদারনাথ ইতোমধ্যে এসে ওদের কথায় শরীক হলো, 'তুমি কোথায় যাবে খুকি?'

'জানি না।' শকুন্তলা জবাব দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এদিক ওদিক সন্তর্পনে তাকিয়ে চলতে লাগলো উদ্দেশ্যবিহীন।

'দাঁড়াও খুকি! আমরা তোমার কোন কাজে আসতে পারি কিনা দেখি।' একথা বলে কেদারনাথের বউ ওর হাত ধরলো।

হাত ছাড়ানোর কোশেশ করে শকুন্তলা বললো, 'যেতে দিন আমাকে। আমি কারো সাহায্যের আশাবাদী নই। হিংস্র একদল পশু আমাকে ধাওয়া করছে।'

কেদারনাথ অগ্রসর হয়ে বললো, 'অসহায় এক কুমারী মেয়েকে বিপদগ্রস্ত দেখে রাজপুতরা কেটে পড়তে পারে না। আমি এক রাজপুত। আমার উপর আস্থা রাখতে পার।'

শকুন্তলা খানিক ইতস্তত করে বললো, 'আপনি এ জনপদের বাসিন্দা?'

'না। আমার বাড়ী গোয়ালিয়রে। বিবাহ ভোজে গিয়েছিলাম। এ জনপদে তোমার কুটুমদের বাড়ীতে যেতে চাইলে বলো - পৌছে দি।'

'না। আমি এখান থেকে দূর-বহুদূরে যেতে চাই।'

নদীর ওপার থেকে খেয়া আসছিলো। ছিলো তার উপর তিন সেপাই ও ঘোড়া। তীরে নৌকা ভিড়তেই সশস্ত্র সেপাই দেখে শকুন্তলার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অসহায় দৃষ্টিতে ও তাকালো কেদারনাথ ও তার স্ত্রীর প্রতি। ভাঙ্গা আওয়াজে বললো, 'এ জমীন ক্রমশঃ আমার জন্য সংকুচিত হয়ে আসছে। সম্ভবতঃ ওরা আমার সন্ধানে বেরিয়েছে।'

কেদারনাথ বললো, 'এক্ষণে তোমার পালাবার যাবতীয় পথ রুদ্ধ। নিশ্চিন্তে বসো, ভগবান তোমাকে সাহায্য করবেন।'

চকিতে শকুন্তলা মাথা নীচু করে বসে পড়লো। কেদারনাথের স্ত্রী এসে ওর চেহারা ওড়না দিয়ে ঢেকে দিলো।

খেয়া ভিড়লো। সওয়াররা চাপলো ঘোড়ার পিঠে। এক সওয়ার কাছে এসে কেদারনাথকে বললো, 'তোমরা কারা?'

'জ্বী, মানে! আমি এক গরীব কৃষক।'

'কোত্থেকে এসেছো, তোমার সাথে কে কে আছে?'

জ্বী! আমার বউ ও মেয়ে। আমরা বিয়ে খেতে এসেছিলাম। মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী থেকে গাঁয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বোঝেন তো- আমার অল্প বয়সী মেয়ে!'

'তোমাদের বড়ী কোথায়?'

'নদীর ওপার ক্রোশ দশেক দূরে।'

'এখানে কতক্ষণ?'

'নৌকার অপেক্ষা করছি। এইমাত্র এলাম।'

'পথিমধ্যে সুন্দরী কোন যুবতী মেয়ে দেখেছো?'

'জ্বী না।'

সশস্ত্র সেপাই আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলো। কিন্তু মাঝ নদীতে আরেকটি নৌকা দেখে সে ঘোড়া পদাঘাত করলো। সঙ্গীরা বললো, 'খামোকা সময় নষ্ট করতে গেলে কেন? সেই কখন নদী পার হয়েছি। নদী পার হয়ে শকুন্তলা কোন বস্তিতে আত্মগোপন করবে হয়তো। আমরা ওপার যেতে চাই।'

চলে গেল সেপাইরা। নৌকায় চাপলো কেদারনাথ, তার বউ ও শকুন্তলা। নদী পার হয়ে শকুন্তলা আরেকবার অসহায় দৃষ্টিতে মহাপোকারীদের চেহারা পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। কেদারনাথ বললো, 'চলো খুকি। আমাদের সাথে যাবে।'

'ভগবান বোধহয় আমার সাহায্যার্থে আপনাদের পাঠিয়েছেন। দেখুন! আপনি আমাকে আপনার মেয়ে বলে পরিচয় দিয়েছেন।'

'তুমি আজ থেকে আমাদের মেয়ে, চলো!'

শকুন্তলা নিশ্চিন্তে ওদের সাথে চলতে লাগলো।

॥ দুই ॥

কেদারনাথের বস্তি। বেশ কিছুদিন হয় এখানে থাকছে শকুন্তলা। কেদারনাথের বস্তি গোয়ালিয়র রাজধানীর শহরতলীতে। সে এক মামুলী কৃষক। কিন্তু তার শ্রেষ্ঠত্ব ও লোক-লৌকিকতায় সমাজে বিশেষ একটা পরিচিতি ছিলো। কেদারনাথের বস্তিতে ছিলেন এক ঠাকুর। তিনি একজন প্রভাবশালী লোক। পার্শ্ববর্তী কয়েকটি বস্তির মালিক। গোয়ালিয়রের এক মন্ত্রী তার আত্মীয়। জনপদের লোক তার ইশারায় জান দিতে প্রস্তুত। জনপদের সর্দারগণ তার সামনে নওকরদের মত জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে থাকত। ঠাকুর মহাশয় কেদারনাথকে বেশ সমীহ করতেন।

কেদারনাথ নিঃসন্তান। শকুন্তলার আগমণে তাদের ঘর আলোকিত হয়। ফুলে ফেঁপে ওঠে তারা খুশিতে। তারা প্রতিবেশীদের লক্ষ্য করে বলতো, 'সবরের ফল খুব মিষ্ট হয়ে থাকে। ভগবান আমাদের এমন এক মেয়ে দান করেছেন- চাঁদ-সূর্য যাকে দেখে ঈর্ষা করে। স্রোতস্বিনী গঙ্গা জলের মত ওর ঝিলিক। নিঃসন্তান আমরা, আর ও নিঃসঙ্গ। জুটি মিলেছে বেশ। ভগবানের কৃপায় ওকে গঙ্গা তীরে কুড়িয়ে পেয়েছি।'

কিছুদিনের মধ্যে শকুন্তলার রূপ যশ ঠাকুর মহলে পৌঁছে গেল। ঠাকুর স্ত্রী ওর মুখ দর্শনের খায়েশ ব্যক্ত করলো। কেদারনাথের স্ত্রী শকুন্তলাকে নিয়ে ঠাকুরের মহলাভিমুখী হয়। শকুন্তলার পড়নে দামী পোশাক। শকুন্তলার নজর কাড়া সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে ঠাকুর কন্যা ভগুনতি ওর সাথে সই পাতায়।

শকুন্তলা চিন্তা করে- জয়কৃষ্ণের মত ধুরন্ধর ব্যক্তি ওকে না পেয়ে চুপ করে থাকবে না। এভাবে সকলের সাথে মিললে একদিন আমার খবর পণ্ডটার কর্ণে

পৌঁছে যাবে। কেদারনাথ ও তার স্ত্রী ছাড়া কেউ ওর অতীত জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলে বলতো- এ দুনিয়ায় এক ভাই ছাড়া আমার আর কেউ নাই। মুসলমানের বন্দীখানায় সে এক্ষণে মৃত্যুর প্রহর গুণছে।

দুই মাস পর। একদিন কেদারনাথ রণবীরদের জনপদাভিমুখী হয়। ফিরে এসে জানায়- 'তোমাদের জনপদের খবর খুব একটা ভালো না। অতএব অতীত কাহিনী কাউকে বলো না যেন। কনৌজের রাজার সাথে জয়কৃষ্ণের অকৃত্রিম ভাব ছিলো। নয়া রাজা ও গোয়ালিয়রের মহারাজার মাঝে ছিল বন্ধুত্ব। তুমি এ জনপদে জানলে- এ গাঁও বরবাদ করে দেবে ওরা। তোমার সন্ধানে সে বিশাল এনামের ঘোষণা দিয়েছে। এলাকার সকল সর্দার তার তল্পীবাহক হয়ে গেছে। তোমার ভাই দ্বিতীয় বার জনপদে পা রাখেনি।

এরপর ভাইয়ের সম্পর্কে শকুন্তলার পেরেশানী বেড়ে যায়। একদিন ও শুনতে পেলো, কনৌজ দখল করে সুলতান মাহমুদ জলন্ধর ও রাচীভিমুখী হয়েছেন। ওর মনে সাহসের সঞ্চয় হলো। বললো কেদারনাথকে লক্ষ্য করে- 'জ্যাঠা মশাই! আপনি আরেকবার আমাদের জনপদটা ঘুরে আসুন। হতে পারে- দাদার সাথে আপনার দেখা হবে। আমার একীন- কনৌজ রাজের সাহায্য না পেলে জয়কৃষ্ণের স্বপ্নের ঠিকানা এতোক্ষণে মিসমার হয়ে গেছে। আমার দাদা হতাশ হলেও হতোদ্যম হবার পাত্র নন। মওকা পেলে তিনি হামলা করতে পিছপা হবেন না। ধর্মযুদ্ধে তার অশ্রুতপূর্ব আত্মত্যাগের কথা লোক মুখে নন্দিত। নিঃসন্দেহে জনপদবাসী তার সঙ্গ দিয়েছে।'

কেদারনাথ বললো, 'আমার ধারণাও কতকটা তাই। কনৌজ রাজের সাথে জয়কৃষ্ণের লোকজনও ভেগেছে। কনৌজবাসী ঐ সব সর্দারদের উপর খুব ক্ষ্যাপা, যারা তারালোচন পালের বিরুদ্ধে রাজকুমারকে লেলিয়ে দিয়েছিল। আমি আবার যাব। শান্ত হও খুকি।'

পরের দিন। কেদারনাথ রণবীরদের জনপদাভিমুখী হল। জনপদে প্রবেশ করতেই নয়া খবর শুনে তার বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেলো। তার মন কিছুতেই মানতে চাইলো না যে, শকুন্তলার দাদা মুসলিমদের দলভূক্ত হয়ে জনপদ দখল করেছে। কিন্তু গোটা জনপদবাসী এ কথার সত্যায়ন করলে তার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু শকুন্তলার কথা সে কাকে বলবে? কিভাবে? বারবার মনকে প্রশ্ন করলো। ফিরে গিয়ে কি শকুন্তলাকে বলবো, তোমার গর্বিত দাদা দেশ জাতি ও ধর্মের দুশমন হয়ে গেছে?

রণবীরের জনপদে পৌঁছে জলন্ধরের পতন খবর শুনে তার মনে চোট লাগলো। এই প্রথম রণবীরের বিরুদ্ধে তার মনে ঘৃণা ও ধিক্কারের সৃষ্টি হলো। বাড়লো তা ক্রমে ক্রমে। শকুন্তলার খবর কাউকে না দিয়ে নদীর পাড় হয়ে সে শ্বশুরবাড়ীভিমুখী

হলো। কাটালো সেখানে ক'টা দুঃসহ দিন। ভাবছিলো- রণবীরের অপেক্ষা না করেই প্রত্যাবর্তন করবে। কিন্তু তড়পানো হৃদয় তাকে যেতে দিল না।

চারদিন পর। সে রণবীরের সংবাদ পেলো।

ও বাড়ীতে এসেছে। যখন শুনতে পেলো সুলতান মাহমুদকে ধন-জন দিয়ে মদদ করার ফলশ্রুতিতে ওকে জনপদের যাবতীয় সর্দারদের শিরোমণি বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন তার ঘৃণা ও ধিক্কারে যতটুকু ভাটা পড়েছিলো, তা উথলে উঠলো। এক্ষণে ওর মুখ দর্শন করা পাপ। যাব না শকুন্তলার খবর নিয়ে। দেশ ও ধর্মের মুখে চুনকালি দেয়া ব্যক্তিত্ব শকুন্তলার দাদা হতে পারে না। ফিরে গিয়ে ওকে বলবো- তোমার দাদা মরেছে।

কেদারনাথের বউ উঠানে বসে চড়কায় সুতো কাটছিলো। আচানক শুনতে পেল দামাল শিশুদের সমস্বর- 'জ্যাঠা এসেছেন। জ্যাঠা এসেছেন। কি মজা! কি মজা!!'

উঠানে প্রবেশ করে এদিক ওদিক তাকিয়ে কেদারনাথ বললো, 'শকুন্তলাকে দেখছি না যে?'

'ঠাকুর কন্যার কাছে গেছে। দীর্ঘ সময় খর্চা করে এসেছেন। ওর দাদার কোন সংবাদ পেলেন?' স্ত্রীর কণ্ঠে উৎকণ্ঠার সুর।

মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো কেদারনাথের। ধপাস করে বসে পড়লো স্ত্রীর পাশটিতে। স্বামীকে শুকনো মুখ দেখে চড়কা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আসুন! খানা খাবেন।'

'না। পথিমধ্যে এক বাড়ীতে ও কাজ সেরে এসেছি। ঠান্ডা জল থাকলে দাও।'

'দুধ নিয়ে আসি?'

'না। শুধু জল।' কেদারনাথের কণ্ঠে বিরক্তি।

কেদারনাথের বউ জগ ভরে পানি নিয়ে এলো। বসে পড়লো একটি মোড়া নিয়ে স্বামীর পাশে। পানি পান করে স্ত্রীকে বললো, 'আমার ভয় হচ্ছে, সত্য কথা বললে শকুন্তলা তকলীফ পেতে পারে।'

'কি হয়েছে?' স্ত্রীর কণ্ঠে রাজ্যের হতাশা।

'ওর ভাই জনপদ কব্জা করে নিয়েছে। কিন্তু দলভুক্ত হয়েছে সে মুসলমানদের। কনৌজের ওপর মুসলিম বাহিনীর হামলা তার গাদ্দারীর পাপ ফসল। জলন্ধরের যুদ্ধে সে মুসলমানদের সঙ্গ দিয়েছে। ওর শ্রমবলে পার্শ্ববর্তী সর্দারগণ মুসলমানদের আনুগত্য কবুল করে নিয়েছে। এমন কি ওর পাল্লায় পড়ে সর্দারগণ মুসলমানের হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।'

'শকুন্তলার দাদার তো এমনটি হবার কথা নয়। ওর দৃষ্টিতে রণবীর অবতারতুল্য। ভগবানের দিকে তাকিয়ে এ কথা শকুন্তলার কানে দিবেন না। ও ক্ষোভে দুঃখে গলায় দড়ি দেবে। পারবে না অবাঞ্ছিত এ খবর হজম করতে।'

'কিন্তু ওকে ধোঁকা দেই কেমনে?'

'রণবীর ম্লেচ্ছ হয়ে থাকলে শকুন্তলার সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। দাদার করুণ পরিণতি শুনলে দেখা তো দূরের কথা, শকুন্তলা ওর লাশ ছুঁবে না। ভগবানের দোহাই। শকুন্তলার কাছে এ সংবাদ গোপন রাখবেন। ওকে বলবেন- রণবীর এখন পর্যন্ত গাঁয়ে ফিরেনি। এ খবর আপাতত গোপন থাকলে আমরা ওকে সৎপাত্রে পাত্রস্থ করতে পারব। ঠাকুর স্ত্রী ওর উপর খুব রহমদিল। সম্ভবতঃ ছেলের জন্য ওকে নির্বাচন করেছেন। ঈশ্বর না করুক, ওকে রণবীরের বোন জানলে- হতভাগীর কপাল পুড়বে। কেউ ওর পাণি গ্রহণ করবে না।'

কেদারনাথ কিছু বলতে চাচ্ছিল। বলা হলো না। উঠানোর দরজা ঠেলে প্রবেশ করলো শকুন্তলা। ও এসে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালো কেদারনাথের দিকে। কেদারনাথ দাঁড়িয়ে ওর মাথায় হাত রেখে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললো, 'খুকি! তোমার জন্য কোন সুসংবাদ আনতে পারিনি। তোমার দাদা লাপাত্তা।'

শকুন্তলা আর্তস্বরে বললো, 'আমাদের গাঁয়ে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তার হদিস নেই।'

'আমাদের মহল কি এখনও জয়কৃষ্ণের দখলে?'

কেদারনাথ ওর দেবীতুল্য চেহারা পানে তাকিয়ে মিথ্যা কথা বলতে লজ্জা পেল। শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী বললো- হ্যাঁ।

শকুন্তলার চোখে অশ্রু উছলে ওঠে। কেদারনাথ সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে- 'খুকি। প্রথমবার যখন তোমাদের ওখানে যাই তখন শুনতে পাই- জয়কৃষ্ণের বন্দী দশা থেকে তাকে মুসলিমরা ছাড়িয়ে নিয়েছে। তুমি তকলীফ পাবে জেনে একথা পূর্বে বলিনি। জানলাম- কনৌজ হামলার পিছনে মুসলিম বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানাতে তোমার দাদার হাত সক্রিয় ছিলো। আমার ধারণা ভুল হয় যেন ভগবান!'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো শকুন্তলা, 'দেবতুল্য দাদার ব্যাপারে আপনার এ ধরনের মন্তব্য আমার সহ্যের বাইরে। দুনিয়া বদলাতে পারে, কিন্তু দাদা আমার বদলাবে না। মুসলিমদের মদদ করে তিনি মহারাজা হয়ে গেলেও আলীশান রাজ মহলে না গিয়ে আমি ভিক্ষা করে পেট চালাব।'

॥ তিন ॥

ঠাকুর কন্যা শকুন্তলার অকৃত্রিম সখীত্ব বরণ করেছিলো। দু'তিন দিন অন্তর সে শকুন্তলাকে ডেকে পাঠাত। কনৌজ থেকে কেদারনাথের প্রত্যাবর্তনের পর ওর অসহায়ত্ব বেড়ে গেল। বার দু'য়েক ভগুনতির চাকরানী ওকে নিতে এসেছিলা। যায়নি একবারও। তবিয়ত ভালো নেই, জানিয়ে দিয়েছে সরাসরি।

একদিন ভগুনতি সরাসরি ওর সাথে দেখা করতে এলো। নিয়ে গেলো জোরপূর্বক ওকে। ঠাকুর বাড়ীর উঠানে প্রবেশ করে দেখলো- দরজা ঠেলে এক নওজোয়ান বেরিয়ে আসছে। সে মৃদু খুড়িয়ে চলছিলো।

'কোথায় যাও দাদা!' ভগুনতি নওজোয়ানের কাছে ঘেঁষে জিজ্ঞাসা করলো।

'বাইরে।'

শকুন্তলা এর পূর্বে ভগুনতির দাদাকে দেখেছে কিন্তু খুড়িয়ে চলতে দেখেনি তখন। কিছুদূর গিয়ে সে ভগুনতিকে খোড়া হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ভগুনতি বললো, 'দাদা এক যুদ্ধে পঙ্গু হয়েছে।'

'কোন্ যুদ্ধে?'

'লমগান যুদ্ধে আমাদের জনপদ থেকে কিছু স্বেচ্ছাসেবী গোয়ালিয়রের রাজার সাহায্যে গিয়েছিলো। দাদা ছিলো তন্মধ্যে একজন। যুদ্ধকালে ঘোড়ার পিঠ থেকে ভূ-তলে পড়লে ওর পা ভেঙ্গে যায়। বন্দী হয় ও। যুদ্ধ শেষে মুসলিমরা অনেক সৈন্যকে ছেড়ে দিয়েছিলো। কিন্তু ওকে নিয়ে নন্দনার কেল্লায় বন্দী করে রাখে। নন্দনা থেকে কিছু কয়েদী মুক্তি পেয়ে বাবার কাছে এসে বলেছিলো- আপনার ছেলে নন্দনা দুর্গে বন্দী। বাবা গেলেন। ছাড়িয়ে আনলেন মুক্তিপণ দিয়ে ওকে।'

'আপনার দাদা নন্দনার কেল্লায় বন্দী ছিলো?' শকুন্তলা প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ।'

'আমার দাদাও তো ছিল ওখানে।'

ভগুনতি চকিতে চাকরানী দিয়ে দাদাকে ডেকে পাঠালো। শকুন্তলাকে নিয়ে প্রবেশ করলো সুদৃশ্য একটি কামরায়। খানিক পর ভগুনতির দাদা গোলাপ চাঁদ প্রবেশ করলো। শকুন্তলা ওকে দেখে ভূমিকা ছাড়া জিজ্ঞেস করলো ঃ 'আমার দাদা নন্দনায় বন্দী ছিলেন। আপনি তাকে চিনবেন হয়তো। নাম রণবীর।'

'রণবীর? সে আপনার দাদা?' গোলাপ চাঁদ শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে বললো।

'আপনি তাকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। আমি তার সাথে একই কুঠরীতে ছিলাম। কেল্লার তামাম কয়েদী ওকে চিনে।'

'তিনি এক্ষণে কোথায় বলতে পারবেন কি? ভগবানের দিকে চেয়ে বলুন!'

'আমার মুক্তির এক হপ্তা পূর্বে ওকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। আমি তো অবাক, সে আপনার কাছে আসেনি এখনও?'

'এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর আগমনের পূর্বে জনপদের এক কুলাঙ্গার আমাদের মহল কব্জা করে নেয়। দুশমনের হাতে বন্দী হন তিনি। পরে অবশ্য তিনি ফেরার হন। ভগবান ভালো জানেন- উনি এক্ষণে কোথায়, কেমন আছেন?'

গোলাপ চাঁদের পীড়াপীড়িতে শকুন্তলা তার করুণ কাহিনী সংক্ষেপে তার সামনে তুলে ধরে। গোলাপ চাঁদ কাহিনী শুনে বললো, 'আপনার দাদা অমন নিকৃষ্ট দুশমনের ভয়ে কাবু হতে পারেন না। জীবিত থাকলে সে অবশ্যই নন্দনা গেছে। নন্দনার কেল্লাপ্রধান ওর প্রতি খুব সদয় ছিলেন। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, কেল্লা প্রধান ওকে যথাসাধ্য মদদ করবেন।'

শকুন্তলার চেহারা আচানক রক্তাভ হয়ে গেলো। গোস্বা কম্পিত কণ্ঠে বললো, 'আমার দাদা এমন কাপুরুষ নন যে, মুসলিমদের অনুকম্পায় জীবন-মৃত্যুর তোয়াক্কা করেন।'

'আপনার দাদার নিন্দাবাদ করছি না আমি। তার স্থলে আমি হলে এ ছাড়া কিছু করার থাকতো না আমারও। কেল্লাপ্রধান খুব মিশুক প্রকৃতির ছিলেন। সকলের সাথে তার ভাব গলায় গলায় ছিলো। নন্দনা বন্দীর কাউকে পেলে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, তারা বলতে বাধ্য-তিনি মানুষ নন, দেবতা। আপনার দাদা জ্বরে আক্রান্ত হলে তিনি নিজ হাতে ওর সেবা করেছেন। আপনার দাদার জিন্দেগী হতাশায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, জীবিত থাকার তামান্না ওর দিলে পয়দা করেছেন তিনি। এক্ষণে নন্দনামুখী হওয়াটা ওর জন্য বিচিত্র কিছু নয়। আমার একীন, আব্দুল ওয়াহিদকে যারা একবার দেখেছে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করবে না জীবনেও।'

'দাদা নন্দনা গেলে আপনার নন্দিত আব্দুল ওয়াহিদের সহায়তায় এতোদিনে আমাদের জনপদ কব্জা করার কথা। জ্যাঠামশাই জনপদে গিয়ে দাদার কোন সংবাদ পাননি।'

'আপনার দাদা নন্দনায়ই গেছে, সে কথা বললাম কখন? হতে পারে গেছে অন্য কোথাও। অপেক্ষা করছে জনপদ উদ্ধারের জন্য। যাহোক, জিন্দা থাকলে সে জনপদে ফিরবেই। খোদ আমি যাব ওর তালাশে।'

॥ চার ॥

জলন্ধর বিজয়ের পর উত্তর ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান অপশক্তি সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে বাধ সাধে। এ জন্য দক্ষিণ ভারতের আক্রমণ স্থগিত রেখে তাঁকে উত্তরমুখো হতে হয়। রণাঙ্গণে পরাভূত হওয়া সত্ত্বেও রাজা গেন্ডার ক্ষতি তেমন একটা হয়নি- যদ্দরুন সে তার বাঁকা কোমড় সোজা করতে পারবে না। জলন্ধরের সুরক্ষিত কেল্লা তার আখেরী ভরসা। সুলতান মাহমুদের এখানে প্রবেশ খুব একটা যুৎসই হবে না বলে রাজা গেন্ডা মনে করতেন। সুতরাং যুদ্ধক্ষত চাঙ্গা করে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য তিনি তৈরি হতে থাকেন।

আব্দুল ওয়াহিদ কনৌজে ছিলেন। তার পদমর্যাদা একজন গভর্নরের চেয়ে বেশী। কনৌজের দিনগুলি কাটছিলো তার ধর্মপ্রচারক হিসেবে। আওয়ামের হৃদয়ে সুলতান মাহমুদের ভীতি ও শক্তি মদ-মত্ততায় ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের মন মুকুরে এমন এক বৈপ্লবিক চেতনা সৃষ্টি করা তাঁর দিন রাত্রির সাধান ছিলো- যা বিনে ভারতবাসীর মুক্তি নেই। শাহী খান্দানের লোকজন ছাড়া যুদ্ধ শেষে জনপদের কায়েমী সর্দারগণ সুলতানের আনুগত্য কবুল করেন। তন্মধ্যে এমনও সর্দার ছিলেন- যারা তাঁদের ভবিষ্যৎ জলন্ধর প্রশাসনের সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন। রাজা গেন্ডার অকস্মাৎ পরাজয়ে তারা সুলতান মাহমুদকে বেছে নেন। আব্দুল ওয়াহিদের কাছে এসে স্বীকার করেন তার আনুগত্য। তাদের একীন- রাজা গেন্ডার পিছু ছাড়ছেন না মহামান্য সুলতান। অচিরেই জলন্ধরের পাথুরে জমীন প্রকম্পিত হবে তাঁর অশ্ব খুড়ে।

আব্দুল ওয়াহিদ প্রভাবশালী লোকদের লক্ষ্য করে বলতেন- 'সুলতান মাহমুদের চোখে প্রিয়পাত্র হবার জন্য নিছক তাঁর মৌখিক আনুগত্য মেনে নিলে হবে না বরং প্রিয়পাত্র হতে হবে আওয়ামের কাছেও। এ ছাড়া আপনারা নেতৃত্বের আসনে টিকতে পারবেন না। সুলতানের দরবারে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ নেই। তিনি যে মৌল অবকাঠামোতে বিশ্বাস করেন, তা মানুষকে বাঘ আর বাঘকে ভেড়ার পালের উপর বন্টনকারী সামাজিক প্রথার প্রতি মুষ্ঠাঘাতের নামান্তর।'

কনৌজের সর্দারগণ আওয়ামের চেয়ে আব্দুল ওয়াহিদের মাধ্যমে সুলতানের প্রিয়পাত্র হবার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন। আব্দুল ওয়াহিদ কনৌজের সব বাড়ীতে আনাগোনা করতেন। শুনতেন আওয়ামের অভিযোগ। দিতেন সর্দারগণকে তাদের দায়িত্বানুভূতি। হিন্দী নওমুসলিমগণ কনৌজের কোণে কোণে ইসলাম প্রচার নিয়ে থাকতেন মশগুল। এসব জীবন উৎসর্গকারী মুবাল্লিগগণ স্থানীয় সর্দারগণের জাত পাত প্রথার প্রতি বৃদ্ধাংগুলি দেখিয়ে যেতেন নীচু আওয়ামের দরজায়। নিতেন তাদের খোঁজ খবর।

নিম্ন শ্রেণীর লোকজন উপলব্ধি করতে পারলো- শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জুলুমের যে জগদ্দল পাথর তাদের মাথার উপর জেঁকে বসেছিলো, তার অপসারণ ঘটতে যাচ্ছে। ইনসাফের সুমহান আদর্শ বুকে আগলে এসব ধর্মপ্রচারকগণ তাদের বরণ করে নিতে এসেছে। জাতপাত ভেদের আলীশান মহল বুঝি ভেঙ্গে দিতে এসেছেন তাঁরা। এসেছেন প্রতিষ্ঠা করতে সৌভ্রাতৃত্বের অনুভূতি। এই প্রথম দেবতা শাসিত ভারত ভূমিতে ওরা নিজেদেরকে মানুষ ভাবতে শুরু করল।

কিন্তু আওয়ামের এ অনুভূতিতে প্রমাদ গুণলো কায়েমী সর্দারগণ। যারা কিছুদিন পূর্বে সদলবলে সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করেছিলো, তারা এক্ষণে উপলব্ধি করতে লাগলো- নিম্নশ্রেণীর লোকজন যে হারে আস্কারা পাচ্ছে, তাতে তাদের ক্ষমতা বেশী দিন টিকবে না। অচিরেই অচ্ছুৎ শ্রেণীর মজবুত হাত তাদের শাহরগে পৌঁছে যাবে। বিশেষ করে রাজপূতগণ এ গরম হাওয়া আঁচ করছিলেন বেশ পূর্বেই। তাঁরা কায়েমী সর্দারদের কাছে গিয়ে বুঝাতেন- 'তোমাদের নেতৃত্বের দিন ঘনিয়ে আসছে। মুসলিম জাতিকে এভাবে পাইকারী হারে ধর্ম প্রচারের সুযোগ দিলে তোমরা উচ্চ শ্রেণীর সৌধ চূড়া হতে ছিটকে পড়বে অচ্ছুৎ শ্রেণীর ক্লেদাক্ত ময়লা স্তূপে। এখনো সময় আছে। জাগো! ধর্ম ও ভারত মাতার দুশমনদের দল ভারী করে নিজেদের পায়ে কুঠার মেরো না। জলন্ধর রাজ এমন এক বিশাল সৈন্য বহর জোগাড় করছেন- যার স্রোতধারায় খড়কুটোর মত ভেসে যাবে সুলতান মাহমুদের ফৌজ। প্রস্তুত হও। চূড়ান্ত লড়াই আসন্ন। ভারত মাতার ইজ্জত রক্ষা করো।'

বিশেষ করে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর পীড়াপীড়িতে কনৌজের সিংহভাগ সর্দার রাজা গেন্ডার সাথে তাদের ভবিষ্যত জুড়ে দেন।

'উনি আসছেন। অতিক্রম করছেন গোয়ালিয়র সীমান্ত। অবরোধ করছেন গোয়ালিয়রের কেল্লা।'

কনৌজবাসী প্রতিনিয়ত এ খবর শুনতো। সকলে পেরেশানী সংযত করে ভবিষ্যত পরিণতি নিয়ে ভাবতো-- এরপর কি হবে? একদিন তারা শুনতে পেলো-রাজা অর্জুন হাতিয়ার সমর্পণ করেছেন।

ঠাকুর পূত গোলাপ চাঁদ রাজার সাহায্যার্থে শ' আষ্টেক সেপাই নিয়ে গোয়ালিয়র গিয়েছিলো। অপেক্ষা করছিলো গাঁয়ের লোকজন যুদ্ধের ফলাফল শোনার জন্য। ভগুনতির পেরেশানীর অন্ত নেই। তার যত চিন্তা ভাইকে নিয়ে। কেদারনাথ ওর সান্ত্বনার জন্য শকুন্তলাকে কিছুদিন ঠাকুর বাড়ী থাকার অনুমতি দিলো।

এক দুপুরে মহলের এক কামরায় ভগুনতি ও তার মায়ের সাথে শকুন্তলা আলাপ করছিলো। আচানক শুনতে পেল সম্মিলিত অশ্ব খুড়ধ্বনি। আলাপ ছেড়ে তিনজনই বাইরে বেরুলো। হন্তদন্ত হয়ে এক নওকর কামরায় প্রবেশ করে বললো, 'ছোট ঠাকুর এসে গেছেন।'

খানিক পর। গোলাপ চাঁদের সাথে কোলাকুলি করছিলেন বড় ঠাকুর। বাবার সাথে আলাপ সেরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গোলাপ চাঁদ অন্দরের দিকে পা বাড়ালো। মহলের বাইরে উৎসুক জনতার ভীড়। তাদের সাথে কথা বলতে বড় ঠাকুর বাইরে এলেন। শকুন্তলার পেরেশানীর অন্ত নেই- পরাজয়ের পরেও গোলাপ চাঁদের চেহারায় হতাশা ও বিষাদের ছায়া নেই কেন?

নতজানু হয়ে মাকে প্রণাম করে গোলাপ চাঁদ শান্ত-স্থির কণ্ঠে ভগুনতির দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার সখীর জন্য আমি এক সুসংবাদ নিয়ে এসেছি।'

'কি সুসংবাদ?' ভগুনতি প্রশ্ন করলো।

ভগুনতির কথার জওয়াব না দিয়ে শকুন্তলার দিকে চেয়ে বললো, 'আপনার ভাই জীবিত।'

এক মুহূর্তের জন্য শকুন্তলার অনুভূতি দু'চোখের মধ্যে এসে জমা হলো। আনন্দ আতিশয্যে সে বললো, 'কোথায়? কার কাছ থেকে জানলেন তাঁর সন্ধান?'

'আমি স্রেফ এতটুকু জানি- সে জীবিত। যিনি খবর দিয়েছেন- এর চেয়ে বেশী বলেননি তিনি। সংবাদদাতা আগামীকাল নাগাদ এসে পৌঁছবেন এখানে। আপনার পেরেশানী দূর হলো তো?'

'কে এই ব্যক্তি?'

'আব্দুল ওয়াহিদ। ইনিই আপনার দাদাকে বন্দীদশা থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। সুলতান মাহমুদের পক্ষ থেকে সন্ধি করতে রাজমহলে এসেছিলেন। ওখান থেকে বের হলে তার সাথে সাক্ষাৎ হয়। আমাকে দেখেই উনি চিনে ফেললেন। সাথে ছিলো কিছু মুসলিম অফিসার। মন্ত্রীবর্গ ও সেনাপতি মহোদয়গণ অতিথিকে বিদায় জানাতে প্রধান ফটক পর্যন্ত এসেছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে রণবীর প্রসঙ্গ তুলতে পারিনি। তিনি অবশ্য আমাকে দেখা মাত্রই উষ্ণ আলিঙ্গন করেন। ভূমিকার পরিসর না বাড়িয়ে সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রণবীর সম্পর্কে কিছু জানেন কি?'

'জ্বী। জানি।'

'তার বোন আমাদের গাঁয়ে নেহাৎ পেরেশানী সহকারে দিনাতিপাত করছে। আমি ওর সন্ধান চাই।'

হয়রান হয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন। অনুমান করলাম- আমার হাতের মুঠো তিনি শক্ত করে ধরছেন। বললেন- 'এসো আমার সাথে। বাইরে এতমিনানের সাথে আলাপ করবে।'

তার সাথে বাইরে এলাম। বহু প্রশ্ন করলেন তিনি আপনাকে নিয়ে। শুনালাম তাকে আপনার করুণ উপাখ্যান অতি সংক্ষেপে। তিনি বললেন, 'রণবীরের বোন নিজ গ্রামে কেন খবর নিলেন না?'

আমি বললাম, 'কেদারনাথ ওর আশ্রয়দাতা। তিনি ওদের জনপদে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ী এসে তিনি জানালেন- জনপদ জয়কৃষ্ণের কব্জায় এখনও। রণবীর লাপাত্তা।'

'কেদারনাথ বাস্তবিকই ওদের জনপদে গেলে এ ভূয়া সংবাদ দিতে পারতেন না।'

'আমি তাকে শত বুঝালাম- কেদারনাথ মিথ্যা কথা বলার মত লোক নন। তিনি এক নীতিবান রাজপুত।'

আব্দুল ওয়াহিদ বললেন, 'আমি তোমাকে এক গুরুত্বপূর্ণ খেদমত করতে সুপারিশ করছি। এখুনি বাড়ী যাও। আমি না আসা পর্যন্ত থাকবে বাড়ীতেই। রণবীরের বোনকে হেফাজত করো। হুকুমতের কাছ থেকে এজাযত পেলে আগামীকল্য তোমাদের ওখানে যাব। অন্যথায় ছোট খাটো একটি অভিযান আছে, তা সেরে যাব। কেদারনাথ আমাদের মোলাকাত সংবাদ না জানলেই ভালো।'

'বারবার তাকে রণবীর কোথায়- জিজ্ঞেস করলাম। তাঁর একই উত্তর- ও জিন্দা আছে। একবার ভুলেও বললেন না- অমুক স্থানে আছে। ক'দিনের মধ্যে আসছে। তিনি শুধু বললেন- রণবীরের বোনকে বলো, আমি তার দাদার বন্ধু। সাক্ষাতে তাকে

সব খুলে বলবো। জনপদে নিয়ে আসার জন্য আমাদের এক লোককে তাঁর কাছে রেখে এসেছি। সম্ভবতঃ আগামীকাল অতি প্রত্যুষে তাকে দেখতে পাবেন। অবশ্য তার হাতে সময় খুব একটা নেই। আসবেন আর যাবেন, এই যা। এজন্য কেদারনাথের ওখানে না গিয়ে আজ আমাদের বাড়ীতে থেকে যান।'

গোলাপ চাঁদের কথায় তার মা-বোন উপলব্ধি করলো- রাজার পতন ও গোয়ালিয়রের ভবিষ্যত নিয়ে ওর কোন আকর্ষণ নেই। ও যতটা স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তে শকুন্তলার সাথে কথা বলছিলো, ততোটা পেরেশানী নিয়ে মা ও বোন ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো। শেষ পর্যন্ত মা বললেন, 'খোকা! এখন গোয়ালিয়রের কি হবে? '

'মা। গোয়ালিয়র নিয়ে ভাবছেন কেন? গোয়ালিয়রের ভবিষ্যৎ এক্ষণে রাজা মহাশয় ও মন্ত্রীবর্গের হাতে। মুসলিমদের সাথে সন্ধিচুক্তি করলে ল্যাঠা চুকে যায়। খামোকা রক্তারক্তির চেয়ে এই ভালো। সুলতান মাহমুদকে রোখার মত শক্তি এদেশে নেই। রাজা মহাশয় পুনরায় ভুল করে বসলে মনে রাখবেন- বাঘের আখেরী হামলা মারাত্মক হয়ে থাকে। গোয়ালিয়র প্রশাসনের জন্য এই শ্রেয় যে, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে আর তরবারী ধারণ করবে না।'

ভগুনতি বললো 'ভুল। গোয়ালিয়র পরাজয়ের পর মনে করছো, হিন্দু সন্তানদের কোমড় ভেঙ্গে বাঁকা হয়ে গেছে? তারা সীনা টান করে আর দাঁড়াতে পারবে না?'

'আমার যদ্দুর বিশ্বাস, কিছুদিন পর দেখবে গোয়ালিয়রের আওয়াম মুসলমানদেরকে দুশমন ভাবছে না।'

মা বললেন, 'খোকা! তোমার ধারনা, এ পরাজয়ের তেঁতো স্বাদ তারা হজম করবেন?'

'না, মা! এটা গোয়ালিয়র আওয়ামের পরাজয় নয়। পরাজয় প্রশাসনের। পরাজয় সমাজ কর্তাদের। পরাজয় ঐ প্রশাসকের যিনি আওয়ামকে রাখালের আশ্রয়ে না দিয়ে, দেন বাঘের মুখে। পরাজয় ঐ সব পৈতাধারী ব্রাহ্মণদের- যারা কেবল নিজেদেরই মানুষ মনে করেন। এ পরাজয়ের তেঁতো স্বাদ হজম করবেন তারা- যারা মজলুম মানবতার শুষ্ক হাড্ডির উপর প্রমোদ ভবন নির্মাণ করেন। এ পরাজয় ঐ সব দেবতাদের- যারা আওয়ামের মাঝে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার বিভাজন সৃষ্টি করেছেন। মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী এ পরাজয়কে মেনে নিতে না পারলেও, যুগ যুগ ধরে তাদের স্টীম রোলারে পিষ্ট মজলুম আওয়াম বিজয় ভেবে ঠিকই একে বুকে আগলে নিবে।'

শকুন্তলা বললো, 'আপনি একজন রাজপুত হয়ে একথা বলতে পারলেন?'

'হ্যাঁ। একজন রাজপুতের জিহবায় একথা শোভা পায় না ঠিকই। কেননা নামের গুণ, দৌলত ও হুকুমতের আশীর্বাদ আমার মাথায় ছায়া করে ছিলো এতোদিন। কিন্তু সে পট পরিবর্তন হয়ে গেছে। একজন রাজপুত হয়ে অপ্রত্যাশিত পরাজয়কে স্বীকার করে নিচ্ছি। এক্ষণে আমাদের মুকাবিলা সে সমাজের বিরুদ্ধে নয়- যে সমাজ আমাদের তলোয়ার ও দেবতাদের দাপটে প্রভাবিত। বরং এমন এক দুর্ধর্ষ জাতির বিরুদ্ধে যারা সর্বদিক দিয়ে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

'আপনি তো তাদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন!'

'বাবার হুকুম শিরোধার্য। তাই গিয়েছিলাম। কিন্তু যাবার পূর্বে একীন ছিলো- মুসলমানদের সামান্য আক্রমণেই রাজা মহাশয় হাতিয়ার সমর্পণ করতে বাধ্য হবেন।'

মা বললেন, 'খোকা! ভগবানের দিকে তাকিয়ে তোমার বাবার সম্মুখে এমনটি বলো না। ঐ তো তিনি আসছেন।'

'মাগো! আপনি পেরেশান হবেন না। বাবা আমার চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞ।'

বড় ঠাকুরের সাথে এসেছেন গ্রামের দু'জন বয়স্ক লোক। তিনি উঠানে প্রবেশ না করে হাতছানি দিয়ে গোলাপকে ডাকলেন। চলে গেলেন বৈঠকখানায়। গোলাপ চাঁদ বাবার অনুসরণ করলো।

॥ দুই ॥

ভগুণতি হন্তদন্ত হয়ে কামরায় প্রবেশ করে বললো, 'শকুন্তলা! উনি আসছেন। ঠিক আমাদের মহলের দিকে।'

শকুন্তলা ওর মায়ের কাছে বসেছিলো। ভগুনতির কথা শুনে পেরেশান হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। ইতস্তত: করে ভগুনতিও তার মা অন্য কামরায় চলে গেলো।

ধক্ ধক্ করে কাঁপছে শকুন্তলার মন। একে তো নিঃসঙ্গতা তার উপর দেবতুল্য দাদার জীবন দাতা। তাও আবার জাদরেল মুসলিম অফিসার। কিভাবে তাঁর সাথে কথা বলবো! বলতে পারবো তো কথা। নাকি হৃদয়ের আবেগ কম্পিত ঠোঁটের কাছে এসে থেমে যাবে?, এমনি হাজারো চিন্তার জাল বুনছিলো শকুন্তলা। খানিকপর শুনতে পেল লঘু পদধ্বনী। বাড়লো পূর্বেরচে' হৃদয়ের ধুক্ ধুকুনী।

গোলাপ চাঁদ দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি মেরে বাইরে তাকিয়ে বললো, 'তাশরীফ রাখুন!'

বড় ঠাকুরের সাথে আব্দুল ওয়াহিদ কামরায় প্রবেশ করলেন। চার চোখের মিলন হতেই আব্দুল ওয়াহিদ মাথা নীচু করলেন। সাথে সাথে অনিন্দ্য সুন্দরী

পটলচেরা নয়নবিশিষ্ট এক যুবতীর প্রেম পরশ তার হৃদয় কন্দরে উষ্ণ হাওয়া বুলিয়ে যায়। আবার মস্তকোত্তলন করেন। তাকান ওর দিকে। এবারের চাহনি পূর্বের চেয়ে গভীর। তার গভীর দৃষ্টি বলছিলো- সত্যিই তুমি অপরূপা শকুন্তলা!

ঠিক সেই মুহূর্তে হুবহু আরেকটি চেহারা তার সম্মুখে উদ্ভাসিত হলো। আনমনে উচ্চারণ করলেন 'আশা'।

গোলাপ চাঁদ পেরেশান হয়ে বললো, 'এতো রণবীরের বোন! নাম শকুন্তলা।'

আব্দুল ওয়াহিদ সম্বিত ফিরে পেয়ে চকিতে ঠাকুর ও তার পুত্রের দিকে তাকান। বলেন, শকুন্তলাকে লক্ষ্য করে, 'মাফ করুন! ভিন্ন একটি খেয়ালে ডুবে গিয়েছিলাম। ভাবতে অবাক লাগছে, দু'টি চেহারা হুবহু এক হলো কি করে? সেই টানা টানা ভ্রু। ডাগর ডাগর চোখ। সরু নাক। প্রশস্ত ললাট। আমার দৃষ্টি আমাকে ধোকা দিচ্ছে না তো?'

বড় ঠাকুর বললেন, 'আপনারা আলাপ সারুন। আমি আপনার সঙ্গীদের দেখে আসি।' কামরার বাইরে এসে তিনি হাতের ইশারায় পুত্রকে ডেকে নেন। গোলাপ চাঁদও যেন হাফ ছেড়ে বাঁচে।

'বসুন।' আব্দুল ওয়াহিদ কুরসীতে বসে শকুন্তলাকে আহ্বান জানালেন। শকুন্তলা তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মুখোমুখি একটি কুরসিতে বসে পড়ে।

আব্দুল ওয়াহিদ ভূমিকা ছাড়াই বললেন, 'শুনেছি, আপনার আশ্রয়দাতা অসৎ প্রকৃতির লোক নন। ভেবে কূল পাচ্ছি না, উনি আপনাকে ভুল সংবাদ পরিবেশন করলেন কি করে? বাস্তবিকই তিনি আপনাদের গাঁয়ে গেলে নিশ্চয় এসে আপনাকে এ সংবাদ দিতেন- কনৌজের প্রতিটি কোণে আপনাকে পাতা পাতা করে তালাশ করা হচ্ছে। কনৌজের নয়া প্রশাসনের পতনের পূর্বেই রণবীর আপনাদের গাঁও দখল করে নিয়েছিলো। এক্ষণে তার জিন্দেগীর একমাত্র ব্রত হচ্ছে- আপনাকে খুঁজে ফেরা।'

শকুন্তলা বললো, 'ভগবানের দোহাই! আপনি বলুন। তিনি কোথায়?'

'বর্তমানে গাঁয়ে নেই। শান্ত হন। জলদি আসবে ও।

'জানেন, তিনি বর্তমানে কোথায় আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তবে কেন আমার কথার উত্তর দিতে গড়িমসি করছেন? আমি ওর সহোদরা বোন।'

শকুন্তলার কথার চেয়ে ওর করুণ দৃষ্টি আব্দুল ওয়াহিদকে প্রভাবিত করলো। তিনি বললেন, 'দাদার জীবন বিপন্ন করতে চান আপনি?'

'না।'

'যদি তাই হয়- তবে 'কোথায়? কোথায়?' এ প্রশ্ন ফের তুলবেন না। আপনাকে এতোটুকু বলতে পারি- আপনার কথা সে জেনে যাবে।'

'তার জীবন বিপন্ন নয় তো?'

'না। মাস দেড়েক পূর্বে তার বার্তা পেয়েছিলাম। বিপন্নাবস্থা থাকলে তা কেটে গেছে এতোদিনে।'

'আমি তার কাছে যেতে পারবো কি?'

'না। অন্ততঃ এক্ষণে পারছেন না। তারচে' আপনি দেশে চলে যান। নিজ বাড়ীতে। গোলাপ চাঁদের বাবা সব ব্যবস্থা করবেন। আর আপনার জন্য রেখে যাচ্ছি আমার কিছু সেপাই। খোদ আমি আপনার সাথে যেতাম। কিন্তু আমার ফৌজ আগামীকল্য গোয়ালিয়রাভিমুখী হবে। তাই আমার যাওয়া হচ্ছে না। আজকেই হাজিরা দিতে হবে কেল্লায়। আমি গেলে সেনা বিন্যাস হবে। রণবীরের অনুপস্থিতিতে গাঁয়ে আপনি নিশ্চিন্তে বাস করতে পারবেন। জয়কৃষ্ণের মত লোক ওদিকে রোখ করতে সাহস পাবে না।'

'জয়কৃষ্ণ কোথায়?'

'আমাদের হামলার পূর্বেই গা ঢাকা দিয়েছে।'

'আমাদের গাঁয়ে হামলা করতে দাদাকে মদদ করেছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

শকুন্তলা চিন্তায় পড়ে গেলো। একদিকে সে মানতে প্রস্তুত ছিলো না- কেদারনাথ জেনে শুনে তাকে ধোঁকা দিয়েছে। অন্যদিকে আব্দুল ওয়াহিদের উপর নয় সে সন্দিহান। এ কোন মিথ্যুকের চেহারা নয়। ইনি এমন এক ব্যক্তিত্ব, এক নজর যার চেহারার দিকে তাকালে ঘাতক শত্রুও মিত্র হয়ে যেতে বাধ্য। খানিকের আলাপে ওর চেহারা হতে অপরিচিতির ভাবটা কেটে গেলো। নারীসুলভ অনুভূতি দ্বারা বুঝতে পারলো- আগন্তুক তার কতদিনের পরিচিত জন!'

'আমার কথার আপনি একীন করতে না পারলে গোলাপ চাঁদকে সাথে দিয়ে দেই।'

'না। গোলাপ চাঁদ থেকে আপনার অনেক মহানুভবতার পরিচয় আমি পেয়েছি। আপনি নিছক একজন অপরিচিত লোক হলেও আপনার কোন কথায় আমি সন্দিহান হতাম না। ভাবতে অবাক লাগছে, কেদারনাথ আমাকে হতাশার আঁধারে ডুবাতে কোশেশ করেছিলেন কেন?

'আপনি অনুমতি দিলে তাকে ডেকে পাঠাই।'

'না। তার প্রয়োজন নেই। হতে পারে, মুসলমানদের সাথে দাদার সখ্যতায় তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছেন। এ জন্য তিনি আমায় ধোঁকা দিতে প্রয়াস পেয়েছেন।'

'দাদার ব্যাপারে আপনার খেয়াল কি?'

'দেবতুল্য আমার দাদা। এ নিয়ে আমি গৌরবান্বিত।'

'বাড়ী যাওয়ার ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত?'

অশ্রুতে শকুন্তলার চোখ ভরে গেলো। বললো, 'এটাও কি ভেবে দেখতে হবে- যাবো কিনা?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান আব্দুল ওয়াহিদ। 'আমার কাজ শেষ।' বললেন তিনি। 'কাল নাগাদ চলে যাবেন বলে আমার বিশ্বাস।'

'আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই।'

'করুন।'

'গোলাপ চাঁদ বলেছে- আপনি আমার দাদার উপর খুব মেহেরবান। জানতে পারি- হেতুটা কি?'

'আপনাকে সান্ত্বনা দিতে স্রেফ এতোটুকু বলতে পারি- আমার সহমর্মিতা হাসিল করার জন্য আপনার দাদা আত্মসম্ভ্রমবোধ বিকিয়ে দেননি।'

এ ধরনের অস্পষ্ট শব্দে আপনার প্রশ্নের উত্তর শুনতে শকুন্তলা প্রস্তুত ছিলো না। সে পেরেশান হয়ে বললো, 'হায়! আপনি আমায় ভুল বুঝলেন। আমার দাদা ক্ষণিকের তরেও চরিত্রহীন হতে পারেন না। পারেন না ভুলতে তার সম্ভ্রবোধ! আমি তবু জানতে চাই- বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে জয়কৃষ্ণের দুশমনি তার জীবন চলার মোড় না ঘোরালে আপনি তার সম্পর্কে কি ভাবতেন? জনপদ কব্জা করতে আপনার কাছে ছুটে না যেয়ে অন্য কোথাও আত্মগোপন করে তিনি জলন্ধর ও গোয়ালিয়র যুদ্ধে শরিক হলে, এটা আপনি কিভাবে নিতেন?

আব্দুল ওয়াহিদ পুনরায় কুরসীতে বসে জওয়াব দেন- আপনি এ ধরনের প্রশ্ন না করলে খুশি হবো। আমার উত্তর আপনার পেরেশানীর মাত্রাটা আরো বাড়াবে। কিন্তু সেদিন বেশি দূর নয়, যেদিন আপনার দাদার মত সমখেয়ালের হবেন আপনিও। জয়কৃষ্ণ আপনাদের মহল কব্জা না করলে, আপনি ও আপনার বাবা ওকে অভ্যর্থনা জানালেও আমাদের বিরুদ্ধে কোন দিন তলোয়ার উঠাতো না। তার তলোয়ার ঠিক তখনই আমাদের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়েছে যখন তার চোখে পর্দা ছিলো। সে পর্দা সড়ে গেলে আমাদেরকে দুশমন ভাবা ওর পক্ষে সম্ভবপর নয়। এক্ষণে ওর চলার পথ, আমাদের চলার পথ। আমাদের গন্তব্য ওর গন্তব্য, এক ও অভিন্ন। বাড়ী এসে দরজার কড়া না নেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া ওর পক্ষে

সম্ভব। কিন্তু আমাদের পথের কন্টক হওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। খোদা না করুন! আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করলেও আমার আন্তরিক দোয়া ওকে তাড়া করে ফিরত। জয়কৃষ্ণের দুশমনি ওর ইতস্ততঃ ভাবটাকে মনমুকুর থেকে জলদি অপসরণ করেছে। আকর্ষণ করেছে আমাদের পথে টেনে আনতে।'

শকুন্তলা বে-চাইন হয়ে বললো, 'আপনার কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না যে? আমি আপনার কাছে শুধু একটা, হ্যাঁ, শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই। আশাকরি আমাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পাবেন না। তাহলো- আমার দাদাকে নিয়ে আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি?'

'রণবীরকে দোস্ত হিসাবে পেয়ে আমি গৌরববোধ করি।'

শকুন্তলার মন মাধুরীতে আচমকা খুশির বন্যা বয়ে গেল। কৃতজ্ঞতা আর উচ্ছাসের অশ্রু বেড়ে পড়লো দু'গাল দিয়ে ওর। কম্পিত হৃদয়ের উচ্ছাসকে দু'ঠোঁটে এভাবে প্রকাশ করলো, আপনি বড় রহমদিল।'

'আচ্ছা বলুন তো, মুক্তির দিনে তার স্বাস্থ্য কেমন ছিল? শেষ বার যখন আপনি তাকে দেখলেন- তখনই বা কেমন? কেমন কেটেছিলো তার কারাবাসের দিনগুলো?'

শকুন্তলার জবাবে আব্দুল ওয়াহিদ রণবীরের কাহিনী সংক্ষেপে বলে যান। অবশ্য উপসংহারে সোমনাথের উল্লেখ না করে শকুন্তলাকে বললেন- এক্ষণে রণবীর ভারতবর্ষের তামাম জয়কৃষ্ণদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। ওর বর্তমান ব্যস্ত সময় কাটছে এমন এক স্থানে, যেখানে হাজারো জয়কৃষ্ণ ইনসানিয়াতের গলা রুদ্ধ করে রেখেছে।'

কথোপকথনের মাঝে আব্দুল ওয়াহিদের চোখ মনের অজান্তে শকুন্তলার কান্তিমান চেহারার উপর নিবদ্ধ হতো। তিনি উপলব্ধি করেন- 'আশা' এক নয়া রূপে তার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছে। কিন্তু সম্বিত ফিরে আসতে মাথা নীচু করে ফেলতেন।

আব্দুল ওয়াহিদ কথা শেষ করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলে শকুন্তলা কি মনে করে বললো, জনাব! যাবার আগে বলুন। রণবীরের খবর কবে, কিভাবে পেতে পারি?'

আব্দুল ওয়াহিদ পিছনে ঘুরে বললেন, 'এটা আমায় জিম্মায় ছেড়ে দিন। অভিযান শেষে আমি কনৌজে আসছি। তখন জানতে পারবেন সবকিছু।'

খানিক পর। ঠাকুর ও গোলাপ চাঁদ আব্দুল ওয়াহিদকে বিদায় দিচ্ছিলেন। বিদায় জানাচ্ছিলো গেঁয়ো লোকজনও। আব্দুল ওয়াহিদ চব্বিশ জন সওয়ার নিয়ে এসেছিলেন। দশ জন শকুন্তলার জন্য রেখে বাদ বাকিদের নিয়ে দ্রুত চললেন কেল্লা উদ্দেশে।

'আপনি মানুষ নন- দেবতা' বলে শকুন্তলা কামরার দিকে পা বাড়ালো।

॥ তিন ॥

আব্দুল ওয়াহিদ চলে যাবার পর শকুন্তলা কেদারনাথের বাড়ী যাবার এরাদা করলো। তার সাথে যেতে-চাইলো ভগুনতিও। কেদারনাথ ও তার স্ত্রী এ যাবত জানতে পারেনি-সুলতান মাহমুদের এক পদস্থ ফৌজী অফিসার শকুন্তলার খাতিরে জনপদে এসেছিলেন।

কেদারনাথের স্ত্রী শকুন্তলাকে দেখে দৌড়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বললো : 'খুকি! আমি এক্ষুণি ঠাকুর বাড়ী যেতে চাচ্ছিলাম। তুমি ছাড়া এ ঘর আলোকিত হয় না।'

উঠানে দু'টি মোড়া ও একটি বেতের চেয়ার পাতা। কেদারনাথ আরেকটি মোড়া নিয়ে এসে বসলো। শকুন্তলা ও ভগুনতি কেদারনাথের স্ত্রীর পার্শ্বে মোড়া পেতে বসলো। কেদারনাথ বসলো একটু দূরে। উঠানে নেমে এলো পীন পতন নীরবতা। শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করে শকুন্তলা বললো, 'জ্যাঠা মশাই! আমি আগামী কাল চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়?' বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো বৃদ্ধ কেদারনাথের।

'নিজ বাড়ীতে।'

কেদারনাথ ও তার স্ত্রীর চেহারায় আচমকা বিষাদের কালো ছায়া প্রতিভাত হলো।

শকুন্তলা পরিস্থিতি সামাল দিয়ে বললো, 'জ্যাঠা! আমৃত্যু আপনাদের অকৃত্রিম ভালবাসা ও মুসিবতের দিনে হতভাগীকে ঠাঁই দেয়ার কথা স্মরণ করবো। কিন্তু আমাকে ভুয়া সংবাদ না দিলেও পারতেন।'

কেদারনাথ লজ্জায় মাথা নীচু করে বললেন, 'খুকি! তোমার দুঃখ বাড়বে জেনে আমি সত্যকে গোপন করতে প্রয়াস পেয়েছিলাম। রণবীরকে তুমি দেবতা মনে করতে। আমার ভয় হচ্ছিলো, নিজ কানে যা শুনলাম তা অকপটে বললে তোমার জিন্দেগী তেঁতো হয়ে যেত। শান্ত হও খুকি! আমরা এতমিনানের সাথে এ ব্যাপার আলাপ করবো।'

'আমি সবৈর্ব জানি জ্যাঠা। আপনি শুনেছিলেন- দাদা আমার মুসলমানদের দলভুক্ত হয়েছেন। শুনেছিলেন, মহল কব্জা করতে ওদের মদদ নিয়েছিলেন। এতে আপনার মনে ঘৃণা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিলো। কিন্তু হায়! আপনি যদি জানতেন- এগুলো সবই আমার খাতিরে করতে হয়েছিলো তাকে। এতে কোন পাপ থাকলে তার জন্য আমিই দায়ী। এ ছাড়া নিদানের কালে তার কিইবা করার ছিলো। দুশমনের মুকাবিলা করার জন্য তিনি হাজার হাজার মাইল দূরে কোচ করেছিলেন।

কাটিয়েছিলেন যৌবনের সোনালী দিনগুলি পাষাণ কারা অভ্যন্তরে। ফিরে এসে দেখলেন- মাথা গোজার ঠাঁই তার স্বপ্নের ঠিকানাটুকু দুশমনের হাতে চলে গেছে। এ শোকের সাথে যোগ হলো প্রিয় বোনহারা শোক।

কোথায় সে? জীবিত না মৃত? জয়কৃষ্ণ তাকে কতল করতে চেয়েছিলো। কুদরত তাঁকে বাঁচিয়েছেন। বলুন! সেই ঘোররম বিপদ মুহূর্তে সে এ ছাড়া আর কি করতে পারে? আপনি কি তাকে ঐ রাজার কাছে যেতে বলেন- যিনি জয়কৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষক? যেতে বলেন- ঐ পুরোহিতদের কাছে, যারা আমার নিরীহ বাবার খুনে তাদের হাত রঙিন করেছিলো? সাহায্য ভিক্ষা করতে বলেন- ঐ সমাজের কাছে, যারা কেবল অভিজাত লোকদের পূজা করতে জানে? কনৌজের মাটিতে তিনি বুকের খুন নজরানা দিয়েছেন, বিনিময়ে কনৌজ তাকে কি দিয়েছে? হতাশা, বঞ্চনা, ব্যর্থতা আর লাঞ্ছনা ছাড়া তিনি কিইবা পেয়েছেন? আমৃত্যু তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। বাধ সাধে পাষাণ লৌহ প্রাচীর। ঘাতক শত্রুরাই তাঁকে জিন্দা থাকার স্বপ্ন দেখিয়েছিলো। অতঃপর নিজ বাড়ীতে এসে জীবন বিপন্ন দেখে তথাকথিত ম্লেচ্ছরাই তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলো।

এরপরও কি আপনি বলবেন- তার উচিত ছিলো একাকী অজেয় দুর্ভেদ্য মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো? বলবেন কি- জয়কৃষ্ণের কাপালিক সৈন্য বহরের সামনে ক্লান্ত রণবীরকে তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াতে? হয়তো বলবেন, মুসলিম সাহায্য নেয়ার দরুন ও আমার দাদা নয়। কিন্তু জেনে রাখুন! আমার দাদার মত খোদ গোয়ালিয়রের রাজাও মুসলিমদের অনুকম্পার ভিখারী আজ।

কেদারনাথ বাষ্পরুদ্ধ আওয়াজে বললো, 'খুকি! তোমার সিল আটা বুকের বিপন্ন প্রশ্নগুলির উত্তর আমার জানা নেই। কিন্তু জেনে রেখো! তোমার বিরহ আমি সহ্য করতে পারব না। তোমাকে সান্ত্বনা দিতে এতোটুকু বলতে চাই- ঐ মুসিবতের দিনে তোমার দাদার কাছে যাওয়াটা ঠিক হতো না। মনে করে দেখ- তোমাকে যখন বলেছিলাম- জয়কৃষ্ণের লৌহবলয় থেকে মুসলমানরা তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে তখন তুমি বলেছিলে, মুসলিমদের সহায়তায় রণবীর রাজা হলেও আমি আলীশান মহলে না যেয়ে ভিক্ষা করে পেট চালাব।'

'আমি এখনও বলছি- আমার দাদা মুসলিম সাহায্য নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু আত্মসম্ভ্রমবোধ বিকিয়ে দেননি তিনি। পরিস্থিতিই তাকে বাধ্য করেছে বিজাতির সাহায্য নিতে। এহেন পরিস্থিতির শিকার মানুষ মাত্রই হয়ে থাকে। কনৌজ ও গোয়ালিয়রের রাজপুতগণ তাঁকে কাপুরুষতার ধিক্কার দিতে পারে না। যে সূর্য সন্তানরা একদিন গজনীর হিমেল উপত্যকা পর্যন্ত দুশমনকে ধাওয়া করতে বদ্ধপরিকর ছিলো এক্ষণে তারা নিজ গ্রাম ও জনপদ রক্ষায় মশগুল। আপনি প্রায়ই

বলতেন-মুসলিম ফৌজ গোয়ালিয়রমুখী হলে এখানকার অবুঝ শিশুরাও জানবাযী দিয়ে লড়াই করে যেত। কিন্তু সেই শিশুদের কোমল কণ্ঠে আজ ঝংকৃত হচ্ছে- রাজা মশাই হাতিয়ার ফেলে সন্ধি করে ধ্বংসের হাত থেকে আমাদের রেহাই দিয়েছেন।

এ জগতে সবাই শক্তির পূজারী। একদিন আমার বাবার কথায় জনপদের সর্দারগণ ওঠা বসা করতেন। পরে এলো জয়কৃষ্ণের পালা। সকলে লেগে গেলো তার পুজায়। এসব সর্দারগণ এক্ষণে মুসলিমদের গুণকীর্তন করছেন। কিন্তু দাদা আমার এদেরচে' ভিন্ন প্রকৃতির। শক্তি পূজারী হলে সুদীর্ঘকাল তাকে লাল দালানের ভাত খেতে হতো না। সম্ভবতঃ তিনি কয়েদ থেকে মুক্তি চাইতেন না- যদি রাজা মহারাজারা হতোদ্যম হয়ে তলোয়ার ফেলে না দিত। এক বোনের প্রীতি ও প্রগাঢ় ভালবাসা তাকে কনৌজে নিয়ে এসেছিলো। কয়েদখানা থেকে মুক্তি পাবার পর যা কিছু তার জীবনে ঘটেছে, তা স্রেফ আমার জন্য। হায়! তাঁর ব্যাপারে কোন মন্তব্য করার পূর্বে আপনি আমায় জিজ্ঞেস করে নিতেন। আমার চোখে এখনও পূর্বের ন্যায় তিনি দেবতা। কার ঘাড়ে দু'টো মাথা আছে, যে তাঁকে বুযদিল বলে আখ্যা দিতে পারে? রাজা, মহারাজা, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণ আমার দাদাকে বুযদিল বলবেন? তাঁরা তো সুলতান মাহমুদের নাম শুনলে কাঁপতে কাঁপতে ভূতলে লুটিয়ে পড়েন। বিলকুল মৃগ রোগীর মত।'

কেদারনাথের সাথে কথা বলে প্রকৃতপক্ষে শকুন্তলা নিজকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করছিলো। কেদারনাথ শুকনো গলায় বললো, 'খুকি! এক্ষণে তুমি আমার কোন কথায় একীন করতে পারবে না। ভগবান জানেন, আমি জেনে শুনে মিথ্যা কথা বলিনি জীবনেও। কিন্তু একবার বলছি, তাও আবার তোমার মত দেবীর কাছে। বারবার তোমাকে সত্য কথাটা বলতে চেয়েছি। কিন্তু কে যেন আমায় কণ্ঠনালী চেপে ধরেছিলো। আফসোস, তুমি চলে যাচ্ছো। কিন্তু এ বুড়োকে উপনীত করে যাচ্ছ শশ্মানের তীরে। আমার এরাদা ছিলো- মুসিবতের দিনে জনপদ নিরাপদ নয়। অবশ্য গোয়ালিয়রের পট পরিবর্তন হবার পর আমার মন হিন্দোলিত হয়েছিলো। ঘৃনা ও ক্ষোভে বিষিয়ে উঠছিলো আস্থা। কি করলেন, আমাদের ভ্রমবিলাসী রাজা আর দেব সন্তানগণ?

বিশেষ করে গোয়ালিয়র ও জলন্ধরের সর্দারগণ যখন সুলতান মাহমুদের তল্পীবাহক হয়ে যান, তখন আমার চিন্তার জগত অন্ধকারে ভরে যায়। ভাবছিলাম- আরেকবার তোমাদের জনপদে যাব। নিয়ে আসবো তোমার দাদাকে সাথে করে। ওর হাতে তোমার হাত তুলে দিয়ে বলবো- ভগবানের দিকে তাকিয়ে এ বুড়োটাকে তোমারা ক্ষমা করো। কিন্তু সে সুযোগ আমায় দিলে না খুকি। আমার ঔরসে জন্মিলে তুমি এতো ভালবাসা পেতে কিনা জানি না!'

শকুন্তলার চোখে অশ্রুবন্যা উপচে উঠলো। বললো, 'আপনার উপর আমার কোনই অভিযোগ নেই। আমি সর্বদা আপনারই থাকবো। আপনারা দু'জন আমার সাথে চলুন। রণবীর গাঁয়ে ফিরেনি এখনও।'

কেদারনাথ খানিকটা আশ্বস্থ হয়ে বললো, 'তোমার সাথে কে কে যাবে? তোমাদের পাড়ার কেউ এসেছে কি?'

'না।' শকুন্তলা জওয়াব দিলো।

'তাইলে এতো কথা তোমায় বললো কে?'

কেদারনাথের প্রশ্নের জওয়াবে শকুন্তলা আব্দুল ওয়াহিদের কাহিনী সংক্ষেপে বলে গেলো। কেদারনাথ খানিক চিন্তা করে বললো, 'খুকি! তুমি যাচ্ছো। যাও! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তোমায় সুখে রাখুন! আমাদের ভুলো না।'

'আপনি আমার সাথে যাবেন না?'

'না। এখন নয়। ওয়াদা করছি- পরে একদিন গিয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করে আসব।'

ভগ্নতি এতোক্ষণ হা করে গোগ্রাসে গিলছিলো কেদারনাথ ও শকুন্তলার কথা। এবার সে মুখ খুললো, 'কাকামনি! আপনি শান্ত হোন। শকুন্তলা আমাদের ছেড়ে বেশী দিন থাকতে পারবে না। একদিন সকলে গিয়ে ওকে ছিনিয়ে আনবো।'

পরের দিন শকুন্তলা বাড়ীভিমুখী হলো। বড় ঠাকুর ওর জন্য যে সব এন্তেজাম করেছিলেন, তা কোন শাহজাদীর সফরের জন্য করা হয় কিনা কে জানে? শকুন্তলা হাতির রথে চড়লো। ওর খেদমতে দেয়া হলো গ্রামের দু'জন মহিলা। আব্দুল ওয়াহিদের দশ সেপাই ছাড়া ঠাকুরের ত্রিশোর্ধ সওয়ার ঘোড়া হাঁকালো ওর পিছু পিছু।

॥ চার ॥

প্রশস্ত ও সুরক্ষিত প্রান্তরে জলন্ধরের কেল্লা নির্মাণ করা হয়েছিলো। তাবৎ কালের রাজা-মহারাজারা একে দুর্ভেদ্য বলে মনে করে আসছেন। সামান্য একটি পরিসংখ্যানে অনুমিত হয় কেল্লার পরিধি তথা ধারণ ক্ষমতা। পাঁচ লাখ লোক, বিশ হাজার ঘোড়া ও পাঁচ শ' হাতির সংকুলান হতো এর মাঝে। সেপাইদের রসদ ও হাতি ঘোড়ার দানা-পানি এতো বিপুল পরিমাণ ছিল যে, দুশমন মাসের পর মাস অবরোধ করে রাখলেও কোন অসুবিধা হবে না। এ আজিমুশ্বান কেল্লা মধ্য এশিয়ার রাজা-মহারাজাদের আখেরী ঠিকানা। গঙ্গা যমুনা অববাহিকায় সুলতান মাহমুদকে রোখবার জন্য এই কেল্লা ছিলো ইস্কাপনের টেক্কা স্বরূপ।

ভারতবর্ষের কোণে কোণে যখন এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো- গজনীর মুসলিম বাহিনী টর্নেডো গতিতে জলন্ধর অভিমুখে ধেয়ে আসছে, তখন মন্দিরে মন্দিরে রাজা গেন্ডার জন্য বিজয় প্রার্থনা করা হলো। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের মহারাজাগণ রাজা গেন্ডাকে এ মর্মে পয়গাম পাঠালেন যে, আপনি জলন্ধরের কেল্লায় চলে যান। দুশমনরা ও কেল্লায় সহজে প্রবেশ করতে পারবে না। আমরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসছি। আপনি হিম্মতহারা হলে এ তুফানকে কেউই রুখতে পারবে না। এ ধরনের সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন তাকে দেশের ব্রাহ্মণগণও। দুশমনগণ এক্ষণে এমন এক অভিযানে আসছে যা কেবল তাদের ললাটে পরাজয়ের তিলকই এঁটে দিবে না, বরং করবে ধ্বংসও। রাজার খেয়াল ছিলো- দুশমন যেভাবে অসম সাহসিকতা প্রদর্শন করে জলন্ধর অভিমুখে ধেয়ে আসছে, উনি ওভাবে গজনীর কেল্লায় ধেয়ে যাবেন। এ অভিপ্রায়ে গত যুদ্ধে তিনি পিছপা হয়েছিলেন।

ভগবানের কাছে আপনারা প্রার্থনা করুন! দুশমন যেন ইরাদা পরিবর্তন না করে।' বলতেন তিনি পুরোহিতদের লক্ষ্য করে। অমুক মন্দিরের অমুক পূজারী এবং অমুক পুরোহিতকে দেবতাগণ স্বপ্নে খোশ খবর শুনিয়েছেন- মাহমুদের ফৌজ শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হয়ে গজনী পালাবে এবং ভারতের সূর্য সন্তানগণ গজনী পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবেন।

পরে একদিন এ খবর বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়লো- গজনীর ফৌজ জলন্ধরের কেল্লা অবরোধ করেছে।

ক'দিন পর আওয়ামের কলিজা বিদীর্ণ হয়ে গেলো যখন তারা শুনলো- রাজা গেন্ডা বার্ষিক একটা হারে জিযিয়া কর দেবার শর্তে সন্ধি করেছেন। শুধু কি তাই! জলন্ধরের বেশ কিছু কায়েমী সর্দারগণ সুলতান মাহমুদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছেন। এক্ষণে মুসলিম বাহিনী সামনে অগ্রসর হলে গোটা ভারত বর্ষ তাদের মুঠোয় চলে যাবে।

এদিকে সুলতান মাহমুদ অগ্রসর না হয়ে গজনী ফিরে গেলেন। দূর বহু দূরের একটি মুল্ক তাকে হাতছানী দিয়ে ডাকছিলো। মন্দিরের পূজারীরা আওয়ামদের বললেন- ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো। সুলতান মাহমুদ পুনরায় যেন না আসেন। এবার এলে বঙ্গোপসাগরের তীরও রক্ষা পাবে না।

এদিকে পূজারীরা যখন আওয়ামকে এ কথা বুঝাচ্ছিলেন, তখন সোমনাথের পুরোহিতরা খুশির ডংকা পিটিয়ে এলান করছিলো- যতদিন ভারতবর্ষের পূজারীরা সোমনাথের দেবতাগণকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে না বসাচ্ছেন, ততোদিন তারা প্রতিটি রণাঙ্গনে মুসলমানদের হাতে রামধোলাই খাবেন। যদি তোমরা গজনীর তুফানকে রুখতে চাও তাবে সোমনাথ পুরোহিতদের পতাকাতলে সমবেত হও। মহান

দেব-দেবীগণ তোমাদের গলে বিজয়ের মালা সেদিনই পড়াবেন যেদিন তোমরা সোমনাথ রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে জীবন উৎসর্গ করবে।

কিছুদিনের মধ্যে গোটা ভারত বর্ষে কেবল একটি ধ্বনি শ্রুত হলো- 'চলো চলো' সোমনাথ চলো!'

॥ পাঁচ ॥

জলন্ধর থেকে সুলতান মাহমুদের ফিরে যাবার দু'হপ্তা পর শকুন্তলা জানতে পারলো- আব্দুল ওয়াহিদ পুনরায় কনৌজের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন। তার খুশির অন্ত নেই। এবার সে তাঁর মাধ্যমে দাদার সংবাদ পাবে। কিন্তু মাস দেড়েক অতিবাহিত হলো অথচ আব্দুল ওয়াহিদের খোঁজ নেই।

এক সন্ধ্যায় মহলের ছাদে নিঃসঙ্গ পায়চারী করছিলো শকুন্তলা। আসমানে হালকা মেঘের আনাগোনা। আচমকা বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগলো। শকুন্তলা ছাদের কোণের ছোট্ট ছায়ানীড়ে এসে দাঁড়ালো। কল্পনায় ভেসে উঠলো শৈশবের সেই সোনালী দিনগুলি- যখন সে আর রণবীর হাত ধরাধরি করে এ ছায়ানীড়ে ছুটাছুটি করেছে। ইট বালু দিয়ে মিথ্যা বনভোজন করেছে। দেখছে দু'ভাই বোন মিলে রিমঝিম বর্ষার মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

শম্ভুনাথ হাঁপাতে হাঁপাতে ছাদে উঠলো। ছায়ানীড়ে দাখেল হয়ে বললো ঃ 'মাইজি! এইমাত্র জানতে পেলাম, কনৌজ গভর্নর দশ বারো জন সঙ্গী নিয়ে জনপদ ঘুরতে এসে সুন্নত নগরের সর্দার বাড়ীতে উঠছেন। রাত কাটাবেন বোধহয় ওখানেই।'

'তিনি কোন সংবাদ দেননি?' শকুন্তলার কণ্ঠে আশার সুর।

'না। আপনি বললে আমি এক্ষুণি গিয়ে রণবীরের খবর জিজ্ঞেস করে আসি।'

'না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। রণবীরের সংবাদ থাকলে আগে উনি এখানে আসতেন।'

'রণবীর বাড়ী থাকলে তিনি অন্য কোথাও রাত কাটাতেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না।'

'তোমার একীন আছে- উনি ওখানেই উঠছেন?'

'এক লোক বলেছে- সন্ধ্যার দিকে তিনি সুন্নত নগরে পৌঁছেছেন।'

'আজ না এলেও কাল অবশ্যই আসবেন। নওকরদের বলো, মেহমান খানা যেন ঝাড় দিয়ে রাখে।'

'হ্যাঁ মাইজি! মেহমানখানা পোড়োবাড়ীতে পরিণত হয়েছে। আমি এখনি

যাচ্ছি।'

বৃষ্টির গতি ক্রমশঃ বাড়ছিল। যেভাবে এসেছিলো সেভাবে হন্তদন্ত হয়ে ছায়ানীড় থেকে বেরুলো শম্ভুনাথ। শকুন্তলা বসলো মোড়ায়। ওর মনের ধুকধুকুনী আওয়াজ দিচ্ছিলো- তিনি আসবেন। অবশ্যই। তাঁকে আসতেই হবে।

কেদারনাথের জনপদ থেকে বাড়ী আসার পর ও ভাবতো- আমি এমন এক সমাজের কোলে চোখ খুলেছিলাম, যে সমাজ কেবল নিম্ন শ্রেণীকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে শিখিয়েছে। আব্দুল ওয়াহিদের স্মৃতিচারণ তাকে কেবল কৃতজ্ঞ আর আবেগ তাড়িত করেছে। বাড়ী আসার পর শম্ভুনাথের কাছে তাঁর সম্পর্কে আরো কিছু জেনেছে শকুন্তলা। আব্দুল ওয়াহিদ রণবীরের কারাজীবন বর্ণনা করতে গিয়ে তারই প্রেরিত অলংকারাদির কথা বলেনি। এ অলংকাগুলি সে দাদার মুক্তিপণ হিসাবে প্রেরণ করেছিল। শম্ভুনাথের মুখে অলংকার ফেরত দেয়ার কাহিনী শুনে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো ওর হৃদয় নদীর বাঁকে বাঁকে। 'তিনি এতো মহান! এতো রহম দিল! এমনও মানুষ এ যুগে আছে?' ওর মনে গভীরভাবে স্থান করে নেয় আব্দুল ওয়াহিদের ভাবনা।

বিগত মোলাকাত কালে শকুন্তলাকে দেখামাত্রই তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে ছিলো- 'আশা'।

কিন্তু কে এই আশা?

এমন কোন দেবী নাকি, যিনি এ মহান দেবতাকে বশীভূত করতে জন্ম নিয়েছিলেন? এক নারীসুলভ অনুভূতিতে ঐ অদৃশ্য মায়াবতী আশার পরিধি বাড়ানো হাসির ঝিলিক, খুশির অশ্রু আর বিরহ বেদনার আহ্ ধ্বনি অনুমান করছিলো ও। কল্পনায় দেখছিলো ঐ অনিন্দ্য সুন্দরী নারী মূর্তিকে, যাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে ভরিয়ে দিতে স্বর্গের দেবতাগণ দু'হাত তুলে এগিয়ে আসছেন।

'ও এক নওমুসলিম'। শকুন্তলার প্রশ্নের জবাবে এতোটুকু বলেছে শম্ভুনাথ। নগরকোটের খান্দানী বংশের ছেলে তিনি। শম্ভুনাথ এরপর আর বলতে পারেনি। শকুন্তলার কোমল মনে রেখাপাত করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। কখনও ভাবতো- আশা তাঁর বোন। জয়কৃষ্ণের মত কোন পাথুরে অন্তর বিশিষ্ট লোক তাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। কখনও ভাবতো- আশা কোন এমন যুবতী হবে, যে তাঁকে ছেড়ে অন্যের গলায় মালা পড়িয়ে দিয়েছে। অথবা কালচক্র তাঁর আশাকে চিরদিনের তরে নিয়ে গেছে। ফিরবে না যেখান থেকে সে। কখনও বা ও আশার উপর ঈর্ষান্বিত হতো। কিন্তু বিবেকের দংশনে গোটা দেহ কেঁপে উঠতো।

'ও এক ম্লেচ্ছ! ধ্যাত! তুমি কি ভাবছো শকুন্তলা! তোমার দাদার দোস্ত, তোমার

মহাপোকারী হলেও সে ম্লেচ্ছ। তাঁর পৌরুষ, বাহাদুরী প্রভাব প্রতিপত্তি ও আভিজাত্য বোধ; ঘৃণা ধিক্কারের ঐ পাহাড়কে কিছুতেই টলাতে পারে না, যা তোমার ও তাঁর মাঝে বিভাজন হয়ে আছে।

বৃষ্টি কমে এলা। দূর অন্তরীক্ষে ভেসে উঠলো সিতারার হাসি। শুক্লা দ্বাদশীর স্নিগ্ধ চাঁদ সে হাসির পরিধি বাড়িয়ে গোটা আকাশে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত করছে। তার এক পশলা এসে আছড়ে পড়ছে বর্ষাস্নাত মেদীনিতে। সন্তর্পণে পা পা করে নীচে নামলো শকুন্তলা। আচানক শম্ভুনাথের সাথে পথে দেখা।

'মাইজী। জলদী নীচে এসো।'

'কি খবর জ্যাঠা মশাই!'

'তিনি এসেছেন।'

'কে? আব্দুল ওয়াহিদ?'

'হ্যাঁ। তাঁকে মেহমান খানায় বসিয়ে রেখে এসেছি। বর্ষণসিক্ত কাপড় বদলাতে বললাম- কিন্তু বদলালেন না। তিনি বলছেন- বৃষ্টি থেমে গেলে সুন্নতনগর ফিরে যাবেন।'

'হায় বৃষ্টি। তুমি যদি আজ না থামতে! তাঁর খানাদানার ইন্তেজাম করতে হয়। চলো!'

'খানার কথা তাকে বলেছিলাম। 'দুপুরের খানা বিকেল করে খেয়েছি, ঝামেলায় যাবেন না' বলে আমায় নিষেধ করেছেন।

সিঁড়ি থেকে নামতে নামতে শকুন্তলা প্রশ্ন করলো, 'তার সঙ্গী ক'জন এসেছেন?'

'স্রেফ তিন নওকর। বাইরের মেহমানখানায় আছে ওরা। দ্বিতলে এসে শকুন্তলা বললো, 'জ্যাঠা শম্ভু! আমি নীচে যাব না। তুমি তাঁকে দ্বিতলে নিয়ে এসো।'

'যথাজ্ঞা মাইজী।' শম্ভু নীচে চলে গেলো। কুরসি ঝাড়তে বলে বিক্ষিপ্ত পায়চারী করতে লাগলো শকুন্তলা। এক চাকরানী জ্বেলে দিলো কারুকার্যময় ঝাড়বাতি।

॥ ছয় ॥

খানিক পর। শম্ভুনাথের সাথে আব্দুল ওয়াহিদ দ্বিতলে উঠে এলেন। শম্ভুনাথ আব্দুল ওয়াহিদকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল। আব্দুল ওয়াহিদ গলা কাঁখারী দিয়ে ঢুকলেন অন্দরে।'

'রণবীরের খবর নিয়ে এসেছি।' ভূমিকা ছাড়া শুরু করলেন কথা।

শকুন্তলা ভয়ে তার দিক তাকালো।

তিনি বললেন, 'পেরেশানীর কোন কারণ নেই। রণবীর ভালো আছে। গত হপ্তায় ওর চিঠি পেয়েছি। আফসোস! আপনার সাথে সাক্ষাৎ হবার পর ওর কাছে তাড়া করে দূত পাঠাতে পারিনি। আমার একান্ত দূত কনৌজে ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছিলো। জলন্ধর অভিযান থেকে ফারেগ হয়ে ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। হপ্তা খানেক পর চাঙ্গা হলে ওকে সোজা রণবীরের কাছে পাঠিয়ে দেই। ওর নির্গমনের দশ দিন পর আপনার দাদার দূত আমার কাছে এসে পৌছে। তার নাকি ওখানে আরো কিছুদিন থাকতে হবে। থাকতে হবে দেখেই দূত পাঠিয়ে আমাকে আশ্বস্থ করেছে।'

'আপনার কথার মতলব হচ্ছে, আমার আগমন বার্তা এখনো তার কানে যায়নি?'

'দেখুন। আপনার দাদা হাজার হাজার মাইল দূরে। খুব সম্ভব এতোদিনে আমার দূত মারফত সে খবর পেয়ে থাকবে।'

শকুন্তলা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ভগবানের দোহাই। বলুন, এক্ষণে তিনি কোথায়, কিভাবে আছেন?'

'ঐদিনই আপনাকে বলেছি। কিন্তু কামরায় উঁকি মারলো কে? আমি শুধু আপনার সাথে কথা বলতে চাই।'

'গোলাপ চাঁদের বোন বোধহয়। বসুন! আমি আসছি' বলে শকুন্তলা বেরুলো। আব্দুল ওয়াহিদ তর্জনী দাঁতের উপর রেখে মৃদু আঘাত করে চিন্তার সাগরে ডুবে গেলেন। খানিক পর শকুন্তলা প্রবেশ করলো। বসলো আব্দুল ওয়াহিদের মুখোমুখি একটি কুরসিতে।

'আপনি নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারেন। চাকরানীদের উঁকিঝুকি মারতে নিষেধ করে এসেছি।'

'আপনি কেবল এক জয়কৃষ্ণকে দেখেছেন। কিন্তু এক্ষণে হাজারো জয়কৃষ্ণ গোটা ভারতে জালের মত ছড়িয়ে আছে। ওদের করাল থাবায় সংকুচিত হয়ে আসছে মানবতার স্বস্তি। জয়কৃষ্ণের দল এখন হাজার মাইল দূরবর্তী এক তীর্থ স্থানে জমায়েত হচ্ছে। ওদের আশা- হিন্দু সন্তানদের সম্মিলিত প্রয়াসে কালচক্রের নিঠুর সয়লাব রোখা সম্ভব। সম্ভব হকের ঝান্ডা ভূলুণ্ঠিত করা- জাত পাত প্রথার প্রতি যা এক্ষণে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই তীর্থস্থানের নাম শুনলে আপনি চমকে উঠবেন। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস- রণবীরের স্থলে আপনি হলে তাই করতেন। জয়কৃষ্ণের লোকজন যেদিন ওর পিছু নিয়েছিলো সেদিন ওকে সাহায্য করেছিল এক নওজোয়ান। আপনি রামনাথের কাহিনী শুনে থাকবেন হয়ত!

শকুন্তলা বললো, 'আমি স্রেফ এটুকু জানি- সে আমার দাদার জীবনদাতা।

থাকতো দাদার সাথে এ মহলেই। আচানক কাউকে না বলে একদিন সে গায়েব হয়ে যায়। পরে তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।'

'আমি তার বিশদ কাহিনী আপনার সামনে তুলে ধরছি। এরপর আপনি সিদ্ধান্ত নিন-আপনার দাদা তার সাহায্যে গিয়ে ভুল করেছে কিনা।'

'শোনান দেখি ওর কাহিনী।'

আব্দুল ওয়াহিদ শুনিয়ে যান রামনাথের কাহিনী। শকুন্তলা মাথা ঝুঁকে গভীরভাবে শুনলো। শেষে বললো ঃ 'দাদার ওখানে জীবনের প্রতি কোন হুমকি নেই তো?'

'এক সেপাইর কোন কাজই হুমকি ছাড়া হতে পারে না। তবে আপনি নিশ্চিন্ত হোন। ওর জীবন বিপন্ন হলে ওখানে মদদগারের অভাব নেই।'

'ওর উপর সোমনাথ দেবতার অভিশাপ নিপতিত হলে দুনিয়ার কোন শক্তিই ওকে বাঁচাতে পারবে না। তাঁরা দেবতাদের দেবতা। তাঁদের শক্তি বলয় সম্পর্কে আপনি জানেন না। দেবতাদের গোস্বা গগণচুমো পাহাড় ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে। বানিয়ে দিতে পারে উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রকে সমতল প্রান্তরে। ভগবানের দোহাই! দাদাকে আমার ফিরিয়ে আনুন!'

আব্দুল ওয়াহিদ মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, 'ভারী কত কতগুলো পাথর ছাড়া সোমনাথ মন্দিরে আর কিইবা আছে। শিল্পীর নিপুণ হাতের বিন্যাস যাকে মূর্তির রূপ দিয়েছে। এ পাথরগুলিই তো এক সময় পাহাড়ের গায়ে বিক্ষিপ্ত পড়েছিল, মূতিকরদের কৃপায় ঠাঁই পেয়েছে ওগুলো পূজার বেদীমূলে।

মনে করুন। তিনটি পাথর সমুদ্র সৈকতে পড়েছিলো। একটি শোভা পেল আপনাদের দেয়ালে, দ্বিতীয়টি মূর্তি বানাতে, তৃতীয়টি রাস্তায়। রাস্তার পাথরকে কারুকার্য দিয়ে যদি পূজার মন্ডপে উঠানো হয়, পক্ষান্তরে পুজা মন্ডপের পাথর মূর্তি ভেঙ্গে যদি রাস্তা বানানো হয়- তাতে তেমন কোন ফারাকের সৃষ্টি হবে কি? ভেবে দেখুন! সোমনাথের সিঁড়ির পাথর আর মূর্তির পাথরের মাঝে কোন পার্থক্য বা ভিন্নতা আছে? এমনও তো হতে পারতো- মূর্তিকরের ইচ্ছা হলে ঐ সিঁড়ির পাথর দিয়েই তিনি মূর্তি নির্মাণ করতে পারতেন। আর যা দিয়ে বানিয়েছেন মূর্তি তা দিয়ে বানাতে পারতেন সিঁড়ি। এক্ষণে মূর্তির পাথর আর সিঁড়ির পাথর আপনার হাতে দিলে পার্থক্য করে কিছু দেখাতে পারবেন কি, শকুন্তলা দেবী?

শকুন্তলার কল্পনা জগত ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সহজাত প্রবৃত্তি লোপ পেয়ে গেলো। তার অবস্থা সমুদ্র বক্ষে ডুবন্ত যাত্রীর খড়কুটোর ওপর ভরসা করার মত। কম্পিত

কণ্ঠে ও বললো, 'না! না!! অমন কথা বলবেন না। আপনি মহাপোকারী, কিন্তু সোমনাথ আমাদের গর্ব, আমাদের আশা ভরসার স্থল, 'স্বর্গরাজ্য'।'

'স্বপ্ন জাল ছিন্ন করতে সব ইনসানই তকলীফ পেয়ে থাকে। আমিও এক সময় আপনার মত ছিলাম। ছিলো ঐ মূর্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু একদিন অবগত হলাম- নিষ্প্রাণ ঐ পাথরের টুকরোগুলির অন্তরালে এক শ্রেণীর নীতিজ্ঞানহীন লোক অসহায় ইনসানের রক্ত শুষে নিচ্ছে যুগের পর যুগ ধরে। জাতিভেদ প্রথার জন্ম দিয়ে ধর্ম ব্যবসা চালাতে ওদের জুড়ি নেই। নীচু জাতের প্রতি মূর্তির দোহাই, দেবতাদের শক্তি দাপট দেখিয়ে ওরা পেট লালন করে আসছে। ওরা আপনাকে মনে করে উচ্চ শ্রেণী। অন্যকে ভাবে নিম্ন, অপাংতেয়। এরা অচ্ছুৎ অস্পৃষ্য। মূর্তির বেদীমূলে অশ্রু, খুন ও ঘামের নজরানা দিতে হবে ওদের। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের একচ্ছত্র অধিকার- গোটা দেশ থেকে মূর্তির নামে সম্পদের পাহাড় গড়বে। ঐ মূর্তিগুলিই মানুষের মাঝে ঘৃণা ও ধিক্কারের সুকঠিন পৃথকীকরণ দেয়াল নির্মাণ করে রেখেছে। এ দেবতাগণ সমাজ ও মানবতার দুশমন। স্বর্ণের প্রলেপ, হীরার খোঁচা ও বাহারী রঙ দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু সাধের সেই মূর্তি যাদের কলজের খুন দিয়ে গড়া, মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি নেই তাদের। নিম্ন শ্রেণী মূর্তিদের প্রণাম ও ভজন দিতে মন্দিরের চৌহদ্দীতে আসতে পারবে না। ভগবান কি একচোখা? তিনি উচ্চ শ্রেণীদের সর্বাগ্রে সৃষ্টি করে সম্মান শ্রদ্ধার সবটুকু অধিকার তাদের দিলেন আর নিম্ন শ্রেণীকে পরে সৃষ্টি করে তাদের দিলেন অবজ্ঞা আর লাঞ্ছনা? ভগবান কি এতই কাপালিক? অচ্ছুৎদের খুন পান না করলে তার ক্ষুধা মিটবে না? উচ্চ শ্রেণীর রক্ত পান করতে তার মনে কি চায় না?

যে মহান স্বত্বা চাঁদ, সূর্য, সিতারা ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন। যে অবিনশ্বর খোদার হুকুমে দিন রাত্রির পরিবর্তন ঘটছে। যার হুকুমে মাটির বুক থেকে রস সংগ্রহ করে ফুল ফুটছে, যিনি উঁচু নীচু জাতকে একই উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। দিয়েছেন একই অন্তর, একই বিবেক। তিনি কি সূর্যের রশ্মি অচ্ছুদের ঘরে পৌছান না? তাঁর কুদরতি বৃষ্টি কি অচ্ছুৎদের স্নাত করে না? অচ্ছুৎদের হাতে বপন করা বীজ থেকে কি ফসল উৎপাদিত হয় না?

এ সমাজে স্রেফ শুদ্রজাতি নিঃগৃহীত নয়। দানবীয় শক্তি বলয় কেবল ওদের গলা টিপে দিচ্ছে। ওরা গোটা মানবতার দুশমন। দুশমন প্রকৃতির। যে দেবতাগণ এক ব্রাহ্মণ বা কায়স্থকে শুদ্র শ্রেণীর গলা টিপে দিতে নির্দেশ দেন, তারা পরস্পরের লড়াইকে নিষেধ করতে পারেন না।

যেদিন মানুষের হাতে গড়া মূর্তি বিলীন হয়ে যাবে এবং মানুষেরা তাদের প্রকৃত

সৃষ্টিকর্তার সামনে মাথা ঝুঁকাবে, সেদিন এদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শুদ্র ও বৈশ্যের মধ্যে কোন ফারাক থাকবে না। সকলেই সমান। ভালো মন্দের বিচার খুন দিয়ে করা যায় না। করতে হয় ব্যবহার দিয়ে। দুর্বল ও হাড্ডিসার মানুষগুলির ওপর বোঝা চাপিয়ে দিলেই উঁচু লোকের পরিচয় পাওয়া যায় না বরং ওদের বোঝা বহন করার মানসিকতা থাকলে সেই-ই কেবল উঁচু মানুষ। দেবতাদের তেলেসমাতির সে যুগ পর্ব শেষ- যাদের দোহাই পেড়ে বর্ণবাদীরা জুলুমের নরক সৃষ্টি করেছিলো ভারতবর্ষে। ইনসাফের আদালতে আজ কেবল ব্রাহ্মণদের বিচার হবে না। বিচার হবে তাবৎকালের জয়কৃষ্ণদেরও।

শকুন্তলার বাকশক্তি রহিত হয়ে এলো। কোন রকম উচ্চারণ করলো, 'আমি আপনার সাথে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হব না। আপনি আমার মনে দেবতাদের উপর কু-ধারণা সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হচ্ছেন কেন?'

'যেহেতু আপনি রণবীরের বোন তাই। ভাই বোনের জীবন চলার পথ এক ও অভিন্ন থাকা দরকার।

আচমকা শকুন্তলার গোটা দেহ ঝটকা দিয়ে উঠলো। আর্ত স্বরে বললো : 'রণবীর কি ইসলাম গ্রহণ করেছে?'

'না। এখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণের এলান করেনি। কিন্তু ওর মনোবাঞ্ছা আমি জানি। ওর অন্তর ইসলামের প্রতি অনুরাগী। যদিও মনের সাথে রসনার সংযোগ হয়নি আজো। ওর সবচে' বড় দুর্বলতা এক বোনের ভালবাসা। সে ভালবাসা ধর্মের ভিন্নতায় চিরতরে খতম না হয়ে যাক, এটা ওর সকাল-সন্ধ্যার ভাবনা। সেই নতুন দুনিয়ায় পা রাখার পূর্বে সে আপনাকে তার সঙ্গী হিসাবে দেখতে চায়। আপনি আমাকে স্বার্থপর ভাববেন না। অন্ততঃ এতটুকু বিশ্বাস রাখবেন- কোন ভয় কিংবা লালসা তাকে স্ব-ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করছে না।'

'আমার কিছুই বুঝে আসছে না। আমি শুধু জানি- দাদা যে পথে চলবেন আমি তার হাত ধরে সে পথে চলতে পারব। চলবো। তার সাথে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতেও আমার আপত্তি নেই।'

'ইসলাম অন্ধ বিশ্বাস করতে শিখায় না। ইসলাম একটি মৌল অবকাঠামোর নাম। নাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার। এ ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে আপনি বেশ ভেবে চিন্তে দেখতে পারেন। আপনি চাইলে আমি ইসলামের মাহাত্ম্য আপনার সামনে তুলে ধরব। অতঃপর কোন বাধ্যবাধকতা নয়- বরং সানন্দে আপনি এ ধর্ম গ্রহণ করবেন। আমি আজ বেশ সময় নিয়ে ফেলেছি। আরেক দিন আসব। আমার কথায় ঘাবড়ে গেলেন না তো?'

'না। আমি শুনতে চাই। চাই জানতে। অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে উপলব্ধি

'সাহাবায়ে কিরাম মানবতার প্রাণ পুরুষ ছিলেন। ছিলেন মূর্ত প্রতীক। সুলতানের সাথে তাদের তুলনা শোভা পায় না। আমার বিশ্বাস সুলতানের বিজয় ধর্মপ্রচারকদের চলার পথ কন্টক মুক্ত করবে। তাঁদের মাধ্যমে আমরা সোনালী যুগের ঝলক দেখতে পারব। সুলতান কেল্লা জয় করবেন আর ধর্ম প্রচারকগণ করবেন মানুষের মন জয়। উত্তর ভারতে দরবেশগণ পৌঁছে গেছেন- যাদের অর্ন্তভেদী দৃষ্টি সুলতানের তলোয়ারের চেয়েও তীক্ষ্ম।

কামরায় নীরবতা ছেয়ে গেল। নীরবতা ভঙ্গ করে আব্দুল ওয়াহিদ বললেন ঃ 'আপনি এজাযত দিন। সকালে চলে যাব। দু'হপ্তার মধ্যে কনৌজের কাজ সেরে আমাকে গজনী যেতে হবে। থাকতে হবে ওখান বেশ কিছুদিন। হতে পারে ওখান থেকে আমাকে অন্য কোথাও পাঠানো হবে। আমার অনুপস্থিতিতে দাদাকে নিয়ে পেরেশান হবেন না। কনৌজে আমার স্থলাভিষিক্ত থাকছেন। তিনি রণবীরের খবরাখবর প্রতিনিয়ত আপনাকে দিবেন। রণবীর এলে ওকে আমার সালাম দিবেন, কেমন।'

শকুন্তলার চেহারায় আচানক বিষাদের ছায়া পড়লো। ভারাক্রান্ত আওয়াজে বললো, 'গজনী থেকে অন্য কোথাও আপনাকে পাঠানো হলে দাদার সাথে সাক্ষাৎ করতে এদিকে আসবেন না?'

'মওকা মিললে অবশ্যই আসব। আপনি বিশ্রাম নিন।' আব্দুল ওয়াহিদ উঠে দাঁড়ালেন।

শকুন্তলা উঠতে উঠতে বললো ঃ 'যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটি কথা বলি।'

'বলুন।'

'আশা' কে?

আব্দুল ওয়াহিদের মুখ কালো হয়ে গেলো।

শকুন্তলা বললো 'মাফ করুন! গোস্তাকী করে ফেলেছি। কিন্তু আমাকে প্রথম দেখেই আপনার মুখ থেকে 'আশা'র নামটি উচ্চারিত হয়েছিলো।

আব্দুল ওয়াহিদ গরদান ঝুঁকে বললেন, 'আপনার দাদার কাছেই শুনবেন আশার কাহিনী। ও ভালো করে জানে তা।'

আব্দুল ওয়াহিদকে বিদায় জানাতে শকুন্তলা সিঁড়ি পর্যন্ত এলো। এদিকে শম্ভুনাথ করিডোরে রাজ্যের উৎকণ্ঠা নিয়ে বিক্ষিপ্ত পায়চারী করছিলো। মেহমানকে বিদায় দিয়ে শকুন্তলা বিশ্রাম কক্ষের দিকে পা বাড়ালো।

'কে এই আশা? আমার প্রশ্নের উত্তর কেন দিলেন না তিনি?

বিছানায় শুয়ে কেবল একথা চিন্তা করছিলো শকুন্তলা। চোখ জুড়ে এক সময় নেমে এলো রাজ্যের নিদ্রা। সুখ নিদ্রা। চোখ খুললো। খোলা বাতায়ন পথে সৌর রশ্মি এসে ওর মুখে পড়লো।

'ওমা! কি মরণ ঘুম আজ ঘুমালাম!' কামরা থেকে দৌড়ে বেরুলো ও। চাকরানী ঝাড় দিচ্ছিলো করিডোর।

শকুন্তলা বললো, 'মেহমান চলে গেছেন?'

'তিনি সেই গভীর রাতেই চলে গেছেন।' চাকরানী জবাব দিলো।

জবাব শুনে শকুন্তলার মনে ব্যথার একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। মনে মনে বললো, 'হায়! আপনি যদি আর ক'টা দিন থেকে যেতেন!'

চূড়ান্ত লড়াই
শেষ পর্ব
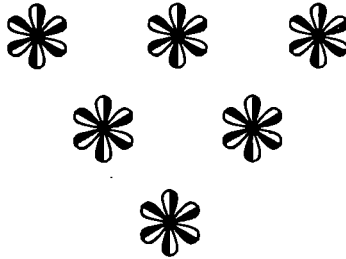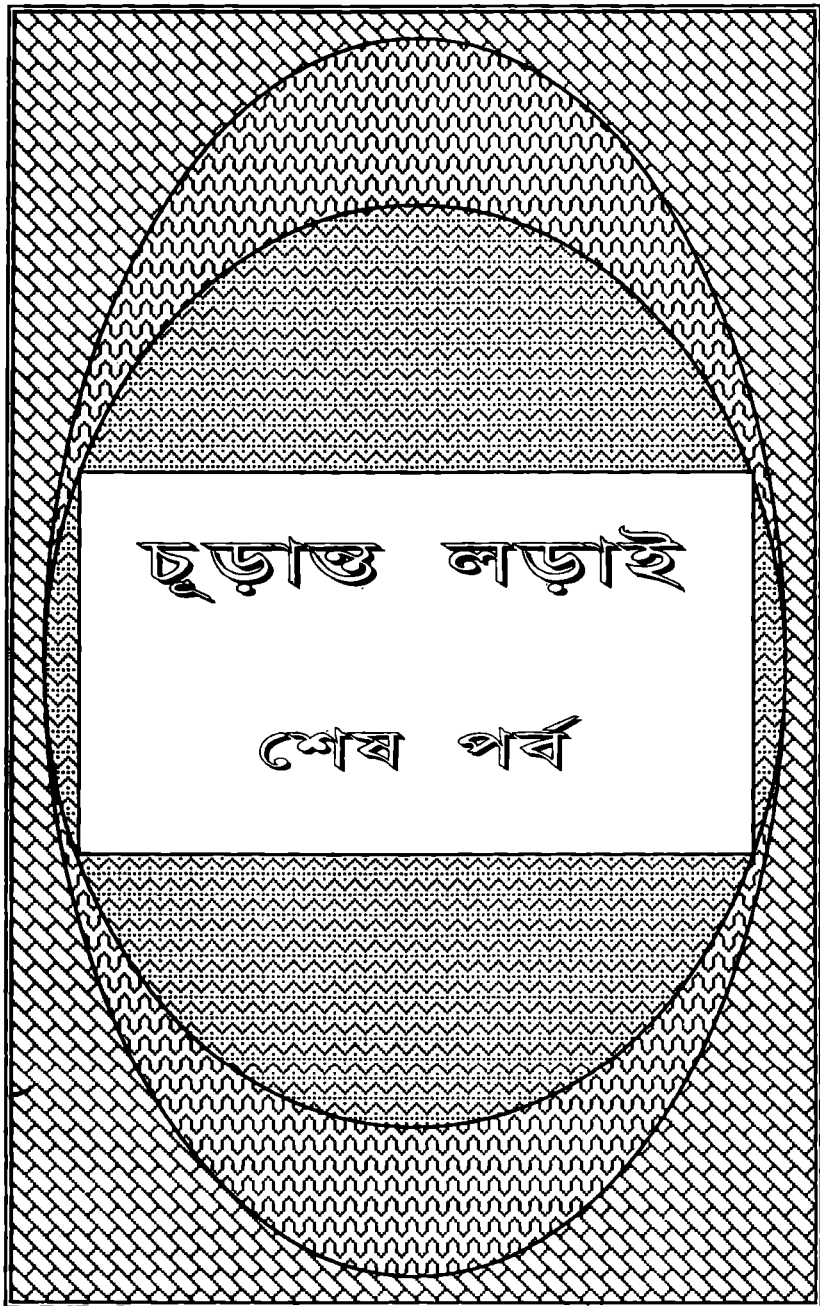
সোমনাথ মন্দির

রণবীরদের গাঁও থেকে বিদায় নেয়ার পর রামনাথের গন্তব্য ছিল সোমনাথ মন্দির। কিছুদিন সফর করার পর সে চাম্বল নদী-তীরবর্তী একটি গাঁও-এ প্রবেশ করল। গাঁয়ের চৌরাস্তার মোড়ে কিছু লোক ওকে দেখা মাত্রই হাতজোড় করে উঠে দাঁড়াল। জনৈক নওজোয়ান এগিয়ে এসে ওর ঘোড়ার লাগাম ধরল। এক লাফে ঘোড়পৃষ্ঠ থেকে রামনাথ গ্রাম্য চৌধুরীর কথা জিজ্ঞেস করল। নওজোয়ান জবাব দিল, 'মহারাজ! সর্দারের হুকুম পেয়েই সে তার লোকজন নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেছে। গ্রামে এক্ষণে স্রেফ ১০/১৫ জন লোক রয়েছে। তারা কেউ-ই শিকারের যোগ্য নয়।'

রামনাথ বললো, 'তোমার কথা মাথামুণ্ড কিছুই বুঝলাম না। স্রেফ এক মুসাফির আমি। আসছি এই জনপদে রাত কাটাতে।'

নওজোয়ান বললো, 'আপনার পদসেবা আমাদের জিম্মায় ফরয। আমি চৌধুরী-পুত। আসুন!'

রামনাথ একটি খাটের ওপর বসল। চৌধুরী-পুত তার ঘোড়া এক লোকের হাতে সোপর্দ করে এসে খাটের অপর পাশটিতে বসল। কথায় কথায় ও জানতে পারল, আনহলওয়ারার মহারাজা স্থানীয় রাজার নির্দেশে শিকারে এসেছেন এবং এলাকার সর্দারদের শিকারে মদদ জোগানোর জন্য তারা পার্শ্ববর্তী বনে গেছেন।

রামনাথ অতি প্রত্যুষে ওই গাঁও থেকে রওয়ানা হলো। ক্রোশ ত্রিশেক বন-বাদাড় অতিক্রম করার পর কিছু হাতি ওর নযরে পড়ল। যেগুলো সাড়ি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। শিকারীরা ওর পৃষ্ঠে সওয়ার। পেছনে পেয়াদারা তেগ-নেযা উঁচিয়ে দণ্ডায়মান। জনৈক নওজোয়ান রামনাথকে হাতের ইশারায় নিষেধপূর্বক অগ্রসর হয়ে বললো, 'আপনি কি আনহলওয়ারা মহারাজার লোক?'

'না।' রামনাথ জবাব দেয়, 'আমি এক মুসাফির।'

'তাহলে দাঁড়ান! এদিকে কারো প্রবেশানুমতি নেই।'

'তাহলে আমি না হয় অন্য কোথাও যাই।'

নওজোয়ান খানিক রূষ্টকণ্ঠে বলল, 'বললাম তো, আপনি আগে যেতে পারবেন না। ডানে-বামে, সামনে-পেছন থেকে আমাদের লোকজন শিকারটিকে দাবড়ে নিয়ে আসছে। আপনার উপকারের জন্য কথাগুলো বলছি। দ্রুত ফিরে যান। এখানে ঘোড়া দাঁড় করাবারও এজাযত নেই।'

এ সময় অন্যান্য লোকদের চিৎকার শোনা যেতে লাগল। রামনাথের মনে শিকার দেখার একটা খায়েশ জন্মাল। ঘোড়ার থেকে নওজোয়ানকে সে বললো, 'শিকার দেখার প্রচণ্ড শখ আমার। অনুমতি মিললে আপনার পাশটিতে দাঁড়াই।'

নওজোয়ান মুচকি হেসে বললো, 'যান! পেছনের কোন গাছে চেপে আপনার শখ মেটান গিয়ে।'

রামনাথের চেহারা গোস্বায় রক্তিম হয়ে গেল। কিন্তু সে বড্ড সংযতচিত্তে এই পরিস্থিতি সামাল দিল। বললো, 'সময় এলে আপনি আমাকে কাপুরুষতার ধিক্কার দিতে পারবেন না।'

'আমার কথায় চোট পেয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন। আমি বলতে চেয়েছি, নেযা-ঢাল ছাড়া নিরস্ত্র অবস্থায় এখানে দাঁড়ানো ঝুঁকিবহুল বৈ তো নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বাহাদুরী ফলাতে চাইলে আমি বাধা দেব না। আপনার ঘোড়া কোন গাছের সাথে বেঁধে দিন।'

'শান্ত হোন। আমার তলোয়ার কাষ্ঠফলক নয়' বলে রামনাথ তার ঘোড়া পেছনে টেনে নিল। সামান্য দূরে ওটি গাছের সাথে বেঁধে শিকারের অপেক্ষায় থাকল।

॥ দুই ॥

শিকারকে ঘিরে নেয়া লোকের চিৎকার ক্রমাগত নিকটবর্তী হতে লাগল। অবোধ প্রাণীগুলো খামোশীর সাথে একে অপরের মুখ চাওয়া চাউয়ি করছিল। গাধা, খরগোশ ও চিতাবাঘগুলো নিরূপায় হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছিল।

রামনাথের থেকে খানিক দূরে আনহলওয়ারার মহারাজা ভীমদেব একটি হাতির পিঠে সোনালী হাওদায় বসে এদিক সেদিক ঝুঁকছিলেন। জনৈক অভিজ্ঞ শিকারী তাঁর পার্শ্বে। মহারাজা মিশুক ও বিশাল বপুধারী। তার হাতির মাথায় মোতির ঝালর ও গলে স্বর্ণ শেকল। পায়ে স্বর্ণের ভারী কড়া চমকাতেছিল।

আচমকা দু'টি চিতাবাঘ দেখা গেল। ও দু'টিকে হেঁকে রাজার দিকে দাবড়ে নিয়ে আসা হচ্ছিল। কিন্তু একটি চিতা সহসাই লাফ মেরে ওঠল এবং জনৈক শিকারীর দেহে তার থাবার আশীর্বাদ রেখে সামনে এগিয়ে গেল। অপর চিতাটিকে লক্ষ্য করে রাজা মহাশয় নেযা মারলেন। চিতাটি যখম হয়ে লম্ফন-কূর্দন করতে করতে রাজ-মাহুতের দেহে থাবা বিস্তার করল। ভয়কাতুরে হাতি তার শুঁড় বৃত্তাকারে পেঁচাল। হাতি চালক ও চিতা দুটোই একসাথে মাটিতে আঁছড়ে পড়ল। মহারাজার সঙ্গী নেযা মেরে মাহুতকে বাঁচানোর কোশেশ করলেন, কিন্তু হতাশ হাতি ততক্ষণে সামনে অগ্রসর হয়েছে অনেক খানিক। ইতোমধ্যে অপরাপর শিকারীদের সামনে আরো কিছু চিতাবাঘের আনাগোনা লক্ষ্য করা গেল। এবার সকলে মাহুতের জীবন

রক্ষার চেয়ে আপনার জান বাঁচানোর চিন্তা করলো বেশী। রামনাথ অগ্রসর হয়ে চিতাবাঘের ওপর হামলা চালাল। ওর তলোয়ারের প্রচণ্ড আঘাতে চিতাবাঘের খুপড়ীর অনেক খানিতে ক্ষতের সৃষ্টি হল। কয়েকটি ওলট-পালট খেয়ে চিতাবাঘটি নিস্তেজ হয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে মাহুত বেচারার জীবন প্রদীপও নির্বাপিত হলো। ইতিমধ্যে আরো দু'টি বাঘ শিকারীরা মেরে ফেলল। বাদবাকী হিংস্র পশুরা কাতার চিরে জংগলে ওঁৎপেতে থাকল। রাজা ভীমদেবের হাতি ৪০/৫০ কদম দূরে গিয়ে থামল। দেহরক্ষীরা এ সময় তাঁর চারপাশে জড়ো হলো। জনৈক সর্দারের মাহুত নিজ হাতি থেকে নেমে রাজার হাতিটিকে আয়ত্বে আনার কোশেশ করলেন। তিনি তখনও পৌঁছুতে পারেননি এই ফাঁকে জংগল থেকে তিনটি চিতাবাঘ একযোগে হামলা শানাল। দু'টি চিতা রাজার পদাতিক বাহিনীর ওপর হামলা করে দু'জনেরই কলিজা বিদীর্ণ করে ফেলল। তৃতীয়টা লাফ দিয়ে রাজার হাতির গর্দানের ওপর চেপে বসল। বর্শা মেরে ওটিকে নীচে আছড়ে মারলেন তিনি। কিন্তু ইতোপূর্বেকার তটস্থ হাতি আরো তটস্থ হয়ে চিৎকার মেরে সামনে অগ্রসর হতে থাকল। রামনাথ রাজা মহাশয়ের জীবন বিপন্ন দেখে পতিত এক সেপাইয়ের নেযা উঁচিয়ে হাতিটার পেছনে দৌড়াতে লাগল। হাতিটি যখন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছিল তখন একটি গাছের তলা দিয়ে অতিক্রমকালে রাজা মহাশয় ঝুলন্ত শাখা ধরে ফেলে কোনক্রমে জীবন বাঁচানোর কোশেশ করলেন। কিন্তু ওই হাতিতে উপবিষ্ট রাজার দেহরক্ষী কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই বৃক্ষ শাখার সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে যমীনে পতিত হয়ে পাথরে টক্কর খেয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করল। রাজা মহাশয় অসহায় অবস্থায় তখনও গাছের ডালে ঝুলন্ত। একটি যখমী বাঘ যেটি আশেপাশে ওঁৎপেতে ছিল, সহসাই ওই বৃক্ষে লাফ মেরে চেপে বসল। রাজাকে হামলা করে শেষ করে দেয়া তার জন্য এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ভয়কাতুরে সেপাইরা চারদিক থেকেই এ দৃশ্য অবলোকন করে হাউমাউ করে চিৎকার জুড়ে দিল। চিতাবাঘ থাবা বিস্তারের পূর্বক্ষণে শেষ বারের মত চোখ-কান খাড়া করল। সমূহ বিপদ আঁচ করে বাদুর ঝোলা থেকে কেঁচকি মেরে দু'পা উঁচিয়ে গাছের শাখায় চড়ে বসে মহারাজা খাপ থেকে তলোয়ার বের করে অপেক্ষায় থাকলেন। আচানক চিতাবাঘটি গর্দান উঁচাল। রাজা মহাশয় ওকে হামলাপ্রবণ দেখে থমকে গেলেন। চিৎকার দিয়ে তিনি সঙ্গীদেরকে সাহায্য করতে বললেন।

রামনাথ চিৎকার শুনে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। ক'কদম সামনে জনা তিনেক শিকারী। রাজা বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার দিচ্ছেন, 'হুঁশিয়ার! ওপর থেকে চিতাবাঘ হামলা সানাচ্ছে।'

রামনাথ ওপরে তাকিয়ে দেখল চিতাবাঘ হামলা করার জন্য প্রস্তুত। ঢাল তাক করে নেযা নিয়ে প্রস্তুতি নিল ও। চিতাবাঘ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বিকট হুংকার দিয়ে

লাফ মারল। চোখের নিমিষে রামনাথ হাটুগেড়ে বসে নেযার গোড়া যমীনে গেড়ে দিল। ভাগ্য ভালো, চিতাবাঘ লাফ দিয়ে ওই প্রোথিত নেযার ওপর পড়ল। মুহূর্তে তার বুক এফোড় ওফোড় হলো। চিতার ভারে নেযা ভেঙ্গে গেল ঠিকই কিন্তু ততক্ষণে রামনাথের উদ্দেশ্যও সাধিত হলো। ও ক'কদম দূরে গিয়ে কোষাবদ্ধ তলোয়ার বের করল। ইতোমধ্যে অন্যান্য শিকারীরা এসে গেল।

চিতাবাঘটি যমীনে ওলট-পালট করছিল। শিকারীরা উপর্যুপরি নেযার আঘাতে তাকে ঝাঁঝড়া করে ফেলল। খানিকবাদে স্থানীয় রাজা ও তার লোকজন এসে জড়ো হলো।

॥ তিন ॥

মহারাজা ভীমদেব বৃক্ষ থেকে নামলেন। লোকেরা বুলন্দ আওয়াজে বললো, 'মহারাজের জয়'। কিন্তু মহারাজা কারো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আস্তিনে ঘাম মুছতে মুছতে সোজা রামনাথের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছু না বলে গলার থেকে মোতির মালা খুলে ওর গলে পরিয়ে দিলেন। বেশ ক'জন শিকারী হাওদার নীচে চাপা পড়া শিকারীকে টেনে বের করল। কিন্তু সে জিন্দেগীর কোলাহল মুখরতা বিদায় জানিয়েছিল চিরদিনের জন্যই। ভীমদেব অগ্রসর হয়ে তার নাড়ী টিপে স্থানীয় লোকদের লক্ষ্য করে বললেন, আমার অতি উত্তম শিকারী খতম হয়ে গেল, কিন্তু এর বিনিময়ে উত্তম আরেক শিকারীকে আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি।'

স্থানীয় সর্দার জবাব দেয়, 'মহারাজার হুকুম শিরোধার্য। কিন্তু আমি মনে করেছিলাম এ নওজোয়ান আপনার-ই লোক।'

'এ লোক আমার হলে তো একে উত্তম হস্তিপৃষ্ঠে সওয়ার দেখতেন।'

'তাইলে বোধহয় ইনি অজিন মহারাজের সাথে এসেছেন।'

রামনাথ অগ্রসর হয়ে বললো, 'না মহারাজ! আমি কারো সাথেই আসিনি। আমি এক ভীনদেশী। ঘটনাক্রমে এখানে আসা।'

ভীমদেব জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কোত্থেকে এসেছ?'

'কনৌজ থেকে।'

'কৈ যাচ্ছ ?'

'মহারাজ! আমি সোমনাথের তীর্থযাত্রী। ওখানে আমার একটি মানত রয়েছে।'

'তুমি আমাদের মেহমান।'

'মহারাজের খায়েশে-ই আমার খুশী।'

মহারাজা ভীমদেব শিকারের পালা চুকে ছাউনীতে ফিরে এলেন। পরদিন রামনাথ বিদায় নিতে এলে মহারাজা তীর্থযাত্রা শেষে আনহলওয়ারা আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, 'তুমি আমার ফৌজি চাকুরী পছন্দ করলে আমি খুশী হব।'

'আমি কথা দিতে পারছি না; কিন্তু পরিস্থিতি হয়ত কোনদিন আপনার কাছে উপনীত হতে আমায় বাধ্য করতে পারে।'

'আমরা সেদিনটির অপেক্ষা করব। ও হ্যাঁ! তোমার সোমনাথ যাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থাদি করে দিচ্ছি আমি।'

'না মহারাজ! ওখানে যেতে বিশেষ কোন ব্যবস্থার দরকার নেই।'

'আমার খায়েশ আমার এক দোস্ত হিসাবেই তুমি ওখানে যাও। বাহন তোমার হাতি। একজন মাহুত ছাড়াও জনাচারেক নওকরও থাকছে তোমার সাথে। ওখানে গিয়ে সদম্ভে এই বলারও অনুমতি থাকল যে, আমি আনহলওয়ারার বৃহৎ ত্রিশজন সর্দারের একজন। ওখানে তোমার বিশাল এক ভূ-স্বামী করার খেয়ালও করেছি। এ কোন প্রতিদান নয়, তোমার বীরত্বের সম্মান মাত্র।'

স্বপ্নঘোরে এই শব্দমালা শুনছিল রামনাথ। কৃতজ্ঞতা ও মাহাত্ম্য প্রদর্শনের কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না সে।

খানিকবাদে হস্তিপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে রামনাথ কাংখিত গন্তব্য উদ্দেশ্যে ওই স্থান ত্যাগ করল। চার সওয়ার ওর সহযাত্রী। এ ওর পুরানো স্বপ্নের তাবীর। ও মনে মনেই আওড়ালো..... 'আমার ও রণবীরের জীবন চলার পথ ভিন্ন। রূপাবতিকে পাওয়ার পর আমার জীবনের কোনই শূন্যতা বাকী থাকবে না। হিন্দু সমাজ ও মাহমুদ গজনবীর হামলারও এতটুকু তোয়াক্কা করব না আমি। পাথরের মূর্তি ভাংলো, কি থাকলো—তারও কোন আকর্ষণ থাকবে না আমার। রূপাবতিকে পাওয়ার পর মাথা গোজার ঠাঁই লাগবে আমার। তাও পেয়ে গেছি। এক্ষণে নিঃস্ব মুসাফির নয়, যাচ্ছি আনহলওয়ারার প্রভাবশালী সর্দার হিসাবে। সোমনাথ পুরোহিতকে এই হাতি দান করলে সানন্দচিত্তেই মন্দিরে বিচরণ করার অনুমিত পেয়ে যাব আমি। পরে মোতির এই মালা নযরানা দিয়ে রূপাকে ছাড়িয়ে আনার কোশেশ করব। আনহলওয়ারার কেউ তা জানবে না। এতেও কাজ না হলে অন্য যে কোন উপায়ে ওকে মন্দির থেকে বের করে আনার কোশেশ করব। কাক-পক্ষীও টের পাবে না। রূপাকে পেলে আমার জীবনে অনস্বাদিত আর কোন দিক থাকবে না।

॥ চার ॥

সোমনাথ মন্দির।

সুবিশাল এক কেল্লা। সুবিস্তৃত এক মন্দির। দিগন্ত প্রসারী এক সুরম্য অফিস। কুঠিয়াওয়ার উপকূলের স্বরস্বতী নদীর তিন মাইল দূরে সুউচ্চ এক প্রাচীর দাঁড়িয়ে। এই প্রাচীর অভ্যন্তরেই সোমনাথ সেপাইদের বাস। এর সামনে সমুদ্রের দিকে সোমনাথের তীর্থযাত্রীদের জন্য মেহমানখানা, নওকর-খাদেমদের বিশ্রামাগার। এরপর

আলীশান সুরম্য অট্টালিকার প্রলম্বিত সারি। যা বানানো হয়েছে হিন্দুস্থানের রাজা-মহারাজাদের রেস্ট হাউস হিসাবে। মন্দিরের পূজারী ও ব্রাহ্মণদের বাসভবনও এর সংলগ্ন। ওখান থেকে প্রশস্ত একটা সড়ক দেখা যেত। পানির থেকে যা ক'গজ উঁচুতে। ওই পথের দু'ধারে পূজারীদের আরো কিছু প্রমোদভবন। শান-শওকতে এগুলো কোন অংশেই রাজা-মহারাজাদের আবাসন থেকে কম নয়। এই পথেরই শেষাংশে সোমনাথের প্রধান পুরোহিতের গগনচুমো প্রাসাদ। এরপরই মন্দিরের সুবিশাল লৌহকপাট।

মন্দিরের তেড়ছা ১৩টি বিল্ডিং পানিতে দাঁড়ান। এর ছাদে ১৪টা সোনার কলসী দূর-দরাজ থেকে দেখা যেত। কেল্লার থেকে দু'টি পথ মন্দিরের উত্তর-দক্ষিণমুখী প্রবেশদ্বারে গিয়ে শেষ হয়েছে। পশ্চিম দিকে একটা প্রশস্ত বেলকনী ছিল যার থেকে একটি সিড়ি পানিতে নেমে গেছে।

মন্দিরের মধ্যবর্তী কামরায় কারুকার্যময় পাথরের বাহারী গাঁথুনি। ওই কামরায় একটি বৃত্তাকার বেদীতে সেই মূর্তিরই অবস্থান, ভারতবর্ষের আনাচে- কানাচে যার শক্তি ও দাপটের প্রসিদ্ধি। এই মূর্তি বেদীর থেকে ৫ হাত উঁচু এবং দু'হাত ওই বৃত্তের মাঝে। তার দেহে মূল্যবান মণি-মাণিক্যের প্রলেপ। ছাদে সোনার শেকলের সাথে মূর্তির একটি জওহর খঁচিত তাজ লটকানো ছিল। আলো দানের জন্য ছাদে ঝুলানো ছিল দুষ্প্রাপ্য ঝাড়-ফানুস। দরোজাগুলোয় চোখ ধাঁধাঁনো জমরুদ, ইয়াকুত ও লাল-মোতির ছাপ। সোমনাথ মূর্তির আশে পাশে হাজারো স্বর্ণ-রৌপ্যের মূর্তি স্থাপিত। এগুলো বড় মূর্তিটির সেবক বলেই হিন্দুদের বিশ্বাস। মন্দিরের দরোজায় স্বর্ণের ঘন্টা ছিল। পূজার সময় ওটা বাজান হতো। ওটি দু'শ মন স্বর্ণের শেকলে ঝুলানো।

হিন্দুদের নিকট সোমনাথ মূর্তি জীবন-মৃত্যুর মালিক। এটা নাকি মানুষকে হর্ষ -বিষাদ দিয়ে থাকে। মৃত্যুর পর মানবাত্মা এই মূর্তির আশে পাশে জমায়েত হয়। এই মূর্তিই তাদেরকে নব-জীবন দান করে।

এই মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের এমন ভীড় থাকত যে, হাজার হাজার ব্রাহ্মণকে তাদের পূজা-পাট শেখানোর কাজে ব্যপৃত থাকতে হত। হাজারো মানুষ তীর্থযাত্রীদের খেদমতে নিযুক্ত ছিল। সহস্র নট-নটি, গায়ক-বাদক মন্দিরের দরোজায় অপেক্ষমান থাকত।

ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কুলীন যুবতীরা নৃত্য ও সংগীত শেখার জন্য এখানে আসত।

তন্মধ্যে স্রেফ নিপুণ নৃত্য শিল্পী ও সুরেলা গায়িকাদের সোমনাথ মূর্তির সামনে স্ব-স্ব নৈপুণ্য প্রদর্শনের অনুমতি মিলত। এসব যুবতীদেরকে ভারতবর্ষের সর্বত্রই

শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। রাজা-মহারাজাদের পুত্ররা এদের পানি গ্রহণের জন্য লাইন ধরে থাকত। এছাড়া অজস্র যুবতী ছিল যাদেরকে সোমনাথের দাসী বলা হত। তন্মধ্যে অনেকে এমনও ছিল যাদের বাবা-মা জন্মের পূর্বেই তার বাচ্চাকে সোমনাথ দেবতার পদসেবার জন্য উৎসর্গ করে রাখতেন। পরে সোমনাথে এদের পাঠান হতো। আবার অনেক এতিম যুবতীদেরকে প্রভাবশালী লোকেরা ওখানে পাঠাত। এই যুবতীরা সোমনাথের পূজারী ও পুরোহিত-ব্রাহ্মণদের সেবা করত। পুরোহিত প্রধানের অনুমতি ব্যতীত মন্দিরের চার দেয়ালের বাইরে বেরোবার অনুমতি ছিল না এদের। নৃত্য ও সংগীত বিদ্যায় পারদর্শী হবার পর মন্দিরের গুপ্ত রহস্যের দারোম্মোচন করা হত এদের কাছে, ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ জানত না যা।

লিঙ্গাকৃতির সোমনাথ মূর্তিকে গোসল করার জন্য প্রাত্যহিক হাজারো মানুষ গঙ্গাজল যোগান দানে নিযুক্ত হত। এভাবে হাজার মাইল দূরবর্তী কাশ্মীরের বন-জঙ্গল থেকে ফুলের মালা আনয়নের জন্য নিযুত কর্মীর নিয়োগ ছিল। মন্দির এত বিশাল ছিল যে, হাজারো কর্মী থাকার জায়গা দিতে কর্তৃপক্ষকে কপালের ঘাম ফেলতে হত না।

সমুদ্র উপকূলবর্তী অসংখ্য কুঠরী সাধু-সন্যাসীদের জন্য নির্ধারিত ছিল যারা দেবসন্তানদের কামলীলা সম্পাদনের যোগান দিয়ে থাকত। এরা পোষাক পরিধান করার স্থলে গায়ে ছাই মেখে থাকতেই অধিক পছন্দ করত।

সোমনাথের ধন-ভান্ডারের প্রমাণ মিলে এই পরিসংখ্যানে যে, ভারতবর্ষের সর্বত্রই তাদের জায়গীর ছিল। ভারতের রাজা-মহারাজা এই মন্দিরের অনুষ্ঠান পালনের জন্য বাড়ী বাড়ী ট্যাক্স আদায় করতে আসত। সকলেই প্রতিযোগিতা মূলক ট্যাক্স দিয়ে থাকত। এছাড়া ভারত মাতার সন্তানেরা তো লাখো নযরানা নিয়ে এখানে সমবেত হতই।

সোমনাথের প্রসিদ্ধি কেবল ভারতবর্ষেই নয় বরং গোটা বিশ্বে ছড়ানো ছিল। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বেশ কিছু দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা তাদের বজরা নিয়ে সোমনাথ বন্দরে ভেড়ানো থাকতেন। ঐসব জাহাজের নাবিকদের মারফত পূজারীরা সোমনাথের অলীক কাহিনী বলত। তারা সোমনাথকে সমুদ্রের দেবতা জ্ঞান করত এবং সামুদ্রিক সফরের প্রতিটি সফল ট্রিপে তার জন্য নযরানা মানত। সোমনাথ সমুদ্রের আশে পাশে জাহাজডুবি হলে এ খবর ছড়িয়ে পড়ত যে, সোমনাথ দেবতা এর মাঝি-মাল্লার ওপর নাখোশ হয়েছেন। পক্ষান্তরে কোন জাহাজ সফলকাম হয়ে ফেরৎ এলে বলা হতো, দেবতা এদের ওপর খোশ।

সোমনাথের কেল্লা ও মন্দিরের বাইরে স্বরস্বতী নদীর তীরে বিশাল এক বন্দর গড়ে উঠেছিল। দেশ-বিদেশের পণ্য এখানে পাওয়া যেত অতি সহজে- সুলভে।

নির্মলা ও রূপাবতি

গোয়ালিয়র-এ জয়কৃষ্ণের স্ত্রীর বড় ভাই সর্দার শ্যামলাল একজন সত্যবাক ও আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন রাজপুত ছিলেন। তার স্বার্থন্ধতা, আমিত্বগিরি ও সুযোগ সন্ধানী মনোভাবের দরুণ জয়কৃষ্ণ তার প্রতি ছিলেন বিরাগভাজন। এ ব্যাপারে অসংখ্যবার তিনি ঐ বিরাগীভাব প্রদর্শন করেছেন। এজন্য জয়কৃষ্ণ তার থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করতেন। কিন্তু নিজ গ্রামে হামলার খবর শুনে তিনি একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোয়ালিয়রমুখো হন। 'বোন ও বোনঝিকে দুশমনের মুখে ফেলে কি করে প্রাণরক্ষা করে চলে এলাম' শ্যামলাল এ প্রশ্ন করলে কি জবাব দেব– এ আত্মজিজ্ঞাসা তাকে পীড়া দিয়েছে পথিমধ্যে। তিনি মনে মনে আওড়ান, ওখানে উঠে প্রথমে গ্রামে হামলার কাহিনী বলা যাবে না। কিন্তু শ্যামলাল এতো সহজে ছেড়ে দেয়ার পাত্র নন। এই বাহানা সামান্য কথায় তিনি উড়িয়ে দিবেন। তিনি অবশ্যই বলবেন, মুসলিম ফৌজ যখন কনৌজ অভিমুখে ধেয়ে আসছে তখন আপনি এখানে কেন ? সুতরাং সীমান্ত অতিক্রমের পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিলেন, তাকে সরকারী ফৌজে নাম লেখাতে হবে। যদি আসন্ন যুদ্ধে রাজার পরাজয় ঘটে তাহলে আমাকে শ্যামলালের কাছে যাওয়া-ই লাগবে না। পক্ষান্তরে তার পরাজয় হলে শ্যামলালকে গিয়ে বলা যাবে, যা কিছু হয়েছে গ্রামে–তা আমার অনুপস্থিতিতেই হয়েছে। রাজা মহাশয়ের পরাজয়ের পর নির্মলা ও তার মাকে রণবীরের কয়েদ থেকে ছাড়িয়ে আনা আমার সাধ্যাতীত। ঘটনাক্রমে সীমান্তে এমন পাঁচ হাজার সৈন্যরে সাথে তার সাক্ষাত যারা রাজার সাহায্যার্থে ছুটে যাচ্ছিল। জয়কৃষ্ণও এদের দলে ভিড়লেন। নওকরদের মধ্যে কেবল পেয়ারলাল-ই তার সংগে।

কনৌজ ও বারী প্রান্তরে চরমভাবে পরাভূত হবার পর জান রক্ষার জন্য জয়কৃষ্ণের পরাজিত ফৌজের ঐ অংশের সাথে তাকে কালিঞ্জরের পথ ধরতে হলো, যারা গেন্ডাকে তাদের শেষ ভরসা মনে করছিল। কালিঞ্জরে প্রবেশ করেই জয়কৃষ্ণ শান্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এবং যুদ্ধে না গিয়ে গেলেন গোয়ালিয়র-এ। পথিমধ্যে প্রতিবেশী রাজা ও বেশ কিছু ফৌজের সাথে সাক্ষাত, যারা রাজা গেণ্ডার সহযোগিতায় যাচ্ছিল। রাজা গেণ্ডার যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে তিনি যদ্দুর শুনেছেন, তা বড্ড সন্তোষজনক-ই। সুতরাং তিনি আরেকবার দোদুল্যমান পরিস্থিতির শিকার হলেন।

কোন এক সন্ধ্যায় গোয়ালিয়র সীমান্তে জনৈক ফৌজি দলের সাক্ষাত। জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারেন, এরা গোয়ালিয়র বাহিনী। রাজা গেণ্ডার মদদে

এদের অগ্রাভিযান। জয়কৃষ্ণ পালানোর চিন্তা ত্যাগ করলেন এবং কতকটা বাধ্য হয়েই এ বাহিনীতে শামিল হলেন। সীমান্ত এলাকার শ্যামলাল ও তার খান্দানের কিছু লোকের সাথে তার দেখা হলো। জয়কৃষ্ণ তাদেরকে আপনার জনপদের কাহিনী বিধৃত করেন।

কালিঞ্জর রণাঙ্গনে রাজা গেণ্ডা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে জয়কৃষ্ণ শ্যামলালের সাথে গোয়ালিয়র-এ এলেন। বেশ ক'দিন পর জনৈক বিশ্বস্ত নওকর পাঠিয়ে নির্মলা ও তার মায়ের খবরাখবর নিলেন। সে খবর নিয়ে এলো, নির্মলার মা ইহলোক ত্যাগ করেছেন। নির্মলা এখনও রণবীরের বাড়ীতে বন্দী। শ্যামলাল খোদ রণবীরের খোঁজে বেরোতে চাচ্ছিলেন, ইতোমধ্যে রণবীরের বিশ্বস্ত নওকর শম্ভূনাথ নির্মলাকে এখানে পৌঁছে দেয়।

নির্মলাকে পাবার পর জয়কৃষ্ণ আপনার ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তায় পড়েন। সুযোগ সন্ধানীদের মত তিনিও বেশ দূরদর্শী গভীর পানির মাছ ছিলেন। তিনি খুব ভালো করেই আঁচ করলেন যে, এক বীরের বেশে জনপদে প্রবেশের পরিস্থিতি চিরতরে খতম হয়ে গেছে। যদি তিনি গোয়ালিয়রকে মাহফুয মনে করতেন তাহলে নিজ মেয়ের ভবিষ্যত ভাবনায় হলেও এখানে মাটি কামড়ে থেকে যেতেন, কিন্তু রাজা গেণ্ডার পরাজয়ের পর তিনি বুঝলেন, মধ্য ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তি ভেঙ্গে গেছে। সুলতান মাহমুদ দ্বিতীয়বার এলে গোয়ালিয়র ফৌজ তাঁর চলার পথে এতটুকু অন্তরায় হতে পারবে না। এরপর রণবীর তার তালাশে বের হলে গোয়ালিয়রের রাজাও দরকার হলে মুসলমানদের চোখে প্রিয়পাত্র হবার জন্য তাকে তার হাতে তুলে দিতে চাইবে। রণবীরের প্রতিশোধ-শংকা তাকে খুবই উদ্বিগ্ন করে তুললো। সুতরাং তিনি এমন একটা ধারণা মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন যেখানে রণবীর কিংবা মুসলমানদের শক্তি বাহু কার্যকরী নয়। অনেক চিন্তা অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিনি সোমনাথ মন্দিরকে নির্বাচিত করলেন। ওখানে পূর্ব-পশ্চিমের অসংখ্য রাজা-মহারাজা সৈন্য সমাবেশ ঘটাচ্ছেন। পুরোহিত অভিজ্ঞ সেনা কমান্ডারদের পুরস্কারে পুরস্কারে দু'হাত ভরে দিচ্ছেন। জয়কৃষ্ণ ভাবলেন, পূজারীদের মনোতুষ্টির পর প্রতিবেশী কোন রাজার চাটুকার হওয়া তার জন্য কোন ব্যাপারই হবে না সেমতাবস্থায়। এ ছাড়া মন্দিরের নারী মহলে নির্মলা তো তুরূপের তাস হিসাবে থাকছেই। সবচে' বড় কথা হোল, সোমনাথ মন্দির মুসলিম হামলা থেকে দূরে-বহুদূরে। আর ওখানে রণবীরের মত দুশমনের প্রবেশের তো প্রশ্নই ওঠে না।

গোয়ালিয়র রাজ দরবারে শ্যামলালের খুব দাপট প্রভাব ছিল। তিনি জয়কৃষ্ণকে রাজকর্মচারীর একটা চাকুরি জুটিয়ে দেয়ায় ধান্দা করছিলেন। জয়কৃষ্ণ এ ব্যাপারে শ্যামলালের কাছে নিজ এরাদার কথা ব্যক্ত করতে কেমন একটা

বিব্রতবোধ করছিলেন। 'নির্মলাকে সে পাঠাতে রাজী হয় কি-না' এ ভয় ছিল তার। সুতরাং তিনি একটা বাহানা খুঁজে পেয়ে শ্যামলালকে বললেন, আমি শিবাজীর নামে মানত করেছিলাম, নির্মলাকে খুঁজে পেলে ওকে নিয়ে সোমনাথ যাত্রা করব। এদিকে নির্মলাও বাবার সাথে সোমনাথ যাত্রার খায়েশ ব্যক্ত করল। সুতরাং শ্যামলাল কোন আপত্তির সুযোগই পেলেন না।

ঐ সময় ঘটনাচক্রে গোয়ালিয়রের কিছু লোক সোমনাথ যাচ্ছিল। জয়কৃষ্ণ মেয়েকে নিয়ে একাকী সফর করার স্থলে এদের তীর্থ কাফেলার সহযাত্রী হলেন।

॥ দুই ॥

তীর্থযাত্রীদের সাথে বেশ কিছুদিন সফর করার পর জয়কৃষ্ণ ও নির্মলা শেষ বিকালে একটি ছোট শহরে প্রবেশ করলেন। শহরের লোকদের কাছে ধর্মশালার রাস্তা জিজ্ঞাসা করার পর তারা এক প্রশস্ত পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। জয়কৃষ্ণ ও নির্মলা ছিলেন সর্বাগ্রে। একটি চকের কাছে পৌঁছে তারা মানুষের শোরগোল শুনতে পেলেন। হাতের ইশারায় জয়কৃষ্ণ সঙ্গীদের থামান। ঘোড়ার পদাঘাত করে যান এগিয়ে। লোকেরা হতাশাবস্থায় এদিক ওদিক সড়ে দাঁড়াল। ব্যাপারটা জানার চেষ্টা করলেন জয়কৃষ্ণ। কিন্তু সকলের মুখে 'পালাও পালাও, এসে গেছে এসে গেছে' আওয়াজ শুনে কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। সামনে এগোবার হিম্মত নেই তার। ঘোড়া থেকে ঝুঁকে তিনি এক লোকের বাযু ধরে বলেন, কি হয়েছে? কে এসেছে ? লোকটা এক ঝটকায় নিজকে জয়কৃষ্ণের হাত থেকে ছাড়িয়ে সরু গলির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ দেয়। গলিপথে তাকিয়ে জয়কৃষ্ণের পিলা চমকে ওঠে। একটা পাগলা হাতি শুঁড় উঁচিয়ে তেড়ে আসছে। মুহূর্তে সেটি জয়কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে যায়। জয়কৃষ্ণ ঘোড়া উল্টা দিকে ফেরান। হাতি জয়কৃষ্ণের পিছু না নিয়ে প্রশস্ত বাজারের দিকে অগ্রসর হয়। এ ঘটনা দেখে ফেলে অজ্ঞাত কাফেলাবাসী, যারা দূরে দাঁড়িয়েছিল। নির্মলাও ছিল এ দলে। ও ঘোড়ায় চেপে চকের দিকে এগিয়ে যায়। যাতে কোন মুসিবত এলে বাবার সঙ্গ দিতে পারে। হাতিটা ওর নযরে ঠিক তখনই পড়ে যখন সরু গলি থেকে বেরিয়ে ও ঠিক হাতির সামনের জমিনে পড়ে। জয়কৃষ্ণ চিৎকার দেবার কোশেশ করেন, কিন্তু তার আওয়াজ কণ্ঠনালীতে এসে আটকে যায়। নির্মলা কোনক্রমে বাবার কাছে পৌঁছাতে চায় কিন্তু ঘোড়া লাফ দিয়ে ওঠায় ও তার পিঠ থেকে আছড়ে পড়ে। বিকট চিৎকার দিয়ে হাতি সামনে এগিয়ে আসে। আত্মরক্ষার কোন হিম্মত নেই নির্মলার। ভাগ্যিস লোকের চিৎকারে হাতি ওর দিকে অগ্রসর হবার মওকা পেল না। হাতিটি অন্য পথ ধরল। অন্যান্য সহযাত্রীরা এ সময় এখানে সেখানে পালায়।

খানিক বাদে নির্মলার আশে পাশে লোকজন জমায়েত হল। ওর ললাট বেয়ে রক্ত পড়ছে। ঘোড়া থেকে নেমে ওকে হুঁশে আনার চেষ্টা করছেন জয়কৃষ্ণ। ততক্ষণে সওয়ারদের এক টুলি ওখানে এসে যায়। জনৈক বেশভূষাধারী তার সঙ্গীদের নিয়ে এসে ওখানে থমকে দাঁড়ালেন। লোকেরা পথ ছেড়ে দাঁড়াল।

নির্মলার হুঁশ এলো। ওকে বসানোর জন্য জয়কৃষ্ণ নিজ বাহুর সাহারা দিচ্ছিলেন। শহরের এক লোক মাথা থেকে পাগড়ী খুলে ওর মাথায় পট্টি বাঁধল। বেশভুষাধারী লোকটা কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার লাগেনিতো খুব একটা ?

নির্মলা এ প্রশ্নের জবাব দেয় না। পট্টিধারী লোকটা দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললো, 'মহারাজ! ভগবানের দয়ায় ওর জান বেঁচে গেছে। নয়তো হাতির পা ওর দিকে সামান্য উত্থিত হলে আর রেহাই ছিল না। ঘোড়াটা ওর কেমন যেন দাম্ভিক হওয়ায় মাটিতে পড়ে এই অবস্থা বেচারীর।'

বেশভূষাধারী এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'হাতি আর কাউকে কোন ক্ষতি করেছে কি ?

'মহারাজ! পেছনের গলিতে এক লোককে পদতলে পিষ্ঠ করেছে।' বলল এক লোক।'

'বড্ড আফসোস। ওর যদি কোন ওয়ারিশ থাকে তাহলে আমার কাছে পৌছে দাও।' বলে সে নির্মলার দিকে তাকায়। বলে, 'তোমার বাড়ী কোথায়?' নির্মলার বদলে জয়কৃষ্ণ জবাব দেন, 'আমরা কনৌজ থেকে এসেছি। জানতাম না, এদেশের হাতি জঙ্গল ও লোকালয়ের পার্থক্য জানে না।'

আগন্তুক জয়কৃষ্ণের এই শ্লেষপূর্ণ উক্তিকে পাশ কাটিয়ে বললেন, এ ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। আমি ভুলের ওপর না থাকলে এই দেবীর.....।

'আমি ওর বাবা......' চট করে তার বাক্য পুরা করে দিলেন জয়কৃষ্ণ।

'তা আপনারা যাচ্ছেন কৈ ?'

'সোমনাথ।'

'এই গন্তব্য তো আমাদেরও। সোমনাথে আপনি আমার মেহমান।'

জয়কৃষ্ণ আঁচ করছিলেন এই লোক নিশ্চয় প্রভাবশালী কেউ হবেন। তিনি ঝোপ বুঝে কোপ মারা লোক। এতদসত্ত্বেও নির্মলার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার শোকর আদায় করছি। আমার মেয়ে বেশ কিছুদিন হয়ত ঘোড়ায় চাপার যোগ্য হবে না।

'আপনি শান্ত হোন। ঘোড়া অপেক্ষা উত্তম বাহনের ব্যবস্থা করে দেব। বৃদ্ধ এই লোক তার এক সেপাইকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা এদের ছাউনীতে নেয়ার ব্যবস্থা করো। আমরা হাতির খবর নিয়ে আসি।'

'কে এই লোক ?' বৃদ্ধ লোকটা চলে যাবার পর সেপাইকে প্রশ্ন করেন জয়কৃষ্ণ।

'ইনি মহারাজ রঘুনাথ। আনহলওয়ারা মহারাজার জ্যাঠা।'

জয়কৃষ্ণ মনে করলেন তার ভাগ্য তারকা যেন সহসাই চমকে উঠছে। সেপাইর সাথে কথায় কথায় জয়কৃষ্ণ জানতে পারেন রঘুনাথ বার্ষিক খাজনা ছাড়াও ২০টি হাতি নযরানা স্বরূপ নিয়ে সোমনাথ যাচ্ছেন।

খানিক পর জনাচারেক লোক পাল্কী করে নির্মলাকে রঘুনাথের শিবিরে নিয়ে যায়। যাবার সময় পূর্বের সহযাত্রীদের দিকে তাকানোরও জরুরত মনে করলেন না জয়কৃষ্ণ। কেননা, এখন তিনি আনহলওয়ারা মহারাজার চাচার মেহমান।

ছাউনীতে রাত কাটাতে একটি পৃথক তাবু দেয়া হলো। নির্মলার অবস্থা আশংকামুক্ত ছিল না। হেকিম ওকে পরীক্ষা করে জয়কৃষ্ণকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার মেয়ের পাল্কীতে করে সফর করায় কোন কষ্ট হবে না।'

রাতের বেলা জয়কৃষ্ণ স্বতঃস্ফূর্তচিত্তে স্বপ্রণোদিত হয়ে রঘুনাথকে বলছিলেন, 'আমার ঘরদোর লুট হয়েছে। আমার এলাকার প্রভাবশালী সর্দাররা মুসলমানদের গোলামি কবুল করেছে, কিন্তু আমি এই নিকৃষ্ট কাজ পছন্দ করিনি। ওরা আমাকে বড় বড় লোভ দেখিয়েছিল, কিন্তু মাহমুদ গজনবীর চাটুকারিতায় গোটা কনৌজ রাজ্য পেলেও তা আমি গ্রহণ করব না। আমার জন্য কোন রাজপুতের রাখালী ওই সিংহাসনের চেয়েও শ্রেয়। দুশমনকে দেশ ছাড়া করাও জীবনের শেষফোটা রক্ত বিন্দু বিলিয়ে দেয়া আমার এক্ষণের খায়েশ। নির্মলাকে সোমনাথের হেফাজতে দিয়ে আশে পাশের রাজা-মহারাজাদের সুপ্ত চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলাও আরেকটি লক্ষ্য আমার।'

রঘুনাথ তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, 'আপনার মত লোকের জরুরত রয়েছে আমার। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, দেশের বড্ড সেবা করতে পারবেন আপনি। আনহলওয়ারা সোমনাথের তোরণদ্বার। ফেরার পথে আপনাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব। মহারাজা আপনার মত লোকের কদর করেন।'

পরদিন জয়কৃষ্ণ রঘুনাথের সাথে সোমনাথ রওয়ানা হলেন। নির্মলা একটি পাল্কীতে শায়িত। এই সফরে রঘুনাথের হামদর্দী এক সময় হৃদ্যিক আকর্ষণে রূপ নেয়। তিনি প্রাত্যহিক হেকিম কিংবা জয়কৃষ্ণের কাছে ওর হালত জানতে চাইতেন। কাফেলা কোথাও বিশ্রামের জন্য থামলে খোদ নিজেও মাঝে মধ্যে নির্মলার কাছে চলে যেতেন। জয়কৃষ্ণ তাঁর এই শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন না, কিন্তু নির্মলা এ ব্যাপারে তেমন একটা পাত্তা দিত না।

মূল গন্তব্যে পৌঁছুতে পৌঁছুতে নির্মলা সুস্থ হয়ে ওঠল। চাঙ্গা হলো ওর মাথার যখম। কিন্তু বাহুর চোট চাঙ্গা হতে ওকে আরো কিছুদিন বিশ্রামে থাকতে হলো।

সোমনাথের চার দেয়ালে পৌঁছার পর জয়কৃষ্ণ ও নির্মলা রঘুনাথের বিশেষ মেহমান হলো। ভারতবর্ষের অপরাপর রাজা-মহারাজার মতই সোমনাথে সুরম্য অট্টালিকা ছিল আনহলওয়ারা মহারাজার জন্য। রঘুনাথ সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করলেন। জয়কৃষ্ণ ও নির্মলাকে কয়েকটা কামরা ছেড়ে দিলেন। রঘুনাথের এই মহানুভবতায় জয়কৃষ্ণ যতটা তৃপ্ত ছিলেন নির্মলা ছিল ততটা বিরক্ত ও পেরেশান। বাবার মর্জির বিরুদ্ধে এই বুড়োটার থেকে ও দূরে থাকতে পছন্দ করত।

সপ্তাহ দুয়েক ওখানে থাকলেন রঘুবাবু। এই সময়ে জয়কৃষ্ণ ও নির্মলার সাথে তার হৃদ্যতা জমে ব্যাপক। প্রাত্যহিক তিনি নির্মলাকে দেখার ছলে ওর কামরায় যেতেন আর নির্মলা তাকে বারবার এই খবর দিত যে, আমি বিলকুল সুস্থ।

নৃত্য ও সংগীতের চেয়ে বই পড়ার শখ বেশী ছিল নির্মলার। পুরোহিত প্রধানের সাথে পরামর্শ করে তাই রঘুনাথ মন্দিরস্থ এক পণ্ডিত বাবুর তত্ত্বাবধানে লেখা পড়ার ব্যবস্থা করেন। সাধারণ যুবতীদের চেয়ে নির্মলা মন্দিরে অভিজাত হিসাবেই সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

রঘুনাথের প্রস্তাবমত জয়কৃষ্ণ আনহলওয়ারা যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। রঘুনাথের অবস্থা দেখে স্রেফ আপনার নয় বরং নির্মলার ভবিষ্যত নিয়েও তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

সপ্তাহ দুয়েক পর বিদায় নিতে গিয়ে তিনি ওকে বলেন, "খুকী! আমার জীবনের আখেরী খায়েশ তুমি কোন সালতানাতের রাণী হও। তোমার ভবিষ্যত আমায় পীড়া না দিলে রঘুনাথের সাথে কিছুতেই যেতাম না।"

নির্মলা অশ্রুসজল নয়নে বললো, 'বাপুজি! রাণী হওয়ার শখ নেই আমার। দুনিয়া ত্যাগ করে আমি মহাদেবের দাসী হতে চাই। এতেই আমি শান্তি পাব।'

জয়কৃষ্ণ মেয়ের দীঘল কালো চুলে হাত রেখে বললেন, "খুকী! এক বাবার অসহায়ত্বের ওপর অশ্রুপাত করো না। ওই অবস্থায়ও আমি তোমার জন্য খুশীর মহল নির্মাণ করতে পারব।'

॥ তিন ॥

রূপাবতি বে-চাইন হয়ে সূর্যাস্তের অপেক্ষা করছিল। ওকে নৃত্য শিক্ষাদাতা পূজারীগণ দীর্ঘ ও কষ্টসহিষ্ণু অপেক্ষার পর জানাল, আজ তুমি দেবতার সামনে তোমার নৃত্য কারিশমা দেখাতে পারবে। এ সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যার জন্য সে দিনের পর দিন অতি কষ্ট স্বীকার করে নাচ শিখেছে। নৃত্য ও সংগীত সোমনাথ প্রথার অন্যতম অংগ। সুতরাং নব যৌবনা ও সুন্দরী যুবতীদের শিক্ষাদানের জন্য অভিজ্ঞ ওস্তাদ নিযুক্ত ছিল।

অভিজাত ঘরের যে সব মেয়েরা স্বেচ্ছায় এখানে কিছুদিনের জন্য আসত, তারা সামান্য ক'মাসের মেহনতে সোমনাথ মূর্তির ভজন গাওয়া কিংবা নাচ-গানের অনুমতি পেয়ে যেত। এদের বাবা-মা খুশীতে পূজারী, ওস্তাদ ও পুরোহিত প্রধানকে পুরস্কারে পুরস্কারে দু'হাত ভরে দিত। পরে এইসব মেয়েদের বিবাহে তাদের বাবা-মাকে রাজী করানোর জন্য উৎসাহী যুবকেরা পূজারীদের দরোজায় ধর্ণা দিত। যদি কারো বাবা-মা রাজী হতো সেমতাবস্থায়ও পূজারীরা অঢেল পুরস্কার পেত। তাই এসব যুবতীদের কত তাড়াতাড়ি নাচ-গান শেখানো যায় এবং মন্দির পার করা যায়– এ চিন্তায় লেগে থাকত পূজারীরা।

পক্ষান্তরে লা-ওয়ারিশ কিংবা গ্রাম্য যুবতীদের প্রসঙ্গ এদের চেয়ে ভিন্ন ছিল না। কেননা এদের বাবা-মাও এদেরকে মন্দিরে উৎসর্গ করে থাকত। এদেরকে বলা হত মন্দিরের দাসী। এরা শিক্ষা-দীক্ষার দীর্ঘ ও কষ্টসহিষ্ণু মঞ্জিল পাড়ি দিয়ে মন্দিরের এমন সব গুপ্ত রহস্যের সন্ধান পেত যা একমাত্র পূজারী-পুরোহিত ছাড়া অন্য কেউ জানত না। মামুলি চেহারার যুবতীরা এই স্তরে উন্নীত হবার আগে ভাগেই মন্দির থেকে ছুটি পেয়ে যেত। কপাল ভাল হলে ওরা কারো সাথে বিবাহ হয়ে যেত। অন্যথায় মন্দিরের সুন্দরী মেয়েদের পদসেবা করে সারা জীবন চাটুকার হয়েই কাটাতে হত। এ ব্যাপারে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত যে, ওরা যেন কিছুতেই মন্দিরের অন্ধকার দিকটার জ্ঞান না পায়। কোনক্রমে একবার পেয়ে বসলে ওদেরকে এমন এক জগতে চালান দেয়া হত যে জগতের খবর একমাত্র ঠাকুর— পুরোহিত ছাড়া অন্য কেউ জানত না।

মন্দিরের চার দেয়ালের মাঝে প্রবেশের পর রূপাবতি বেশ কিছুদিন উদাস ও ভারাক্রান্ত ছিল। রামনাথের চিন্তা ওকে ভাবিয়ে তুলত। ওর হৃদয় কাড়া গান কানে গুঞ্জন তুলত। কিন্তু এক্ষণে এই কল্পনা পাপ ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা সে এখন সোমনাথের দাসী। রাতের বেলা কেঁদে কেঁদে ধৈর্যধারণ করার শক্তি চাইত দেবতার কাছে। সময় যতই অতিক্রান্ত হত ততই ওর হৃদয়ের যখম চাঙ্গা হয়ে যেত। ওর যাবতীয় আশা-আকাংখার কেন্দ্রবিন্দু মন্দিরের চার দেয়াল। বিগত জীবনের সমস্ত স্বপ্ন মন্দিরের দিলকাশ জীবনের হাতছানির সামনে ম্লান হয়ে যেত।

ওর কণ্ঠে যাদুর চমক। সংগীতজ্ঞরা ওর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ওর সুন্দর নিটোল লাবন্যময়ী মুখশ্রী, হৃদয়ে ঝড় তোলা দেহ সুষমা নৃত্য-ওস্তাদদের চোখে দ্রুত ধরা পড়ে। একদা এক অভিজ্ঞ ওস্তাদ ওকে বলেন, 'রূপাবতি! তুমি যেভাবে গাইতে জান সেভাবে নাচতে জানলে কোনদিন দেখা যাবে তুমি মন্দিরের দেবী বনে গেছ এবং দেবীর মুকুট তোমার শিরে ধারণ করছে।'

'মন্দিরের দেবীর মুকুট আমার স্বপ্নাতীত মহারাজ! আমি স্রেফ একবার দেব-মূর্তির সামনে আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা বিকাশের সুযোগ পেতে চাই। এরপর আমার হৃদয়ে আর কোন খায়েশ থাকবে না।' বলল রূপাবতি।

'সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন তোমার এ খায়েশ পূরণ হবে। আমার যদ্দুর বিশ্বাস অন্যান্য মেয়েরা যেটা এক বছরে রপ্ত করবে তুমি সেটা করতে পারবে এক মাসের মধ্যেই। তোমাকে স্রেফ মেহনত করতে হবে।'

'আমি জানতোড় মেহনত করব।' রূপাবতি আশাব্যঞ্জক কণ্ঠে বললো।'

এরপর রূপাবতি সকাল-সন্ধ্যা কেবল নাচের অনুশীলন করতে লাগল। ওর পা অবশ হয়ে আসত। গিঁটে গিঁটে ব্যথা দেখা দিত কিন্তু অনুশীলন বন্ধ হত না। কখনো বা ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ত ও, ওস্তাদ ওকে আরাম করার পরামর্শ দিতেন, কিন্তু বৈষয়িক নৈপুণ্যতা অর্জনের অদম্য স্পৃহা ওকে দৈহিক দৌর্বল্যের কথা মনে করতেই দিত না। উঠে দ্বিতীয়বার অনুশীলনে লেগে যেত। কখনও বা স্বপ্নে দেখত, সোমনাথ মূর্তির সামনে নৃত্য পরিবেশন করছে আর মহাদেব ক'জন দেবতাসহ আকাশ থেকে নেমে ওকে দেখছেন। ও 'আমার দেবতা, আমার দেবতা' বলে মহাদেবের চরণে লুটিয়ে পড়ছে। মহাদেব ওকে দু'হাতে তুলে আপনার সাথে এমন এক রঙিন জগতে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাসন্তি পুষ্প যেখানে সদা বিকশিত, নদী-প্রস্রবনীর চিরন্তন কলনাদ যেখানে সদা প্রবাহিত। এই স্বপ্নভঙ্গ হলে অনেকক্ষণ স্মৃতির পাতায় একে রোমন্থন করে অনাস্বাদিত তৃপ্তিবোধ করতে চাইত। প্রচণ্ড খাটুনির দরুন রূপাবতির স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছিল। কিন্তু সৌন্দর্যে এসেছিল স্বর্গীয় অপ্সরীর লাবণ্যতা আর নয়ন যুগলে আকর্ষণের এক আবীর আকুতি।

॥ চার ॥

সূর্যাস্তের পর মন্দিরের অনবরত ঘন্টা ধ্বনি ও কাস্‌বাদ্যে রূপাবতির হৃদয়ে দুরুদুরু কাঁপন ধরিয়েছিল। নৃত্য শিল্পীদের সাথে এমন এক কামরার সামনে ও দাঁড়িয়েছিল যেখান থেকে প্রশস্ত খাস কামরায় যাওয়ার একটি মাত্র দরোজা বাকী। ওই খাস কামরায়ই সোমনাথ মূর্তির অবস্থান। নৃত্য শিল্পীরা পর্দার আড়ালে সকলেই দণ্ডায়মান।

ঘন্টা ও কাস্‌ধ্বনি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ব্রাহ্মণেরা ভজন গাওয়া শুরু করে দিলেন। অতঃপর নৃত্য পটিয়সীরা পালাক্রমে তাদের স্ব-স্ব কারিশমা প্রদর্শন করে যেতে লাগলেন। সর্বশেষে ঐ দলের পালা এলো রূপাবতি ছিল যে দলে। দেবতার কুঠরিতে প্রবেশ করে রূপাবতি স্তম্ভিত হয়ে গেল। হীরা মতি খচিত ঝাড়-ফানুসের চোখ ঝলসানো আলোকোচ্ছটা। ছাদ, দেয়াল, শার্সি, কার্নিশ ও

দরোজায় মূল্যবান জমরুদ ও মণি-মাণিক্যের প্রলেপ। সোমনাথ মূর্তি মূল্যবান পাথর ও অলংকারে অলংকারে সাক্ষাৎ তারকার মত চমকাচ্ছিল। ব্রাহ্মণরা দেয়ালের কাছে দাঁড়ান। সোমনাথ মূর্তির আশে পাশে অসংখ্য স্বর্ণ-রৌপ্যের মূর্তিকে মূল মূর্তির দারোয়ানের মত মনে হচ্ছিল।

নৃত্য শুরু হলো। নুপুর-নিক্কনের ছনছনানি ও সংগীতজ্ঞদের বাদ্যযন্ত্রের নিঠুর সুর রূপাবতির শীরাতন্ত্রীতে নিবিড় স্বর্গীয় রাগের সৃষ্টি করে। ও নেচে যাচ্ছে। পুরাতন নটিদের সামনে নয়া এই নৃত্য শিল্পীর নাচ দর্শকদের দৃষ্টিকে আটকে রাখতে সমর্থ হলো। মনে হচ্ছে জীবনের সমস্ত স্পন্দন ও মনের মাধুরী মিশিয়ে নাচছে রূপা। নৃত্য শিল্পীদের প্রত্যেকেই সোমনাথ দেবতার সম্মুখে যার যার কারিশমা দেখিয়ে আশে পাশের কক্ষে অদৃশ্য হয়ে যেত। রূপাবতির পালা এলে ও অজ্ঞাতবশতঃ দীর্ঘক্ষণ নাচল; কিন্তু মোহগ্রস্ত তন্ময় দর্শককূল সময়ের দিকে খেয়াল রাখার সুযোগ পেল না। মনে হচ্ছিল ওর শরীরের গোটা শিরাতন্ত্রী নাচছে। ইতোমধ্যে সমুদ্রের দিকস্থ দরজা থেকে পুরোহিত প্রধানের আবির্ভাব ঘটল। খানিক রূপার নাচ দেখে তিনি দু'হাত উঁচু করলেন। বাদ্যযন্ত্র বন্ধ হলো। রূপাবতি ঘাবড়ে পর্দার আড়ালে লুকালো। পুরোহিত বললেন, 'চন্দ্র মা সমুদ্রের দেবতাকে জাগিয়ে তুলেছেন। এক্ষণে স্রেফ সোমনাথের দেবী নাচবে।'

পর্দার নেপথ্যে বাদ্যযন্ত্রে হাজারো রাগ ভেসে এলো। নৃত্য শিল্পীরা সকলে এসে মূর্তির পাশে সমবেত হলো। ফরাশের ওপর শুয়ে দেহ পল্লবী বিভিন্ন ঢং-এ ঘুরাতে লাগল। সহসা হীরা মুকুটধারী জনৈকা নারী সৌন্দর্যের পিরামিড আবির্ভূত হলো। নাচতে নাচতে সে সোমনাথ দেবতার সামনে এগিয়ে এলো। কামিনী তার নাম। কিন্তু লোকেরা তাকে সোমনাথের দেবী মনে করে। কামিনী দেবীর নাচ প্রভুর প্রভুত্ব বিকাশের চেয়ে দর্শকদের যৌন ক্ষুধাই মেটাত অধিক। ক্ষুধার্ত এক বাঘিনীর মত সর্পিল আকারে হেলে দুলে গোটা মঞ্চ কাঁপিয়ে তুলত কামিনী। পূজারীদের তনুমনে শান্তির হিমেল পরশ বইয়ে দেয়া দেবতাদের জন্য কামিনী ছিল এক সাক্ষাৎ আকুতি-মিনতি।

মন্দিরের শিংগা, শংখ, কাষ্ ও ঘন্টা ধ্বনি ক্রমশ আরো বুলন্দ হতে লাগল। পূজারী ও নৃত্য শিল্পীরা পূর্বের চেয়েও জোরে ভজন গীত গাইতে লাগল। ঘন্টা ধ্বনি যতই বেড়ে চলছিল ততই কামিনীর নাচের জোশ বেড়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ওর শীরাতন্ত্রীতে রক্তের স্থলে বিদ্যুৎ বয়ে চলছে। অতঃপর মন্দিরের বাইরে সমুদ্রো পকূলে শোরগোল শোনা গেল এবং ফুঁসে ওঠা সমুদ্রের পানি কুঠরীতে জমা হতে থাকল। কুঠরীর পানি প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে পূজারীরা 'মহাদেব কি জয়' শ্লোগান তুলে ওপরের তলায় দৌড়ে যেত। এক্ষণে তাদের স্থলে চন্দ্র দেবতা তার কাজ

সমাধা করত। সোমনাথ মূর্তি আস্তে আস্তে পানির তলে তলিয়ে যেত। পূজার কর্ম শেষ হতে থাকত। পূজারীদের নারার জবাবে হাজারো তীর্থযাত্রী সমস্বরে আওয়াজ তুলত 'মহাদেব কি জয়' বলে।

॥ পাঁচ ॥

সোমনাথ মূর্তির সম্মুখে নৃত্য পরিবেশন করে পূজারীদের পাশাপাশি পুরোহিত প্রধানেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল রূপাবতি। সাধারণ যুবতীদের হোস্টেলে বসবাস না করিয়ে ওকে এক্ষণে পুরোহিতজির আলীশান মহলের পাশের এক নয়নাভিরাম প্রাসাদে থাকতে দেয়া হলো। অভিজাত যুবতীরা যেখানে থাকত সাধারণতঃ ওই প্রাসাদের উপর তলায় থাকত কামিনী। মন্দির ও পুরোহিত প্রধানের মহলে আসা যাওয়ার রাস্তা ভিন্ন ছিল। কামিনী ও বিশেষ দাসীদের দেখার ভাগ্য সাধারণদের খুবই কম মিলত। মন্দিরের ভেতরে বাইরে কামিনীর ছিল রাজ রাণীর পরিচয় ও প্রসিদ্ধি। কোন দাসী কিংবা পূজারী তার সাথে অকৃত্রিম হতে সাহস পেত না। মন্দিরে একথা সর্বজনবিদিত ছিল যে, যে খোশ কিসমত যুবতী সোমনাথ দেবীর মুকুট শিরে ধারণ করবে, ক'মাসের মধ্যেই সে অজানা কোন পথ ধরে মহাদেবের চরণে পৌঁছে যাবে, আর জগতের কেউ তাকে দেখতে পারবে না। পরবর্তীতে দেবীর তাজ অন্য ভাগ্যবতি যুবতীর শীরে ধারণ করানো হবে। অনেক বার এমনও হয়েছে যে, কোন কোন যুবতী দেবীর তাজ মাথায় ধারণ করার সপ্তাহ কিংবা পক্ষ কালের মধ্যে অন্তর্ধান হয়ে গেছে, কিন্তু কামিনী দেবীর প্রতি সকলের কেমন একটা ঈর্ষা। সকলেই ভেবে অবাক, কামিনী আজ তিন বছর মাথায় দেবীর মুকুট ধারণ করেছে কিন্তু অদ্যাবধি মহাদেব তাকে চরণে ঠাঁই দেননি। অনেক যুবতীরা কানাকানি করত, কামিনীর বোধ হয় কোন পাপ আছে। এজন্য বুঝি মহাদেব তাকে কাছে ডাকছেন না। তবে বিজ্ঞ দাসীদের ধারণা, কামিনীর মত রূপে গুণে যোগ্য দ্বিতীয় জন না এলে তার আসন কেউই টলাতে পারবে না। মহাদেবও তাকে কাছে ডাকবেন না। রূপাবতি সেই ভাগ্যবতী যুবতীদের একজন যাকে কামিনী দেবীর বিকল্প মনে করা হত। বিশেষ করে সাধারণ যুবতীদের থেকে ওর বাস ভবন ভিন্ন করার পর থেকে। তাই ঠাকুর-পূজারীরা ওর নাচের প্রতি ধ্যান-খেয়াল বেশী দিতে লাগলেন।

একদিন ও প্রাত্যহিক নিয়ম মোতাবেক কুঠরীতে নাচের মশ্‌ক করছিল। কে যেন আস্তে দরোজা ফাঁক করল। এলো ভেতরে। দরোজায় দাঁড়িয়ে ও মোহগ্রস্থের মত তাকিয়ে রইল। আচমকা সেদিকে রূপার নযর পড়ে যাওয়ায় ও থতমত খেয়ে গেল। দেখল দরোজায় পুরোহিত প্রধান দাঁড়িয়ে। পুরোহিতজি টকটকে বাদামী রঙ ও মাঝারী গোছের মানুষ। বয়স চল্লিশের ওপর। কিন্তু চেহারার দিক তাকালে এই

বয়সের ধারণা পেতে কষ্ট হয়। বিশাল গোঁফের আড়ালে প্রকাণ্ড চেহারার ভীমরতি আরো বাড়িয়ে তুলছিল। চোখ দু'টি বেশ বড়। এর ওপর মোটা এক জোড়া ভ্রু দূর আকাশের ছায়াপথের মত। রূপাবতি সম্বিত ফিরে পেয়ে সহসাই পুরোহিতের চরণ ছুঁতে ঝুঁকে পড়ে। পরে হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ায়।

পুরোহিত গভীর নযরে ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুমি বেশ নাচতে পার।" পুরোহিতের দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আপনার দৃষ্টি সোজা রাখতে না পেরে রূপাবতি দৃষ্টিশক্তি নত করে ফেলে।

পুরোহিতজি খানিক পরে আবারো বলেন, 'তোমার শখ এভাবে জারী থাকলে তুমি অনেক কিছুই শিখতে পারবে। কামিনীকে বলব তোমার প্রতি খুব খেয়াল রাখতে।'

পুরোহিত আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন। রূপাবতির হৃদয়ে আনন্দের হিন্দোল। খুশীতে কখনো এদিক আবার কখনো ওদিক দৌড়াচ্ছিল ও। মহলের এক কামরায় গিয়ে ও দরোজা খটখটাল। ভেতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে ভেসে এলো, 'কে ?'

'আমি রূপাবতি।'

'ভেতরে এসো।'

রূপাবতি প্রবেশ করল। নির্মলা বিছানায় শায়িত। ওকে দেখে আলস্য ভেঙ্গে শরীর আড়মোড়া দিয়ে বসে পড়ল সে।

'তুমি এখনো ঘুমুচ্ছো। সূর্য উঠেছে সেই কখন।' বলল রূপা।

'ঘুমাচ্ছিলাম না। এমনিতেই শুয়েছিলাম। উঠতে মন চাচ্ছিল না। বসো। আরো তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস ফুলে ওঠেছে যে। খবরাখবর ভালো তো?'

রূপাবতি ওর কাছটিতে বসে গেল। বললো, 'আজ এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেছে। মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি। কামরায় নৃত্য অনুশীলন করছিলাম। আচমকা তাকিয়ে দেখি পুরোহিতজি সেখানে দাঁড়িয়ে। বুঝতে পারছিলাম না, আমি কোথায়। তিনি বললেন, 'তুমি বেশ নাচতে পার। কামিনী দেবীকে বলব, তোমার দিকে খেয়াল রাখতে।' এটুকু বলে তিনি বের হয়ে যান।

নির্মলা বললো, 'আমি প্রথম দিনই তোমার নাচ দেখে বলেছিলাম তুমি অচিরেই মন্দিরের দেবী হতে চলেছো। এক্ষণে তোমার একথা বলার আর সুযোগ রইল না যে, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি। তুমি বড্ড ভাগ্যবতি রূপা।'

'কিন্তু আমার কেমন যেন ভয় লাগছে।'

'কিসের ভয়?'

'ভাবছি মহাদেব আমাকে কি করে তাঁর চরণে ঠাঁই দেন। কামিনীর নাচ দেখে তো মনে হয় না, আমি ওর মত হতে পারবো।'

'তুমি কি জান, কামিনী দেবী তোমার ব্যাপারে কি ধরনের মন্তব্য করেছেন?'

'কি বলেছেন, কার কাছে বলেছেন?'

'আমি গতকাল তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বললেন, রূপাবতি কোনদিন আমাকে টেক্কা দিয়ে যেতে পারে।'

'কামিনী দেবীর বড় রহমদিল। কিন্তু আমি এর যোগ্য নই।'

'আয়নায় কখনও আপনার চেহারা দেখেছ কি' ?

'কি আছে আমার চেহারায় ?'

'তুমি খুবই সুন্দরী রূপা।'

'তোমার চেয়ে তো নই।'

'বড্ড খেয়ালী তুমি।' নির্মলা মুহাব্বত ভরে ওর দীঘল কাল চুলে হাত বুলিয়ে বলল।

নির্মলা ও রূপাবতির পরস্পরের পরিচয় খুব নিকট সময়ের। মাস তিনেক পূর্বে একদিন নির্মলা রূপাবতিকে নাচতে দেখেছিল। পরে একদিন ও ওস্তাদের থেকে সবক নিয়ে ফিরছিল। পাশের কামরায় গানের আওয়াজ ভেসে আসছিল। নির্মলা সাহস করে সে কামরায় প্রবেশ করল। গায়িকা রূপাবতি।

নির্মলা বললো, মাফ করুন! আপনার সুমিষ্ট আওয়াজ আমাকে এখানে টেনে আনতে বাধ্য করেছে।

'আসুন না!' সহাস্য বদনে অভ্যর্থনা জানায় রূপা।

'না আরেক দিন। এক্ষণে আমার পাঠ মুখস্থ করতে হবে।'

'অবশ্যই আসবেন।'

নির্মলা দরোজার কাছে এসে থামল এবং রূপাবতির দিকে তাকিয়ে ফের বললো, 'বেশ কিছু দিন হলো আপনাকে নাচতে দেখেছি। ওই সময়ই ইচ্ছা ছিল আপনার সাথে দেখা করার। আমার এ কথার উদ্দেশ্য, অচিরেই আপনার মাথায় মন্দিরের দেবীর মুকুট শোভা পেতে যাচ্ছে।

'যাহ্! ঠাট্টা রাখুন।'

'না না। আমি ঠাট্টা করছি না।'

এ হলো ওদের পয়লা সাক্ষাতের সংলাপ। অতঃপর দেখা সাক্ষাতে ওঠা বসায় ওদের মধ্যে ভাব বিনিময়, সর্বশেষে তা পরিনত হয় অন্তরঙ্গ সখীত্বে। নির্মলা তখনও আনহলওয়ারা রাজার প্রাসাদে ছিল। সাধারণতঃ ও রূপাবতির কাছে যেয়ে থাকত। কিন্তু ঘটনাচক্রে ওর আসতে দু'একদিন বিলম্ব হলে খোদ রূপাবতিই ওর কাছে চলে আসত।

৷৷ ছয় ৷৷

একদিন নির্মলার সাথে মোলাকাতের পর মহল থেকে নীচে নামছিল রূপাবতি। নীচ তলায় এ সময় কারো গানের কণ্ঠ ভেসে আসে। ক'কদম হেটে পরে ও নিথর দাঁড়িয়ে যায়। কারো কল্পনায় ওর গোটা দেহ ঝটকা দিয়ে ওঠে। মনের ধুক ধুকুনির পাশাপাশি শ্বাস-প্রশ্বাসেও কেমন একটা তীব্রতারও ওঠানামা পরিলক্ষিত হয়। এই কণ্ঠ ও অসংখ্যবার শুনেছে। এই রাগ ওর হৃদয়ে গাঁথা। হৃদয় বীনার সুক্ষ্ম তারে এই সুমধুর কলরব ঝংকার তুলত এক সময়। কিন্তু সেই পরিবেশ–পরিস্থিতি পাল্টেছে। আনন্দ-শিহরণের স্থানেও এসেছে পরিবর্তন। ওর দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। দ্রুত পায়ে হেটে নীচতলার ওই কামরার সামনে এসে দাঁড়ায় রূপা। কিন্তু আগে বাড়ার এতটুকু শক্তি নেই ওর। যে কামরা থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে কতকটা দ্বিধা ও শংকা নিয়ে তার দরোজার সামনে এসে দাঁড়ায় রূপা। কয়েকবার দরোজা ফাঁক করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কম্পিত হাত কপাট ছোঁয়ার স্থলে বার বার পেছনে ফিরে এসেছে। জানালার ফাঁক দিয়ে কিছু দেখতে যাবে সেই মুহূর্তে ওপাশের বারান্দা থেকে কারো পদধ্বনি শুনতে পেয়ে দ্রুত দ্বিতলে নির্মলার কক্ষের দিকে ছুটে যায়।

'কি হোল? নির্মলার কণ্ঠে পেরেশানী।'

'ও......... ও কে ?' রূপাবতি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে।

'কার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? আরে কোথাও ভুত-টুত দেখে বসনি তো?'

'নীচ তলায় কেউ গান গাইছে, সে কে?'

'কেন সে তোমায় কিছু বলেছে ?'

'না, না .... আমি .... আমি ওর কণ্ঠ শুনে চমকে গেছি।'

'বসো। তোমার তবিয়ত ঠিক নেই। তোমার চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করছে। নীচতলার গায়ক কোন ভুত-প্রেত নয়— মানুষই হবে। আর সে কোন ভীতিকর প্রাণী বলেও মনে হয় না আমার।'

'কিন্তু সে কে ? আপনি তাকে চিনেন ? সে এখানে কি করে ?'

'ও আনহলওয়ারা মহারাজার লোক। শুনেছি এক বাহাদুর সেপাইয়ের রক্ত বইছে ওর দেহে। এখানে এসে ও ফৌজি দায়িত্ব পেয়েছে।

'কিন্তু ও তো ....' এতটুকু বলে রূপাবতি থমকে যায়।

'হ্যাঁ বলো, ও কি?' সপ্রশ্ন দৃষ্টি নির্মলার।

'কিছু না। ভাবছি সে বুঝি দুনিয়ার নির্যাতিত মানুষদের একজন।'

'হ্যাঁ, ওর আওয়াজে ব্যাথার মোচড় সুস্পষ্ট। সময় সুযোগ পেলেই সে গানে মেতে যায়। অনেক সময় শেষ রাতেও তার কণ্ঠ শুনতে পাই। কিন্তু তোমার পেরেশানীর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনা যে। সত্যি করে বলোতো, তোমার সাথে সে কোন গোস্তাকী করেনি তো?'

'না! আমি তো তাকে দেখিও নি।'

'তাইলে এত পেরেশানীর হেতুটা কি শুনি?'

রূপাবতি লা-জওয়াব হয়ে বললো, 'আমি ওর দরদমাখা কণ্ঠ শুনে থমকে দাঁড়াই। পরে স্বপ্নঘোরে দেখি মহাদেব আমাকে ভর্ৎসনা করছেন। কোন পুরুষের কণ্ঠ শোনাও যে আমার জন্য পাপ।'

'তুমি বড্ড আত্মভোলা।'

'কখনও বা আমি পাগলিনীর মত কথা বলতে থাকি। আচ্ছা এক্ষণে উঠি তাহলে।'

রূপাবতি কারো থেকে বেরিয়ে এলো। ততক্ষণে গায়কের গান বন্ধ হয়েছে। ও যখন নীচে নামছে তখন সিড়ির পিলারের কাছে কে যেন ঝুঁকে কি দেখছে। রূপা মাঝ সিড়িতে আসতেই সে ওর পিছু নেয়। রূপা আচমকাই ওর দিকে ঘাড় কাত করে তাকায়। স্তম্ভিত রূপা। দাঁড়িয়ে থাকে চিত্রার্পিতোর মত। এ সেই নওজোয়ান যে ওর জীবন যৌবনের কামনার ধন। আনমনে রামনাথ এগিয়ে আসে।

'রূপা! রূপা!! আমার রূপা!!' মনের অজান্তেই রামনাথের দু'ঠোঁট ফেটে বেরিয়ে আসে প্রিয়জনের মধুর নাম। চার চোখের মিলন হয়। এর মাঝে পরক্ষণে পর্দা হয়ে দাঁড়ায় বাধভাঙ্গা অশ্রু।

'রূপা! সেই কবে থেকে এখানে বসে তোমার অপেক্ষা করছি। আশা ছিল তোমার সাথে দেখা হবে। দেখ, কাউকে তোমার নামটি পর্যন্ত বলিনি আমি। ভগবান আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তোমার দেখা পেয়ে যাই। এখন থেকে আর তোমাকে আমার চোখের আড়াল হতে দেব না। কেউ তোমাকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

'ভগবানের দিকে তাকিয়ে অমন কথা বলো না।' রূপাবতি ঘাবড়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে আস্তে বলল। রামনাথ অগ্রসর হয়ে ওর হাত ধরে বলল, এসো আমার সাথে রূপা। তোমাকে আমার অনেক কিছু বলার আছে।'

রূপা কিছু না বলে ওর সাথে চলল। খানিক বাদে ও রামনাথের কামরায় এলো। রামনাথ বলে যাচ্ছে, 'রূপা! আমি তোমায় নিতে এসেছি। এক্ষণে সোমনাথ মন্দিরের সুউচ্চ দেয়াল আমাদের চলার পথের অন্তরায় হতে পারবে না কিছুতেই।'

রূপাবতি মিনতি ভরা কণ্ঠে বললো, ' ভগবানের দিকে তাকিয়ে অমন কথা বলো না রাম! তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি। এখন থেকে আমরা চিরদিনের তরে জুদা হয়ে গেছি। আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল অগ্নিপর্বত। ওটা অতিক্রম করার কোশেশ করলে আমরা জ্বলে ছাই হয়ে যাব। আমি মহাদেবের দাসী হয়েছি। এখন থেকে এ দুনিয়ার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। রূপাবতি তোমার জীবন থেকে মরে গেছে রামনাথ।'

'পাগলী! তুমি কি মনে করছ এই পাথরের মূর্তি তোমাকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে ?'

'দোহাই ভগবানের! অমন পাপের কথা মুখে এনো না।'

'নির্বোধ কোথাকার।' বলে রামনাথ দু'হাতে ওর গলা পেঁচিয়ে ধরতে যাচ্ছিল। কিন্তু রূপাবতি এক ঝটকায় ওর দু'হাত সরিয়ে দিল। বললো গোস্বা কম্পিত কণ্ঠে, 'তুমি আমায় ছুঁয়ো না। এরপর তুমি আমায় দেখতে পাবে না। কোনদিনও না।'

'আমি সোমনাথ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বলব, তুমি আমার, শুধুই আমার।'

'তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ', বলে রূপাবতি দরোজা খুলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। রামনাথ নিথর নিস্তব্দ দাঁড়িয়ে। ওর অবস্থা সেই মুসাফিরের মত যার গোটা পুঁজি খোয়া গেছে।

রণবীর ও রামনাথ

হতাশা ও অসহায়ত্বের তিমিরাচ্ছন্নতা এক্ষণে রামনাথকে ঘিরে ধরে। জীবন এক্ষণে অর্থহীন। যে দিলকাশ সংগীতের সুর মূর্ছনায় রূপাবতিকে আবিষ্কার করত ও, তা এখন হৃদয় গহীনে ডুকরে কেঁদে ওঠছে। এতদসত্ত্বেও হাল সহজে ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয় এই রামনাথ। ওর ভাবনা, রূপাবতি চিরদিনের তরে ওর থেকে দূরে সরে যেতে পারে না। ও অতি প্রত্যুষে বিছানা ছেড়ে উঠে মন্দিরের নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। জনসাধারণের বিশেষ সময় ছাড়া পরিখার সাঁকো পাড়ি দিয়ে ওপারে যাবার অনুমতি ছিল না। ওই সাঁকোর ওপারেই মূল মন্দির। এখানে এলে চৌকিদাররা গভীর নজরে তাকাত।

রামনাথ ওই সাঁকো দিয়ে পণ্ডিত, সাধু, দাসী ও নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের আসা যাওয়া করতে দেখত, কিন্তু রূপাবতিকে ওর দৃষ্টি খুঁজে পেত না। অতঃপর হতাশ হয়ে ও ফৌজি ট্রেনিং ক্যাম্পের দিকে পা বাড়াত। গোড়ার দিকে নেযা ও তেগ চালনায় ও বেশ নামযশ কুড়িয়েছিল, কিন্তু রূপাবতির সাথে সাক্ষাতের পর ওর দৈহিক ও মানসিকতায় কেমন একটা শৈথিল্যভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। পরবর্তীতে ফৌজি কমাণ্ডার ওকে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডাকলে অসুস্থতার ভান ধরত ও।

কোন এক সন্ধ্যায় ও বিশ্রামাগার থেকে বেরিয়ে পায়চারী করতে করতে পরিখার সাঁকোর নিকটে এসে দাঁড়াল। পরিখার ওপারে রূপাবতিকে দেখতে পেল ও। রূপা ও নির্মলা কথা বলতে বলতে সাঁকোর দিকে এগিয়ে আসছে। রামনাথের হৃদয়ে ধুক ধুকানি শুরু হলো। সাঁকোর নিকটে এসে রূপাবতি থমকে দাঁড়াল, কিন্তু নির্মলা ওর হাত ধরে ফেলল এবং টেনে সাঁকোর ওপর তুলল।

সাঁকোর মাঝামাঝিতে এসে রামনাথের ওপর রূপাবতির দৃষ্টি পড়ল। ও আচমকা থমকে এদিক ওদিক তাকিয়ে পেছনের দিকে কেটে পড়ল। নির্মলা হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। অতঃপর নিজ কক্ষের দিকে অগ্রসর হতে থাকল।

রামনাথের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। খানিক ভেবে নির্মলার পিছু নিয়ে ওর কাছাকাছি গিয়ে অনুনয়ের সুরে বললো, 'একটু দাঁড়াবেন! একটা কথা বলি!'

নির্মলা ওর দিকে তাকাল।

'মাফ করুন। আপনাকে আমার কিছু বলার ছিল।' আবারো বলল রামনাথ।

'বলুন!' নির্মলার লঘু ও শান্ত উত্তর।

'আমি ওই মেয়েটি সম্পর্কে জানতে চাই, এইমাত্র যে আপনার সাথে ছিল।'

'মন্দিরের দেবী' হতে যাওয়া ব্যক্তিসত্তাকে 'মেয়ে' শব্দে খেতাব করাকে নির্মলা কেমন একটা বেখাপ্পা মনে করল। বললো, 'আপনার সাথে অন্য কোন কথা বলার পূর্বে এটা জানিয়ে দিতে চাই যে, ও সাধারণ মেয়ে নয়। খুব শীঘ্রই মন্দিরের দেবী হতে যাচ্ছে ও।'

রামনাথের বুকে ছুরির পোঁচ লাগল যেন। নিজকে খানিক স্বাভাবিক করে ও বললো, 'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তিনি আপনার বান্ধবী। একদিন তাকে আপনার মহলে দেখেছিলাম। উনি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন?'

'তাহলে ওইদিনও তার পেরেশানীর কারণ ছিলেন আপনি! আজো বোধহয় সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আপনাকে দেখেই বুঝি সে চলে গেল। জিন্দেগীর প্রতি যদি উদাসীন না হয়ে থাকেন তাহলে ওর প্রতি আর চোখ তুলে তাকাবেন না। এটা মহাদেবের মন্দির–আনহলওয়ারার বাজার নয়।'

রামনাথ কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু অব্যক্ত শব্দ ওর কণ্ঠনালীতেই আটকে থাকল।

॥ দুই ॥

রাতে রামনাথ বিছানায় কেবল এপাশ ওপাশ করল। আশার শেষ ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুও ওর নির্বাপিত হয়ে গেছে। বুকের ভেতর গুনগুনিয়ে উঠা প্রেম গুঞ্জন বন্ধ হয়ে গেছে। জীবনের কিছু বাকী নেই এখন। রূপাবতি চিরদিনের তরে ওর হাতছাড়া হয়ে গেছে। তারপরও বেঁচে থাকতে চায় কেবল ঘৃণার জন্য। রূপাবতি ওর প্রেমপুষ্প দলন করে চলে গেছে। এক্ষণে ও ওর চোখের কাঁটা। পরে আবার ভাবে, আমার ঘৃণা প্রদর্শনে ওর কিছু যায় আসে কি! না না আমার হৃদয়ের আগুন কেবল আমাকেই জ্বালাক। ও আমাকে দেখবে না। দেখতেই পারবে না। আমার ও ওর মাঝে মন্দিরের সুউচ্চ দেয়াল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে । ও মন্দিরের দেবী হতে চলেছে। রাজা-রাণীরা পর্যন্ত ওর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ানো থাকবে। ও কি করে আমাকে সহ্য করবে! দেবতাদের ভয় ওর ও আমার মাঝে প্রচন্ড এক বাধা। পরে কোন একদিন ও মহাদেবের চরণে পৌঁছে যাবে। কিন্তু তা কি করে হয় এবং কেন ? ওর কাছে এই আত্মজিজ্ঞাসার কোন জবাব নেই। একটি কাল্পনিক বিষয় ধুমায়িত হয়ে পরে তা অবলীলায় চুপসে বিলীন হবার মত এই আত্মজিজ্ঞাসা। তেলেসমাতির সেই নিঃসীম গভীরতার তলা খুঁজে পেতে ওর দৃষ্টি অপারগ– সোমনাথ তার ভেতরে যা ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে।

দীর্ঘক্ষণ চিন্তার জাল বোনার পর ও এই বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিচ্ছিল যে, রূপাবতির পাষণ্ডতা ও কপটচারিতার বিপক্ষে আমার কিছুই করার নেই। আমি

পাথরের মূর্তিগুলোর শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু এ বাস্তবতাকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না যে, রূপাবতিকে চিরদিনের তরে আমার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আমি একে কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারব না। কোন সালতানাতের রাজা হয়েও আমি সোমনাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবো না।

মন্দিরের পুরোহিত প্রধানের হুকুমে দেশের লাখো ইনসান আমার হাড্ডি থেকে তাহলে গোশত আলাদা করতে ছুটে আসবে। যেদিন আনহলওয়ারার মহারাজা তাঁর গলার হীরার মালা ও হাতি দান করেছিলেন সেদিন নিজকে কতই না হিরো মনে করেছিলাম। সোমনাথমুখো হবার সময় মনে করেছিলাম, দুনিয়া আমার পদতলে উৎসর্গিত। রূপাবতি আমার এই সাফল্যে গর্বিত হবে– কিন্তু এক্ষণে আমার হলো কি ! এক্ষণে আমি এমন একজন মানুষ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে যে হেরে গেছি। ঐদিন ওর গলে হীরের মালা পরিয়ে দেবার মওকা পাইনি। মওকা পেলেও হয়ত ও অবজ্ঞার হাসি হেসে বলত, পাথরের মূর্তি অমন মালা প্রাত্যহিক আমার পদতলে বিসর্জন দিয়ে থাকে। রূপাবতিকে নিয়ে নিজকে এই তুচ্ছজ্ঞান আত্মশ্লাঘা ও আত্মহননে ভোগাতে থাকে ওকে। সোমনাথ থেকে দূরে কোথাও ভাগতে চাচ্ছিল ও, যেখানে রূপার স্মৃতি ওকে ভোগাবে না– কিন্তু দুনিয়ার এমন জায়গা নেই যে। ও জানে, মন্দিরের দেবী হতে যাওয়া রূপা ওর থেকে চিরদিনের তরে হারিয়ে গেছে। কিন্তু যে গ্রাম্য সহজ-সরল বালিকা নদীর তীরে আমার গান শোনার জন্য পিছু নিত, আমৃত্যু সে আমার পিছু নিতেই থাকবে। ওর মুচকি হাসি-সর্বদা আমার চোখের সামনে নৃত্য করতেই থাকবে। আমার আত্মা জগতের এই বিভীষিকাময় বিস্তৃতিতে হামেশাই ওকে আহবান করতে থাকবে।

'রূপা! রূপা!!' ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে রামনাথ, 'এখন আর আমি এখানে থাকতে পারি না। থাকব না।'

সকাল হয়ে গেল। বিশাল এক কষ্টের বোঝা বহন করে মহলের বহিরস্থ আস্তাবলের দিকে ছুটে গেল। মন্দিরের দিকে তাকাল বড্ড আফসোসের দৃষ্টিতে। আচমকা কারো হস্তস্পর্শে ও চমকে ওঠল। 'রণবীর, রণবীর' বলে ও আগন্তুকের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রণবীর এক সাধারণ সেপাইয়ের পোশাক পরিহিত। জলদি রামনাথের বাহুবন্দি থেকে নিজকে মুক্ত করে সে বললো, 'এখানে আমাদের দু'জনকে অকৃত্রিম মেলামেশা করলে চলবে না।'

'এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তোমার আগমন হয়েছে। নইলে কোথাও হারিয়ে যেতে বসেছিলাম আমি। তা কবে এলে?' বললো রামনাথ।

'কদিন হলো এসেছি, কিন্তু কেল্লার ফৌজে ভর্তি হয়েছি গত পরশু। ইতিপূর্বে ছিলাম শহরে। তুমি কৈ যাচ্ছিলে ?'

'জানিনা। কিছুদিন এদিক সেদিক ঘুরে অবশেষে হয়তো তোমাদের জনপদেই যেতাম।'

'তোমাকে বেশ ভারাক্রান্ত ও পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে। রূপাবতির কোন খোঁজ পেয়েছ ?'

'চিরদিনের তরে ওকে আমার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। হায়! যদি এখানে না আসতাম।'

'কি হয়েছে। আমাকে শোনাও দেখি!'

রামনাথ ওর মোলাকাতের কাহিনী শুনিয়ে গেল। ওর চোখে নেমে এসেছিল বাঁধভাঙ্গা অশ্রু।

রণবীর ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো– হতাশ হয়ো না।'

'তুমি জানো না রণবীর, মন্দিরে দেবী হবার পর দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে না।'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার নিখাদ প্রেমের সামনে জাগতিক গোটা শক্তি পরাস্ত হতে বাধ্য।'

রামনাথ আরেকবার অকূল পাথারে খড়কুটোর আশ্রয় পেল যেন। সে রণবীরের হাত ধরে বললো, 'এসো আমার সাথে। তোমাকে অনেক কিছু বলার আছে।'

॥ তিন ॥

নির্মলা সিড়ি বেয়ে নীচে নামছিল। আচমকা রণবীর ও রামনাথকে উপরে উঠতে দেখল ও। ওদেরকে পথ দিতে ও একপাশে সরে দাঁড়াল। রণবীর মাথা নীচু অবস্থায় রামনাথের সাথে কথা বলতে বলতে উঠছিল। এজন্য সে নির্মলাকে দেখতে পেল না।

প্রথমবার নির্মলা ওর দিকে গভীরভাবে তাকাল। কিন্তু দ্বিতীয়বার ওর দিকে তাকাতেই ওর চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ওদের মাঝে যখন কদম দুয়েকের ব্যবধান তখন আচমকা রণবীর গর্দান ওঠালে চার চোখের মিলন হলো। থমকে দাঁড়াল রণবীর। রামনাথ ততক্ষণে ক'ধাপ অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু ওরা দু'জন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কারো চোখে-মুখে কোন ভাষা কিংবা পলক নেই। দু'জনের হৃদয়েই তোলপাড়। নির্মলার চেহরায় লাল-সাদা ঢেউ তরঙ্গ খেলে যায়। রণবীর রামনাথের দিকে তাকাল, যে কিনা ক'ধাপ ওপরে পেরেশান হয়ে ওর অপেক্ষায়। ও আস্তে আস্তে ওপরে ওঠতে লাগল। নির্মলা তখনও পূর্বস্থানে দণ্ডায়মান। ওরা দু'জন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে নির্মলা নীচে না নেমে উপরেই ওঠতে লাগল। হার কদমে ওর গতি বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ওপাশের কামরার সামনে গিয়ে রণবীর রামনাথকে প্রশ্ন করল, 'জানো এ কে?' রামনাথ অপর পাশের কক্ষটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সে ঐ রুমে থাকত বলে জানি। শুনেছি আনহলওয়ারা রাজা মহাশয়ের চাচা ওর বাবার দোস্ত। কিন্তু তাকে দেখে তুমি অমন বিব্রত হলে কেন ?'

'এ সেই জয়কৃষ্ণের মেয়ে। কেন তুমি তাকে আমাদের মহলে দেখনি?'

'না সেখানে দেখার সুযোগ মিলেনি আমার।'

'ওর বাবাও কি এখানে থাকেন?' প্রশ্ন রণবীরের।

রামনাথ এ প্রশ্নের জবাব দিতে যাবে সেই মুহূর্তে নির্মলাকে ওপরে আসতে দেখে চুপ করল। সিড়ির মোড়ে এসে এক মুহূর্তের জন্য নির্মলা থেমে ওদের দিকে তাকাল। অতঃপর তর তর করে তৃতীয় তলার সিড়ি বেয়ে উঠে গেল।

রণবীর বললো, 'আমি ওর বাবা সম্পর্কে তোমার কাছে প্রশ্ন করছিলাম।'

'আমি ওর বাবা সম্পর্কে কিছু জানিনা। তবে এটা অবশ্য বলতে পারি যে, তিনি এখানে নেই। এই মেয়ের কাছে ক'জন চাকর-চাকরানী থাকে মাত্র। শুনেছি শিক্ষা গ্রহণ করতে তার এখানে থেকে যাওয়া। জানি না তোমায় দেখার পর তার প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়ায় ? ইচ্ছা করলে সে তোমার বহু অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। এখানে আনহলওয়ারা ফৌজের কয়েক ডিভিশন উপস্থিত। ও হুকুম দিলে তারা মুহূর্তেই এ মহল অবরোধ করে ফেলবে। মন্দিরের পুরোহিত প্রধান পর্যন্ত ওদের বশীভূত।'

'ওর বাবা এখানে না থাকলে আমার কোনই ভয় নেই। এতদসত্ত্বেও যে উদ্দেশ্যে আমার এখানে আগমন তার জন্য খুবই চৌকস থাকতে হবে। দাঁড়াও! এই আসছি আমি।' রামনাথকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রণবীর দ্রুত প্রস্থান করল। তর তর করে সিড়িতে উঠার আওয়াজ শোনা গেল।

কামরার আশে পাশে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে নির্মলা। সিড়িপথে রণবীরকে দেখা গেল। ওর চেহারায় ফুটে ওঠল উদ্বিগ্নতার ছাপ। রণবীরকে অগ্রসর হতে দেখে দ্রুত সে কামরায় প্রবেশ করল। রণবীর থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খানিকবাদে দরোজা ঈষৎ ফাঁক করে নির্মলা তাকাল। রণবীর কামরায় ঢুকল। মস্তক অবনত দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে। নির্মলা মুচকি হাসল। এর পাশাপাশি ওর দু'চোখ অশ্রু বন্যা নামল। রণবীর ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো, 'মাফ করুন! আমি আপনাকে পেরেশান করতে আসিনি। স্রেফ এতটুকু বলতে এসেছি, আমার দ্বারা ক্ষতির আশংকা করতে হবে না আপনাকে।'

'আপনাকে সে কথা বলার জরুরত ছিল না।' ক্ষীণ কণ্ঠে বলে নির্মলা।

'কিন্তু আমি যে আপনার বাবার দুশমন।'

'দুনিয়ায় কোন মানুষের ভাগ্যে উত্তম বন্ধু না জুটলেও উত্তম দুশমন মিলে যাওয়াটা গনিমত নয় তো কি। আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার তলোয়ার আমার বাবার গর্দানে উত্থিত হলেও আমি আপনার কাছে করুণা ভিক্ষা চাইব না।

'আমি আমার পিতৃহন্তাকে ভুলতে পারি' যদি এ ধারণা করে থাকেন, তাহলে বলব, ভুল করছেন আপনি।

'এ কথাই কি বলতে এসেছেন আপনি?' নির্মলার খুবছুরত আঁখি যুগলে আবারো অশ্রু বন্যা।

ওর দিকে নয়ন উঠিয়ে তাকাল রণবীর। পরক্ষণে প্রতিশোধের আগুনে ভাটা পড়ল ওর। ক্ষণিকের তরে সবকিছু ভুলতে চাচ্ছিল ও। ওর সামনে এমন এক যুবতী দণ্ডায়মান যার মুচকি হাসি পেছন অতীতের যাবতীয় তিক্ততা ভোলাতে সক্ষম। যার আঁসু হিংসা ও উগ্রতার গোটা কালিমা ধুতে পারে। ওর কানে এমন এক দিলকাশ সংগীতের সুর-মূর্ছনা যা নয়া জীবনের কলনাদ শোনায়। কল্পনায় ও এমন এক জোড়া শতদল সুকোমল হস্ত দেখছিল জীবন-যৌবনের দগ্ধক্ষতে প্রেমের হিমেল পরশ বুলায়। নির্মলা তার সৌরভ ও দিগন্তপ্রসারী পুষ্পরাগ নিয়ে যেন ওর জীবনের এক একটা রোমাঞ্চকর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আচমকা ওর আপাদমস্তক কেঁপে ওঠল। 'হায়! হায়! একি ভাবছি আমি' আত্মজিজ্ঞাসা রণবীরের। সহসাই বৃদ্ধ বাবার খুন আর যুবতী বোনের আঁসু সুউচ্চ দেয়াল হয়ে দাঁড়ায় ওর সামনে। নির্মলা ফের বলে, 'আমার বাবাকে মাফ করতে পারবেন না– সে কথা বলতে এসেছিলেন বুঝি ?'

'আপনি এখানে সে কথা জানতাম না। এসেছিলাম আমার বোনের তালাশে।'

'আমিও আপনার বোনের তালাশ করেছি। শকুন্তলা নামী এখানে তিনটি মেয়ে আছে। কিন্তু এদের কেউই কনৌজের নয়। পুরোহিত প্রধান ও পূজারীদেরও এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি।'

'এই হামদর্দীর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু ও যে এখানে সে ধারণা আপনার হোল কি করে ?'

'আপনাদের জনপদ ছাড়ার পর ভগবানের কাছে স্রেফ এই প্রার্থনা-ই করেছি যেন আপনার বোনের সন্ধান পেয়ে যাই। গোয়ালিয়রেও আমি তার সন্ধান নিয়েছি। কিন্তু আপনাকে ভেঙে পড়লে চলবে না। তার সন্ধান একদিন না একদিন অবশ্যই পাবেন। এ দুনিয়ায় কখনও কখনও এমনও ঘটনা ঘটে মানুষ যা ধারণাও করতে পারে না। কল্পনায়ও ছিল না যে, দ্বিতীয় বার আপনার দেখা পাব। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আপনি আমার সম্মুখে উপবিষ্ট।'

রণবীর আরেকবার অনুভব করল যে, তার পায়ের তলায় মাটি নেই। ওর তনুমন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। ও চোখ বন্ধ করে চিৎকার দিতে চাচ্ছিল 'তুমি আমার, শুধুই আমার হে জয়কৃষ্ণের মেয়ে!' একবার পতিত হলে কেউ সহজে উঠতে পারে না। ও মনে মনে বলছিল, 'তুমি কি জয়কৃষ্ণকে ক্ষমা করতে পারবে? কি তুমি তোমার বাবা-বোনের প্রতিশোধ নিবে না ?'

'বসুন!' নির্মলার মিনতি ঝরা কণ্ঠ।

'না না। ক্ষমা করবেন।' মুষ্টিবদ্ধ দু'হাত দেয়ালে ঠেসে বললো রণবীর, 'আমার এখানে আসাই উচিত হয়নি।'

নির্মলা তার কম্পিত হস্ত ওর বাযুতে রেখে বললো, 'দেখুন! এটা ভগবানের খেল। তাঁর মর্জির সামনে আমরা উভয়েই অসহায়।'

কিন্তু রণবীর আচমকা পেছনে ফিরে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

'রনবীর!' পেছন থেকে শোনা গেল নির্মলার কণ্ঠ। সে অনুমান করল ভারী শেকলে কে যেন তার পা আটকে দিচ্ছে। কিন্তু পেছনে ফিরে তাকানোর হিম্মত নেই ওর। কাঁপছে ওর পদযুগল। এতদসত্ত্বেও বাড়ছে চলার গতি। দু'তরুণী সিড়িপথে উপরে চড়ছে। রণবীরের বেপরোয়া চলন দেখে ভয়ে তারা একপাশে সরে দাঁড়াল। রামনাথ দোতলার সিঁড়ির মোড়ে দণ্ডায়মান। সে বলল, কি হোল রণবীর ? তুমি এতটা ভারাক্রান্ত যে' ?

'কিছু না।' আত্মপেরেশানী চাপা দিতে চেষ্টা করল রণবীর।

খানিক পরে অনুচ্চস্বরে একে অপরের কাহিনী শুনিয়ে গেল। রূপাবতি সম্পর্কে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করার পর রণবীর বললো, 'আমি এখন কেল্লার বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে বলতে পারব, তোমার কতটুকু মদদ করতে পারব। রূপাবতির বিপদ ঘনিয়ে আসছে। দ্রুত ওকে এখান থেকে বের করতে হবে।'

'কি বিপদ ?'

'কেন তুমি জানো না, যে-ই মন্দিরের দেবী হয় তাকেই নৃত্য পরিবেশন করতে হয়। আচমকা একদিন সে গায়েব হয়ে যায়।'

'হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু জলজ্যান্ত একটা মানুষ কি করে মহাদেবের চরণে পৌঁছে যায়—এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।'

'যদি আমরা জানতে পারি মন্দিরের বর্তমান দেবী কোন্ রাতে গায়েব হবেন তাহলে স্বচক্ষেই দেখতে পাবে, সে কি করে মহাদেবের চরণে গায়েব হয়!'

'কিন্তু একথা তো আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি। কোন এক রাতে আচমকা মন্দিরের ঘন্টা বেজে ওঠে। লোকেরা মনে করে মন্দিরের দেবী মহাদেবের চরণে

পৌঁছে গেছেন। পরদিন ওই দেবীর তাজ অন্য যুবতীর মাথায় পরিয়ে দেয়ার উৎসব অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

'আমি এমন কিছু লোকের সাথে পরিচিত যারা হামেশা ওই রাতের অপেক্ষায় থাকে, যে রাতে তারা অসংখ্য দেবীকে মহাদেবের চরণে পৌঁছুতে দেখেছেন। আমি এমন এক দেবীর সম্পর্কে শুনেছি যিনি চার বছর পূর্বে মহাদেবের চরণ পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতে ফিরে এসেছেন। মন্দিরের পুরোহিত প্রধান তার জীবিত খবর শুনলে গোটা সৈন্যবাহিনী দিয়ে হলেও তাকে খুঁজে ফিরবেন!'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ভগবানের দিকে তাকিয়ে আমাকে ঘটনা খুলে বলো।'

'মন্দিরের দেবীর জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য পুরোহিত প্রধানকে যৌনতা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা। পুরোহিতজি কারো প্রতি বিরাগভাজন হলে কিংবা প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে মনে হলে তাকে অন্য কোন জগতে চালান করে দেন।'

রামনাথ কম্পিত কণ্ঠে বলে, 'তোমার কথার মতলব তাকে মেরে ফেলা হয়?'

রণবীর মৃদু হেসে বললো, 'না না তা নয়, বরং তাকে দূর সমুদ্রের এমন স্থানে ফেলে আসা হয় যেখানে সর্বদা আদমখোর মাছ মানুষের তালাশে বিচরণ করে।'

'না না! আমি এটা মানতে প্রস্তুত নই। কেউ হয়ত তোমাকে ভুল বলেছে। এটা অসম্ভব।'

'সত্যি বলতে কি, এটা এক বাস্তব অভিজ্ঞতা। তোমার মানা কিংবা না মানায় এতে কিছু যায় আসেনা। তোমার মনে কষ্ট দেয়ার জন্য একথা বলিনি। স্রেফ বলতে চাই, তোমার রূপাবতি ওই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি থেকে বেঁচে যাবে। এখন আমি উঠি।'

রণবীর উঠে দাঁড়াল। রামনাথ জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাও?'

'শহরের বাইরে দরিয়ার কিনারে এক সাধু বাস করেন। নাম ভগবান দাস। আমার প্রয়োজন মনে করলে তার ওখানে চলে এসো। শহরবাসী তাকে চিনে। সুতরাং তাকে খুঁজে নিতে খুব একটা কষ্ট হবে না।'

॥ চার ॥

রণবীরের সাথে মোলাকাতের দ্বিতীয় দিনে নির্মলা পাঠান্তে মহলে ফিরে এলে চাকরানী বললো, 'এইমাত্র আপনার বাবা এসেছেন। তিনি অপেক্ষমান।'

পিতার আগমন অপ্রত্যাশিত। এইতো ক'দিন হলো পত্র মারফত তিনি জানিয়েছেন, রঘুনাথের কোশেশে আনহলওয়ারার রাজা তাকে একটা জায়গীরের

ব্যবস্থা করেছেন। তিনি এর দেখাশোনায় ব্যস্ত। এজন্য তিন/চার মাস সোমনাথে আসতে পারবেন না।

দ্রুতপায়ে ও কামরায় প্রবেশ করল। জয়কৃষ্ণ তাকে দেখা মাত্র উঠে দাঁড়ালেন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'খুকী! তোমার চেহারা মুষড়ে পড়েছে কেন ? তোমার তবিয়ত ঠিক আছে তো ?'

'বিলকুল ঠিক বাপুজি! বসুন।'

জয়কৃষ্ণ আবারো কুরছিতে বসতে গিয়ে বললেন, 'তোমার চেহারা কেমন হলদে বর্ণ ধারণ করেছে।'

নির্মলা পাশের চেয়ারটায় বসতে বসতে বললো, 'বাপুজি! আপনার দৃষ্টিতে সর্বদাই আমি অসুস্থ।'

'আমি তোমার জন্য একটা খোশ খবর নিয়ে এসেছি।'

'কি খবর বাপু ?'

জয়কৃষ্ণ উঠে পালঙ্কে রাখা আবনুস কাঠের ছোট একটা বক্স উঠিয়ে ওর ক্রোড়ে রাখলেন।

'কি এতে বাবা?' নির্মলার ভ্রু-কুচকানো দৃষ্টি।

'খুলেই দেখ না।'

বক্সের মুখ খুলতেই মণি-মাণিক্যের ঝলক ঠিকরে পড়ল। জিজ্ঞাসুনেত্রে সে বাবার দিকে তাকায়।

জয়কৃষ্ণ বললেন, 'এ মণি-মাণিক্যের সবটাই তোমার।'

নির্মলার হয়রানী, ভয়ে এবং পেরেশানীতে রূপ নিল।

জয়কৃষ্ণ খানিক দম নিয়ে বললেন, 'বড্ড ভাগ্যবতি তুমি। রঘুনাথ বিশাল সাম্রাজ্যাধিপতিদের কন্যাদের দূরে ঠেলে তোমায় নির্বাচিত করেছেন। আমি তোমায় নিতে এসেছি।'

নির্মলার চোখের সামনে অন্ধকার ছেয়ে গেল। জয়কৃষ্ণ ওর সামনে রঘুনাথের ব্যক্তিত্ব, বিত্ত-বৈভব, মহলের শান-শওকত ও রাজ দরবারের কাহিনী বলছিলেন— নির্মলা যেন তা শুনছিলই না। ও মনে মনে বললো, 'এটাই কি আমার স্বপ্নের তাবীর ? এই ঝড়ো হাওয়া মোকাবিলার জন্যই কি আমি চেরাগ রওশন করেছি ? কুদরতের অজ্ঞাত হাত কি স্রেফ ভিন্ন জগতে বিচরণের আশায় আমাদেরকে বেদনার বারিধি তীরে উপনীত করেছে ?

এইতো গতকালও রণবীর আমার জন্য নয়া জীবনের পয়গাম নিয়ে এসেছিল। পেরেশানীর বিক্ষুব্ধ সৈকতে আমাকে ফেলে গেলেও হতাশ হইনি আমি। আমার দৃঢ়

বিশ্বাস ও আবার আসবে, বারবার আসবে। ওকে আসতেই হবে। ও না এলেও কুদরত আমাকেই ওর কাছে পৌঁছে দেবেন। এগুলো কি সব তাহলে অলীক ছিল ?'

জয়কৃষ্ণ রঘুনাথের প্রশংসার পাহাড় জমাচ্ছিলেন। নির্মলার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ও চিৎকার দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু কণ্ঠনালী কে যেন চেপে ধরে। চাচ্ছিল বাবার সামনে দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে, কিন্তু টলবার শক্তি ছিল না ওর।

শেষ পর্যন্ত কুরছি থেকে ওঠতে গিয়ে জয়কৃষ্ণ বলেন, 'আমি পুরোহিতজির সাথে দেখা করে আসি। তোমাকে নেয়ার জন্য তার অনুমতি দরকার।' তিনি বেরিয়ে গেলেন। নির্মলার নিমীলিত আঁখি যুগলে অশ্রুপ্লাবন। ওর হৃদয় চৌচির।

॥ পাঁচ ॥

অতি প্রত্যুষে রামনাথ কেল্লা ছেড়ে শহরের বাইরে বেরুল। ভগবান দাসের ঠিকানা জিজ্ঞেস করে একটি বাগানে প্রবেশ করল। ভগবানের প্রকৃত নাম তার সামান্য কিছু লোক ছাড়া আর কেউ জানে না। তিনি একটি বড়ই গাছের নীচে উপবিষ্ট। কিছু লোক আশে পাশে।

'আমি ভগবান দাসের সাথে দেখা করতে চাই।' রামনাথ অগ্রসর হয়ে বললো।

ভগবান দাস গর্দান উঠালেন। রামনাথের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, 'ভগবান দাস আমার নাম। বলুন!'

'আমি রণবীরের তালাশে এসেছি। সে-ই আমাকে এই স্থানের সন্ধান দিয়েছে।'

ভগবান তার দিকে আবারো গভীর নজর বুলিয়ে বলেন, 'আপনার নাম?'

'আমার নাম রামনাথ।'

'রণবীর এখানে নেই। ও এখানে আসতেও পারে, নাও আসতে পারে।'

'সে এখন কোথায় ? আমি শীঘ্র তার সাথে মিলিত হতে চাই।'

ভগবান আরবী ভাষায় তার এক সাথীকে কি যেন বোঝালেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর রামনাথকে লক্ষ্য করে বললেন, 'যান ওর সাথে।'

রামনাথ তার সাথে চললো। খামোশির সাথে চলছিল ও। শেষ পর্যন্ত ও সাথীকে বললো, 'রণবীর কোথায়?'

'তিনি আপনার সাথে বন্দরগাহে মিলিত হবেন।' সঙ্গীটি জবাব দিল।

রামনাথ পথিমধ্যে আর কোন কথা বললো না।

বন্দরগাহ সোমনাথের একটি নয়নাভিরাম শহর। বড় বড় দোকানগুলোয় দূর-দরাজের মালামাল পাওয়া যেত। সমুদ্রতীরে দেশ-বিদেশের পসরার জাহাজ

নোঙ্গর করা। ওই জাহাজের অধিকাংশই পাল তোলা। লোকের ভীড়ের মাঝে রামনাথ থেমে থেমে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে। ওর সঙ্গী বললো, 'তাকে আপনি এখানে পাবেন না। আসুন আমার সাথে।' রামনাথ আবারো তার পিছু নিল। সমুদ্রের কিনারে গিয়ে সে একটি ছিপি নৌকার সামনে এসে দাঁড়াল। আরবীতে মাঝিকে কিছু বোঝানোর পর নৌকায় চাপল। রামনাথ করল তার অনুসরণ।

খানিক বাদে এই নৌকা গভীর সমুদ্রের দিকে রওয়ানা হলো। জাহাজের নিকটে এসে রামনাথের সঙ্গী আরবীতে বুলন্দ আওয়াজে মাঝি-মাল্লাদের কিছু বললো, জনৈক মাঝি তার সাথে কিছু বলে জাহাজের ভেতরে গেল। খানিক পরে সে রণবীর সহকারে বেরিয়ে এল। রণবীরের ইশারা পেয়ে মাঝি-মাল্লারা সিঁড়ি নামিয়ে দিল।

রামনাথের সঙ্গী বললো, 'আপনি উপরে যান। আমরা এখানেই অপেক্ষা করছি।'

সিড়ির দ্বারা উপরে চড়তে লাগল রামনাথ। জাহাজে পা রেখেই রণবীরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সেই সকাল থেকে তোমার তালাশ করছি।'

'ভালো আছো ?' রণবীর জিজ্ঞাসা করল।

জবাব না দিয়ে রামনাথ এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। সেই সাথে হৃষ্টপুষ্ট এক লোককে দ্রুতগতিতে জাহাজের কোণ থেকে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল। দৈহিক দৃষ্টিকোণে তার চেহারা কিছুটা পাতলা। প্রশস্ত ললাট, চোখের গভীরতায় যেন বীরত্ব টপকে পড়ছিল। তার চলনে ছিল আত্মবিশ্বাসের ছাপ। তাকে দেখামাত্রই মাঝিরা এদিক-ওদিক সড়ে গেল।

রণবীর তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ইনি আমার দোস্ত রামনাথ। ওর কথাই বলছিলাম আপনাকে।

মুচকি হেসে তিনি রামনাথের দিকে হাত বাড়ালেন। বললেন, 'সালমান আমার নাম।'

'ইনি এই জাহাজের কাপ্তান।' বললো রণবীর।

মোসাফাহার সময় রামনাথের হাত তার লৌহ কঠিন মুষ্টিতে মোমের মত গলে যাবার অবস্থা।

রণবীর রামনাথকে গড়িমসি করতে দেখে বললো, 'এখানে অকৃত্রিমভাবে কথা বলতে পার।'

সালমান হাতের ইশারা করতেই মাঝি-মাল্লারা এদিক ওদিক সরে গেল। রামনাথ বললো, 'তোমাকে এই খবর দিতে এসেছি যে, জয়কৃষ্ণ এসেছে।'

'কোথায় সে ?' হৃদয়ের মণি কোঠায় কেমন একটা খোঁচা অনুভব করে প্রশ্ন করল রণবীর।

'ঐ মহলেই মেয়ের কাছে।'

'তাহলে সে আমার আগমনের কথাও জেনেছে নিশ্চয়ই।' খানিক ভেবে বলল রণবীর।

'আমার যদ্দুর বিশ্বাস, নির্মলা তার সামনে তোমার নামোল্লেখ করেনি।'

'কেন?'

'আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করেছি। রাতে সে আমার কক্ষে এসেছিল। কেঁদে কেঁদে আমার কাছে দরখাস্ত করেছিল যেন আমি তোমার কাছে তার আখেরী এ পয়গাম পৌঁছে দেই। আগামীকাল সে বাবার সাথে চলে যাচ্ছে। কিন্তু যাবার আগে সে তোমার সাথে ক'টা কথা বলে যেতে চায়।'

'তাহলে এখনও একথা মনে করছে, অশ্রু দিয়ে সে তার বাবার পাপ ধুতে পারবে ?'

'নিশ্চিত জেনে রেখো, সে তোমার জন্য সবকিছু কোরবান করতে পারে।'

রণবীরের এরাদা আরেকবার দোদুল্যমান হয়ে গেল। নিজকে স্বাভাবিক করার কোশেশ করে ও বললো, এ আমার সাধ্যাতীত রামনাথ! আমি একথা ভুলতে পারি না যে, সে জয়কৃষ্ণের মেয়ে আর আমি মোহন চাঁদের পুত্র, শকুন্তলার ভাই। বংশীয় সম্ভ্রমবোধকে এক মেয়ের অশ্রুর বিনিময়ে জলাঞ্জলী দিতে পারব না আমি। আমি ওখানে যাব। মিলিত হব জয়কৃষ্ণের সাথে। অবশ্য এটা তার-আমার আখেরী মোলাকাত।'

'কিন্তু আমি তোমাকে জয়কৃষ্ণের সামনে যেতে দেব না।'

রণবীর রামনাথের কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে সালমানের দিকে তাকিয়ে বললো, 'রাতের বেলা সামুদ্রিক পথে মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চাই। কেননা কেল্লার দরোজা তখন বন্ধ থাকবে। বের হবার সময়ও আমাকে বিকল্প পথ খুঁজে নিতে হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আপনার মদদের প্রত্যাশী আমি।' সালমান রণবীরের কাধে হাত রেখে বললো, 'যদি আমি অস্বীকার করি তাইলে ?

'তাইলে এখনই রামনাথের সাথে ওখানে চলে যাব। জয়কৃষ্ণ নামের আপদ বিদায় করা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা।'

'কিন্তু তুমি প্রতিশোধ নিতে সমর্থ হলেও ওখান থেকে নির্বিঘ্নে বের হওয়া সহজ নয়।'

'সে পরোয়া নেই আমার।'

সালমান মুচকি হেসে বলেন, 'তুমি বিশাল ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ। যাক সর্বাবস্থায় আছি তোমার সাথে।'

'আমিও যাব।' বলল রামনাথ।

'না। তুমি এখনই ফিরে যাও। সূর্যাস্তের পরপরই আমি উপস্থিত হচ্ছি। লোকেদের পূজা-পাটে মশগুল হবার সময়টাই আমর জন্য উত্তম সময়। মহলের দরোজায় তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো। আমার সম্পর্কে নির্মলাকে কিছু বলার দরকার নেই।'

'সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি মহলের বাইরে থাকব।'

বিদায় কালে সালমান বললেন, 'আমরা আবারো মিলিত হব। আপনার দোস্তের মুখে আপনার পুরো কাহিনী শুনেছি। আপনি কখনও হিম্মত হারা হবেন না।'

রামনাথ আশাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে লাগল। তিনি খানিক খামোশ থেকে আবারো বলতে লাগলেন, 'তুমি ওই মেয়েটাকে কোনক্রমে মন্দির থেকে বের করতে পারলে এই জাহাজ হবে তোমার উত্তম আশ্রয়স্থল।

হৃদয়ের ধুক ধুকুনিকে কোনক্রমে সামলে রামনাথ বললো, 'আপনি এখানে থাকছেন কতদিন ?'

'তোমার মদদ না করা পর্যন্ত।'

আচমকা কি একটা খেয়াল আসায় রামনাথের দিলমনে হতাশা ছেয়ে গেল। সে বলল, 'আমার মনে হয় না সে স্বেচ্ছায় মন্দির থেকে বের হবে।'

'সে মন্দিরের দেবী হলে দেখবে এই খেয়ালে বেশ পরিবর্তন এসেছে। ঐরাতে সে চিৎকার দিয়ে তোমাকে স্মরণ করবে।'

রামনাথের দমরুদ্ধ হয়ে আসছিল। সে অনুনয়ের স্বরে বললো, 'এ ধরনের কথা আমি ইতিপূর্বে কয়েকবার শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, আপনি মিথ্যা বলছেন না। ভগবানের দিকে চেয়ে বলুন, কোন জায়গার সাথে কোন ঘটনার কি সূত্র ?'

'ঘটনার সূত্র ও রহস্য তাই, যা বিগত শতাব্দীকাল ধরে কুমারী মেয়েদের সাথে করে আসা হচ্ছে। এখনও এক নারী মালাবারে অপরিচিত জীবন যাপন করছে। বছর চারেক পূর্বে সে মন্দিরের দেবী ছিল। মন্দিরের পুরোহিতের মন তার প্রতি খারাপ হলে মহাদেবের কাছে পৌঁছানোর নামে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে।'

রামনাথ বলে, 'আমার যদ্দুর বিশ্বাস রূপাবতির এই পরিণতি হবে না। ভগবান ওর মদদ করার জন্যই আপনাকে পাঠিয়েছেন।'

'আমি খোদার কাছে দোয়া করি তিনি যেন তোমাদের মদদ করার শক্তি দেন।'

॥ ছয় ॥

গভীর রাত।

জয়কৃষ্ণ নির্মলার কক্ষে বসে কথা বলছিলেন, কিন্তু দৃষ্টি ছিল অন্য কোথাও। রণবীরের কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য সে সকাল-সন্ধ্যা কয়েকবার নীচতলায় গিয়েছে। কিন্তু ওকে পাওয়া যায়নি। এখন আরেকবার ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইল। কিন্তু জয়কৃষ্ণ রঘুনাথের প্রসঙ্গ কপচে কপচে মুখে ফেনা তুলছেন তো তুলছেনই। তার কথা শেষ হতেই চায় না। নির্মলা ভাবে, রামনাথের বিলম্ব ঘটার কারণ হয়ত এই যে, সে রণবীরকে খুঁজে পায়নি। কিংবা অনেক দেরীতে পেয়েছে, রাতের বেলা কেল্লার দরোজা বন্ধ দেখে ফিরে গেছে। হয়ত সকাল করে আসবে এবং দেখা করা ছাড়াই বাবার সাথে তাকে চলে যেতে হবে। এজন্য সফর বিলম্বিত করার পরিকল্পনা আঁটতে থাকে নির্মলা, যে কোন মূল্যে রণবীরের সাথে ওর দেখা করা লাগবেই। রণবীরের হৃদয়ের এক কোণে সামান্য ঠাঁই পেলে ও যে কোন তুফানের মোকাবেলা করতে পারে, কিন্তু রণবীর নাখোশ হলে ওর হাসি-আনন্দ সবই অর্থহীন। রণবীর ওর শেষ ভরসা। সেই ভরসা টুটে যাওয়ায় ভবিষ্যত কেমন যেন অন্ধকার হয়ে আসে।

খানিক বাদে নির্মলা চোখ বন্ধ করে হাই তুলে বলে, 'বাপুজি! আমার শরীর ভেঙ্গে আসছে।'

জয়কৃষ্ণ পেরেশান হয়ে বললেন, 'উহু! তোমার তো ঘুম আসছে। কথায় কথায় তা খেয়ালই করিনি। কাল রাতে তুমি দেরীতে ঘুমিয়েছ। আচ্ছা আমি উঠি।'

নির্মলা তার সাথে উঠতে উঠতে বললো, 'চলুন! আপনাকে কক্ষে পৌঁছে দি।'

'না মা! তুমি ঘুমাও।' বলে জয়কৃষ্ণ বেরিয়ে গেলেন।

নির্মলা কামরার চেরাগ নেভাল এবং লঘু পায়ে কামরা থেকে বেরুল। বারান্দার অল্প দূরে চৌকিদারকে দেখা গেল।

সে মশাল হাতে রামনাথের সাথে কথা বলছিল। নির্মলা ওর সাথে রণবীরের কথা নিয়ে আলোচনা করার জন্য বে-কারার ছিল, কিন্তু পাহারাদারের উপস্থিতিতে সামনে অগ্রসর হবার হিম্মত ছিল না ওর। বারান্দায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে নির্মলা। এরপরও পাহারাদার স্থানচ্যুত না হলে নির্মলা কামরায় ফিরে আসে এবং পাহারাদারের চলে যাবার অপেক্ষা করে।

জয়কৃষ্ণ কামরায় প্রবেশ করেই দরোজা বন্ধ করেন। পাগড়ী খুলে একটি হ্যাংগারে লটকান এবং বিছানায় বসে যান। বেলকনির দিক থেকে খোলা বাতায়ন পথে সামুদ্রিক হিমেল হাওয়া কক্ষ্যভ্যন্তরে আছড়ে পড়ে। জয়কৃষ্ণ নিশ্চুপ বসে সে

হাওয়া খান। অতঃপর বেলকনির দিকে এগিয়ে যান। ডান-বাম কর্ণারের কামরাগুলো ছাড়া অপরাপর কামরাগুলো গ্যালারী সদৃশ।

বেলকনিতে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা বায়ু সেবন শেষে নির্মলার কক্ষের সম্মুখস্থ বেলকনিতে একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পান তিনি।

'কে ?'

'আমি পাহারাদার।' দ্রুত অগ্রসর হতে গিয়ে কে যেন বলে ওঠল।

জয়কৃষ্ণ আবারো বললেন, 'পাহারাদারকে সিঁড়ি খেয়াল করা চাই। এখানে তোমার তাড়া কিসের ? তুমি বড্ড ....., জয়কৃষ্ণ তার বাক্য শেষ করতে পারলেন না। পাহারাদার অগ্রসর হয়ে তার বক্ষে তলোয়ার চেপে ধরল। বলল, 'খামোশ।'

জয়কৃষ্ণ ভয়ে ক' কদম পিছু হটলেন। আগন্তুক তার বাযু চেপে ধরল এবং ধাক্কিয়ে কামরাভ্যন্তরে নিয়ে গেল।

জয়কৃষ্ণ হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

রণবীর বললো, 'জীবন বাঁচাতে চাইলে বলো, আমার বোন শকুন্তলা কৈ ?'

কম্পিত কণ্ঠে জয়কৃষ্ণ বললেন, 'জানিনা'।

'মিথ্যা বলছ তুমি।'

'ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি। বলছি মহাদেবের শপথ করে। আমার কথা বিশ্বাস করো। আমাকে ক্ষমা কর।'

রণবীর খঞ্জর সজোরে চেপে ধরে বললো, 'তোমাকে শেষ বারের মত সুযোগ দিচ্ছি।'

'না না আমার প্রতি রহম কর। তোমার বোনের কথা আমি জানিনা। তোমাদের জনপদের লোক এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আমি তাকে অনেক তালাশ করেছি। কিন্তু কোন হদীস মেলাতে পারিনি। এমনকি ওর সন্ধান দাতার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করেছি। আমার মেয়ের সাথে তোমার ব্যবহার দেখার পর ভেবেছি, তোমাকে কোথাও পেলে ওকেসহ গিয়ে তোমার পায়ে কপাল ঠুকে মাফ চাইব।

'আরে! মনে করছ এতেই তোমাকে মাফ করে দেব ? আমার বাবার খুনে যার হাত রঙীন এত সহজেই সে পার পেয়ে যেতে চায় ?'

এই কথাবার্তা শুনতে পেয়ে নির্মলা বেলকনির পথ ধরে কামরার দিকে এগিয়ে এলো এবং রণবীর ওকে দেখে এক কদম পিছু হটে গেল। নির্মলা রণবীরের সামনে দাঁড়িয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, 'আজ আপনার বিজয়ের দিন। থেমে গেলেন কেন? কাঁপছে কেন আপনার হাত ? আপনার কাছে রহমের দরখাস্ত নিয়ে আসিনি আমি।' জয়কৃষ্ণ উঠে এসে রণবীরের পায়ে পড়লেন। কেঁদে কেঁদে বললেন, 'ক্ষমা করে দাও আমাকে। পাপের প্রতিবিধান আমার কম হয়নি।'

রণবীর নির্মলার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি আমায় বুযদিল বলতে পারেন, আমার কমযোরির প্রতি ধিক্কার দিতে পারেন।'

নির্মলার দু'চোখে অশ্রু উছলে উঠলো। রণবীর পিছু হটার কোশেশ করল। কিন্তু জয়কৃষ্ণ শক্ত করে ওর পা ধরা। ঝুঁকে তাকে সড়াল। পরে এগিয়ে গেল দরোজার দিকে।

বাবার বাযু ধরে ওঠানোর কোশেশ করল নির্মলা। কিন্তু জয়কৃষ্ণ মুখ থুবড়েই পড়ে থাকলেন।

দরোজা খুলে বেরিয়ে গেল রণবীর। বাবার বাযু ধরে ওঠাল নির্মলাকে এবং বিছানায় বসিয়ে দিল। জয়কৃষ্ণের চেহারা ঘামে চুপসানো। নির্মলা খানিক দরোজার দিকে তাকিয়ে রইল। বারবার ও চাচ্ছিল দৌড়ে রণবীরের জামা টেনে ধরতে, কিন্তু শরম ও অনুতপ্তের সীমাহীন অনুভূতি ওর পায়ে জিঞ্জির লাগিয়ে দেয়। ফের ও বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু জয়কৃষ্ণ চোখ খোলার সাহস পাচ্ছেন না। আস্তে আস্তে বাবার প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার রহম ও দয়ায় রূপ নেয়।

'বাপুজি!' নির্মলা ডাকে মধু বচনে।

জয়কৃষ্ণ গর্দান ওঠালেন। কিছু না বলে দু'হাত উঁচু করে দেন। নির্মলা ফুঁপিয়ে কেঁদে বাবার বুকে মাথা রাখে।

'বাপু! ওয়াদা করুন ওর পিছু নিবেন না।'

'দুনিয়াতে এক্ষণে আমার কোন দুশমন নেই খুকি!' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন তিনি। 'এক্ষণে আমার বেঁচে থাকা কেবল তোমার জন্যেই।'

নির্মলা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, বাপুজি! আমার খেয়াল ছিল সকালে আপনার সাথে যাব না; কিন্তু এক্ষণে আপনাকে পেরেশান করব না। আমরা অতি সকালেই রওয়ানা হয়ে যাব।'

জয়কৃষ্ণ বাৎসল্যভরে ওর মাথায় হাত ফেলান। আচানক তার কি একটা মনে আসায় মৃত শিরাতন্ত্রীতে প্রতিশোধ আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি বলেন, 'আমি তো অবাক, রণবীর এখানে এলো কি করে এবং কি করে জানল যে, আমি এখানে ? আমার মনে হয় কি জানো, যখন তোমার সাথে কথা বলছিলাম তখন সে বেলকনিতে চুপটি মেরেছিল। এক্ষণে কেল্লার দরোজা বন্ধ। আমার যদ্দুর ধারণা, সকাল নাগাদ ও বেরোতে পারবে না।

নির্মলা সহসাই উঠে দাঁড়াল। হতাশা মন নিয়ে ক্ষেপে ওঠল, 'না না বাপুজি! আপনি এমন ধারণা করবেন না। এক্ষণে ওর ব্যাপারে আপনার মনে কোন কুখেয়াল জন্মালে চিরদিনের তরে আমাকে হারাবেন '

জয়কৃষ্ণ নির্মলার হাত ধরে কাছে বসিয়ে বললেন, 'খুকি! তুমি শান্ত হও।'

'এক্ষণে ওর পিছু নেয়ার কোন পরিকল্পনা ও মানসিকতা নেই আমার। অবশ্য সোমনাথ মন্দিরের আশে পাশে তার বিচরণ খুবই সন্দেহজনক ও ভয়াল।'

'বাপু! ও স্রেফ ওর বোনের তালাশে এসেছে। আমার ধারণা, আপনি দ্বিতীয়বার ওর দেখা পাবেন না। কিন্তু ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি ওর পিছু নিলে এই মহলের ছাদ থেকে আমি লাফ মেরে আত্মহত্যা করব। হামেশার জন্যে ওকে ভুলে যান।'

জয়কৃষ্ণ খানিক থেমে প্রশ্ন করেন, 'রণবীর এখানে ছিল তা কি তুমি জানতে' ?

'হ্যাঁ! ও এখানে এসেই আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে। বলেছি তাকে তোমার বোন এখানে নেই।'

'কিন্তু তুমি আমায় সতর্ক করলে না কেন ?'

'বাপুজি! আমি জানতাম সুযোগ পেলেও সে আপনার গায়ে হাত উঠাবে না।' কিন্তু সুযোগ পেলে আপনি তাকে জীবন্ত ছেড়ে দেবেন না-এই জন্যে। জয়কৃষ্ণ খামোশ হয়ে যান।

রণবীর জয়কৃষ্ণের কক্ষ থেকে বেরিয়ে রামনাথের সামনে এসে দাঁড়াল।

খানিক পর মহল থেকে বের হলে রামনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'আমার বিশ্বাস ছিল তুমি নির্মলার বাবার গায়ে হাত ওঠাতে পারবে না।'

'নৌকাওয়ালারা এখন আমার অপেক্ষা করছে। কিছুদিন আমি তোমার কাছে আসব না। জয়কৃষ্ণের মত লোকদের মাথা ঘুরতে সময় লাগে না। আমার প্রয়োজন পড়লে ওই ঠিকানাতো তোমার জানা আছেই।'

নৃত্য অনুশীলন শেষে রূপাবতি বিশ্রাম কক্ষের দিকে আসছিল। ওর তনুমন খুশী উদ্বেলে কম্পমান। আজ পুরোহিতজি ও মন্দিরের প্রধান প্রধান পূজারীরা তার নাচ দেখেছেন। মন্দিরের নিয়ম ছিল, প্রথাগত নাচ শেষ হলে কামিনী দেবী তার বাহারী নাচের শেষ ঝলক দেখাত, কিন্তু আজ যখন কামিনীর পালা এলো তখন সে অনুপস্থিত। আর পুরোহিতজি তার স্থলে রূপাবতিকেই নাচতে দিলেন।

নাচ শেষে পুরোহিতজি ও পূজারীরা চলে গেলে নাচের ওস্তাদ ওকে বললেন, 'আজ পুরোহিতজি তোমার প্রতি খোশ ছিলেন। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, কামিনীর পর তিনি তোমাকে মন্দিরের দেবী বানানোর মনস্থ করেছেন। অতঃপর দাসীরা রূপাকে বিশেষ রুমে নিয়ে যায় এবং মোবারকবাদ দিতে থাকে। বান্ধবীদের থেকে অনেক কিছু জেনে বিজয়ীনির গর্ব নিয়ে ও বেরিয়ে আসে। এত আনন্দের মধ্যেও ওর মনে একটা ব্যথা। ওর কারণেই হয়ত কামিনী চিরদিনের তরে হারিয়ে যাবে। আবার কখনও রামনাথের কথা মনে করে ব্যথায় মনটা মোচড় দিয়ে ওঠে। দুঃসহ বেদনার ভারবাহী বোঝায় নুয়ে পড়ে ওর দিলমন।

কামরার সামনে এসে রূপাবতি থমকে দাঁড়ায়। দারোজায় রামনাথকে দেখতে পায় জনৈক পূজারীর পোশাকে দণ্ডায়মান। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ও দ্রুত কেটে পড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু কদ্দুর চলার পর মনে হয় ওর পিছনে কেউ আসছে। দ্রুত হেটে রূপাবতি আরেকটি কামরায় প্রবেশ করে। রূপাবতি দরোজা বন্ধ করার পূর্বেই রামনাথ প্রবেশ করে।

'ভগবানের দিকে চেয়ে এখান থেকে চলে যাও।' রূপাবতি পিছু হটে বললো। রামনাথ দরোজা বন্ধ করে বললো, 'আমি জীবনের মায়া ছেড়ে দিয়েছি। তুমি চাইলে পাহারাদারদের ডেকে পাঠাতে পার।'

'তুমি কি চাও?' শুকনো গলায় বললো রূপা।

'তোমার মনের কাছেই জিজ্ঞাসা করে দেখ,' বলে রামনাথ দরোজার ছিটকিনি লাগাল।

'রামনাথ সাবধান! তুমি আগুন নিয়ে খেলছ।'

'এ খেল তো তুমিই শিখিয়েছ। ভয় নেই রূপা! আমি তোমাকে স্রেফ একটা কথা বলতে এসেছি।'

'ভগবানের দিকে চেয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'

'না! আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেরুব না।'

'আমি তোমার প্রতিটি কথার জবাব দিয়ে ফেলেছি ইতোমধ্যে।'

'না না। কিছু কথা এখনও আছে যার জবাব তুমি দিতে পার না। তুমি ওই কথার জবাব দিতে পার না যে, জীবিত মন্দিরের দেবী কি করে মহাদেবের চরণে পৌঁছে যায় ?

'এ ধরনের কল্পনাও মহাপাপ।'

'না! একথা মহাপাপ নয় বরং মন্দিরের দেবী মহাদেবের চরণে না গিয়ে মানুষখেকো মাছের পেটে যায়। একথা বলা নিশ্চয় পাপ নয় যে, দেবীগণ পুরোহিত প্রধানের ক্লেদাক্ত পাপের বোঝা নিয়ে মন্দিরের বাইরে বেরোয়। এ কথা বলা পাপ নয় যে, কামিনী দেবীর পরে তোমার জীবনের প্রতিটা ক্ষণ মৃত্যু থেকে ভয়ানক ও বিভীষিকাময় হবে।'

'অমন কথা আর মুখে এনো না রাম ? ভগবানকে ভয় করো।'

রামনাথ কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু বাইরে থেকে কেউ দরোজা খটখটালে চুপ করল। বাইরের থেকে কেউ রূপাবতিকে ডাকল। রূপাবতি ভয় পেয়ে রামনাথের হাত ধরে বললো, 'ভগবানের দিকে তাকিয়ে খাটের তলে লুকাও। সম্ভবতঃ এ কামিনী দেবী। মন্দিরের দেবী।' বাইরের থেকে আওয়াজ এলো, 'রূপাবতি! রূপাবতি! দরোজা খোল!'

রূপাবতি পূর্ণ শক্তিতে রামনাথকে খাটের তলে ঠেলে দিয়ে বললো, 'জী খুলছি।'

কামিনী অন্দরে প্রবেশ করলো। বেতের মোড়ায় বসে কামিনী বললো, 'আমার যা ধারণা, তুমি কারো সাথে আলাপ করছিলে।'

'আমি কখনও একাকীই কথা বলি, শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় রূপা, 'আজ আপনি নাচতে আসেননি। ভাবছি আপনার সাথে দেখা করব।'

কামিনী গোমরা মুখে বললো, 'আজ রাতে আমি চিরদিনের তরে তোমাদের ছেড়ে চলে যাব। আমি তোমার কাছে একটি ফরিয়াদ নিয়ে এসেছি। ছিটকিনি লাগাও তো'।

রূপাবতি ছিটকিনি লাগাল। কামিনী খানিক থেমে বললো, 'আমার মা কণ্ঠকোট-এ বাস করেন। তিন মাস অন্তর তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। সেই হিসাবে আগামী মাসে তার আসার কথা। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি তাকে বুঝতে দিও না যে, এখানে তার কেউ নেই।'

'আপনার মাতার সেবাই আমার ধর্ম, কিন্তু আজ রাতে আপনি বিদায় নিচ্ছেন– এ সংবাদ অবগত হলেন কি করে ? পুরোহিতজি আপনার কাছে কি সেই রহস্য খুলে ধরেছেন, যা অন্য কেউ জানে না ?'

'পুরোহিতের বলার দরকার নেই। বেশ ক'দিন ধরে এ রহস্য জাল আমার সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে গেছে। আজ যখন তিনি আমাকে নাচতে নিষেধ করলেন তখন আমার জানতে বাকী নেই যে, সোমনাথে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।'

'ক'দিন ধরে? কিভাবে? ভগবানের দিকে চেয়ে আমাকে সব খুলে বলুন!'

কামিনী ওঠতে গিয়ে বললো, 'অমন কথা মুখে এনো না। আমি তোমায় কিছুই বলতে পারব না।'

কামিনী চলে গেলে রূপাবতি দরজা বন্ধ করল। খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে রামনাথ বললো, 'তোমাকে আর পেরেশান করব না। তবে তোমার প্রতি কোন নাযুক পরিস্থিতি নেমে এলে দেখবে জীবন দিতেও এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করছি না আমি।'

'এ সময় আমার জীবনের নাযুক পরিস্থিতি সে তো তুমিই। ভগবানের দিকে চেয়ে যাও। নয়তো আমি এ মহল ছেড়ে চলে যাব।'

'আমরা খুব শীঘ্রই একে অপরের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি।' রামনাথ একথা বলে দরোজা খুলে বেরিয়ে গেল। রূপাবতি অবনতমস্তকে দু'হাটু গেড়ে এই প্রার্থনা করছিল, 'ভগবান! রামনাথকে ক্ষমা করো। ও জানে না যে, কি করছে।' পরক্ষণেই ওর কানে কোন স্বর্গীয় সুর-মূর্চ্ছনা ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ বেয়ে নামল অশ্রুবন্যা।

রূপাবতির কক্ষ থেকে বেরিয়ে রামনাথ বিশ্রামাগারের দিকে অগ্রসর হলো। নৃত্য ও সংগীতজ্ঞরা ছাড়া এবং মন্দিরের বিশেষ পূজারী ব্যতিরেকে এ দিকটায় অন্য কারো আনাগোনা তেমন একটা লক্ষ্য করা যায় না। রামনাথের মনে ভয় ছিল, যদি কেউ তাকে পরিচয় জিজ্ঞেস করে- তাহলে জবাবটা কি দেয়া যাবে ?'

এদিকে আসার সময় মনের অবস্থা এক রকম ছিল। রূপাবতির কাছে যাবার জন্য ও যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এক্ষণে ওর মনে নতুন আশার মুকুল উদগত হচ্ছে। ও চাচ্ছে, যে কোনভাবে রণবীর ও সালমানকে এই খবরটা জানাতে হবে। দাসীদের বিশ্রামাগার থেকে বেরোবার পথে অনেক পূজারী ও চৌকিদারদের সাথে ওর সাক্ষাৎ, কিন্তু পূজারীর পোষাকে দেখে ওকে কেউ তেমন কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করল না।

খানিকবাদে রামনাথ কামরায় এলো। দ্রুত পোষাক পাল্টে ফেলল। পূজারীর পোষাক গাটুরি বেঁধে বোগলদাবা করল। বেরিয়ে এলো কক্ষ থেকে। বারান্দার এক কোণে এসে ওটা এক স্থানে ফেলে দিল। নেমে এলো নীচে। ওখান থেকে সোজা কেল্লার সেনাপতির দফতরে এলো। পি, এ, মারফত তার কাছে দেখা করার আবেদন জানাল। সেনাপতির প্রবেশের অনুমতি পেয়ে তার দফতরে এলে ও বললো, 'মহারাজ! আমি একটি দরখাস্ত নিয়ে এসেছি।'

'কিসের দরখাস্ত ?'

'মহারাজ! আমি আনহলওয়ারা যেতে চাই।'

'ফিরছ কবে ?'

'এখানে আসার পূর্বে তিনি আমায় জায়গীর দান করেছিলেন।'

'এর মানে এই যে, তুমি আমাদের ফৌজে থাকতে চাচ্ছ না ?'

'মহারাজ! আমার প্রয়োজন পড়লে কোন প্রকার নোটিশ ছাড়াই চলে আসব।'

'তুমি এক জাদরেল সৈনিক ছিলে। তোমার চলে যাওয়ায় দুঃখবোধ করছি, তবে এই কথাও ভুলছি না যে, আনহলওয়ারা মহারাজার লোক হয়ে তুমি তার প্রভূত উপকার করতে পারবে।'

'জায়গীরের লালসা নেই এতটুকু কিন্তু সোমনাথে কোনদিন মাহমুদ গজনবীর হামলা হলে আনহলওয়ারাই হবে আমাদের সর্বশেষ দূর্গ। আমি ওখানে গিয়ে ওখানকার যুব শক্তিকে একত্রিত করতে চাই।'

সেনাপতি উঠে উষ্ণভরে ওর সাথে মোসাফাহা করে বললেন, 'আমি সানন্দে তোমাকে যাবার অনুমতি দিচ্ছি।'

ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে রামনাথ বেরুল, কিন্তু আনহলওয়ারা না ছুটে ওর ঘোড়া ছুটল ভগবান দাসের আড্ডার উদ্দেশ্যে।

॥ দুই ॥

পরদিন রাতে মন্দিরের অনবরতঃ ঘন্টা, কাস্ ও শিংগাধ্বনি এ কথার সাক্ষ্য বহন করছিল যে, মন্দিরের দেবী মহাদেবের চরণে পৌঁছে গেছেন।

শেষ রাতের অনবরতঃ এই ঘন্টাধ্বনিতে রূপাবতির ঘুম ভেঙ্গে গেল। নিরব নিথর হয়ে ও বিছানায় বসে রইল। রাতে প্রচুর গরম পড়ায় ও দারোজার খিল খুলে রেখেছিল। ঘন্টাধ্বনি ছাড়াও পূজারীদের ভজনগীত শোনা গেল। পূজারীদের একদল ভজন গাইতে গাইতে ওর কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। সকলের হাতে দপদপে মশাল। রূপাবতি চমকে উঠল। বাড়ল ওর মনের ধুক-ধুকানি দ্রুত।

জনৈক পূজারী হাতে মশাল নিয়ে ওর কক্ষে প্রবেশ করল। অতঃপর আরো দু'জন পূজারী ভেতরে এলো। ওদের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াল ও। জনৈক পূজারী ওর শরীরে গঙ্গাজল ছিটাল। আরেকজনে গলে পরাল ফুলের মালা। আরেকজনে ছিটাল আতর। গোটা কক্ষ ঘ্রাণে ঘ্রাণে মৌ মৌ করতে লাগল। এরপর সকলে 'মহাদেব কি জয়' শ্লোগান লাগিয়ে পিছু হটল।

অতঃপর বয়োবৃদ্ধ দু'নারী কক্ষে প্রবেশ করল এবং রূপাবতির বাহু ধরে বাইরে নিয়ে গেল। পথিমধ্যে রাস্তার দু'ধারেই পূজারীদের লম্বা সারি। রূপাবতি যখন

উঠান পেরিয়ে যাচ্ছিল তখন সকলে ঝুঁকে ওর পা ছুঁয়ে যাচ্ছিল। রূপাবতি এ অভাবনীয় সম্মানে অভিভূত, পুলকিত। ভুলে গেল ও ওর অতীত। ভবিষ্যত সম্পর্কে হলো বেপরোয়া। বর্তমান নিয়েই এক্ষণে ও ভাবতে চায়।

খুশী আনন্দ আর শ্রদ্ধা-সম্মানে টুইটুম্বর ও এখন গ্রাম্য সাদাসিধা মেয়ে নয়, যে কিনা একদা এক সাধারণ যুবকের প্রেমগীত গাইত। এখন সে এক রাণী-মহারাণী। প্রশস্ত উঠান পেরিয়ে ওকে এক উঁচু ইমারতে উঠানো হলো। খোলা ছাদে মরমর পাথরের বিছানা। বামদিকে বেশ কিছু কামরা, যেগুলোর বেলকনী সমুদ্রের দিকে খোলা। ডান দিকে প্রশস্ত হলঘর, তার পাশে একটি স্বর্ণের মঞ্চ। দাসীরা ওকে একটি প্রশস্ত কামরায় নিয়ে গেল। এর ছাদে অমূল্য পাথরাদির নকশার পাশাপাশি দামী ঝাড়-ফানুস লটকানো ছিল। আবনুসের ফরাসের ওপর হাতির দাঁতের শ্বেত-নকশা। দরোজা-জানালায় স্বর্ণতারের নকশাযুক্ত মোটা কাপড়। সেগুন গাছের প্রকাণ্ড ফটক আর তাতে চমৎকার স্ফটিকের বার্ণিশ আয়না সদৃশ পরিবেশের সৃষ্টি করছিল। স্বর্ণ-রৌপ্যের চেয়ারের মাঝামাঝি একখানা দামী পালংকও আছে ওখানে। মখমলের চাদর বিছানো তার ওপর। দাসীরা রূপাবতিকে একাকী ওই রুমে রেখে চলে গেল।

বিস্ময় বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে রূপাবতি ওই রুমের চারদিকে তাকায়। অতঃপর ও আশপাশের কামরার দিকে তাকায়। পাশের উপকামরায় অসংখ্য কাপড়ের ছড়াছড়ি। রয়েছে সাজ সজ্জার টেবিল। ফিরে এসে ও একটি চেয়ারে উপবেশন করে। আচমকা ওর মনে হয় যেন সামনের দেয়ালটা ক্রমশঃ দু'দিকে সড়ে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে ও উঠে দাঁড়ায়। সড়ে যাওয়া দেয়ালের ফাটল এক সময় একটা দরোজায় রূপ নেয়। রূপাবতি পালানোর প্রস্তুতি নিলে কে যেন বলে ওঠে, 'ভয় নেই।'

খানিক পর মন্দিরের পুরোহিত প্রধানকে ঐ পথে প্রবেশ করতে দেখা গেল। পুরোহিতজি শান্তভাবে সামনে অগ্রসর হন। রূপাবতিও অগ্রসর হয়ে তার পায়ে হাত রাখে এবং আদবের সাথে মাথানীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'ভয় পেয়েছিলে বুঝি!' পুরোহিত ওর চিবুকে হাত রেখে মাথা উঠিয়ে বলেন।

রূপাবতির গোটা শরীর কাঁপছিল। ভয়কাতুরে কম্পিত কণ্ঠে ও বলে, 'মহারাজ! মহারাজ! আমার জানা ছিল না, দেয়ালেও দরোজা থাকতে পারে।'

'এটা আমার মহলের রাস্তা। এখন তো তোমার ভয় লাগার কথা নয়।'

রূপাবতি পুরোহিতের চেহারার দিকে তাকাল। সেই দৃষ্টি যেন ওকে লেহন করছে, গিলে খাচ্ছে।'

'তুমি সত্যই ভাগ্যবতি। আজ রাতে তুমি সেই মুকুট পরিধান করতে যাচ্ছ, এদেশের শাহজাদীরা যা পরিধান করতে উদগ্রীব থাকে।'

'এ সবই আপনার দয়া মহারাজ।'

'না না। এগুলো দেবতাদের কৃপা।'

রূপাবতি ভয়ে ভয়ে বললো, 'মহারাজ! আপনি রাগ না করলে একটা কথা বলি?'

'বলো।'

'মন্দিরের দেবী মহাদেবের চরণে কি করে পৌঁছে ?'

'এ প্রশ্ন করা পাপ। দেবতাদের মর্জি হয়ে গেলে এ প্রশ্নের জবাব তুমি এমনিতেই পেয়ে যাবে। আজ রাত থেকেই তুমি এমন কিছু বিষয় অবগত হতে পারবে, অন্যে যা পারেনি। অবশ্য এখন তোমার আরামের সময়।'

যে পথে এসেছিলেন সে পথেই চলে গেলেন পুরোহিতজি। রূপাবতি কুরছিতে বসে গেল। দীর্ঘক্ষণ ওর অনুভব হতে লাগল, রহস্যপূর্ণ কামুক জোড়াদৃষ্টি ওকে ছাদ ও দেয়ালের ওপাশ দিয়ে যেন গিলে খাচ্ছে।

সূর্যোদয়ের পর মন্দিরের পুরোহিত প্রধানকে এক অপ্রত্যাশিত পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হল। যে পাঁচজন পূজারী কামিনীকে নৌকায় চড়িয়ে সাগরে ফেলতে গিয়েছিল তারা এখনও লাপাত্তা। দুপুরের কিছু আগে জনৈক পূজারীকে মৃত উদ্ধার করা হোল। এর দ্বারা বোঝা গেল নৌকা ডুবেছে এবং কামিনীসহ অপরাপর পূজারীরা মানুষখেকো মাছের পেটে গেছে।

সন্ধ্যার দিকে বয়োবৃদ্ধ দাসীদের যারা মন্দিরের দেবীর খেদমতে নিযুক্ত ছিলেন তারা রূপাবতিকে গোসল করিয়ে, খোশবু লাগিয়ে নয়া লেবাছ পরিধান করাচ্ছিলেন। পুরোহিত গুপ্তপথ ছেড়ে আরো জনা পনের পূজারীসহ কামরায় প্রবেশ করলেন। জনৈক পূজারী সোনার ট্রে উঠালো। এতে মন্দিরের দেবীর তাজ রাখা এবং অগনিত অমূল্য রত্ন-অলংকারাদি। পুরোহিতের ইশারায় রূপাবতিকে অলংকার সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হলো। অতঃপর পুরোহিত নিজ হাতে মুকুট ওঠালেন এবং রূপাবতির শীরে ধারণ করালেন। জনৈক পূজারী শিংগা বাজাল। মুহূর্তে গোটা মন্দিরের শিংগা ও কাষ্ঠগুলো বেজে ওঠল। পুরোহিত ও পূজারীবৃন্দ ভজন গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেলেন। রূপাবতির কাছে স্রেফ দু'জন দাসী রইল।

জনৈকা দাসী আয়নার দিকে ইশারা করে বললো, 'অগ্রসর হোন। আপনাকে মহারাণী মনে হচ্ছে।'

রূপাবতি দ্রুত আয়নার দিকে এগিয়ে গেল। আয়নার প্রতিবিম্বে আজ নিজকে অন্যরূপে আবিষ্কার করল ওর চোখ। অপর দাসী বললো, 'আপনি আরাম করুন। আপনার পালা এলে আমরা যথাসময়ে এসে নিয়ে যাব।

দাসীদ্বয় কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। রূপাবতি চেয়ার পেতে আয়নার সামনে বসে গেল।

॥ তিন ॥

রাতের বেলা মন্দিরের পুরোহিত, দাসী ও বিশেষ বিশেষ পূজারীরা বিস্ময় বিস্ফোরিত লোচনে সোমনাথের সামনে নয়া দেবীর নৃত্যসুধা উপভোগ করছিল। উত্থিত লহরের পানি কক্ষে প্রবেশ করলে রূপাবতির নাচ খতম হোল। পূজারীরা 'মহাদেব কি জয়' রবে এবং মন্দিরের ঘন্টা ও কাষ্ ধ্বনিতে পাষাণ গাত্র প্রকম্পিত হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রশস্ত কামরা জনশূন্য হলো। উত্থিত লহর আস্তে আস্তে সোমনাথ মূর্তিকে কোলে করে নিচ্ছিল। মন্দিরের মত কেল্লার হাজারো ইনসান 'মহাদেব কি জয়' শ্লোগানে গোটা প্রকৃতি কাঁপিয়ে তুলছিল।

নৃত্য শেষে রূপাবতি বয়োবৃদ্ধ দু'দাসীর তত্ত্বাবধানে বিশ্রামাগারের দিকে রোখ করল। দাসীদ্বয় ওকে কামরায় রেখে চলে গেল। রূপাবতি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ঝাড়-ফানুসের আলোকচ্ছটা অবলোকন করে কুরসীতে বসে পড়ল। ওর হৃদয়ে খুশীর তোলপাড়। খানিকপর মাথার ভারী মুকুট খুলে স্বর্ণের টিপয়ের ওপর রাখল। দাঁড়াল গিয়ে জানালার কাছে। প্রচন্ড দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি সত্ত্বেও ওর চোখে ঘুম নামছিল না। কাছে কেউ নেই। একাকীত্বের দহনে দগ্ধ হচ্ছিল ওর তনুমন। ও ভাবছে, পুরোহিতজির কাছে দরখাস্ত করে বলি যে, পাশের কামরায় যাতে তিনি আমার কোন বান্ধবীকে থাকতে দেন। অতঃপর আবারো ভাবে, কামিনীতো একাকী ছিল এখানে। খুবসম্ভব মন্দিরের দেবীকে একাকীই থাকতে হয়।

আচমকা কক্ষের দেয়াল ক্লিক ক্লিক করে ওঠল। ঘুরে সেদিকে তাকাল রূপা। দেয়ালের অদৃশ্য দরোজা ক্রমশ খুলে যাচ্ছে। ওর হৃদয়ে ধড়াস ধড়াস হাতুরি পেটা। মুহূর্ত পরে পুরোহিতজি বেরিয়ে এলেন। হাতে তরুতাজা ফুলের স্তবক। আরেকটি মালা। রূপাবতি অগ্রসর হয়ে তার পা ছুঁইল। পুরোহিত কিছু না বলে ওর গলায় মালা পরাল। রূপাবতির সামনে আবার রহস্যপূর্ণ একজোড়া কামুক দৃষ্টি ভেসে উঠল।

'এসো আমার সাথে।' পুরোহিতের শান্ত অথচ চাপা নির্দেশসূচক আহবান।

'কোথায় মহারাজ'?

'আজ তোমাকে সেই রহস্য জানাব, যা আমি ছাড়া কেউ জানে না।' বলে পুরোহিত গুপ্ত দরোজার দিকে এগুলেন।

রূপাবতি এক মুহূর্তে থেমে অবশেষে তার পিছু নিল। দরোজার সামনে একটি সরু বারান্দায় নয়ন ঝলসানো ঝাড়বাতি আলোক বন্যা আছড়ে ফেলছে। সেই বারান্দা ছেড়ে এক সময় তিনি আরো একটি সরু পথে চললেন। এই রাস্তা সমুদ্রের একটি স্পটে গিয়ে শেষ। স্পটের তীরে দাঁড়িয়ে পুরোহিত বললেন, 'কিছুক্ষণের

মধ্যেই সমুদ্রের পানি নামা শুরু করবে। ঐ দেখ পানি সিড়ির অষ্টধাপ পর্যন্ত এসে গেছে। এর মতলব মন্দিরের মহাদেবের মূর্তি পানিতে ডুব মেরেছে। এসো এখনো অনেক কিছু দেখতে বাকী আছে তোমার।

রূপাবতি কতকটা সাহস করে পুরোহিতের পিছু নিল। মনকে ধিক্কার দিল, এ কু-খেয়াল কেন হলো প্রথমবার তার সাথে বেরুতে। সমুদ্রের কিনারা দিয়ে চলার পর ওরা একটি প্রশস্ত সিঁড়ির দিকে এগুলো। অতঃপর এলো প্রশস্ত উঠানে। মেঘের আড়ালে চাঁদের হাসি। খোলা উঠানে তার আলোর বন্যা। বিকশিত পুষ্পরাজি উঠানের কোনে কোনে সৌরভ ছড়াচ্ছে। এর এক কোনে মরমর পাথরে বাঁধানো পুকুর। পুকুরের অনতিদূরে রূপাবতির সামনে এক আলীশান মহল ভেসে উঠলো। মহলে দাখেল হবার পর রূপাবতির মনটা ছ্যাৎ করে ওঠল। এখানে কোন চাকর-চাকরানী নেই। অথচ মহলের প্রতিটি স্থান আলোতে আলোতে সাক্ষাৎ দিন। প্রশস্ত বারান্দা পেরিয়ে পুরোহিত একটি কামরায় ঢোকলেন। এই কামরাটির সামনে সোমনাথের অন্যান্য কামরা কিছুই নয়। কামরার মাঝখানে মহাদেবের স্বর্ণ মূর্তি স্থাপিত। তার পাশে দুটি রৌপ্য মূর্তিকে নৃত্য করতে দেখা যাচ্ছে। পুরোহিত পর্দা উঁচিয়ে রূপাবতিকে প্রবেশ করতে বললেন। রূপাবতি ভেতরে এলো। গোটা কামরায় খোশবু মৌ মৌ করে ওঠল। কামরার মেঝেতে এমন দামী কার্পেট বিছানো, রূপাবতি আজ পর্যন্ত যা দেখেনি। এক কোনে আবনুস কাঠের নকশাযুক্ত দামী পালংক। সেদিকে ইশারা করে পুরোহিতজি বললেন, 'বসো রূপা।'

' জি...... জি. .... মানে আমি এই গোস্তাকী করতে পারি না।'

'কিসের গোস্তাকী! তুমি মন্দিরের দেবী আমি তোমার সেবক।' বলে পুরোহিত দরোজা দরাম করে বন্ধ করে দিলেন। লাগালেন ছিটকিনি। রূপাবতির সামনে আরেক পুরোহিত আবিষ্কৃত হলো এক্ষণে। ওর আপাদমস্তক কাঁপছে। পুরোহিত এগিয়ে আসছেন ওর দিকে। এসে গর্দানে নামিয়ে দেন দু'হাত। মাথা তুলে আপনার প্রতি আকর্ষণ করে বলেন, আমার দিকে তাকিয়ে দেখ রূপা! আমিই মহাদেব।'

রূপাবতির সামনে অন্ধকারাচ্ছতা। সেই অন্ধকারে পুরোহিত পিশাচের লোভাতুর চোখ দুটো চকচক করে নাচছে। বড়ই লোভাতুর, বড়ই নারীমাংসলোভী সে চাহনী। ওর পুরো দেহের রক্তস্রোত জমে হিম শীতল। 'ভয় পেয়ো না রূপা! ভয় নেই।' বলে পুরোহিত ওর নারী দেহের স্পর্ষকাতর অংশ মৈথুন করতে লাগল। এক সময় কোমড়ে হাত নামিয়ে দিল। আচমকা রূপাবতির জড়দেহে প্রাণের সঞ্চার হোল। সতিত্ব রক্ষায় ওর ৩৬০ জোড়া অস্থি-মজ্জা সটান হয়ে উঠল। মনে হচ্ছে কে যেন ওর দেহ জলন্ত অংগারে ছ্যাঁকা দিচ্ছে। মন্দিরের দেবী ও মহাদেবের পূজারিণী

হওয়া সত্ত্বেও ওতো নারী। বিদ্যুৎ গতিতে নারীমাংসলোভী নর পিশাচ পুরোহিতের দু'হাত ঝটকা মেরে সড়িয়ে দিল। পুরোহিত তখন সাক্ষাত পশুতে পরিণত। তিনি অগ্রসর হলেন। এ সময় কে যেন দরোজায় করাঘাত করল। তিনি ভড়কে সেদিকে তাকান। রূপাবতি এই ফাঁকে দু'হাতে সোনার ফুলদানি তুলে নেয় এবং আগে বেড়ে তা পুরোহিতের কপাল তাক করে মেরে দেয়। এক চক্কর খেয়ে পুরোহিত ভূতলে লুটিয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি কারা যেন সজোড়ে দরোজা ধাক্কাতে থাকে। দৌড়ে এসে রূপাবতি দরোজা খুলে দেয়। ওর সামনে তিন পূজারী দণ্ডায়মান। রূপাবতি চিৎকার দিয়ে বলে, 'আমি পশুটাকে মেরেছি। মন্দিরের পুরোহিতকে ভূতলশায়ী করেছি। সে নারীলোভী পাপিষ্ট।'

এক পূজারী অগ্রসর হয়ে ওর বাযু সজোড়ে চেপে ধরে বললো, 'আস্তে রূপাবতি! আমি রামনাথ!' অর্ধ বেহুশ রূপাবতি নিমিলিত চোখে ওর দিকে তাকায়। রামনাথের অপর দু'সাথী ভেতরে প্রবেশ করে। তন্মধ্যে একজন রণবীর অপরজন কামিনী দেবী।

রণবীর পুরোহিতের কাছে গিয়ে তার নাড়ীর স্পন্দন দেখে বললো, 'এ এখনো জীবিত।' কামিনী খঞ্জর বের করে পুরোহিতের দিকে এগিয়ে গেল। রামনাথ খপ করে হাত ধরে ফেলল এবং ধরে বাইরে নিয়ে এলো।

'রামনাথ! রামনাথ! রূপাবতি ক্ষীণকণ্ঠে ডাকল। ফের ফুঁপিয়ে কেঁদে ওর বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'রূপাবতি! এক্ষণে তোমার আর কোন ভয় নেই।' বলল কামিনী।

রূপাবতির কানে এই কণ্ঠ পরিচিত বলেই অনুমিত হলো। চকিতে ও আগন্তুকের দিকে ঘুরে বললো, 'কামিনী! কামিনী তুমি!'

'ভয় পেয় না রূপা! আমি জীবিত।'

নিথর নিস্তব্দ রূপা। অতঃপর রামনাথকে ছেড়েও কামিনীর বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রণবীর বলে, 'এক্ষণে আর দেরী নয়। চলো বেরিয়ে পড়ি।'

'এ মুহূর্তে আমাদের কোন ভয় নেই। সকাল নাগাদ এদিকে কেউ আসবে না।'

খানিক পর। ওরা চারজন পুরোহিত-মহল থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের কিনারা দিয়ে সেই স্পটের কিনারায় এলো। ওখান থেকে অল্প দূরে একটা কিশ্‌তি ভেড়ানো। ওদের দেখে সেটি কিনারে এলো এবং সিড়ি নামিয়ে দিল। ওরা তরতর করে নৌকায় চাপল। রূপাবতির গন্তব্য জানা নেই। ও রামনাথকে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা ওখানে পৌঁছুলে কি করে। এর জবাবে রামনাথ ওকে বোঝাল, এ সবই কামিনী দেবীর মেহেরবানী। উনি আমাদের সাথে না থাকলে মন্দিরে আমরা

তোমাকে কিছুতেই তালাশ করে পেতাম না।' অতঃপর ও কামিনীর দিকে তাকালে সে বললো, 'রামনাথ আমাকে মানুষখেকো মাছের থেকে বাঁচিয়েছে।'

নৌকা যতই মন্দির থেকে দূরে সড়ে আসছিল। ততই রূপাবতি শান্তির নিঃশ্বাস ফেলছিল। এসময় ও রামনাথকে জিজ্ঞাসা করলো, আমরা কোথায় যাচ্ছি রামনাথ ?

রামনাথ পশ্চিম দিকে ইশারা করে বললো, 'ঐ যে জাহাজটা দেখছ না, ওটা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ওতে চড়ে আমারা শতক্রোশ দূরে নিরাপদ স্থানে উপনীত হতে পারব।'

'কিন্তু এদেশে এমন কোন স্থান নেই যেখানে পুরোহিতের লোক আমাদের পিছু ধাওয়া করবে না। সে না মরে থাকলে মন্দিরে আমার অনুপস্থিতিকে সকলে মনে করবে, আমি তাকে মেরেছি।'

রামানাথ ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'আমি পরীক্ষা করে দেখেছি সে মরেনি। তার নাড়ী সচল ছিল। সে হুঁশ থাকা অবস্থায় আমাদের দেখে চিনে ফেললে অবশ্যই মেরে ফেলতাম। সকালে অন্যান্য পূজারীরা তাকে টেনে বের করলে তোমার আঘাতের স্থলে সে অন্য কোন বাহানা তালাশ করবে।'

কামিনী বললো, 'আমি জানি সে কি করবে, সে বদনামীর ভয়ে তোমাকে তালাশ করার জন্য সেই সব পূজারীদের হুকুম দিবে যারা তার রহস্য সম্পর্কে অবগত। অতঃপর সে ফরমান জারী করবে, আমার মত তুমিই মহাদেবের চরণে পৌঁছে গেছ। পরে শহর ও জনবহুল লোকালয়ে তোমার তালাশ করতে থাকবে অতি সঙ্গোপনে।'

রূপাবতি ও কামিনী কথা বলে যাচ্ছিল। রামনাথ রণবীরকে বোঝাচ্ছিল, 'কামিনী ও আমরা তোমাদের জনপদে যাই– এই খেয়াল পেশ করো তো তুমিও আমাদের সাথে চলো। এখানে সম্ভবতঃ তোমার আর কোন কাজ নেই। সোমনাথের আশে পাশে থাকা তোমার জন্য নিরাপদ নয়।'

'না! আমার এখানে থাকা একান্ত জরুরী। তোমাদেরকে আমার মদদের জরুরত থাকলে অতি অবশ্যই যেতাম। সালমান তোমাদেরকে নিরাপদ উপকূলে নামিয়ে দেবে। ওখান থেকে তোমরা সোজা কনৌজ যেও। তোমাদের জন্য আমার বাড়ী অপেক্ষা নিরাপদ আর কোন স্থান নেই। যেদিন সুলতান মাহমুদ গজনবী সোমনাথ মন্দিরে ইসলামের পতাকা ওড়াবেন সেদিনই আমি বাড়ী ফেরব বলে মনস্থ করেছি। আমি ঐ মন্দিরের পরাজয় স্বচক্ষে অবলোকন করতে চাই, যার ভেতরে জুলুম ও অন্যায় প্রতিনিয়ত। এটাই আমার জীবনে এক্ষণের সবচেয়ে বড় আশা। শকুন্তলাবিহীন আমার বাড়ী বিধ্বস্ত নগরীর সমতুল্য।'

নৌকা জাহাজের কাছে ভিড়লে সালমান যিনি মাঝি-মাল্লাদের নিয়ে ডেক-এ দাঁড়িয়েছিলেন, বলে ওঠলেন, 'তোমরা বেশ দেরী করে ফেলেছো। মেয়েটার কিছু করতে পারলে ?'

'আমরা তাকে নিয়ে এসেছি। মন্দির থেকে তাকে বের করতে তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি। কেউ ঠাহরও করতে পারেনি।'

ওরা রশির সিঁড়ি ফেলে দিলে সকলে জাহাজে চাপল। রামনাথ রূপাবতিকে ধরে উঠাল। নৌকার তিন মাঝিও জাহাজে চাপলো, বাকী চারজন নৌকায় থাকল। সালমান রণবীরকে বললেন, 'এখন কথার সময় নয়, ভোরের আলো ফুটে উঠার পূর্বেই আমাদেরকে অত্র স্থান ত্যাগ করতে হবে। নিজের ব্যাপারে কি ফয়সালা করেছ তুমি ?'

রণবীর বললো, 'আমি আব্দুল্লাহর কাছে ফিরে যাব।'

'সালমান মোসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আচ্ছা খোদা হাফেজ! ইনশা আল্লাহ! অতিশীঘ্র আমরা একে অপরের সাথে মিলিত হবো।'

'আপনি মন্দিরের কয়েদীদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিলেন?'

'এক্ষণে ওদের চিন্তা নয়। ওদেরকে এমন স্থানে নামিয়ে দেব যেখানে সোমনাথের কোন টিকটিকি পৌঁছুতে সক্ষম নয়।'

রূপাবতি ক্ষীণকণ্ঠে কামিনীকে বললো, 'কয়েদী কারা ?'

কামিনী জবাব দেয়, আমাকে নৌকায় করে নিয়ে আসা তিন পূজারীকে জীবিত গ্রেফতার করা হয়েছে।'

সালমান মোসাফাহা শেষে রণবীর ও রামনাথের সাথে হাত মেলালো। রামনাথের চোখে কৃতজ্ঞতার আঁসু। জাহাজের পাল খোলার অনুমতি দেন তিনি। রণবীর রশির সিঁড়ি মাড়িয়ে নৌকায় নামল।

কিছুক্ষণ পর জাহাজ ছাড়ল। কামিনী, রামনাথ ও রূপাবতি জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে রণবীরের নৌকার শেষ দৃশ্য দেখছিল। কামিনী নিদ্রার বাহানা করে ওখান থেকে কেটে পড়ল। রূপাবতি এদিক ওদিক দেখে রামনাথের বুকে মিশে গেল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ও 'রামনাথ আমায় ক্ষমা করে দাও। তখন বুঝিনি আমি কি করছিলাম।'

'রূপাবতি! তুমি যা কিছু করেছিলে তা ছিল এক ভয়ানক স্বপ্ন। ভুলে যাও তা। আজ থেকে আমরা একে অপরের চোখে আঁসু দেখতে চাই না। উজাড় দুনিয়ায় ফের আমরা সংগীত ও হাসি-কোলাহলে ভরপুর করতে চাই। রূপাবতি! আজ আমরা নতুন করে জন্ম নিলাম। চলো এক্ষণে তোমার আরামের প্রয়োজন। জাহাজের কাপ্তান তোমার ও কামিনীর জন্য তার কামরা খালি করে দিয়েছেন।'

রূপাবতি ওর পিছু নিল কিন্তু ক'কদম চলে কি ভেবে থেমে গেল।

'দাঁড়াও রামনাথ!' বলে ও গলা ও শরীরের তামাম অলংকারাদি খুলে নদীতে নিক্ষেপ করল। একমাত্র আংগুলে কষা আংটি ছাড়া সবই নদীতে ফেলল। রামনাথ পকেট থেকে একটি রুমাল বের করল। তাতে পেঁচানো আনহলওয়ারা মহারাজার দেয়া মালা। খুলে সেটি রূপাবতির গলে পরিয়ে দিল।

॥ চার ॥

শেষ রাত।

পুরোহিত হুঁশ ফিরে পেয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ব্যথায় মাথা টনটন করে ওঠল। চোখের সামনে গোটা দুনিয়া অন্ধকার হয়ে এলো। তিনি আবার ফরাশে মাথা এলিয়ে দেন। শুয়ে শুয়ে চোখ খুলে গোটা কক্ষের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। আচমকা রাতের ঘটনা বিজলি-বিদ্যুতের মত তার দিল-দিমাগে ভেসে ওঠে। হামাগুড়ি দিয়ে দরোজার কাছে এগিয়ে যান। ব্যথার কারণে তার গোড়ালী কাজ করছিল না। বাইরে থেকে দরোজা বন্ধ থাকায় তিনি চাকরদের ডাক দিচ্ছিলেন। পরে অবশ্য তার খেয়াল এলো, সূর্যোদয়ের আগে পূজারী কিংবা চাকর-চাকরানীদের এদিকে আসার অনুমতি নেই কারোরই। দু'হাতে মাথা চেপে তিনি বিছানায় এসে বসলেন। তার বিশ্বাস মন্দিরের ভেতরে-বাইরে তার বিরুদ্ধে রূপাবতির কথা কেউই শুনবে না। রূপাবতির কেল্লায় পৌঁছে যাওয়া তার জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারত, তবে এ মুহূর্তে পাহারাদার তাকে বের হতে দেবে না– এ বিশ্বাসও আছে তার। আচমকা তার খেয়াল এলো, রূপাবতির আঘাতের পূর্বেই কারা যেন দরোজায় করাঘাত করছিল। কিন্তু তারা কারা! খুব সম্ভব এটা আমার ভ্রান্ত ধারণা। তিনি দীর্ঘক্ষণ নিথর পড়ে রইলেন। শেষে বিছানায় শুয়ে গেলেন তবে দু'চোখে ঘুম নামল না।

সূর্যোদয়ের পরে জনৈক পূজারিণী তার নাশতার খবর নিয়ে এলো। বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগানো দেখে নওকরকে তিনি ডাকলেন। পুরোহিত উঠে দরোজা নাড়ালেন। পুজারিনী বাইরে থেকে দরোজা খুলে দেয়। পুরোহিত তার সাথে কোন কথা না বলে দ্রুত রূপাবতির কক্ষের দিকে ছুটে যান। রূপাবতির কক্ষের বাইরের দাসীরা পেরেশান হয়ে দাঁড়িয়ে।

'রূপাবতি কোথায়?'

'সে এখানে নেই মহারাজ। সেই সকাল অবধি তাকে আমরা তালাশ করছি।' বললো রূপার এক চাকরানী।

পুরোহিত কিছু না বলে চলে এলেন। প্রায় এক ঘন্টা পর মন্দির বিশেষ পূজারীরা অতি সংগোপনে রূপার খোঁজ নিচ্ছিল।

পরদিন সকালে মন্দিরের সর্বত্রই এ খোশ খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, মন্দিরের নয়া দেবীও মহাদেবের চরণে পৌঁছে গেছেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় লোকেরা রূপার শ্রেষ্ঠত্ব মনে করল। সর্বত্রই ওর প্রশংসা চলতে লাগল; কিন্তু পুরোহিতের নিকট এই ঘটনা মারাত্মক এক বিপ্লবের ভূমিকা ছিল। তার জানবায একদল পূজারী পুরোদস্তুর ওর তালাশ করে যাচ্ছিল দেশের সর্বত্রই।

॥ পাঁচ ॥

রূপাবতি, রামনাথ ও কামিনীকে সালমানের হাতে তুলে দেবার পর আব্দুল্লাহর কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রণবীরের সকাল হয়ে যায়। সারা রাতের দৌড় ঝাপের দরুন ওর শরীর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসছিল। আব্দুল্লাহকে মন্দিরের কাহিনী শোনানোর পর ও খানা খায় এবং নিরিবিলি একটি কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওর দু'চোখে নেমে আসে রাজ্যের ঘুম। দুপুরের দিকে ঘুম ভাঙ্গে এবং কুঠরী থেকে বের হয়ে আসে।

আব্দুল্লাহ একটি বৃক্ষের নীচে অপরিচিত একজনের সাথে কথা বলছিলেন, রণবীরকে আসতে দেখে বললেন, 'এদিকে এসো রণবীর, তোমার জন্য একটি খোশখবর।' রণবীরের মনে ধুক ধুকুনি শুরু হোল। দ্রুত অগ্রসর হয় ও, 'কি খবর?'

'তোমার বোনের সন্ধান পাওয়া গেছে।'

সহসাই রণবীরের অশান্তিময় হৃদয় কোণে সুখের সংগীত বেজে ওঠল, 'কোথায় ? কখন ? কে বলল আপনার কাছে ? এক শ্বাসে প্রশ্নগুলো করে ও।'

আব্দুল্লাহ আগন্তুকের দিকে ইশারা করে বলেন, 'আব্দুল ওয়াহিদ তাকে পাঠিয়েছেন।'

আগন্তুক উঠে দাঁড়িয়ে গেল। রণবীর তার হাত আপনার হাতের মুঠোয় পুরে বললো, 'কোথায় আমার বোন?'

'আপনাদের বাড়ী পৌঁছে দেয়া হয়েছে।'

রণবীরের কিছু প্রশ্নের জবাবে আগন্তুক শকুন্তলার কাহিনী শোনাল।

'এক্ষণে তোমার ইচ্ছা কি ?' আব্দুল্লাহ উঠে রণবীরের কাঁধে হাত রেখে বললেন। রণবীর চকিতে তার দিকে তাকাল, ওর দু'চোখ আঁসুতে ভরপুর। কলেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে সে আব্দুল্লাহকে বললো, অনেকদিন আগে থেকেই আমি ইসলামের সততার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আজ আপনার সামনে সে

কথার প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিলাম। খোদার কাছে দোয়া করবেন যেন তিনি আমাকে হিম্মৎ ও স্থিতিশীল করেন আর আমার জন্য একটা নয়া নাম রাখবেন।'

আব্দুল্লাহ ওকে বুকে তুলে নিয়ে বললেন, 'তোমার চেহারা দেখার পর নাম রাখতে আমার দেরী লাগেনি। তোমার জন্য 'ইউসুফ' নামটা পছন্দ করেছি। এক্ষণে তুমি বোনকে দেখতে বে-কারার। ওই দেখ তোমার ঘোড়া প্রস্তুত।'

রণবীর ক'কদম দূরে একটা ঘোড়া দেখতে পেল। 'জীন লাগানো তাতে। সে বললো, কিন্তু আপনি এ খেয়াল কি করে করলেন যে, আমি এই মুহূর্তে যাব। আমি কি আপনাকে বলিনি যে, যতদিন সোমনাথ বিজয় না হচ্ছে ততদিন আমি এখান থেকে যাব না।'

'আব্দুল ওয়াহিদের চিঠি দ্বারা বোঝা গেছে এই মুহূর্তে সুলতান মাহমুদের এদিকে অগ্রসর হবার কোন সম্ভাবনা নাই। সোমনাথ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য তোমার নখদর্পণে। কাজেই তোমার এখানে থাকার দরকার নাই। বিশেষ করে যখন তোমার বোন সকাল-সন্ধ্যা তোমার পথচেয়ে। মুখে আব্দুল ওয়াহিদের পয়গাম শুনেই তোমার ঘোড়া প্রস্তুত করে রেখেছি, অবশ্য তখন তুমি ঘুমিয়েছিলে।'

খানিকবাদে রণবীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছুটাল। ওর চোখের সামনে শকুন্তলার মুচকি হাসি নাচছিল।

॥ ছয় ॥

পরদিন রূপাবতির গভীর নিদ্রা ভঙ্গ হলে কামিনীকে পাশে বসা দেখল।

'অনেক ঘুমিয়েছ তুমি।' কামিনী বলল।

'ও কোথায়?' প্রশ্ন রূপার।

'রামনাথ এসেছিল। তোমাকে ঘুমন্ত দেখে কাপ্তানের কাছে চলে গেছে।'

'এখন তো কোন ভয় নেই আমাদের?' উঠে বসতে বসতে বলল রূপা।

'না এখন আমরা অনেক দূরে এসে পৌঁছেছি।'

'মনে হচ্ছে একটি ভয়াবহ স্বপ্ন দেখছি। বিশ্বাসই করতে পারছি না যে, সোমনাথ মন্দিরে এ ধরনের কাজ হয়ে থাকে।'

'ভগবানকে ধন্যবাদ, তুমি জীবন্ত ফিরতে পেরেছ।'

'কামিনী আমি তোমার কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই। তুমি শেষবার যখন মোলাকাত করেছিলে তখন তোমার কথার দ্বারা বোঝা যাচ্ছিল, তুমি তোমার পরিণাম সম্পর্কে বে-খবর নও। পুরোহিত কি তোমায় বলেছিল যে, তোমার সময় ফুরিয়ে এসেছে?'

'হ্যাঁ, আমার পীড়াপীড়িতে সে বলে দিয়েছিল। সে না বললেও আমি বুঝেছিলাম মন্দিরে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

'তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে' এ কথাও কি বলেছিল ?

'না, আমাকে বলেছিল, তুমি মহাদেবের চরণে পৌঁছুতে যাচ্ছ।'

'এ কথায় নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলে কি ?'

'তা অবশ্য না। কিন্তু মনকে প্রবোধ দেয়া ছাড়া তখন আমার আর কিছুই করার ছিল না।'

'কামিনী! তোমার চেহারা দেখার পর ভাবতেও কষ্ট লাগে যে, কেউ তোমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে।'

কামিনী উভয় হাতে চেহারা ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে বললো, 'রূপাবতি! পুরোহিতের পাপ মাটি চাপা দেয়ার জন্য আমার বলিদান জরুরী ছিল। হায়! এরা যদি আমাকে না বাঁচাত। তার পাপের বোঝা নিয়ে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুহূর্ত আমার জন্য মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর।' কামিনী ডুকরে কেঁদে ওঠল।

রূপাবতি ওর মাথা আপনার কোলে নিয়ে বললো, 'কামিনী! আমার দৃষ্টিতে তুমি এক দেবী।'

'দেবী!' কামিনী ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি নিয়ে আর্তনাদ করে ওঠল, 'না না! আমি দেবী নই। দেবী হলে যে রাতে সে আমার সতিত্ব পর্দা ছেদন করেছিল সে রাতই হতো আমার জীবনের শেষ রাত। যে সাধাসিধা যুবতী ঐ রাতে মহাদেবের দাসী হতে চেয়েছিল, মারা গেছে সে। আর যে কামিনীকে পরবর্তীতে মন্দিরের পূজারীরা দেখেছে, পাপের প্রতিশোধমনা এক নারী সে। তাকে স্রেফ এই আশায় বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল যে, রাজা-রাণীরা তার সম্মুখে হীরার মালা নিয়ে অপেক্ষা করবে।'

'কামিনী! তুমি এক বোনকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করেছ। তোমার এই ঋণ কোনদিন শোধরাতে পারব না।'

'আমি তোমার কোন উপকার করিনি। স্রেফ নারীমাংসলোভীটাকে খতম করতে গিয়েছিলাম। রণবীর বাধা না দিলে আমার খঞ্জর তার বুকে ঠিকই ঢুকিয়ে দিতাম। রূপাবতি! দুনিয়ায় কারো সামনে মুখ দেখানোর কায়দা নেই। এক্ষণে বেঁচে থাকার প্রতিটি ক্ষণ মৃত্যু অপেক্ষা কষ্টদায়ক।'

'কামিনী! তুমি আমার সাথে যাবে। আজীবন তোমার পদসেবা করব আমি।'

'না আমি তোমাদের সাথে যাব না।' কামিনী রূপাবতির হাত সরিয়ে বললো, 'আমার রাস্তা তোমাদের থেকে ভিন্ন।'

রূপাবতি পেরেশান হয়ে বললো, 'কিন্তু তুমি যাবে কৈ ? '

'সে প্রশ্নের উত্তর এখনও ঠিক করিনি।'

বাকী সারাদিন কামিনী পেরেশান অবস্থায় কাটাল। সন্ধ্যার দিকে রূপাবতির সাথে সামুদ্রিক দৃশ্য অবলোকন করছিল। অতঃপর ও নিজ কক্ষে চলে গেল। রামনাথ অনেকক্ষণ তার সাথে কথা বলল। রূপাবতি দেখছিল কামিনী ক্রমশঃ স্বাভাবিক হচ্ছে। রামনাথ চলে গেল। খানিক কথা বলে সে শুয়ে গেল। সকালের দিকে ঘুম ভাঙ্গার পর রূপাবতি কামিনীকে দেখতে পেল না। ও ভাবল, খুব সম্ভব সামুদ্রিক নৈসর্গিক দৃশ্য দেখছে। খানিক অপেক্ষা করে ওর খোঁজে বের হল। কিন্তু কোথাও নেই কামিনী। সালমানের জিজ্ঞাসার পর দু' মাঝি বললো, 'তখন গভীর রাত। আমরা তাকে জাহাজে টহল দিতে দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলে বললো, ভেতরে দম আটকে আসছে। ঠাণ্ডা বায়ু সেবনে বের হয়েছি। এরপর তিনি জাহাজের ওপাশে চলে গেলেন। পরে আর তাকে দেখিনি আমরা। ভেবেছি, উনি বুঝি নীচের কামরায় গেছেন।' সালমানের নির্দেশে জাহাজের কোণে কোণে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, কিন্তু কামিনী নেই কোথাও। সালমান ও তার সঙ্গীদের একথা বুঝতে কষ্ট হলো না যে, সোমনাথের দেবী সাগর বক্ষে ঠাঁই নিয়েছেন।

কিছুদিন পর সালমান রামনাথ ও রূপাবতিকে শেষ রাতে উপকূলে নামিয়ে দিলেন। ওরা বালুতে বসে সকালের অপেক্ষা করছিল। জাহাজে সফরের শেষ দু'দিন রূপাবতির স্বাস্থ্য ভালো যায়নি। কিন্তু সে এতদসত্ত্বেও রামনাথকে পেরেশান করতে চায়নি। রামনাথ কখনো ওর রোগাটে চেহারার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চাইলে ও বলত, 'এ সামুদ্রিক লোনা আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। জাহাজ থেকে নামতেই আমার তবিয়ত ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু উপকূলে নামার পর রামনাথের উপলব্ধি, ওর তবিয়ত খারাপ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। রূপাবতি ওর পাশে বসে নানান কথা বলার এক ফাঁকে হাই তুলতে গিয়ে যমীনে লুটিয়ে পড়ল।

পেরেশান হয়ে রামনাথ বললো, 'কি রূপাবতি! কি হলো ?'

'কিছু না। এমনিতেই শুয়ে গেছি। রাতে জাহাজে আমার বিলকুল ঘুম আসেনি।'

রামনাথ ওর কপালে হাত রেখে বললো, তোমার প্রচন্ড জ্বর দেখছি।'

'না আমার জ্বর হয়নি। এটা তোমার ভ্রান্ত খেয়াল। আমার খানিক আরাম করা প্রয়োজন।'

'সালমান বলেছিলেন, এর আশে পাশে জেলের বসতি। ভোরের আলো ফুটে ওঠতেই আমরা ওদের কারো কাছে নীত হব। ওখানেই তুমি নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারবে।

'না না। খুব শীঘ্র এই এলাকা ছেড়ে যেতে হবে আমাদের।'

সকালে দু'ক্রোশ দূরে ওদের সম্মুখে বসত-ভিটার চিত্র ফুটে ওঠল। ওরা ওদিকেই চলল। বসতির আধাক্রোশ দূরে রূপাবতি যমীনে বসে পড়ল। বলল, 'আমাকে একটু দম নিতে দাও রামনাথ। আমি ক্লান্ত।'

রামনাথ ওর পাশে হাটু গেড়ে বসে পড়ল। গলার মোতির মালা খুলে রূপাবতি বললো, 'রামনাথ! এটি লুকাও। ওটি গলায় দিয়ে বসতিতে প্রবেশ করা ঠিক হবে না।' রামনাথ রূপার থেকে মালা নিয়ে ভেতর পকেটে ঢোকাল। খানিক দম নিয়ে ও পুনরায় রামনাথের সাথে চলতে লাগল। কিন্তু জনবসতি পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌছুতে ও বিলকুল অসুস্থ হয়ে পড়ল।

জেলেদের এই বসতি ছোট খাটো ৫০টি কুটিরে সীমিত। বসতির সর্দার রামনাথকে অভিজাত বংশের মনে করে তার ঘরে স্থান দিলেন। রূপাবতি ওই দিন

ও পরবর্তী দিন প্রচন্ড জ্বরে ভুগল। জেলেদের মৌখিক কথায় রামনাথ জানল, এখান থেকে ৮ ক্রোশ দূরে ছোট একটা শহরে হেকিম আছে। সুতরাং এখানে না থেকে পরদিন রূপাবতিকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার মনস্থ করল। সর্দার চার যুবককে ডেকে পাল্কিতেই রূপাকে রামনাথের সাথে রওয়ানা করাল।

দুপুরের দিকে ওরা ঐ গন্তব্যে উপনীত হলো। রামনাথ ওখানকার বিখ্যাত হেকিমের কাছে গেল। ওদের আরামের জন্য হেকিম একটি রুম খালী করে দিলেন। রামনাথের কাছে যে ক'টা স্বর্ণ মুদ্রা ছিল তা হেকিমের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু তিন দিন চিকিৎসার পর ওর উপলব্ধি, রূপাবতির অবস্থা পুরোদস্তুর খারাপের দিকে যাচ্ছে। আরো ভালো চিকিৎসার জন্য স্থানীয় সর্দারের কাছে গেলে তিনি জানালেন, আজকালের মধ্যে আনহলওয়ারার শাহী হেকিম মুন্নিগড়ে আসবেন। ওখানে পৌঁছুতে পারলে রোগিণীর জীবন বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু তার থেকে চিকিৎসা করানো সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তিনি কেবল স্বর্ণের চমক দেখেই কথা বলেন।

এই প্রথম আনহলওয়ারা মহারাজাকে আপনার স্বার্থে ব্যবহার করার চিন্তা করল রামনাথ। সে সর্দারের সামনে রাজার সাথে প্রাথমিক মোলাকাতের কাহিনী পেশ করল। সর্দার একথা শুনে খুবই প্রভাবিত হলেন। রূপাবতিকে মুন্নিগড় প্রেরণের জন্য তার অতি উত্তম রথ ও টাট্টু দিলেন। পরদিন রামনাথ ও রূপাবতি রথে চড়ে মুন্নিগড়ের উদ্দেশে ঐ শহর ত্যাগ করে।

॥ দুই ॥

আনহলওয়ারার শাহী হেকিম মনুরাজের পৈতৃক বাড়ী মুন্নিগড়। দু'/তিন মাস অন্তর তিনি মুন্নিগড়ে আসতেন। এখানকার আমীর-উমরা শ্রেণীর লোকেরাই তার চিকিৎসা নিতে সমর্থ হত। দৌলতের কোন কমতি ছিল না তাঁর কাছে। মহারাজা তাকে বিরাট এক জায়গীরের ব্যবস্থা করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন খুবই লোভী। জনগণের মধ্যে তার সম্পর্কে প্রচারিত আছে যে, তিনি রোগীর চেহারা দেখেই ধনাঢ্য কিংবা দরিদ্রতার লক্ষণ বুঝতে পারেন। মুন্নিগড়ের ঠাকুর রঘুনাথ যিনি মহারাজার চাচা এই হেকিমের পৃষ্ঠপোষক। এই মনুরাজ কোন অসুখ ছাড়াই মাঝে মধ্যে তাকে ঔষধ সেবন করাতেন।

কোন এক সকালে মনুরাজ বিছানা ছেড়ে পূজা-পাটের তৈরী নিচ্ছিলেন, এমন সময় তার নওকর এসে বললো, 'এক নওজোয়ান আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

'কে সে?'

'জানিনা মহারাজ! অপরিচিত সে।'

'তুমি জানো না, এ সময় আমি কারো সাথে কথা বলিনা ?'

'মহারাজ আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু সে জিদ্দি প্রকৃতির। আপনার সাথে দেখা করেই তবে যাবে। কাক-পক্ষি ডাকার পূর্বেই সে দরোজার কড়া নাড়তে শুরু করে। আমি তাকে এও বলেছি যে, আমাদের মহারাজ সাধারণ লোকের সাথে কথা বলেন না, কিন্তু সে বলল, মহারাজের চাহিদানুযায়ী আমি পারিশ্রমিক দেব।'

'আচ্ছা ডাকো তাকে।'

নওকর বেরিয়ে গেল। খানিক বাদে এক নওজোয়ানসহ প্রবেশ করল। নওজোয়ানটি রামনাথ। মনুরাজ নওজোয়ানের চেহারায় আভিজাত্যের স্থলে ক্লান্তি, পেরেশানী ও দারিদ্র্যের ছাপ দেখতে পান। রামনাথের কাপড়-চোপড়ও ময়লাযুক্ত। শাহী হেকিমের দেহে রাগে আগুন লাগলো। রামনাথের দিকে না তাকিয়ে নওকরের ওপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফেলে বললেন, 'তুমি .... একটা আস্ত গাধা। আমি তোমাকে কি বলেছিলাম ?'

'মহারাজ! আমি বহুদূর থেকে আপনার নাম শুনে এসেছি। চটজলদি আমার সাথে চলুন।'

মনুরাজ গোস্বায় কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'যে নির্বোধ তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে সে আমার চাকর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।'

পকেটে হাত দিয়ে রামনাথ মূল্যবান মোতির মালা বের করল। মনুরাজের কাছে পেশ করে বললো, 'আপনার কথার আগাগোড়া আমার বোধগম্য নয়। যদি আপনি আমাকে ভিখারী মনে করে থাকেন তাহলে এটি আপনার কাছে রাখতে পারেন।'

মনুরাজ স্তম্ভিত হয়ে মালার দিকে তাকিয়ে থাকেন। অতঃপর ওটি আবার নেড়ে চেড়ে দেখে বলেন, 'এ মালা তুমি পেলে কৈ ?'

'এটা চোরাই মাল নয় মহারাজ।'

মনুরাজ নওকরকে হাতের ইশারায় বের করে দিলেন। অতঃপর মালাখানি হাতের তালুতে রেখে বললেন, 'রোগি কোথায় ?'

'মহারাজ! ধর্মশালায়।'

'ধর্মশালায়!'

'জী হ্যাঁ! আমরা গভীর রাতে পৌঁছেছি। এজন্যে ওখানে উঠেছি।'

'তোমার সরাসরি এখানে আসার দরকার ছিল।'

'মহারাজ! লোকেরা বলেছিল, ভোরের আলো ফোটার পূর্বে আপনি কারো সাথে দেখা করেন না।'

'এই প্রথম হয়ত কাউকে দেখতে আমি ধর্মশালায় যাচ্ছি। তুমি শীঘ্র ফিরে যাও। দরোজায় আমার অপেক্ষা করো, এই তো আমি এলাম বলে।'

'মহারাজ! জলদি করবেন। রোগিণীর অবস্থা আশংকাজনক' বলে রামনাথ বেরিয়ে গেল।

'মনুরাজ মালাটি আবারো নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলেন।'

মনুরাজের স্ত্রী দরোজা ঠেলে প্রবেশপূর্বক বললেন, 'আপনি কার সাথে কথা বলছিলেন ?

মনুরাজ তার দিকে ঘুরে মালাটি তার চোখের সামনে মেলে ধরে বললেন, 'এটি দেখ।'

স্ত্রীর চোখ খুশীতে ঝিলিক মেরে ওঠল। সহসাই সামনে এসে চিলের মত মালাটি স্বামীর হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন।

মনুরাজ বললেন, এটি নকল না হলে একমাত্র মহারাজাই পারবেন এর যথার্থ মূল্য দিয়ে খরীদ করতে।'

'আপনি কোত্থেকে সংগ্রহ করলেন ?'

'সাধারণ এক লোকে দিয়ে গেল। তার লোকের চিকিৎসার জন্য এটি দিয়ে গেল।'

'হতে পারে কোন রাজা আপনার কাছে বেশভূষা বদল করে এসেছিল।'

'আনহলওয়ারার বহু বড় হীরে ব্যবসায়ী ঠাকুর রঘুনাথের দুলহানের অলংকারাদি গড়ে নিয়ে এসেছেন। মালাটি দেখে তিনি এর মূল্য নির্ধারণ করতে পারবেন।'

'তাহলে তো জলদি তার কাছে যাবার দরকার।'

'আগে রোগি দেখে আসি। তারপর না হয় তার কাছে গেলাম।'

কিন্তু স্ত্রী এ ধরনের মোয়ামালায় দেরী করার পক্ষপাতি নন। মনুরাজ রোগি দেখতে বেরুতেই তিনি নওকরকে ডেকে ঠাকুর রঘুনাথের বাড়ীতে আসা হীরা ব্যবসায়ীকে ডেকে পাঠালেন। কিছুক্ষণের মধ্যে হীরা ব্যবসায়ী এসে গেলো। মনুরাজ-বৌ এদিক ওদিক তাকিয়ে মালাটি তার সামনে মেলে ধরলেন। তিনি পেরেশান হয়ে বললেন, এ মালা আপনাদের হাতে এলো কি করে ?'

'কেন কি হয়েছে ?' মনুরাজ-বৌ পেরেশান হয়ে বলেন।

'আপনার হয়ত জানা নেই। এ মালা মহারাজার।'

'মহারাজার ?'

'তবে কি বলছি। আমিই তাকে এটি গড়ে দিয়েছিলাম। এর মধ্যে এমন দু'খণ্ড হীরে আছে যা দশ বছর সযত্নে আমার কাছে রেখেছিলাম। মহারাজা হেকিমের

প্রতি নেহাৎ মেহেরবান মনে হচ্ছে। কিন্তু তিনি তো কখনও এই অপূর্ব পুরস্কারের কথা আমাকে জানাননি।'

'এ মালা রাজামশাই তাকে দেননি বরং দিয়েছে সাধারণ এক ভীনদেশী।'

'কে এই লোক ?'

'এই মাত্র সে তার অসুস্থ লোক দেখাতে এসেছিল।'

'আপনার কি মন হয় সে লোকটা চোর নয়।'

'আমি তাকে দেখিনি।'

'লক্ষ্য রাখবেন, হেকিমের না আবার বদনাম হয়ে যায়।'

'খুব সম্ভব আমাদের নওকর জানতে পারে তার পরিচয়। একটু অপেক্ষা করুন! আমি তাকে ডেকে দিচ্ছি' বলে নওকর আনতে ছুটলেন।

নওকর ভেতরে প্রবেশ করল। হীরা ব্যবসায়ী তাকে প্রশ্ন করল, তুমি কি জান হেকিমজি কার চিকিৎসায় ধর্মশালায় গেছেন ?'

'জী তিনি ধর্মশালার উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। যিনি এসেছিলেন তাকে ধর্মশালার কথাই বলেছিলেন।

হীরা ব্যবসায়ী মনুরাজ-বৌকে বললেন, 'হেকিমজি আমার প্রতি খুবই সদয় ছিলেন। কিন্তু আমি মহারাজার বহু নেমক খেয়েছি। এ ধরনের ব্যাপার গোপন করা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তাঁর এই বদনামি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো চোরটাকে পলায়নের মওকা না দেয়া। আপনি কিছু মনে না করলে স্বয়ং আমি ঠাকুরজির কাছে যাব। কল্যাণ কেবল এতেই। যে লোক এই মালা চুরি করেছে সে যেনতেন চোর নয়। আপনি যথাশীঘ্র নওকরকে ধর্মশালায় পাঠায়ে দিন, যাতে ঠাকুরজির সেপাই না আসা পর্যন্ত সে ব্যাটাকে চোখে চোখে রাখতে পারে।'

মনুরাজ-বৌ অনুনয় বিনয় করে বলেন, 'আপনি জানেন আমরা বে-কসুর। এক্ষণে বদনামি থেকে বাঁচানো আপনার দায়িত্ব।'

'আপনি চিন্তা করবেন না। আমার যদ্দুর ধারণা, ব্যাটাকে পাকড়াও করতে পারলে মহারাজা তাকে পুরস্কারে পুরস্কারে দু'হাত ভরে দিবেন।

॥ তিন ॥

রূপাবতির নাড়ী টিপে মনুরাজ রামনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনি বুঝি তোমার স্ত্রী?'

রামনাথ বলেন, 'জী .....মানে ..... হ্যাঁ, আমার স্ত্রী।' রূপাবতি বিছানায় শুয়ে বড় চোখ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

রূপাবতির অসুখ সম্পর্কে কিছু কথা বলার পর রামনাথকে মনুরাজ বলেন, 'তুমি চিন্তা করো না। খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবে। আমি চাচ্ছি তার চিকিৎসা আমার বাড়ীতেই হোক। কিন্তু আজই তাকে কষ্ট দেয়া ঠিক হবে না। নওকরের মাধ্যমে এখন তার ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজকালের মধ্য তার অবস্থা উন্নতি হলে তাকে আমার ওখানে নিয়ে যাব। সন্ধ্যার দিকে একবার আসব। সময় পেলে দুপুরের দিকেও একবার আসতে পারি।

রামনাথ অনুনয় করে বললো, 'অবশ্যই আসবেন! এখন যে শুধু আমরা আপনার দয়ার ওপর নির্ভরশীল।'

'তুমি চিন্তা করো না। ওকে আমার মেয়ে ভেবেই চিকিৎসা করব।'

মনুরাজ আশ্রমের থেকে বেরিয়ে অল্প দূরে তার নওকরকে আসতে দেখলেন। নওকরের চেহারা বিমর্ষ দেখে মনুরাজের মাথা চক্কর দিল। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। নওকর কাছে এলো। বিমর্ষ ও পেরেশানীর কারণ জিজ্ঞাসা করলে নওকর হীরে ব্যবসায়ীর কাহিনী শুনিয়ে গেল।

মনুরাজের পায়ের তলার মাটি যেন সড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, 'আমরা আশ্রম-ফটকে সেপাইদের অপেক্ষা করব। স্ত্রীকে একাকী রেখে সে কিছুতেই পালাতে পারে না। তবে এও ঠিক যে সে চোর নয়। কিন্তু মালা যদি মহারাজারই হয় তাহলে আমরা কোন ব্যাপারেই জড়াতে যাব না।'

মনুরাজকে ধর্মশালার দরোজায় দাঁড়ানো দেখে সেখানে অনেক লোক জড়ো হলো। ব্যাপারটা তার জন্য খুবই পেরেশানমূলক। খানিক বাদে ঠাকুরজির সেপাইদের দেখা গেলে তিনি সস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সামনে অগ্রসর হলেন। অফিসারকে বলতে লাগলেন, 'দেখুন! প্রথমতঃ তাকে চোর মনে হচ্ছে না। চোর হলেও একথা শহরের সর্বত্র ছড়াক– তাও আমি চাই না যে, আমি এক চোরের স্ত্রীর চিকিৎসায় ধর্মশালা গিয়েছিলাম। ঠাকুরজিও আমার বদনামি পছন্দ করবেন না। তারচে' এই ভালো যে, আমি তাকে কোন বাহানায় মন্দিরের বাইরে নিয়ে আসব আর তখন আপনারা তাকে গ্রেফতার করবেন।

অফিসার একথার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করলে মনুরাজ ধর্মশালায় চলে যান। তিনি গিয়ে দেখেন রামনাথ রূপাবতির মাথা টিপে দিচ্ছে। তাকে দেখে রামনাথ হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে বললো, 'আপনি ফিরে এসেছেন মহারাজ।'

'হ্যাঁ! তুমি আমার সাথে চলো। ওষুধ সেবনের জন্য তোমাকে অনেক কিছু বোঝাতে হবে। রামনাথ পেরেশান হয়ে রূপাবতির দিকে তাকাল। রূপাবতি ক্ষীণকণ্ঠে বললো, 'আমার চিন্তা করো না। যাও রাম!'

মনুরাজের সাথে রামনাথ ধর্মশালার থেকে বেরিয়ে এলো। খোলা ময়দান পেরিয়ে ওরা যখন সরু গলিপথে এসে দাঁড়াল। ঠাকুরের সেপাইরা আচমকা ওকে ঘিরে নিল। রামনাথ চিৎকার ও এলোপাতাড়ি ধস্তাধস্তি করল। কিন্তু ১০/১৫ জন সেপাইয়ের সামনে অবশেষে ও আত্মসমর্পণ করল। মনুরাজ ততক্ষণে ৩০/৪০ কদম অগ্রসর হয়েছেন। রামনাথ চিৎকার দিচ্ছে। 'ভগবানের দিকে চেয়ে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মহারাজার দোস্ত। 'একথায় সেপাইরা হো হো করে হেসে ওঠল।

॥ চার ॥

রামনাথকে বন্দী করে ঠাকুর রঘুনাথের মহলে নিয়ে আসা হলো। মনুরাজ ও হীরা ব্যবসায়ী ঠাকুরের দু'পাশে কুরসিতে উপবিষ্ট। ফৌজি কিছু সেপাই ও অফিসার তাদের আশে পাশে।

ঠাকুরজি রামনাথকে মালা দেখিয়ে বললেন, 'এ মালা তুমি কোথায় পেয়েছ ?'

'মহারাজ! এ মালা আমাকে মহারাজা দিয়েছেন।'

'আমাদের মহারাজা ?'

'জী -হ্যাঁ!'

'কবে ?'

'মহারাজ! এই প্রশ্নের জবাব মহারাজার কাছে করলে আপনার সেপাইদের আমাকে গ্রেফতার করার প্রয়োজন পড়ত না। এ মালা উনি আমাকে সেদিন দিয়েছেন যেদিন তিনি বাঘ শিকারে বেরিয়েছিলেন। আমি ঐদিন তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর হাতিও দিয়েছিলেন।

রঘুনাথ সহসাই উঠে দাঁড়ালেন। ফৌজি অফিসার রামনাথের কাছে দাঁড়ানো ছিলেন। আগে বেড়ে তিনি গম্ভীর নযরে রামনাথের প্রতি তাকিয়ে বললেন, 'মহারাজ! ঐ শিকারে আমি মহারাজার সাথে ছিলাম। হ্যাঁ! এ সে-ই। আমি আগে ভাগে দেখলে সেপাইরা এমন ভুল করত না।'

রঘুনাথ পেরেশান হয়ে প্রথমে হীরা ব্যবসায়ী পরে মনুরাজের দিকে তাকালেন, সর্বশেষে উঠে মালাটি রামনাথের গলে পরিয়ে দিলেন। হীরা ব্যবসায়ী ও মনুরাজ ঠায় দাঁড়িয়ে।

রামনাথ গলার থেকে মালা খুলতে গিয়ে বললো, 'না মহারাজ! এ মালা আমি হেকিমকে দিয়ে সেরেছি। আর দেয়া জিনিস ফিরিয়ে নিতে নেই। আপনি আমার প্রতি কোন দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাতে চাইলে তাকে বলুন, রোগিণীকে যেন ভালো করে চিকিৎসা করেন।'

'রোগিনী কি তোমার স্ত্রী ?'

'জী...... জী হ্যাঁ। আমার স্ত্রী।'

'এক্ষণে তাইলে তুমি আর ধর্মাশ্রমে থাকতে পারছ না। আজ থেকে তোমরা আমার মেহমান। আমার লোক দিয়ে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আসবো। তিনি তার চিকিৎসা এখানেই চালাবেন। মালাটি তোমার কাছেই থাক। আমরা তাঁর পারিশ্রমিক আদায় করে দেব।

মনুরাজ তার মনের খুঁতখুঁতি ও গোস্তাকী দূর করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে ভাঙ্গা গলায় বললেন, 'মহারাজ! আমি তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। ভগবান সবজান্তা, স্ত্রী আরোগ্য লাভ করলে এটি তার কাছে ফেরৎ দেয়ারই ইচ্ছে ছিল আমার। আমার আরো ভয় ছিল, এত দামী জিনিস সে যেন খুইয়ে না বসে। শেঠজির ভুলের কারণে তাকে পেরেশান হতে হয়।'

হীরা ব্যবসায়ী কাঁচুমাচু হয়ে বললো, 'মহারাজ ! আমি জানতান না এই মালা খোদ মহারাজাই তাঁকে দিয়েছেন।'

মনুরাজকে মালা দিতে গিয়ে রামনাথ বললো, 'না মহারাজ! মালা এখন আপনার। আমি আমার স্ত্রীর জান বাঁচানোর জন্য দুনিয়ার গোটা সম্পদ ব্যয় করতেও রাজী।

'আমাকে আর লজ্জা দিও না বলে মনুরাজ জবরদস্তিমূলক রামনাথের গলে মালা পরিয়ে দেন।

ঠাকুর রঘুনাথের চার নওকর রামনাথের সাথে ধর্মশালায় গেল এবং রূপাবতিকে পাল্কীতে করে ঠাকুরবাড়ী নিয়ে এলো। রঘুনাথ প্রশস্ত একটি ফ্লাট রামনাথের জন্য খালী করে দিলেন। দীর্ঘ এক সপ্তাহ পর্যন্ত রূপাবতি জীবন মৃত্যুর মাঝে দোল খেল। শহরের অভিজাত মহিলাগণ নিছক ঠাকুরজির সন্তুষ্টির জন্য ওর সেবার উদ্দেশ্যে এলো। রামনাথ সাবধানবশতঃ রূপাবতির নাম পাল্টে 'সাবিত্রী' রাখল। এতদসত্ত্বেও অধিক সংখ্যকে নারীর আনাগোনায় ওর আশংকা– বিলক্ষণ কেউ না আবার ওকে চিনে ফেলে।

পরের সপ্তাহে রূপাবতির জ্বর ছাড়ল। কিন্তু ও এত দূর্বল হয়ে পড়ল যে, চেনাই মুশকিল ওকে। ঠাকুরজি জনা দুয়েক নওকর ওর সেবায় নিয়োগ করলেন। তৃতীয় সপ্তাহে নওকরের কাধে ভর করে রূপাবতি চলাফেরার যোগ্য হয়ে ওঠল। এ সময় রামনাথ ঠাকুরজির কাছে বারংবার দরখাস্ত করেছে যাতে তাদেরকে মহলের বাইরে কোথাও থাকতে দেয়া হয়। কিন্তু প্রতিবারই ঠাকুরজি ওকে এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছেন যে, তোমার স্ত্রী সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ঐ দরখাস্ত কবুল করতে পারছি না।

মহলের নওকরদের মারফত রামনাথ এ খবর জানতে পেরেছে যে, ঠাকুরজির বিবাহ আসন্ন। মহলে তাই হাজারো মেহমানের আনাগোনা। এজন্য এসব লোকের চোখ থেকে রূপাবতিকে আড়াল করতে বিবাহের পূর্বে মহল ছাড়াকে জরুরী মনে করে ও। কিন্তু দূরপাল্লার সফরের যোগ্য নয় যে এখনও রূপাবতি। শাহী হেকিম মনুরাজ রূপাবতির রোগ সেড়ে ওঠার ব্যাপারে আশার বাণী শোনালেও একথার জোড় তাগিদ দিয়ে যান যে, রূপাবতিকে দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন।

মুন্নীগড়স্থ মনুরাজেরই এক শাগরেদ প্রত্যহ রূপাকে দেখতে আসত। একদা রামনাথ ঠাকুরজির সকাশে হাজির হলে বললো, 'মহারাজ! আমার স্ত্রী বিলকুল সুস্থ। আপনার ঋণ আমি শোধ করতে পারব না কোনদিনও। শেষবারের মত আপনার কাছে অনুরোধ করছি আমাকে মহলের বাইরে কোথাও থাকতে দিন। অনুগ্রহ পূর্বক আপনি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করুন।'

'তুমি হয়ত জাননা, তোমার চেয়ে প্রিয় মেহমান আমার আর কেউ নেই। তারপরও তোমার মর্জির বিরুদ্ধে এখানে থাকতে চাপ দেব না। উপশহরে আমার একটা বাড়ী খালী পড়ে আছে। আমার বিয়েতে লোকজনে এ বাড়ি গিজ গিজ করবে এবং তা তোমাকে পেরেশান করবে ভাবলে ওখানে উঠতে পার। মহারাজাকেও তোমার সম্পর্কে বলেছি। আমার বিয়েতে এখানে এলে তিনি সর্বপ্রথম তোমার খোঁজ খবর নিবেন। তিনি আনহলওয়ারা থেকে কণ্ঠকোট চলে গেছেন। নয়ত এতদিনে তার দূত এসে পড়ত।' বললেন ঠাকুরজি।

পরদিন রামনাথ ও রূপাবতি মহল ছেড়ে রঘুনাথের একটি পুরাতন বাড়ীতে চলে গেল। রঘুনাথের নওকররাও ওদের খেদমতে এখানে হাজির। মহলের বয়োবৃদ্ধা এক চাকরানীর সাথে রূপার পরিচয় ছিল, সেও এলো ওদের সাথে। রামনাথদের বাড়ীর কাছে বিশাল একটা প্রাসাদ। এটি ঠাকুর রঘুনাথের হবু শ্বশুড়ের বাড়ী। সম্প্রতি এ জায়গীর পেয়েছেন তিনি।

॥ পাঁচ ॥

একদিন রূপাবতি তার বয়োবৃদ্ধা চাকরানীর সাথে কুঠির ছাদে দাঁড়িয়ে ঠাকুরজির বরযাত্রা অবলোকন করছিল। রাজা, ঠাকুর ও শাহী খান্দানের বেশ কিছু অভিজাত লোক হস্তিপৃষ্ঠে সওয়ার। ঠাকুরজি রাজা মহাশয়ের আগমনের পূর্বেই ব্যান্ড পার্টিকে তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে বিদায় করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও শানাই ও পিয়ানো বাজানোর জন্য বিশাল একদল লোক নিযুক্ত ছিল।

বরযাত্রীদল চলে গেলে ছাদে দাঁড়িয়ে অবলোকন করা রূপা ক্লান্তিতে নেমে এসে বিছানায় শুয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে বুড়ি চাকরানীও নীচে নামল।

রূপাবতিকে বললো, 'কাজটা কেমন করলে, কন্যা তো দেখলে না। আমি দেখেছি। ভগবানের দোহাই সাক্ষাৎ চাঁদের টুকরা। ঠাকুরজির বয়স ওর বাপের চেয়েও বেশী মনে হলো।'

খানিক পর রামনাথ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে প্রশ্ন করল, রূপা! তোমার তবিয়ত এক্ষণে কেমন ?'

'সুস্থ!' রূপা বললো, 'ছাদে দাঁড়িয়ে বরযাত্রী দেখেছিলাম। হঠাৎ কেন যেন মাথাটা চক্কর দিল।

'আমি এক সুখবর নিয়ে এসেছি। মহারাজ আমাকে দেখে বেজায় খুশী। বরযাত্রীদের আনাগোনা শেষে তার মহলে একটি অধিবেশন বসবে। তিনি এর আগে ভাগেই আমাকে দরবারে থাকতে নির্দেশ দেন। সুতরাং আমার আসতে দেরী হলে ঘাবড়ে যেওনা।'

'রামনাথ! আমার ভয় লাগছে। আমার মন বলছে, এখান থেকে দ্রুত কেটে পড়া দরকার। আমি এখন সফরের উপযুক্ত।'

'তুমি অত চিন্তা করোনা রূপা! এক্ষণে আমি রাজা ভীমদেবের অধীনে ও আশ্রয়ে। পুরোহিত এলেও ইজ্জত খোয়ানোর ভয়ে তোমার ব্যাপারে মুখ খুলবেন না।'

রূপাবতি ভয়ে হবুজবু হয়ে বললো, 'তাইলে তোমার মতলব আমরা এখানেই থাকছি।'

'না! আমার মতলব এটা নয়। আমি বলতে চাচ্ছি তোমার আরো কিছুদিন বিশ্রাম করা দরকার। তোমার অজানা নয় রাজকীয় সফর আমাদের জন্য খুবই নিরাপদ ও সুখের হবে।'

একথা বলে রামনাথ চলে গেল। রূপাবতি চিন্তার অথৈ সাগরে ডুবে গেল। নতুন বাড়ীতে ওঠার পর ওর উপলব্ধি, রামনাথের পারি-পার্শ্বিকতা বেপরোয়া হয়ে ওঠছে এবং ঠাকুরের দোস্তি ওর দিলমনে গেঁথে বসে যাচ্ছে। ও বুঝতে শুরু করেছে, দুনিয়াতে ও নিঃসঙ্গ নয়। শহরের লোকেরা ওকে রামনাথের বউ জ্ঞান করে। বিগত দিনের ঘটনাবলী রামনাথকে ধর্ম ও সমাজের প্রতি অনেকাংশেই বিদ্রোহী করে তুলেছে।

ও-ই তো সোমনাথের পুরোহিত থেকে ওকে বাঁচিয়েছে। ও-ই তো পূজারী ও দেবতাদের প্রতি টিপ্পনি কাটে। এত কিছুর পর কোন পণ্ডিতের কাছে গিয়ে প্রথাগত বিয়ে বন্ধন তাই ওর কাছে তামাশার শামিল।

কিন্তু সোমনাথ পুরোহিত ও ঠাকুর সমাজের প্রতি যারপরনাই ঘৃণা সত্ত্বেও রূপাবতির সামাজিক প্রথা ও পারিপার্শ্বিক নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি ছিল অগাধ ভক্তি

ও শ্রদ্ধা। ছিল দেবতার প্রতি নিখাদ বিশ্বাস। নারী-পুরুষের এমন মেলামেশার কল্পনা করতে ও তৈরী ছিলো না, যা ধর্ম ও সামাজিক প্রথা থেকে বিলকুল মুক্ত স্বাধীন। আপনার ধর্মের প্রতি আস্তে আস্তে তিক্ততা ও আত্মজিজ্ঞাসা হচ্ছিল ওর। যদিও এর মূলে দায়ী নারীমাংসলোভী সোমনাথ পুরোহিত ও কিছু কুলাংগার ঠাকুর। যুক্তির চেয়েও চোখের পানি দিয়ে ও রামনাথকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, স্বামী-স্ত্রী বন্ধন রচনা করতে সামাজিক প্রথার আশ্রয় নিতেই হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অনিরাপত্তা কাটিয়ে ওঠা দরকার। আর সেটা সম্ভব হবে কনৌজে রণবীরের বাড়ীতে উপনীত হতে পারলে। কনৌজস্থ রণবীরদের বাড়ী এমন এক কেল্লা যেখানে বাধাহীন মুক্ত জীবন যাপন সম্ভব। রূপাবতি রামনাথকে বলত, 'ওখানে গিয়ে আমি একথা বলতেও ভয় পাব না যে, আমি সোমনাথ মন্দির থেকে পালিয়ে এসেছি।

সোমনাথের কোন পূজারীও মুসলমানদের ভয়তে ওখানে আমাদের পিছু নিতে সাহস পাবে না। রণবীরও উৎসাহের সাথে তার মহলের পাশে আমাদের জন্য একটা ঝুপড়ি বানানোর অনুমতি দিবে। অতঃপর তুমি যখন ক্ষেতে লাঙ্গল ঠেলে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন আমি তোমার খানা নিয়ে এসে থাকব, তুমি গাইতে থাকবে আর শুনতে থাকব আমি।'

এর পাশাপাশি রামনাথও কখনও কখনও ভবিষ্যৎ ভাবনায় জড়িয়ে পড়ত। কিন্তু অধিকাংশ সময় আত্মসচেতনতা ও আত্মতৃপ্তিতে ভুগে বলত, 'না রূপা! তুমি সাধারণ এক রাখাল কিংবা কৃষকের বউ হবার জন্য পয়দা হওনি। রণবীরের মহলের পাশে তোমার ঝুপড়ি নয়, বানিয়ে দেব এক প্রাসাদোপম মহল। আমি এক সেপাই। আমার তলোয়ার রাজা-মহারাজাদের কাছে থেকে ট্যাক্স আদায় করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মাঝে সেপাইত্ব থাকছে ততক্ষণ প্রসিদ্ধি ও সফলতার রাস্তা উন্মুক্তই থাকছে।

আনহলওয়ারা মহারাজা তার মালা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। তোমাকে নিয়ে এখানে নির্বিঘ্নে থাকতে পারব এই পরিবেশ সৃষ্টি হলে দেখতে আমি রাজার কাছে যেতাম আর অভিজাত ঘরণীরা তোমার প্রণাম করতে আছড়ে পড়ছে।'

রামনাথের মুখে এ ধরনের কথা শুনে রূপাবতির হৃদয় বসে যেত ও কথোপকথনের ভাষা ও বিষয়বস্তু পাল্টে ফেলত। ওর ইচ্ছা যত দ্রুত পারা যায় কনৌজ পৌঁছা। জ্বর সেড়ে যাবার পর ও প্রায়ই বলত, এক্ষণে আমি বিলকুল সুস্থ। এক্ষণে আমি সফরের যোগ্য। ভগবানের দিকে চেয়ে চটজলদি এখান থেকে কেটে পড়। আমার কেমন ভয় লাগছে। কিন্তু হেকিমের কথামত ওর দীর্ঘ বিশ্রামের প্রতি লক্ষ্য করে রামনাথ সফরের ঝক্কি-ঝামেলায় জড়াতে রাজী ছিল না।

॥ ছয় ॥

গভীর রাত।

রামনাথ ফিরছে না।

রূপাবতি অন্তহীন পেরেশানী নিয়ে ওর পথচেয়ে।

বৃদ্ধা চাকরানী ওর সাথে অনেকক্ষণ কথা বলে অবশেষে তার কামরায় চলে গেছে। এত দেরী করে রামনাথ কোনদিন ফেরেনি। রাত যত বাড়ছিল রূপাবতির অভিমান তত ভীতিতে পর্যবসিত হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত উঠানে রামনাথের আওয়াজ শোনা গেল। রূপার অন্তরের ভীতি দূর হলো। মনে উছলে উঠল আনন্দের ফোয়ারা। দরোজা ফাঁক করে ও বাইরে তাকাতে থাকে। রামনাথ চৌকিদারের সাথে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। আচমকা রূপাবতিকে দরোজায় দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে ও বললো, 'কি আশ্চর্য তুমি এখনও ঘুমাও নি ?'

অভিমান ঠাসা হৃদয় নিয়ে পিছু হটে খাটে বসে রূপা বললো, 'তুমি ছাড়া ঘুমাব– এ খেয়াল হোল কি করে তোমার ?'

রামনাথ এই অভিযোগ ও অভিমানের জবাব না দিয়ে সোনার খাপ থেকে তলোয়ার বের করে বললো, 'দেখ রূপা, মহারাজা এটা দিয়েছেন আমাকে।

তলোয়ারের খাপ স্বর্ণ ও হীরের প্রলেপযুক্ত। রূপাবতি বললো, 'ভগবানকে ধন্যবাদ, এ ধরনের খুবছুরত জিনিস তোমাকে বাড়ীর পথ ভুলায়নি ?'

আগে বেড়ে দরোজা বন্ধ করে চেয়ারে বসে রামনাথ বললো, 'আফসোস তোমাকে অন্তহীন পেরেশানীর মুখোমুখি হতে হয়েছে। মহারাজা তার সাথে নৈশ ভোজন করতে বললেন। এরপর দীর্ঘক্ষণ তিনি আমার কথা শোনলেন। আমার মর্জির বিরুদ্ধে-ই আমাকে তার পার্শ্বে বসিয়ে রাখলেন। তোমার জন্য একটি সুসংবাদ নিয়ে এসেছি।'

রূপাবতি বললো, 'আমার জন্য সবচেয়ে উত্তম খবর এটাই যে, 'আমরা আগামীকাল এখান থেকে রওয়ানা করছি।'

'না। রূপা!' এখন আমাদের দ্বারে দ্বারে আর ঘোরাফেরা লাগবে না। আজ থেকে আমি সর্দার সোমনাথ। রাজা মশাই জনাকীর্ণ অধিবেশনে ঘোষণা করেছেন, রামনাথ আজ থেকে আমার দোস্ত। আর আমার দুশমন তোমার দুশমনে পর্যবসিত হল। মহারাজা আমাকে পুরো আটটা গ্রামের ভূ-সম্পত্তির মালিক বানিয়েছেন।'

'না না।' রূপাবতি অনুনয় করে বললো, 'ভগবানের দিকে চেয়ে এখানে থাকার চিন্তা মন থেকে মুছে ফেল।'

'রূপাবতি! তোমাকে পেরেশান হতে হবে না। আমার এখানে কোন অসুবিধা হলে আনহলওয়ারা সাম্রাজ্যকে টক্কর দেব। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কনৌজ

অপেক্ষা আমরা এখানে কম নিরাপত্তায় আছি কি! এটা আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া কিছু নয় যে, সোমনাথ পূজারীরা আমাদের পিছু নিবে। আজ সোমনাথের দু'ঠাকুর এসে ঠাকুরজিকে জানালেন যে, সোমনাথের নয়া দেবী পয়লা রাত্রীতেই মহাদেবের চরণে পৌঁছে গেছেন। পরদিন পুরোহিতজি দেবী-মুকুট অন্য এক যুবতীর মাথায় ধারণ করিয়েছেন। পুরোহিত শয়তানটা মরেনি, জ্যাতা এখনও। পূজারী বললেন, সিঁড়ির থেকে পা পিছলে পড়ার দরুন পুরোহিত মাথায় চোট লেগেছিল। মহারাজার সাথে কথা বলতে গিয়ে দ্রুতই তোমার অন্তর্ধানের ব্যাপারে তিনি বললেন, 'মহাদেব নয়া দেবীর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তাকে তাড়াতাড়ি চরণে ঠাঁই দিয়েছেন।'

'তোমার সারকথা হচ্ছে, এক্ষণে আমাদের কোন ভয় নেই। কিন্তু প্রকারান্তরে তলে তলে পূজারীরা যে আমারই সন্ধান করছে–সেটা ভাবছ না কেন ?'

'না রূপাবতি। পূজারীদ্বয় যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন তাও জানি আমি। ঠাকুরজি আমাকে বলেছিলেন, সোমনাথের প্রতি মুসলিম অভিযানের সম্ভাবনা দৈনিক বাড়ছে। তাই পুরোহিত মহারাজার সাথে পরামর্শ করার জন্য এদের পাঠিয়েছেন। কাজেই এ মুহূর্তে তোমার খোঁজের প্রশ্নই আসে না। আমার তো মনে হয় পূজারীরা তোমায় চিনে ফেললেও ভাবতে পারবে না যে, তুমিই রূপাবতি। এমনকি তুমিই যদি জনসম্মুখে এই ঘোষণা কর যে, আমি রূপাবতি– তাহলে তারা তোমাকে পাগলিনী বলবে। রূপাবতির যমীনে নয় এক্ষণে আকাশে থাকার বিশ্বাস সকলের।'

'মনে কর শহরে এমন কোন মেয়ে থাকে যে আমাকে মন্দিরে দেখেছে তাহলে ?'

'কিছু না। প্রথমতঃ এ ধরনের সমস্ত মেয়েদের বিশ্বাস, মন্দিরের রূপাবতি অন্য কোন জগতে চলে গেছে। তারপরও কারো সাথে দেখা হলে বলবে, আমি রূপাবতি নই সাবিত্রী। এর পরিণতিতে পুরোহিত ও পূজারীদের বর্ণনার মিথ্যা প্রতিপন্ন কল্লে তারা মানতে বাধ্য হবে যে, রূপা ও সাবিত্রী একই চেহারার দু'টি নাম মাত্র।'

'পুরোহিতের কানে যদি এ খবর যায় যে, এ শহরের রূপাবতির মত এক তরুণীর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাহলে জাগতিক কোন্ সে শক্তি যা আমাকে তার প্রতিশোধ থেকে বাঁচাতে পারে? রাজা ও ঠাকুরজি তার মামুলি ইশারায় জান কোরবান করতে প্রস্তুত। সর্বপরি আমার গলা থেকে কোন আওয়াজ বেরোবার পূর্বেই কণ্ঠনালী টিপে ধরবে। কেউ ঘুণাক্ষরেও জানবে না যে, পুরোহিত তার পাপ ঢেকে রাখার জন্য আমাকে মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত করেছে। রাজা ও ঠাকুরজি তোমার প্রতি রহমদিল কিন্তু আমাদের অস্তিত্বে পুরোহিতের অনীহা দেখে তারা এতটুকু ঘাঁটারও চিন্তা করবেন না যে, কি অপরাধ আমাদের ?'

'রূপাবতি! অমন কথা তুমি ভাবছ কেন। আমরা সোমনাথ থেকে শত মাইল দূরে। আমি আনহলওয়ারার সর্দার। রাজা ভীম দেব আমাকে সাফাই গাওয়ার পূর্বে

তোমাকে পুরোহিতের হাতে সোপর্দ করবেন না কিছুতেই। আর পুরোহিত বেকুফ হলে খামোকাই আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলবে।'

'মন্দিরে আমি কোন মৃত্যুর ভয় করিনি। কিন্তু তোমার জগতে আসার পর মৃত্যু আমার কাছে খুবই বিভীষিকাময় মনে হয়। এক্ষণে আমি মরতে চাই না। আমার দেবতা এক্ষণে তুমিই।' রূপাবতি হতাশাগ্রস্ত কণ্ঠে বলে।

চেয়ার টেনে রূপাবতির কাছে গিয়ে ওর হাত মুঠোয় পুরে রামনাথ বললো, 'তুমি বিনে আমার জীবন বৃথা। এখন যা কিছু করছি তার সবই তোমার জন্য। আমি তোমার এই ভুল ভাংতে চাই যে, আমি অত্র শহরে থাকতে চাচ্ছি। মহারাজা আমাকে আশে পাশেই জায়গীর দিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি এই বাহানা তুলেছি যে, আমার শিকারের শখ আছে। এজন্য পূর্বাঞ্চলের বনসমৃদ্ধ অঞ্চলে জায়গীর দিয়েছেন তিনি। এই জায়গীরের আশে পাশে খোলা ময়দান আছে যেখানে নিম্নজাতের লোকজন গরু চড়ায়। ওগুলো আবাদ করলেও তা আমার বলে গণ্য হবে। বছর কয়েক পূর্বে শিকারকালীন বিশ্রামের জন্য রাজা মশাই একটা রেস্ট হাউজ নির্মাণ করেছিলেন। সীমান্তবর্তী বসতিগুলো হেফাজতের জন্য ওখানে এখন এক ডিভিশন সৈন্য থাকছে। আমি ঐ এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছি। আমি পৌঁছুতেই ঐ বাড়িটি খালী করে দেয়া হবে। সিপাইদেরকে ক্যাম্পে পাঠাতে হবে। আমার যদ্দুর বিশ্বাস এই বাড়ী সোমনাথ পূজারীদের নাগপাশমুক্ত। নিশ্চিত স্বাধীন আমরা ওখানে বসবাস করতে পারব। আমি কোন ব্রাহ্মণকে ধরে এনে চুপে চাপে বিবাহটা আমাদের সেড়ে নেব। ওখানকার লোকজন বেশ ভয়াবহ। তারা ডাকাতি ও চুরি-ছ্যাচরামি করে। ওদের সাথে কঠোর ব্যবহারের স্থলে ভালো ব্যবহার করলে সকলে আমাকে পছন্দ করবে এবং আমাকে আপোষকামি ও নিরাপত্তাকর্মী ঠাওরাবে। তোমার শারীরিক দুর্বলতা কেটে গেলে সামান্য ক'দিনের ব্যবধানে ওখানে নিয়ে যাব। আর ক'সপ্তাহ তোমার এখানে থেকে যাওয়াকে আমি নিরাপত্তা ও ভীতিজনক মনে করছি না। অসুস্থতার কারণে তোমার চেহারার যা পরিস্থিতি তাতে কারো চেনার উপায় নেই যে, তুমিই রূপের হাটের রূপাবতি।'

'কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমার বুঝে আসছে না, তুমি কনৌজ যাত্রার এরাদা মুলতবি করছ কেন ? জানি, সাধারণ লোক হওয়ার চেয়ে একজন সর্দার হওয়াকে অধিক পছন্দ কর তুমি; কিন্তু রণবীর ও কনৌজের গভর্ণরের বন্ধুত্ব কি তোমার কোন কাজে এলো না? জীবন যাপনের জন্য ওখানে সামান্য জোত-জমি কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?'

'রূপাবতি! কনৌজের ভবিষ্যৎ আমায় ভাবিয়ে না তুললে মহারাজার সুবিশাল জায়গীরও আমি উপেক্ষা করে ওখানে যেতাম। কিন্তু কনৌজ ও আশেপাশের

গভর্ণররা এইভেবে পেরেশান যে, অচিরেই সুলতান মাহমুদ ও তার সেনাদল চলে যাবে। সে সময় মুসলিম জাতিকে সমর্থনকারী হিন্দুদেরকে কট্টর হিন্দুরা কচুকাটা করবে। ওই সময়টায় রণবীরদের জীবনই হুমকীর মুখে থাকবে। একা হলে আমি অবশ্যই রণবীরদের ওখানে থাকতাম। কিন্তু তোমাকে নিয়ে এমন শংকামুক্ত এলাকাতে থাকতে চাই আমি। তোমাকে সান্ত্বনা দিতে জানাচ্ছি কনৌজের খবরাখবর আমি অবশ্যই রাখব। ওখানে যখনই আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ জানব তখনই পৌঁছে যাব।'

'তোমার কথা মাথামুন্ডু কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। সোমনাথ মন্দিরের ওপর হামলার সম্ভাবনা সত্ত্বেও তুমি ওই এলাকার অনিরাপত্তার কি দেখছ তুমি ?'

'অনিরাপদ দেখলাম কৈ ? সম্ভাবনার কথাই না বললাম।'

'রাজার জায়গীরদার হয়েও কি তুমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার সঙ্গ দিবে না?'

'না! এই জায়গীর আমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শর্তে গ্রহণ করিনি; বরঞ্চ এটা মহারাজার জীবন বাঁচানোর সামান্য উপহার মাত্র। বাধ্য হলে কনৌজ কিংবা অন্য যে কোন সীমান্ত পাড়ি দিতে আমার এতটুকু কুণ্ঠা নেই। রাজার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে পারব না আমি। কিন্তু সে কথা এখন তুমি না হয় নাইবা ভাবলে। সময় এলে দেখবে সবই ঠিক হয়ে গেছে। সীমান্তবর্তী এলাকা কনৌজ থেকে কোন অংশেই কম নিরাপদ ও শংকামুক্ত নয়। আচ্ছা যাও এখন আরাম কর।'

রামনাথ ওপাশের কামরার উদ্দেশ্যে উঠে দরোজা পর্যন্ত গিয়ে কি একটা মনে আসায় ওর দিকে ঘুরে বললো, 'রূপাবতি! ঠাকুরজির দুলহানকে বড় বড় সর্দার-বৌরা নানান তোহফা পেশ করছে। সকলেই যখন জানে তুমি আমার স্ত্রী এবং ঠাকুরজির প্রতি আমরা ঋণী, এ জন্যে তার দুলহানকে তোমার দামী কিছু একটা উপহার দিতে হয়। আনহলওয়ারার হীরা ব্যবসায়ী এখনো এখানে। কথা বলে এসেছি তার সাথে। উনি ওয়াদা করেছেন সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আনহলওয়ারা থেকে এক জোড়া দামী কাঁকন আনিয়ে দিবেন। দাম আমাকে পরে শোধ করলেও চলবে। ঠাকুরজির মন রক্ষার্থে বলেছি আমার স্ত্রীর তবিয়ত ভালো নেই। সুস্থ বোধ করতেই বৌ-ঠাকরুনকে প্রণাম করতে আসবে।'

খানিক বাদে ওপাশের কামরায় শুয়ে নাক টানছিল, কিন্তু রূপাবতি কেবল পিঠ বদল করে পেরেশানী দূর করছিল। ও কল্পনা করছিল, শক্ত কোন বিপক্ষ শক্তি ওর রামনাথকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। ও বারবার উচ্চারণ করছিল, 'রামনাথ! তুমি আত্মপ্রবঞ্চিত হচ্ছো।'

॥ সাত ॥

পরদিন।

মহারাজা ভীমদেব রাজধানী অভিমুখে ছুটলেন। যাবার কালে তিনি ঠাকুরজিকে বলে যান, জায়গীর হস্তান্তরে রামনাথকে সম্ভব সব মদদ করতে। রূপাবতির দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, রামনাথ কনৌজ যাবে না। সুতরাং যে কোন মূল্যে যথাশীঘ্র ও সীমান্তের ঐ নতুন বাড়ীতে যাবার জন্য উঠে পড়ে লাগল। ও সকাল-সন্ধ্যা রামনাথকে বোঝাত, 'আমি এখন সফরের উপযুক্ত। কাজেই এখন যথাশীঘ্র আমাদের এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। প্রতিবারই রামনাথ ওকে এই বলে বিমুখ করত যে, তুমি এখনও কমযোর। পথিমধ্যে কোথাও অসুখে পেয়ে বসলে ভালো হেকিম তখন নাও পাওয়া যেতে পারে।'

ঠাকুর রঘুনাথের বিয়ের চারদিন পর রূপাবতির পীড়াপীড়ি আরো বেড়ে গেলে। রামনাথ খানিকটা বিরক্তি ভঙ্গিতেই বললো, 'আচ্ছা তাই হোক। আমি কালই জায়গীর দেখতে চলে যাচ্ছি। ৫/৬ দিনের মধ্যে থাকার ব্যবস্থাদি করে তবে ফিরব এবং তোমাকে নিয়ে যাব। এ সময়ে তোমার হালত আরো ভালো হবে।'

পরদিন ছ'জন সওয়ার ঠাকুর রঘুনাথ যাদের নিযুক্ত করেছিলেন মহলের বাইরে দাঁড়ান। ওদিকে উঠানে রামনাথ রূপাবতির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল, 'রামনাথ! দেরী করো না।' রূপার কণ্ঠে একরাশ মিনতি ঝড়ে পড়ে।'

রামনাথ ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'চিন্তা করো না। আমি খুব শীঘ্রই ফিরে আসছি। হীরা ব্যবসায়ী কাঁকন নিয়ে এলে চাকরানীসহ ঠাকুরবাড়ী যেও। তিনি ঠাকুর-বৌ'র জন্য এক জোড়া, আরেক জোড়া আনবেন তোমার জন্য।

'ঠাকুরজি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বলেছি, তোমার স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে যাচ্ছে। দিন দুয়েকের মধ্যেই তুমি বৌ-ঠাকরুনকে প্রণাম করে আসতে পার।'

'জলদী এসো রাম। আমার কেমন যেন ভয় করছে।'

'তুমি ঠাকুর বাড়ী যেতে ভয় পাচ্ছ। আমরা তো এখনও তার মেহমান।'

'না... আমার কোন শংকা নেই। চিন্তা ও শংকা কেবল তোমাকে নিয়ে। এক্ষণে তুমি সর্দার হয়েছ। ভয় হয় কেউ তোমাকে আবার না আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।'

'রূপাবতি! মৃত্যুই কেবল তোমাকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে।'

'অমন কথা বলো না।' রূপাবতি অশ্রু সজল নয়নে বললো, 'আমি পাগলিনী হয়ে যাব। যাও তোমার সঙ্গীরা বাইরে অপেক্ষমান।'

রামনাথ ফটকের দিকে এগুলো। রূপাবতির দু'চোখে অশ্রু প্লাবন। এক নযর ওর দিকে তাকিয়ে ফটকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় রামনাথ। খানিক পর দিক চক্রাবলে ভেসে আসে সপ্ত অশ্ব খুড়ের বিলীয়মান খুড়ধ্বনি।

পরিচিতি

দু'দিন পর।

চাকরানী সহ রঘুনাথ মহলে দাখেল হলো।

চাকরানী একটি রূপার ট্রে হাতে। রেশমী কাপড়ে ঢাকা। ঠাকুরজির এক চাকরানী যে ওদের পথ দেখাচ্ছিল একটি কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। ভেতরে গিয়ে খানিকবাদে এসে সে ইশারা করল। রূপাবতি চাকরানসহ ভেতরে গেল।

ঠাকুরজির স্ত্রী একটি উচু পালঙ্ক-এ উপবিষ্ট। মখমল ও সোনালী তারে চকচক করছে এর গদি ও ঝালর। রূপাবতি এক হাতে ট্রে নিয়ে তার পায়ের সামনে ঝুঁকল এবং অপর হাত তার পায়ে নামিয়ে দিল। বৌ-ঠাকরুন ওর বাযু ধরে ওঠাল। শ্রদ্ধা ও ভক্তি বিমিশ্রতভাবে হাটুগেড়ে ট্রে এগিয়ে দেয় রূপা। সে ঢাকনা উঁচিয়ে উপহার দেখে এক পাশে রেখে দেয়।

রূপাবতি উঠে দাঁড়ায়। বৌ-ঠাকরুন এই প্রথম গভীরভাবে ওর প্রতি তাকাল। আচমকাই তার কণ্ঠচিড়ে বেরিয়ে এলো, 'তুমি! তুমি এখানে?'

রূপাবতি চমকে মাথা উঠাল। বিস্ময় বিস্ফোরিত নয়নে ও বৌ-ঠাকুরুনের দিকে তাকায়। হায়-হায়! এ যে নির্মলা! ভয়ে দু'পা পেছনে এলো ও একটি চেয়ার টেনে বসে পড়ল। মাথা ঘুরতে লাগল। দু'চোখের সামনে নেমে এলো রাজ্যের অন্ধকার। নির্মলার খানিক আশপাশের পরিবেশের কথা মনে থাকল না। ও তাকিয়ে আছে সেই আন্তরিক বান্ধবীর দিকে, এই তো ক'দিন পূর্বে পূজারীরা যার মহাদেবের চরণে পৌছে যাবার খবর দিয়েছিল। আস্তে আস্তে রূপাবতির বিমর্ষ চেহারা ও পাথুরে চোখ ওই যুবতী থেকে ভিন্নতর দেখাচ্ছিল যার অস্তিত্বে জীবনের হাসি-আনন্দ পুষ্পিত সৌরভ খুঁজে পেয়েছিল নির্মলা।

রূপাবতির পাথুরে দৃষ্টির সামনে জগতের স্বাভাবিক ভাব ফুটে উঠল। এতদসত্ত্বেও ভীত সন্ত্রস্ত ওর তনুমন নির্মলার হতাশা দূর করতে যথেষ্ট ছিল। সম্বিত ফিরে পেতেই রূপাবতির আত্মরক্ষা কৌশল সজাগ হয়ে ওঠল। ও ভাঙ্গা গলায় বললো, 'মাফ করুন। আমি রোগা, মাথা চক্কর দিয়েছিল।'

নির্মলা বললো, 'এ অবস্থায় আপনার কষ্ট করা ঠিক হয়নি।'

'ভালো হয়েছি মনে করেই এসেছিলাম।'

'আপনাকে দেখার পর আমি কেমন যেন দোটানায়পড়ে গেছি। তা আপনার নাম।'

'জ্বী...... মানে....... সাবিত্রী আমার নাম।'

'আপনার কোন বোন সোমনাথ মন্দিরে ছিল কি ?'

'জী না।'

'সোমনাথ মন্দিরে জনৈক তরুণীকে দেখতে বিলকুল আপনার মত। আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে রূপাবতি রূপ বদলে এখানে এসেছে।'

রূপাবতি শুকনো গলায় বললো, একই চেহারার দু'যুবতীকে দেখে ঘাবড়ানোর কারণ কি ?'

'কারণ হলো, ঐ যুবতী মন্দিরের দেবী হয়ে মহাদেবের চরণে পৌঁছে গেছে। ওর কথা প্রায়ই মনে পড়ে।'

'আপনার সেই স্মৃতিচারণ এক্ষণে রূপ বদলে আমাকে আপনার কাছে বুঝি পাঠিয়েছে।'

'না। আমি তো প্রথম একেবারেই হতভম্ব।'

রূপাবতি মুচকি হাসির কোশেশ করে বললো, 'এখন আমাকে দেখার পর তো আর ভয় নেই?'

'না! কিন্তু আপনাকে ওয়াদা করতে হবে, সুস্থ হয়ে দেখা করতে আসবেন।'

'আসব না মানে। বলেন কি। অবশ্যই আসব।'

'নির্মলা ট্রে উঁচিয়ে কৌটা খুলে উপহারের প্রতি নযর বুলাল।'

'বোন! আপনি বড্ড কষ্ট করেছেন।' বলল নির্মলা।

'আমার বিশ্বাস এক গরীব বোনের নগণ্য এই তোহফা আপনাকে লজ্জায় ফেলবে না।

'নির্মলা কাঁকন কৌটাবন্দি করে বললো, 'আপনি বিশ্বাস রাখুন! একে আমি শ্রেষ্ঠ তোহ্ফা হিসাবে বরণ করলাম। অলংকার পরিধানের শখ নেই আমার। তবে আপনার এই জিনিষ আমি সর্বদা ব্যবহার করব।'

॥ দুই ॥

রূপাবতি চলে যাবার প্রস্তুতি নিতে গবাক্ষ পথে ঠাকুর রঘুনাথ ঢুকলেন। রূপাবতি তাকে দেখে হাতজোড় করে দাঁড়াল।

'আরে সাবিত্রী যে, তুমি কখন এলে ?' প্রশ্ন ঠাকুরজির।

'এইমাত্র মহারাজ।'

এক্ষণে তোমার স্বাস্থ্য তো ভালই মনে হচ্ছে।' বলে তিনি নির্মলার দিকে তাকালেন, 'ও আমাদের নয়া জায়গীরদারের ধর্মপত্নি। ওর পতি জীবনবাজি রেখে আমাদের মহারাজার জীবন রক্ষা করেছিল।'

রূপাবতির চেহারায় পেরেশানীর মাত্রা আরো প্রকট হয়ে দাঁড়াল। ও নির্মলার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এক্ষণে আমায় এজাযত দিন। আমার তবিয়ত ঠিক নেই।'

নির্মলা জবাব দেয়, বহুত আচ্ছা। যান আরাম করুন গিয়ে। কিন্তু দ্বিতীয়বার আগমনের কথা ভুলেন না যেন।'

রূপাবতি ঠাকুর ও ঠাকুরীকে প্রণাম করল এবং কামরা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। নির্মলার সামনে একটি চেয়ার পেতে বসলেন ঠাকুর। নির্মলা খানিক ভেবে বললো, 'আমি যখন সোমনাথে ছিলাম তখন ওখানে এক নওজোয়ান থাকত। জনৈক সেপাই বলেছিলেন, সে মহারাজাকে চিতাবাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছে।

'এ সেই জোয়ান। শুনেছি, সোমনাথে যাবার সময় রাজা মশাই তাকে নিজ হাতি দিয়েছিলেন। আর সে ওখানে আমাদের মহলেই থাকত।'

'কি নাম যেন তার?'

'রামনাথ।'

'আপনি ওই মেয়েটার নাম জানেন কি ?'

'হ্যাঁ! ওর নাম সাবিত্রী।'

'ওর বাড়ী কোথায় জানেন কি ?' প্রশ্ন নির্মলার।

রামনাথ আমাকে বলেছিল, সোমনাথে আসার পূর্বে স্ত্রীকে বাপের বাড়ী রেখে এসেছিল। সাবিত্রীর বাবা কালিঞ্জর সীমান্ত প্রদেশে বসবাস করতেন। গোয়ালিয়র বিজয় শেষে মুসলিম বাহিনী যখন কালিঞ্জরের ওপর চড়াও হয়েছিল তখন সাবিত্রীর বাবা ক'জন সৈন্য নিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধ করে মারা যান। সাবিত্রীর মা মরেছিল এর বহু পূর্বে। বাবার মৃত্যুর পর সে এক ওফাদার নওকরের সাথে রামনাথের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। ঘটনাচক্রে ওরা একটি তীর্থ কাফেলা পেয়ে বসে। ওরা সেটির সহযাত্রী হয়ে গেল। এদিকে রামনাথ কালিঞ্জরের হালত জানতে পেরে সাবিত্রীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। এও সম্ভব ছিল যে, রামনাথ গোটা দেশ চষে বেড়াত আর রূপাবতি ওকে সোমনাথে তালাশ করত। কিন্তু ভগবানের অশেষ কৃপায় সোমনাথ থেকে ৩০/৪০ ক্রোশ দূরে ওদের সাক্ষাৎ হয়। সোমনাথ না গিয়ে রামনাথ তখন আনহলওয়ারার পথ ধরল। কিন্তু পথিমধ্যে স্ত্রীকে রোগ-ব্যামোতে পেয়ে বসল। এখানে উপনীত হতে হতে সাবিত্রীর অবস্থা আশংকাজনক দেখা দিল। এজন্য ওকে আমার এখানে ওঠাই।'

রূপাবতিকে আত্মগোপন করাতে শহরের কিছু অভিজাত লোক ও অফিসারদের কাছে মনগড়া এই কাহিনী বলেছিল রামনাথ। কিন্তু ঠাকুরজির কাছে আরো কিছু প্রশ্ন এবং এর উত্তর প্রাপ্তির পর নির্মলার সন্দেহ আরো ঘণীভূত হলো। ওর দৃঢ় বিশ্বাস হলো, রামনাথই সেই জোয়ান যাকে ও সোমনাথে দেখেছিল। কিন্তু রূপাবতির কথা যতই ভাবত ততই পেরেশানী বাড়ত।

'ঠাকুর প্রশ্ন করলেন, 'কি ভাবছ তুমি ?'

'কিছু না। এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি হয়রান যে, সাবিত্রীর মত একটা মেয়ে আমি সোমনাথে দেখেছি।'

'কিন্তু এত ভাবাভাবির কি আছে। একই চেহারার হাজারো মানুষ দুনিয়াতে ঠাসা।'

'আমি তো ঐ মেয়েকে দেখে বিলকুল ভড়কে গিয়েছিলাম। আপনি পূজারীর মৌখিক ভাষণে ঐ মেয়েটির কথা শুনেছেন, সোমনাথ মন্দিরের দেবী হবার প্রথম রাত্রীতেই যে মহাদেবের চরণে পৌঁছে গিয়েছিল। সাবিত্রীকে দেখার পর আমার মন বলছে মন্দিরের দেবী এক নয়ারূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত। তবে সাবিত্রীর সাথে পরিচিত হবার পর দেখলাম, মন্দিরের সেই রূপাবতি ওর চেয়ে অনেক সুন্দরী ছিল। তারপর আরো দুঃখের বিষয় হলো আমার পক্ষ থেকে কোন উপহার দিতে পারলাম না। 'আমার জন্য সে খুবই দামী উপহার এনেছে।' বলে নির্মলা দ্রুত কৌটা খুলে কাঁকন বের করে দেখাল।

ঠাকুরজি কাঁকন দেখে বললেন, 'বাস্তবিকই এগুলো খুবই দামী। আমারও বড্ড অনুতাপ যে, সাবিত্রী আমাদের বাড়ী থেকে খালি হাতে ফেরৎ গেল।

'কিন্তু আমার এরাদা ওর কাছে যাব এবং কিছু একটা দিয়ে আসব।'

'বাহ! চমৎকার প্রস্তাব। আমাদের মহারাজ রামনাথের প্রতি খুবই রহমদিল। তাই ওর বৌয়ের প্রতি আমাদের সদয় থাকা চাই। ওদের বাড়ী তোমার পিতাজীর বাসার কাছেই। যখন মন চায় পাল্কী করে চলে যেও।'

'তাইলে কাল না হয় এক চক্কর দিয়ে এলাম। এর সাথে বাবাকেও এক নযর দেখে আসব।'

'বহুত আচ্ছা।' বলে ঠাকুরজি বেরিয়ে গেলেন।

শেষ বিকালে নির্মলার ঘুম ভাংলে চাকরানী বললো, 'ঠাকুরজি এসেছিলেন। আপনাকে নিদ্রালু দেখে তিনি ব্যঘাত ঘটাননি। ঠাকুরজির কাছে এই মর্মে খবর এসেছে যে, সোমনাথের পুরোহিত প্রধান আনহলওয়ারা মহারাজার সাথে দেখা করতে আসছেন। আগামীকাল রাতে তিনি এখানে যাত্রাবিরতি করবেন। এক্ষণে ১৫/২০ ক্রোশ দূরে আছেন। ঠাকুরজি তাকে সম্বর্ধনা জানাতে গেছেন। রাতে তিনি ওখানে থাকবেন। বোধকরি কাল দুপুর নাগাদ এসে পৌঁছুবেন।

॥ তিন ॥

পরদিন।

রূপাবতি কামরায় বসে চিন্তার জাল বুনছিল। হেনকালে চাকরানী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললো, 'ঠাকুরনি এসেছেন।'

রূপাবতির শিরায় খুন জমে গেল। ও হেলতে দুলতে কম্পিত আপাদমস্তকে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে ওঠল। ততক্ষণে নির্মলা ভেতর আঙ্গিনায় প্রবেশ করে সেড়েছে।

'আপনার তবিয়ত কেমন ?' প্রশ্ন নির্মলার।

'জী ভালো!' কম্পিত গলায় জবাব রূপাবতির, 'আসুন! বসুন।'

'আমি আপনাকে পেরেশান করব না।' নির্মলা পার্শ্ববর্তি কামরায় প্রবেশ করল।

'আপনাকে দেখে পেরেশান হব, এ খেয়াল হলো যে আপনার ? বসুন না।'

'নির্মলা রূপাবতির চাকরানীকে বললো, 'তুমি যাও। দরোজাটা বন্ধ কর। আমি তার সাথে নিরিবিলিতে আলাপ করতে চাই।'

চাকরানী বাইরে গিয়ে দরোজা বন্ধ করল। রূপাবতির আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হলো।

'নিরিবিলিতে কথা বলার জন্য পেছনের কামরাই উত্তম জায়গা ছিল।'

'চলুন।'

রূপা ও নির্মলা পেছনের কামরায় প্রবেশ করল। এই কামরা তুলনামূলক অন্ধকার। নির্মলা ও রূপা মুখোমুখি বসল। ওরা একে অপরের মুখ চাওয়া চাউয়ি করছে।

রূপার হৃদয়ে করছে অনবরত হাতুড়ি পেটা। শেষ পর্যন্ত নির্মলা গলার থেকে একটা হার খুলে ওর গলে পরিয়ে বললো, 'গতকাল এটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম– নিন।'

'না না! এটা আপনার গলায়ই বেশ লাগছে।'

'অমন মালা কি আমার কাছে দু'একটা ? আপনার হয়ত জানা নেই, অলংকারের সাথেই আমার বিয়ে হয়েছে।' বলে নির্মলা রূপাবতির গলে মালা পরিয়ে দিল।

আবারো ওদের মাঝে নেমে এলো রাজ্যের নিস্তব্ধতা। নির্মলা নিরবতা ভঙ্গ করে বললো, 'আপনি হয়ত জানেন না, আমি সোমনাথে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলাম। আজ শোনলাম আপনার পতি সেই মহলেই থাকতেন যেখানে থাকতাম আমি।'

রূপাবতি মনে করছে ওর দম যেন রুদ্ধ হতে চলেছে। নির্মলা খানিক থেমে আবারো বললো, 'আমার মনে হয় আপনার পতিকে দেখেছি। ওখানে তার দোস্ত ছিল। রণবীর নাম তার।'

রূপাবতি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, 'আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে চাই, কোনদিন আমি সোমনাথে যাইনি। কালিঞ্জরে ওর তালাশে এসেছিলাম। আমাদের কাফেলা সোমনাথ থেকে কিছু দূরে ছিল। এমতাবস্থায় ওকে পেয়ে বসি। অসুস্থ ছিলাম আমি। ও-ই আমাকে এখানে নিয়ে আসে।'

'আপনি ওখানে গেছেন কি-না সে কথা বলিনি তো আমি। কিন্তু আমার ধারণা আপনার পতি কখনও রণবীরের ব্যাপারটা আপনার সাথে আলাপ করেছে কি-না।'

'এখন পর্যন্ত ওই নামের কোন দোস্তের কথা আমার সাথে ও বলেনি। তবে ওয়াদা করছি, এলে জিজ্ঞাসা করে নেব।'

'না না। আপনি ওকে একথা জিজ্ঞেস করবেন না। বলবেন না, আমি তার কাছে রণবীরের ব্যাপারটা জানতে আগ্রহী।'

'আচ্ছা জিজ্ঞাসা করব না।'

'তা আপনার পতি কবে ফিরছেন ?'

'দিন সাতেকের ওয়াদা করে গেছে। আমার মন বলছে, ফিরবে আরো জলদি।'

নির্মলা উঠতে উঠতে বললো, 'আচ্ছা আজকের মত তাহলে উঠি'।

রূপাবতি হাত বেধে দাঁড়াল। ও মনে করল বিশাল বাঁধার পাহাড় বুঝি আরেকটা কেটে গেল। নির্মলা উঠতে গিয়ে আবারো কেন যেন থমকে গেল।

ঘুরে রূপাবতির প্রতি গভীর নযর ফেলাল। রূপাবতির মনে আবারও তোলপাড় শুরু হোল।

নির্মলা বললো, 'আজকের দিনটা আমাকে বাড়ী থাকতে হবে। নয়ত সন্ধ্যা নাগাদ আপনার সাথে কথা বলতাম। চলুন না আমার সাথে। একাকী করবেন কি? আমরা উভয়ে পাল্কীতে করে যাব। বাড়ীতে আজ সোমনাথের পুরোহিত প্রধান আসছেন। আপনার সুস্থতার জন্য তাকে প্রার্থনা করতে বলব।'

রূপাবতি জবাইকৃত মুরগীর মত ছটফট করতে করতে বললো, 'না না।' এতটুকু বলে বিছানায় ধপাস করে পড়ে মুর্ছা গেল।

রূপাবতি হুঁশ এলো। ও দেখল নির্মলা ওর পাশে মুখে পানি ছিটাচ্ছে। বৃদ্ধা চাকরানীর পাশে আরো চার মহিলা। দু'জন নিয়ে এসেছে নির্মলা আর দু'জন হাবেলীর চাকরদের বউ।

রূপাবতি নির্মলার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। নির্মলা এই খামোশ দৃষ্টির মাঝে এমন এক অসহায় নারীর ফরিয়াদ খুঁজে পেল, জল্লাদের তলোয়ার যার মাথায় লটকে আছে। ও মহিলাদের দিকে ইশারা করে বললো, 'কমযোরির কারণে তার মাথায় চক্কর খেয়েছে। সুতরাং এখানে কারো থাকার দরকার নেই।'

নির্মলার কথার সমর্থনে রূপাও হাত উঠালে মহিলারা একে একে চলে গেল। এবার ও উঠে বসে বললো, 'কি ইচ্ছে এক্ষণে আপনার ?'

নির্মলার অবশিষ্ট সন্দেহটুকু এবার দূরীভূত হল। সে বললো, 'রূপাবতি! আমার থেকে ক্ষতির আশংকায় তোমার এতটা ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া ঠিক হয়নি।'

রূপাবতি আবারো নির্মলার দিকে গভীর নযরে তাকাল। মুহূর্তে নির্মলার পায়ে আছড়ে পড়ে বললো, 'নির্মলা! আমি আমার জন্য নয় রামনাথের জন্য তোমার কাছে কৃপা ভিক্ষা করছি। আমার কোন পাপ থাকলে সে শাস্তিতো রামনাথের পাবার কথা নয়। ভগবানের দিকে তাকিয়ে পুরোহিতের কাছে হাওয়ালা না করে নিজ হাতেই তুমি আমার গলা টিপে দাও। আর আমিই বা কি এমন পাপ করেছি। এক নারীর ইজ্জত রক্ষাকে তুমি পাপ বলবে কি ?'

ফুঁপিয়ে কাঁদছিল রূপাবতি। নির্মলা ওকে বাযু ধরে ওঠাল, বললো, 'বোন আমার! তোমার জন্য আমি জান কোরবান করতে প্রস্তুত। কিন্তু এর আগে ঠিক করে বলতো, প্রকৃত ঘটনাটা কি ?'

'ওকথা জিজ্ঞাসা করো না নির্মলা। ভগবানের দোহাই! ওকথা বলতে বলো না।' আমার কথায় তুমি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না। সত্যের বাস্তবোচিত হৃদয়গ্রাহী পর্দা এতই ভয়াবহ যে, তা প্রকাশ করলে তুমি আমার টুটি চিপে ধরবে। যা কিছু আমার দু'নয়ন দেখেছে তোমার কান তা বরদাশ্‌ত করতে পারবে না। তুমি আমাকে উন্মাদিনী বলবে। হয়ে যাবে আমার ঘোর শত্রু।'

'ভগবানের দোহাই। কোন কথা তুমি গোপন করতে যেও না। আমি তোমার মদদ করব। গোটা দুনিয়ায় তোমাকে মিথ্যাবাদী বললেও আমি তোমাকে সততার সার্টিফিকেট দেব।'

নির্মলার প্রতি তাকিয়ে অশ্রুসজল নয়নে রূপাবতি ওর কাহিনী বলে গেল। রূপাবতির কাহিনী শেষ লাইন শোনার পর নির্মলা ওকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘর থেকে বের হলে ওর চিন্তাজগতে কেমন যেন পরিবর্তন এলো। সোমনাথ সম্পর্কে ওর যে প্রগাঢ় ভালবাসা ভক্তি-শ্রদ্ধার অদম্য স্পৃহা যাকে জিন্দেগীর আখেরী সাহারা বানিয়েছিল, সেটা এক্ষণে ঘৃণা ও ধিক্কারে পরিণত হলো। বুড়ো ঠাকুরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর ও জীবনের সুখ আহলাদকে বিসর্জন দিয়েছিল। নিছক দেবতার সন্তুষ্টির উদ্দেশে বাবার এই একপেশে সিদ্ধান্ত মেনে জীবন-যৌবনকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল। শুষ্ক জীবনের মরু বিয়াবনে পূজারীদের ও পুরোহিতগণের পদসেবা করার সেকি আগ্রহ ছিল ওর। ঠাকুরের কাছ থেকে অর্জিত অর্থের সবটাই দীন-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দেবতাদের দৃষ্টিতে ভালো হতে চেয়েছিল ও। কিন্তু রূপাবতির কাহিনী শুনে ওর স্বপ্নের সে জগত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে

যায়। ওর বর্তমান ও ভবিষ্যত এমন এক দোদুল্যমান কালোমঞ্চে উত্থাপিত যেখান থেকে সোনালী অতীতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। ওর অবস্থা বিলকুল ওই মোসাফিরের মত যে তার যাবতীয় পাথেয় হারানোর পাশাপাশি পথও হারিয়ে ফেলেছে।

মহলের বাইরে হাজারো লোক সোমনাথ পুরোহিতের অপেক্ষায় পথ চেয়ে। নির্মলার পাল্কী দেখে তারা এদিক ওদিক সড়ে দাঁড়াল। মহলের ফটকে এসে পাল্কী দাঁড়াল। নারীরা ওকে ঘিরে নিল। পুরোহিতজি কখন আসছেন– 'জিজ্ঞাসা সকলের এটাই। কিন্তু তাদের কারো কথার জবাব না দিয়ে রফরফ পায়ে চলে গেল ও। দ্বিতলে এসে একাকীত্ব ও অসহায়ত্বের জ্বালায় ভুগছিল। চোখে দেখা দিল অশ্রু প্লাবন।

মনে মনে ও বলছিল, 'রণবীর! তোমার বোনের জন্য তুমি দুনিয়ার তামাম খুশী বিসর্জন দিতে পার। এক দোস্তের জন্য জীবন বিপন্ন করতে পার। তোমার পিতার হত্যাকারী জ্ঞানে আমার বাবাকে ঠিক তখনই মাফ করেছিলে যখন তোমার তলোয়ার তাঁর গর্দানে ছিল। কামিনী ও রূপাবতিকে বাঁচানোর জন্য আপনার জান বাজি রাখতে পার; কিন্তু তোমার দৃষ্টি আমার হৃদয়ের গভীরতা খুঁজে পায়নি। আমার আকুতি ও আঁসু তোমার মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারেনি। তুমি হয়ত জানো না, তোমার স্মৃতিচারণই আমার জীবনের শেষ সম্বল। হায়! তুমি যদি আমার তপ্ত আঁসু দেখতে। শুনতে আমার হাহাকারে ডুকরে কেঁদে ওঠা হৃদয় গহীনের আহ্ধ্বনি; তাহলে, তুমি স্বতঃই অনুধাবন করতে যে, রূপাবতির চেয়েও আমি অসহায় ও নিঃস্ব।'

জনৈকা চাকরানী কামরায় দাখেল হয়ে খানার কথা জিজ্ঞেস করল। কিন্তু নির্মলার সাফ জবাব, 'খিদে নেই।' কিছুক্ষণ পরে আরেক চাকরানী এসে বললো, 'শহরের অভিজাত মহিলাগণ আপনার সাথে দেখা করতে চান, কিন্তু নির্মলা তাদেরকে এই বলে বিদায় দিতে বললো যে, বলো আজ কারো সাথে দেখা করার মত মানসিকতা নেই আমার।' চাকরানী বললো, আপনি হুকুম দিলে হেকিমকে ডেকে পাঠাই।'

নির্মলা রাগান্বিত হয়ে বললো, 'না না' হেকিমকে ডাকা লাগবে না। তুমি গিয়ে সকল চাকর-চাকরানীকে বলে দাও, আমি তলব না করা পর্যন্ত কেউ যেন আমাকে জ্বালাতন না করে।'

॥ চার ॥

সূর্যাস্তের মুহূর্তে মহলের বাইরে 'সোমনাথ কি জয়' 'জয় পুরোহিতজি কি'-এর শ্লোগান শোনা গেল। খিড়কি খুলে বাইরে উঁকি মারল নির্মলা। মহলের চার দেয়ালের বাইরে প্রশস্ত ময়দানের মাঝে মানুষের ভীড়ের সামান্য দূরে ৫০/৬০ জন সওয়ারের টুলি দেখা গেল। সর্বাগ্রের সোনালী হাওদার হাতিটায় সূর্যের শেষ রশ্মি পড়ে চমকাচ্ছে।

মহলের ফটকের সামান্য দূরে সওয়ারদের একটা দল সড়ে গেল এবং মানুষেরা পঙ্গপালের মত সর্বাগ্রের হাতিটার দিকে অগ্রসর হলো। ঐ হাতিটা মোতি ও হীরায় পরিপূর্ণ। গলায় লোহার বড় শেকল। যার সাথে ঘন্টা বাঁধা। সোনালী হাওদার দু'পাশে মোতির ঝালর লটকানো। হাওদায় উপবিষ্ট সোমনাথের পুরোহিত প্রধান। অন্যান্য হাতিগুলোয় সোমনাথের পূজারীবৃন্দ। তাদের পেছনে আরেকদল রক্ষীবাহিনী।

খানিক পর।

পুরোহিত প্রধান ঠাকুরজির সাথে আঙ্গিনায় প্রবেশ করলেন। পেছনে কিছু পূজারী ও শহরের গণ্যমান্য অভিজাত ব্যক্তিবর্গ। আঙ্গিনায় সমবেত নারীরা অগ্রসর হয়ে তার পা ছুঁতে লাগল।

'ধোঁকা, মিথ্যা, প্রতারণা' নির্মলার মুখ থেকে সহসাই শব্দ তিনটা বেরিয়ে এলো। দ্বিতীয়বার ও কুরসীতে বসে পড়ল।

মহিলাদের ভক্তির মিছিলে ভাটা পড়ল, ঠাকুরজি বুলন্দ আওয়াজে বললেন, 'পুরোহিতজি মহারাজ খুবই ক্লান্ত। অতি প্রত্যুষে তিনি এখান থেকে কোচ করবেন। কাজেই এক্ষণে তার বিশ্রামের প্রয়োজন। মহারাজার সাথে মোলাকাতের পর দু' তিন দিন তিনি এখানে যাত্রা বিরতি করবেন। তখন সকলে তার সেবা করার মওকা পাবেন। কাজেই এখন যার যার ঘরে ফিরে যান।'

দীর্ঘক্ষণ চেয়ারে বসে রইল নির্মলা। কক্ষে রাজ্যের অন্ধকার। জনৈক চাকরানী কামরায় প্রবেশ করতে গিয়ে বাতি জ্বেলে বললো, 'দিনের বেলা আপনি কিছু মুখে দেননি। অনুমতি দিলে আপনার খানা নিয়ে আসতাম।'

নির্মলা জবাব দেয়, 'হ্যাঁ নিয়ে এসো। দাঁড়াও! ঠাকুরজি আমার কথা কাউকে জিজ্ঞেস করেননি তো ?'

'জ্বী না। উনি এখন পর্যন্ত উপরে ওঠার সুযোগই পাননি। মেহমানদের দেখভালে মশগুল।'

'সমস্ত মেহমানই কি এখানে থাকবেন?'

'জ্বী না। স্রেফ পুরোহিতজি এবং কিছু পূজারী। অন্যান্যরা মেহমান খানায়।'

'আচ্ছা! যাও খানার এন্তেযাম করো।'

খানিক পর চাকরানী খানা নিয়ে এলো। ক'লোকমা মুখে দেয়ার পর নির্মলা থ' মেরে বসে রইল। একাকী বসে থাকতে থাকতে বিরক্তি ভাব এসে যাওয়ায় ও পাশের বেডরুমে গিয়ে পালংকে শুয়ে পড়ল। এর পর পর ঠাকুরজি এলেন। বললেন, নির্মলা! পুরোহিতজির অভ্যর্থনায় তোমার নীচে যাওয়ার দরকার ছিল।

'আমার প্রচন্ড মাথা ব্যথা ছিল', উঠে বসতে গিয়ে বললো নির্মলা, 'সর্বপরি এত মানুষের সামনে দিয়ে যেতেও কেমন একটা দ্বিধায় জড়িয়ে পড়েছিলাম।'

'শহুরে লোকজনকে আমি সেই তখনই পাঠিয়ে দিয়েছি। খানা খাওয়ার পর পুরোহিতজি কামরায় একাকী থাকবেন। তোমার বাবাও থাকছেন। তাকে রেখে দিয়েছি। তার পাঁ ছুয়ে প্রণাম করা অপরিহার্য। খোদ তিনি তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তোমাকে দেখে তিনি বড্ড খুশী হবেন। কিছুক্ষণ পরে এসে তোমাকে আমি নিয়ে যাব।'

ঠাকুরজি নির্মলার জবাবের তোয়াক্কা না করে বেরিয়ে গেলেন। পুরোহিতকে খানা খাওয়ানোর পর তিনি পুনরায় এলেন। নির্মলাও কিছু না বলে তার সাথে চলল। নীচ তলায় মেদবহুল নেড়ে মাথার কিছু পূজারী খোশ গল্পে মজেছিল। ঠাকুরের নওজোয়ান চাকররা দরোজার সামনে এদের সেবায় দণ্ডায়মান। পুরোহিতের কামরায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে নির্মলার ঘৃণা ও ধিক্কার শত গুণে বৃদ্ধি পেল। পুরোহিতজি স্বর্ণখচিত একটি পালংকে আসন গেড়ে বসা। জয়কৃষ্ণ তার সামনের একটি চেয়ারে হাতজোড় করে মাথা নীচু করে বসা। নির্মলা পাথরের মূর্তির মত দণ্ডায়মান। ঠাকুরজির পেরেশানীর মাত্রা এতে বাড়তে থাকে। পুরোহিতের দিকে অগ্রসর না হয়ে ও বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে অগ্রসর হয়। জয়কৃষ্ণ ওর বাযু ধরে উঠিয়ে পুরোহিতের দিকে ঠেলে দিতে গিয়ে বললেন, 'পুরোহিতজি মহারাজের পা ছোঁও, রাজা-মহারাজা সবাই তার দরোজার ভিখারী।'

একান্ত বাধ্য হয়ে কম্পিত ও ঘৃণা বিমিশ্রিত হাত নির্মলা পুরোহিতের নাপাক চরণে রাখে। নারীমাংসলোভী পুরোহিতের উত্থিত হাত মুহূর্তেই নির্মলার নিটোল সুন্দর গন্ডে নেমে আসে। বলেন, 'সুখী হও মা।'

নির্মলা উঠে দাঁড়াল। ঠাকুর তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'আজ ওর তবিয়ত ঠিক নেই।'

পুরোহিত খালী চেয়ার দেখিয়ে বলেন, 'বসুন ঠাকুরজি! আর মা তুমিও।'

নির্মলা পিছু হটে বাবার পাশটিতে বসে গেল। ঠাকুর ওর কাছটিতে বসল আরেকটি চেয়ার পেতে। ঠাকুর বললেন, 'মহারাজ! নির্মলা প্রাত্যহিক আপনার স্মৃতিচারণ করেন।'

পুরোহিত নির্মলার বিমর্ষ চেহারায় গভীর দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'কিন্তু আজ তো মনে হচ্ছে এ আমাকে দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছে।'

ঠাকুর জবাব দিলেন, 'মহারাজ। কখনও কখনও দেবতা-প্রেম ভক্ত হৃদয়ে ভীতির সৃষ্টি করে। আর নির্মলা তো প্রতি কথাই ভয় পাবার মেয়ে। পরশু এক

আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে গেছে। আমাদের নয়া জায়গীরদারের স্ত্রী রোগাটে ছিল। ওদিন সে নির্মলার জন্য তোহফা নিয়ে আসে। তাকে দেখামাত্রই ওর চেহারা যেন বিবর্ণ হয়ে গেল।

আমি ....'

নির্মলা ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে ঠাকুরের প্রতি তাকাল। কথার মোড় ঘুরানোর জন্য বললো, এসময় মহারাজের বিশ্রামের প্রয়োজন। তাকে .....'

পুরোহিত শান্ত গলায় বলেন, 'না না। ঠাকুরজিকে তার কথা শেষ করতে দাও।'

নির্মলার হৃদয়ে প্রচণ্ড ঝড়। ঠাকুর বলতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এত পেরেশান কেন ? ও বললো, এই মাত্র যে মেয়েটি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলো, তার চেহারা অবিকল সেই দেবীর মত, সোমনাথ মন্দিরের দেবী হবার পর পয়লা রাত্রীতেই যে মেয়েটা মহাদেবের চরণে ঠাঁই নিয়েছিল। সারা দেশবাসী যে ঘটনা অবগত।

পুরোহিতের মধ্যে চাপা উত্তেজনা নেমে এলো। কিন্তু একমাত্র নির্মলা ছাড়া পুরোহিতের মানসিক অবস্থা আর কেউ অনুধাবন করতে পারল না। ঠাকুরজি বলে চলেছেন, 'মহারাজ! দুনিয়ার অসংখ্য মানুষের চেহারা এক রকম হতে পারে। দর্শককূল অধিকাংশ সময় ধোঁকা খেয়ে যায়; কিন্তু নির্মলার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, সে মন্দিরের দেবী। এক নয়া রূপে সে ওর সামনে এসেছে। তারপর আমি বলেছি ওর নাম রূপাবতি নয় সাবিত্রী। আর সে সোমনাথ থেকে নয়, এসেছে কালিঞ্জর থেকে। এ সময় ওর মনের খুঁতখুতি কিছুটা কাটে।'

জয়কৃষ্ণ আচমকা পুরোহিতের দিকে তাকালেন। ভীত কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজের হোল কি! আপনার তবিয়ত ভালো নেই কি ?'

পুরোহিতজি নিষ্পলক নেত্রে তেঁতো জীবনের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিস্বাদ হজম করছেন যেন। তিনি ভাঙ্গা গলায় বললেন, ... আমি সুস্থ। বিলকুল সুস্থ। তোমরা যেন কি বলছিলে যে, কোন্ মেয়ের চেহারা যেন রূপাবতির সাথে মিলছে হুবহু।'

'না মহারাজ! নির্মলার সন্দেহ হয়েছিল। এ জন্য ও ভয়ও পেয়েছিল।'

'তা না হয় বুঝলাম যে, নির্মলা রূপাবতিকে সোমনাথে দেখেছিল; কিন্তু তাতে ভড়কে যাবার এমন কি উপাদান ছিল ? কত চেহারাইনা দুনিয়াতে এক রকম।'

'হ্যাঁ মহারাজ! যখন ওকে বুঝালাম তখন খোদ ও নিজেই বুঝে গেল। এ যুবতী রূপাবতির চেয়ে ভিন্ন।

'সে যুবতী কি এখানেই থাকে।'

'হ্যাঁ মহারাজ!'

'স্বামীসহ ?'

'হ্যাঁ মহারাজ! গতকাল তার স্বামী পূর্ব পাঞ্জাবে জায়গীর দেখতে গিয়েছে। যুবতীটি অসুস্থতার দরুন সঙ্গে যেতে পারেনি, তাই রয়ে গেছে।'

'কবে বিয়ে হয়েছিল ওদের ?'

'একথার সত্যাসত্য জানা নেই আমার। কিন্তু ওর স্বামীর কথা দ্বারা এ টুকু বোঝা যায় যে, সোমনাথ যাত্রার পূর্বেই ওদের বিয়ে হয়েছিল।'

'তাহলে সে কি এ শহরের বাসিন্দা নয় ?

' না মহারাজ! সে কনৌজবাসী। সোমনাথ যাত্রাপথে আমাদের মহারাজার বাঘ শিকার কালে ওর সাথে দেখা। ও মহারাজার জীবন বাঁচিয়েছে। মহারাজা তাকে খুব পেয়ার করেন।'

'তা অবশ্য ঠিক। এ ধরনের লোকের পেয়ার করাই উচিত। কি যেন নাম তার ?'

'রামনাথ!'

নির্মলার দমরুদ্ধ হয়ে আসছিল। এর পাশাপাশি বিপদ ঘণীভূত আঁচ করে ওর প্রতিরোধ শক্তি সজাগ হয়ে উঠল। সে বললো, 'মহারাজ! ঠাকুরজি আমার দৌর্বল্যে হাসছেন কিন্তু সন্ধানী দৃষ্টি বুলালে দেখা যাবে, সামান্য পার্থক্য ছাড়াই রূপাবতির চেহারার সাথে তার মিল রয়েছে। আপনি থাকলে অতি সকাল সকালেই তাকে ডেকে পাঠাতাম।'

পুরোহিত ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন, আমাকে দেখাতে হবে না। আমি জানি দুনিয়াতে রূপাবতি স্রেফ একজন। এক্ষণে তুমি গিয়ে আরাম কর। জয়কৃষ্ণ তুমিও। আর ঠাকুরজি আপনার সাথে কথা আছে।'

॥ পাঁচ ॥

নির্মলার বুঝতে বাকী নেই ঠাকুরজির সাথে পুরোহিতজি কি বলতে চান। ওখান থেকে মুক্তি পাবার জন্য নির্মলা একটাই ফন্দি আঁটল। ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দু' তিন কদম পিছু হটে আচমকা মাথা দু' হাতে চেপে বিছানায় বসে পড়ল। ঠাকুর ঘাবড়ে উঠে দাঁড়ালেন। জয়কৃষ্ণ এগিয়ে এসে ওর বাযু ধরে বললেন, 'কি হলো খুকী ?'

'মাথা চক্কর দিয়েছে বাবা। ব্যথায় মাথা দেহ থেকে আলাদা হবার উপক্রম।' কৃত্রিম কাতরাতে কাতরাতে জবাব দেয় নির্মলা। ঠাকুর এগিয়ে যান ওর পাশটিতে। ওর আরেক হাত ধরে তিনি পুরোহিতজির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আমি ওকে ওপরে

পৌঁছে দিয়ে আসি।' পুরোহিতজি বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তাই আসুন এবং দেখুন ঘাবড়াবেন না যেন। আমরা ওর জন্য মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করছি।'

জয়কৃষ্ণ ও ঠাকুরজির ওপর ভর করে নির্মলা কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ও বোঝাতে ছিল যে, ও মুর্ছা যাবার উপক্রম। সিঁড়ির কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে একটু সুস্থতার পরিচয় দিল।

ক'সিড়ি অতিক্রম করার পর জয়কৃষ্ণ স্বস্তির ঢেকুর তুলে বললেন, 'ঠাকুরজি আমি ওকে ওপরে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি কোন কবিরাজ ডাকুন।'

'এখুনি ডাকছি।' বলে ঠাকুর তরতর করে নেমে যান।

আচমকা নির্মলা বাবার হাত ধরে বললো, 'বাপুজি! জলদি ওপরে চলুন। আপনার সাথে আমি জরুরী কথা বলতে চাই।'

জয়কৃষ্ণ বিস্ময়াবিভূত হয়ে ওর সঙ্গ দিলেন। নির্মলা ওকে একটি কামরায় নিয়ে গেলেন। দরোজা বন্ধ করে বললেন, 'বাপুজি! এখনি আপনি আমাকে বাসায় নিয়ে চলুন। এটা আমার জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। ভগবানের দিকে চেয়ে ঠাকুরজিকে ডেকে পাঠান। তাকে বলুন, কবিরাজ ডাকার প্রয়োজন নেই। এ ধরনের মাথা ব্যথা আমার অসংখ্য বার হয়েছে। এর দাওয়া আমাদের বাসায় রয়েছে। নওকর সম্ভবতঃ তা তালাশ করে পাবে না। প্রয়োজনে অন্য যে কোন বাহানায় হলেও আপনি আমাকে বাসায় নেয়ার ব্যবস্থাদি করুন। অন্যথায় কাল আমার লাশ দেখবেন।'

কিন্তু খুকী, আমাকে তোমার রহস্যটা খুলে বলবে...।

নির্মলা দরোজা খুলতে গিয়ে বললো, 'ভগবানের দিকে চেয়ে এক্ষণে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। বাইরে গিয়ে আপনাকে যা বলার খুলেই বলব। জলদি যান।'

জয়কৃষ্ণের পেরেশানী এবার বিভীষিকায় রূপ নিল। ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান। বারান্দার কোণে কোণে জলন্ত কুপি। সিড়ির অনতিদূরে ঠাকুরের সাথে তার দেখা।

'আপনি যাচ্ছেন কৈ?' প্রশ্ন ঠাকুরের।

'আপনাকে ডাকতে। নির্মলার অবস্থা উন্নতির দিকে।'

ঠাকুর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'আমি কবিরাজ ডাকতে লোক পাঠিয়েছি। তারা এখনই এসে যাবে।'

'আপনার লোকজনকে ফিরিয়ে আনুন। এধরনের ব্যথা নির্মলার নতুন নয়। আমি সন্যাসীর থেকে কয়েক প্রকার দাওয়াই এনে রেখেছিলাম। ঐ দাওয়া সেবন করলে ওর ঘুম এসে যায়। নির্মলা বলেছে ঘরে কোথাও তা লুকিয়ে রেখেছে ও।'

'তাইলে বাসায় গিয়ে আপনি দ্রুত তা এনে দিন।'

'আমার ভয় করছে, যাওয়া-আসা ও দাওয়া তালাশ করতে দেরী লেগে যেতে পারে। নির্মলা বলছে ও-ই তা জানে কোথায় কোন সিন্দুকে রেখেছে। এজন্য আমি নির্মলাকে সাথে নিয়ে যেতে চাই। এখন ওর অবস্থার কিছুটা উন্নতি। কিন্তু ঘন্টা খানেকের মধ্যে তা আবার বাড়তে পারে। সুতরাং ওকে দ্রুত বাড়ী পৌছে দেয়া দরকার। দাওয়া পেয়ে গেলে তা সেবন করতেই ওর ঘুম এসে যাবে। অন্যথায় কবিরাজের ঘর আমাদের বাসার কাছে। প্রয়োজনে তাকে ডেকে নেব। পুরোহিতজি আপনার অপেক্ষা করছেন। সুতরাং আমাদের অনুমতি দিন।'

'আপনার অনুমতি নেয়ার দরকার ছিল না। নির্মলাকে সফরের প্রস্তুতি নিতে বলুন। এক্ষণি পাল্কীর এন্তেজাম করে দিচ্ছি। পুরোহিতজির সাথে খানিক কথা বলে খোদ আমি আসছি।'

'না না। তার দরকার নেই। আপনি বড্ড শ্রান্ত-ক্লান্ত। প্রয়োজন হলে আপনাকে ডেকে পাঠাব। না পাঠালে আপনি নিশ্চিন্তে আরাম করতে থাকবেন।

'ওর সুস্থতা ও ঘুম দেখা দিলে আমাকে খবর দিবেন যথাশীঘ্র। নীচে পাল্কীর ব্যবস্থা করছি। আপনি ওকে নিয়ে আসুন।'

খানিক বাদে নির্মলা পাল্কীতে চড়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছিল। জয়কৃষ্ণ ওর সাথে পদাতিক।

।। ছয় ।।

দরোজার কাছে এসে জয়কৃষ্ণ বেয়ারাদের রুখল।

ফটক খোলার জন্য এগিয়ে গেল। নির্মলা বললো, 'বাপু! দাঁড়ান। পাল্কী ভেতরে নিয়ে যাবার দরকার নেই। আমি এখানে নামছি।'

'আচ্ছা, তোমরা পাল্কী এখানেই নামাও।'

বেয়ারাদের একটা টাকার তোড়া দিয়ে জয়কৃষ্ণ বললেন, 'তোমরা পরস্পরে ভাগ করে নিও।'

বেয়ারারা অন্ধকারে গায়েব হয়ে গেল। নির্মলা বাবার হাত ধরে দেউড়ীর ভেতরে নিয়ে বললো, 'বাবা মহলে ঢোকার আগে আমাকে অনেক কিছু ভাবার আছে।

'এখন সত্যি করে বলো, তুমি কি করতে চাও।'

'বাবা! আমি আপনার কথা মত আমার বলিদান কার্যকর করেছি। জীবন-যৌবন জলাঞ্জলী দিয়েছি। প্রতিজ্ঞা করেছি এর বিনিময় আপনার কাছে কিছু চাইব না। কিন্তু আজ আপনার কাছে প্রাপ্তির ঝুলি দরাজ করেছি। তাও আমার জন্য নয়, আরেক জনের জন্য।

আমার সামান্য ভুলে দু'দুটো মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি। আপনি তাদের বাঁচাতে পারেন। আপনে কিছু করতে না পারলে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেয়া থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না কিছুতেই।

'তুমি রামনাথ ও ওর স্ত্রী সম্পর্কে কি কিছু বলতে চাইছ ?'

'হ্যা! সাবিত্রীই সেই মেয়ে সোমনাথে যাকে রূপাবতি বলে ডাকা হত।'

'তোমার মতলব। রূপাবতি তাহলে জীবিত ?'

'হ্যাঁ, পুরোহিতজি যখন জেনেছেন, ও জীবিত এবং এই শহরেই বাস করছে তখন ওকে আস্ত রাখবেন না। এই মুহূর্তে ঠাকুরজির সাথে তিনি ঐ ব্যাপারে শলা-পরামর্শ করছেন। এক্ষণে কথা বলার সময় নয়। ঐ মেয়েকে তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে পাঠাতে হবে এবং রামনাথকে জানাতে হবে যে, তোমার জীবন হুমকীর মুখে। রূপাবতির কাহিনী আমি ওর মুখেই শুনেছি। পুরোহিত যদি আমার সাথে ঐ ব্যবহার করতেন যা তিনি করেছেন রূপাবতির সাথে তাহলে আপনি সোমনাথ মন্দিরের এক একটা ইট খুলে এর প্রতিশোধ নিতেন। রূপাবতি মহাদেবের চরণে পৌছেনি বরং নারীমাংসলোভী পুরোহিত থেকে ওর ইজ্জত বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছে।

আর ওকে এমন এক দেবতা সোমনাথের পাপপুরী থেকে উদ্ধার করেছেন যিনি পিতৃহন্তার গর্দানে তলোয়ার রাখার পরও যাকে মাফ করে দিয়েছেন। নিজের বোনের প্রতিশোধ নেয়ার স্থলে যিনি আমাকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। বাবা! জীবনে এই প্রথম একটা শুভ কাজের মওকা মিলেছে– এটি হাতছাড়া হতে দিয়েন না। আমি ওকে এখানে নিয়ে আসছি। ঘোড়া তৈরী করুন। সাথে একজন নওকর পাঠান। আরেকজনকে পাঠান রামনাথের কাছে। আমি রূপাবতিকে ডাকছি।'

'না না! তুমি যেতে পার না। জয়কৃষ্ণ ওর হাতে ধরে বললো, 'তার নওকর তোমাকে চিনে ফেলবে। রূপাবতিকে যদি তুমি বেরও করতে পার তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তি তোমাকে পুরোহিতের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

'বাবা! ভগবানের দিকে চেয়ে আমাকে রুখবেন না। যদি রূপাবতিকে বাঁচাতে না পারি তাহলে গোটা দুনিয়ায় বলে বেড়াব, কি অপরাধে ওকে শাস্তি দেয়া হয়েছে? ঠাকুর ও মহারাজার সামনে আমি পুরোহিতের যৌন পঙ্কিল অন্ধকার দিকটা তুলে ধরব। জানি এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে আমার কণ্ঠনালী চিপে ধরতে আসবে। কিন্তু এর জন্য তৈরী আমি।'

'রূপাবতিকে তুমি কোথায় পাঠাতে চাচ্ছ ?'

'কনৌজস্থ রণবীরদের বাড়ীতে। এ মুহূর্তে ওর নিরাপত্তায় তেমন কোন স্থান মনে আসছে না।'

'আমি পেয়ারলালকে ওর সাথে পাঠাতে পারি। কিন্তু এ মুহূর্তে ওকে ঘর থেকে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। ওদের নওকরদের ধোঁকা দেয়ার জন্য আমি সাধারণ এক সেপাইয়ের ছদ্মবেশ ধারণ করতে রাজি। ওদের বলব, রামনাথ আমাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু রূপাবতিকে কি করে আমার একনিষ্ঠতা ও সততার ওপর বিশ্বাস করাবে ?'

নির্মলা হাতের থেকে কাঁকন খুলে বললো, এ দু'টি দিলে ও বিশ্বাস করবে। ও-ই আমাকে ইহা দিয়েছে। বললেন, আমি বাড়ীর বাইরে দণ্ডায়মান।'

'এখন তুমি আমার সাথে এসো। প্রথমে আমাকে বাড়ী যেতে হবে। ভগবান মুখ তুলে চাইলে আমরা সামান্যই সময় পাব।'

তিনি দ্রুত দেউড়ি এগিয়ে গেলেন। জয়কৃষ্ণ পাহারাদারদের ডাকলেন। ওরা দরোজা খুলল। দেউড়িতে মশাল জ্বলছিল। জয়কৃষ্ণ ভেতরে ঢুকেই প্রহরীদের বললেন, 'পেয়ারলাল কোথায় ?

'জী মহারাজ! খুব সম্ভব সে শুয়ে গেছে।'

'এখনই শুয়ে গেছে। যাও তাকে জাগিয়ে তোল। ওর স্থানে আজ তুমি আরাম করো। ও এখানে পাহারা দিবে। গোবিন্দরামকেও এখানে পাঠাও।'

'বহুত আচ্ছা মহারাজ!' নওকর একথা বলে চলে গেল।

জয়কৃষ্ণ নির্মলার প্রতি তাকিয়ে বললেন, 'তুমি জলদি পুরানো একটা ওড়না এনে দাও। নির্মলা দ্রুত ভেতরে চলে গেল। খানিকবাদে তিনি পেয়ারলালের পোষাক এবং নির্মলার আনা ওড়না মাথায় পেঁচিয়ে নিলেন। গোবিন্দরাম হয়রান হয়ে সেদিক তাকিয়ে রইল।

'চলুন বাপুজি! বেশ দেরী করে ফেলেছি।' নির্মলা বে-করার হয়ে বলল।

জয়কৃষ্ণ নওকরদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা সামান্য সময়ের জন্য বাইরে বেরুচ্ছি। তোমরা তিনটি ঘোড়া তৈরী করো। একটি লম্বা সফরের জন্য তৈরী হয়ে যাও। বাকী নওকররা যেন জানতেও না পারে যে, তোমরা যাচ্ছ কৈ। আস্তাবলের কাছে অন্য নওকররা থাকলে অন্য কোথাও পাঠাও।

জয়কৃষ্ণের সাথে নির্মলা ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। নওকরটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

পেয়ারলালই একমাত্র লোক যে মুসিবতের দিনেও জয়কৃষ্ণের সঙ্গ ছাড়েনি। তার অবশিষ্ট নওকররা একে একে কেটে পড়েছে। দেশের মায়া তাকে পীড়া দিত কিন্তু রণবীরের ভয়ে ঐ মায়া তাকে ফিরিয়ে রেখেছে। রণবীরদের গায়ের অল্প দূরে তার ভাইয়ের আত্মীয় বাড়ী ছিল। এ আশায় তিনি মাঝে মধ্যে কনৌজ দখলের চিন্তা করতেন।

গোবিন্দরাম গোয়ালিয়রস্থ নির্মলার মামার চাকর। নির্মলা তাকে সাথে নিয়ে এসেছিল।

বিছানায় শায়িত রূপা।

চোখে ঘুম নেই।

চাকরানী কামরায় দাখেল হয়ে বললো, 'আপনি এখনও ঘুমাননি?

'ঘুম আসছে না।'

'কুপি নিভিয়ে দেই ?

'না না। আমিই নিভাব।'

'কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি ?'

'না। তুমি শুয়ে পড়।'

চাকরানী পাশের কামরায় চলে গেল। খানিকবাদে রূপাবতি তার নাকডাকা বিচিত্র আওয়াজ শুনতে পেল। স্তব্দ হয়ে থাকল বিছানায়। আচনক উঠানে কারো কণ্ঠস্বরে ওর কান সচকিত হয়ে ওঠল। ওর মনে হল, চৌদিকার কারো সাথে কথা বলছেন। দ্রুত উঠে দরোজায় কান লাগাল ও। এরপরই বারান্দায় কারো সতর্ক পদধ্বনি শুনতে পায়।

'কে?' ভয়কানো হৃদয়ের জিজ্ঞাসা রূপার।

'আপনি এখনও জেগে আছেন দেবী ?' চৌকিদার বলে ওঠে।

'হ্যাঁ! কেন কি হয়েছে? '

'বাইরে একলোক দাঁড়ানো। সে নাকি সরদার রামনাথের পয়গাম নিয়ে এসেছে।'

রূপাবতি দ্রুত ছিটকিনি খুলে বেরোল। বললো, লোকে তাঁর পয়গাম নিয়ে এসেছে—আর তুমি তাকে বাইরে বসিয়ে রেখে এসেছো? '

'ভেতরে কাউকে প্রবেশ করার পূর্বে আপনার এজাযত নেয়ার জরুরত মনে করেছি ?'

'সে কি একা ?'

'জী হ্যাঁ! উনি বলেছেন, সর্দার রামনাথের পয়গাম শুধু আপনার জন্য।'

'আচ্ছা তাকে ডেকে পাঠাও। খুব সাবধান থেকো।'

'সে চিন্তা আপনাকে না করলেও চলবে।' বলে চৌকিদার চলে গেল। খানিকবাদে এক লোককে সাথে করে নিয়ে এলো। রূপাবতি বারান্দার থামের আড়ালে দাঁড়ান।

আগন্তুক কাছে এলে ও থামের আড়াল থেকে প্রকাশ্যে এলো।

আগন্তুক কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই বললেন, 'সর্দার রামনাথ আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি আপনার জন্য জরুরী এক পয়গাম নিয়ে এসেছি। শহরের ক' কদম দূরে আমার ঘোড়া দম ফেল করেছে। নয়ত সন্ধ্যার পূর্বেই পৌছুতে পারতাম।'

'কবে আসবে সে?'

'খুব শীঘ্র।'

'কি পয়গাম তার?'

আগন্তুক ঘুরে চৌকিদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কারো সামনে তা প্রকাশ করার অনুমতি নেই আমার।'

রূপাবতি ইশারা করতেই চৌকিদার চলে যায়। আগন্তুক এদিক ওদিক তাকিয়ে পকেট থেকে দু'টি কাঁকন বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে বলে, 'এটা নিন!'

'ও পাঠিয়েছে বুঝি ?'

'ভেতরে গিয়ে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে জানতে পারবেন, কে পাঠিয়েছে এই জিনিষ?'

রূপাবতি কাঁকন হাতে নিল। কামরায় প্রবেশ করে গভীরভাবে দেখার পর ওর রক্ত জমে বরফ হয়ে গেল। আগন্তুক দরোজার কাছে এগিয়ে এলেন। চুপি চুপি বলতে লাগলেন। 'চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি জয়কৃষ্ণ, নির্মলার বাবা। নির্মলা এ চিহ্ন এজন্য দিয়েছে যাতে তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস না হারিয়ে ফেল। হাবেলীর বাইরে ও দাঁড়ানো। ভেতরে এলে তোমার নওকররা ওকে চিনে ফেলার সম্ভাবনা ছিল। তুমি ও রামনাথ জীবনে বাঁচতে চাইলে আমার কথামত চল। অন্যথায় তোমাদের পাশাপাশি নির্মলা ও আমার কারো রক্ষা নেই। পুরোহিত জেনে ফেলেছেন যে, তুমিই রূপাবতি। খুবসম্ভব কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সেপাইরা এ মহল ঘিরে ফেলবে। এক্ষণে চিন্তার সময় নেই। তোমার এখান থেকে চলে যাবার ব্যবস্থাদি করেই তবে এসেছি।'

'কিন্তু রামনাথ!' বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বলল রূপা।

'তুমি এখান থেকে নির্বিঘ্নে বেরুতে পারলে রামনাথের জীবনও বেঁচে যেতে পারে। পক্ষান্তরে তোমার গ্রেফতারীর খবর শুনলে ও পলায়ন করার কোশেশ করবে না। এক্ষণে জলদী এখান থেকে বের হও। অলংকারাদি ও নগদ পয়সা-কড়ি থাকলে তা নিয়ে নাও। খুব চৌকান্না থেকো, তোমার পাহারাদার যেন ঘুনাক্ষরেও জানতে না পারে। আমার একটা ফন্দি মনে আসছে। তোমার আস্তাবলে ঘোড়া আছে কি ?'

'হ্যাঁ! একটা কেন তিন-তিনটা ঘোড়া।'

'তুমি আমার সাথে চলো। পাহারাদারকে, আমার ফিরে যাবার জন্য ঘোড়ার দরকার। ও আস্তাবলের দিকে গেলে তুমি বেরিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। হাবেলীর পেছনে নির্মলার দেখা পাবে। ওর সাথে আমার বাসায় চলে যেও। ঘোড়া নিয়ে ওখানে যাব আমি। পাহারাদার কাউকে জাগানোর কোশেশ করলে ওকে নিষেধ করে দিও।'

রূপাবতি জয়কৃষ্ণের হাতে কাঁকন দিয়ে দিল এবং অলংকার ও নগদ স্বর্ণ-মুদ্রা সংগে করে জয়কৃষ্ণের সাথে বেরিয়ে এলো। দেউড়ীর বাইরে আঙিনা দাঁড়ানো চৌকিদার। রূপাবতি তাকে বললো, 'দেখ! তাকে এখনি ফিরে যেতে হবে। সুতরাং আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে নিয়ে এসো। কেউ যেন তার আগমনের খবর না জানে। উত্তম ঘোড়াটি তাকে না দিলে সর্দার রাগ করবেন। অন্য কাউকে জাগানোর দরকার নেই।' বলে রূপাবতি কামরার দিকে গেল। চৌকিদার চোখের আড়াল হতেই ও দ্রুত দেউড়ীর দিকে ছুটে গেল। জয়কৃষ্ণ শক্ত হাতে ফটকের ছিটকিনি খুলে দিলেন। রূপাবতি বেরিয়ে গেল। অতঃপর পূর্ববৎ ফটক বন্ধ করে নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন জয়কৃষ্ণ।

৷৷ দুই ৷৷

খানিক পর।

রূপাবতি নির্মলার সাথে জয়কৃষ্ণ ভিলার উদ্দেশ্যে কোচ করছিল। নির্মলা একে সান্ত্বনা দিয়ে বলছিল, 'যে নওকরকে তোমার সাথে দিচ্ছি বডড ওফাদার সে। গোয়ালিয়রস্থ মামা বাড়ীর নওকর সে। আমিই তাকে ওখান থেকে নিয়ে এসেছিলাম। বাপুজি রামনাথকে খবর দেয়ার জন্য আরেক নওকরকে পাঠাচ্ছেন। খোদ ভগবানই তোমার মদদ করছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রামনাথ তোমার সাথে মিলিত হবেই। তুমি রাতভর সফর করবে এবং দিনের বেলা কোন বন জংগলে লুকিয়ে থাকবে। আফসোস! তোমার শরীর এখনও সুস্থ নয়। কোথাও অবস্থানের জরুরত পড়লে শহরকে না বেছে সেমতাবস্থায় অখ্যাত নির্জন কোন পল্লীতে থেকো। সীমান্ত পেরুলে তোমার আর কোন ভয় থাকবে না।'

রূপাবতি কৃতজ্ঞতার অশ্রু বিসর্জনপূর্বক বললো, 'নির্মলা! তুমি সাক্ষ্যাৎ এক দেবী। ভগবানের দিকে তাকিয়ে যথাশীঘ্র রামনাথকে খবর দিও।'

'তুমি সে চিন্তা করো না।'

'নির্মলা! রামনাথের কাছে তোমার মনের কথা জানিয়েছ। তুমি রণবীরকে কোন খবর দিতে চাও কি ?

'হ্যাঁ! ওকে স্রেফ এতটুকু বলবে, তুমি যে নির্মলাকে চিনতে-সে মারা গেছে।'

মহলের কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ওরা পেছনে ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি শুনতে পেল। জয়কৃষ্ণ ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে নামতে বললেন, 'রূপাবতি! তুমি এ ঘোড়ার পিঠে চাপ। আর নির্মলা! তুমি দাঁড়াও ওর কাছটিতে। আমি এখনি গোবিন্দরামকে নিয়ে আসছি। পেয়ারলালের প্রতি আমি আস্থাশীল তারপরও ওকে সব কথা খুলে বলা ঠিক হবে না।'

জয়কৃষ্ণ দেউড়ীর দিকে ছুটে গেলেন। রূপা চাপল ঘোড়ায়। গোবিন্দরামকে নিয়ে এলেন জয়কৃষ্ণ। গোবিন্দ একটা ঘোড়ার লাগাম হাতে দাঁড়ানো।

জয়কৃষ্ণ বললেন, 'গোবিন্দরাম! তোমার গন্তব্য কনৌজের সেই বাড়ী যা কোন সময় আমার ছিল। এই দেবীর ইজ্জতের দুশমন তার পিছু ধাওয়া করছে। তাই যথাশীঘ্র তোমরা সীমান্ত অতিক্রম করবে।

'বাপুজি! আমি এ দেবীকে সবই বুঝিয়েছি। সুতরাং ওকে এবার এজাযত দিন।' বলে গোবিন্দরামের দিকে তাকাল নির্মলা, 'জ্যাঠা গোবিন্দ! ওর ইজ্জত আমার ইজ্জত, ওর জীবন আমার জীবন মনে কর।'

আচানক কি একটা মনে আসায় জয়কৃষ্ণ অগ্রসর হয়ে রূপাকে বললেন, 'তোমার পতির কাছে বিশ্বাসযোগ্য এমন কোন নিদর্শন তুমি দিতে পারবে কি ? যাতে সে আমার দূতকে বিমুখ না করে।'

'হ্যাঁ! ও আমার আংটি চিনবে।' বলে রূপাবতি আংটি খুলে দিল।

৷৷ তিন ৷৷

রূপাবতি ও গোবিন্দরাম রাতের আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়কৃষ্ণ মেয়েসহ দেউড়ীতে প্রবেশ করলেন। পেয়ারলাল ওখানে দু'টি ঘোড়া নিয়ে দণ্ডায়মান। ও ভয়তে ভয়তে প্রশ্ন করল, 'মহারাজ? গোবিন্দরাম গেল কৈ?'

'কাউকে ডাকতে পাঠিয়েছি'। জয়কৃষ্ণ দায়সারা গোছের জবাব দেন।

'কিন্তু আমি দু'টি ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি শোনলাম যে। তার সাথে আর কেউ ?'

'হ্যাঁ! তার সাথে আরেক লোকও গেছে। এক্ষণে বলো, তুমি সর্দার রামনাথকে চেন কি-না ?

'সীমান্তে লম্বা জায়গীর পেয়েছেন— সেই তো ?'

'হ্যাঁ!'

'চিনবনা মানে ! তাকে খুব ভাল করেই চিনি।'

'সে জায়গীর দেখতে গেছে। তোমার যেতে হবে তার কাছে। তুমি সোজা পূর্বে যাবে। ওখানে গিয়ে যখন দেব নগরে উপনীত হবে, ওখান থেকে ১৫/২০ ক্রোশ দূরে যে বসতি দেখতে পাবে, তা-ই রামনাথের জায়গীর।

'জী তাকে আমি তালাশ করে নেব।

'এটা নাও।' পেয়ারলালের হাতে রূপাবতি আংটি দিতে গিয়ে জয়কৃষ্ণ বললেন, 'এটা আমার পক্ষ থেকে তাকে দিয়ে বলো, যে মেয়ে তোমাকে এই আংটি পাঠিয়েছে সে কনৌজ রওয়ানা হয়ে গেছে। এজন্য তুমি শহরে না এসে কনৌজ রওয়ানা হয়ে যেও।'

'না বাপুজি! সান্ত্বনার জন্য এতটুকু কথাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। আমি তাকে একটা পত্র দিচ্ছি।'

'তোমার পক্ষ থেকে ?'

'তাতে আমার নাম লেখব না, কিন্তু সে ঠিকই বুঝে যাবে, আমি কে?'

'কিন্তু তোমার পত্র যদি ধরা পড়ে যায় ?'

'যদি ধরা পড়েই যায় তাহলে ওই মেয়ের দুশমন ঠাকুরজির সামনে আমার মুখ থেকে সেই রহস্য-জাল খুলতে চেষ্টা করবেন না যে, এই পত্র আমি কেন লিখেছি।'

জয়কৃষ্ণ অসহায় হয়ে বললেন, 'নির্মলা! যা মন চায় করো। আজ আমার বিবেক কাজ করছে না। এমন এক দুলদুলে তুমি আমায় চাপিয়েছ যার থেকে পরিত্রাণ পাবার সাধ্যি নেই আমার।

'না বাপুজি! আজ আপনাকে আকাশের উচ্চতায় দেখছি। আপনি খানিক এন্তেযার করুন। এই আসছি আমি। আর আপনি পোশাক পাল্টাননি-খেয়াল আছে তো?'

নির্মলা ঘরের ভেতর চলে গেল। জয়কৃষ্ণ পোশাক পাল্টালেন এবং ভেতর আঙিনায় টহল দিতে লাগলেন। এরপর এক সময় পেয়ারলালকে বললেন, ফটকের কড়া লাগাও। বাইরে থেকে কেউ ফটক থাবড়ালে খোলার পূর্বে ঘোড়া আস্তাবলের দিকে হাঁকিয়ে দিও। এই আসছি আমি।'

॥ চার ॥

নির্জন কক্ষে বসে পত্র লিখছে নির্মলা। চাকরানী উঁকি মেরে বললো, 'আমি আপনার তিনটা সিন্দুকই খুলে দেখেছি কিন্তু কোথাও দাওয়া পাইনি।'

'খুবসম্ভব বাবার সিন্দুকে রেখেছি। শুয়ে যাও। আমিই তালাশ করে নেব।'

চাকরানী চলে গেল। খানিকপর জয়কৃষ্ণ কামরায় প্রবেশ করলেন। নির্মলা বললো, 'বাবা! আমি পত্র লিখে সেড়েছি। এই দেখুন!'

আগে বেড়ে তিনি চিঠি নিলেন। চেরাগের রৌশনীতে তা মেলে ধরলেন। ওর পত্রের বিবরণ নিম্নরূপ!–

"ভাই রামনাথ!

যখন পত্রবাহককে জিজ্ঞাসা করবে যে, আমি কে এবং কার মেয়ে তখন তোমার এই সান্ত্বনা হয়ে যাবে, আমি যা লিখছি তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। রূপাবতির রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে। যে দুশমনের থেকে ওকে মুক্ত করেছিলে এই শহরে সে তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। রূপাবতি বলত, রণবীর ওকে বোন ডাকত। সেই রণবীরদের বাড়ীতেই ওকে রওয়ানা করে দিয়েছি। এজন্য তুমিও ওখানে পৌঁছে যাও। ফিরে এলে তোমার জীবন বিপন্ন হবে। পত্রবাহক আমার পুরানো নওকর। পত্র ছাড়াও রূপাবতির একটা নিদর্শন তার কাছে দিলাম।

– তোমারই এক বোন"

জয়কৃষ্ণ মুহূর্তে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পত্রের শেষে তোমার নামটা দিলে পার্থক্য হত কি ?'

'তেমন কিছু হত না।' নির্মলা শান্তকণ্ঠে জবাব দেয়, 'বাপুজি! যদি আমার নাম লিখে দেই এবং এ পত্র ধরাও খেয়ে যায়; তাতেও ঠাকুরজির কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠোকার পূর্বে পুরোহিতকে একথা মানতে হবে যে, সাবিত্রীই রূপাবতি এবং তিনি লোক সমাজে যা প্রকাশ করেছেন-তা অবৈধ, মিথ্যা এবং প্রতারণা সর্বস্ব, আর এ এমন একটা ব্যাপার, পুরোহিত যা পছন্দ করবেন না। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, পেয়ারলাল এই পত্র যথাযথভাবে সযত্নে পৌঁছে দেবেন।'

'আপনি স্রেফ ওকে এনামের ওয়াদা করুন।'

জয়কৃষ্ণ লা-জওয়াব হয়ে বললেন, 'চলো জলদি করো।'

তারা দু'জন দেউড়ীর সামনে এগিয়ে গেলেন। জয়কৃষ্ণ পেয়ারলালকে পত্র দিয়ে বললেন, 'দেখ পেয়ারলাল! তুমি ফিরে এলে দু'হাত ভরে তোমায় স্বর্ণ উপহার দেব। এই চিঠি রামনাথ ছাড়া আর কাউকে দেবে না।' 'আর ঠাকুরজি থেকে কিছু ভূ-সম্পত্তি তোমার নামে কবলা করে দেব। যাতে স্বস্তির সাথে তুমি দিন গুজরান করতে পার। রামনাথ তোমার কাছে আমার ও বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে বলে দিও।' বললো নির্মলা।

'কিন্তু রামনাথ ছাড়া এ চিঠি আর কারো হাতে পড়লে তোমার চামড়া ছিলে ফেলব। এক্ষুণি শহর থেকে বেরিয়ে পড়।' বললেন জয়কৃষ্ণ।

পেয়ারলাল ফটক খুলে ঘোড়ার লাগাম ধরে বললো, 'মহারাজ! অপর ঘোড়াটিতে কে যাবে ?

জয়কৃষ্ণ থতমত খেয়ে বললেন, ওটা এখানেই থাকবে, ভগবানের দিকে তাকিয়ে জলদি যাও।'

পেয়ারলাল বেরিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপল। জয়কৃষ্ণ মশাল উঁচিয়ে বললেন, 'নির্মলা! এখন তুমি ভেতরে যাও। বড্ড একটা ভুল করে ফেলেছি। এখানে আসামাত্রই কারো মাধ্যমে ঠাকুরজীর কাছে খবর পাঠানো দরকার ছিল যে, তোমার দাওয়া মিলে গেছে এবং তুমি আরামবোধ করছ। ঘোড়া আস্তাবলে রেখে কাউকে পাঠাচ্ছি। তুমি শুয়ে যাও। তোমার সাথে অনেক কথা রয়ে গেছে।'

'এক্ষণে আপনি সারারাত কথা বললেও অসুবিধে নেই।'

কামরায় প্রবেশ করে নির্মলা বাবার অপেক্ষা করছিল। বিগত বিবেকী ও মানসিক টেনশনের দরুণ নির্মলা নেতিয়ে পড়েছিল। এখন অবশ্য ভাল লাগছে। বিমর্ষ চেহারায় জয়কৃষ্ণ কামরায় দাখেল হলে নির্মলা বললো, বাবা! খুশির কাজের পর বিমর্ষ ও পেরেশান হওয়া মানায় না।'

জয়কৃষ্ণ দুর্বল দেহ নিয়ে ওর পাশে বসে বললেন, 'মনে হচ্ছে কি জানো, এগুলো যেন সব স্বপ্নের মত হয়ে গেল এক একটা। জানিনা পুরোহিতজি এখন কি করছেন।'

'এখন তিনি কিছুই করতে পারবেন না। সকাল নাগাদ রূপাবতি কয়েক ক্রোশ দূরে চলে যাবে। ভগবান মুখ তুলে চাইলে পেয়ারলালও যথাসময়ে রামনাথের হাতে পত্র পৌছাবে।'

'এক্ষণে আমি ওদের সম্পর্কে না-চিন্তা করছি তোমাকে নিয়ে। রূপাবতি গায়েব হয়েছে জানলে পুরোহিতজি সুনিশ্চিত তোমাকে সন্দেহ করবেন। তার প্রতিশোধ এক্ষণে হতে পারে খুবই বিভীষিকাপূর্ণ।'

'আমি তাকে ডরাইনা! রূপাবতি সীমান্তে অতিক্রম করুক-এই আশাই করছি এক্ষণে বাপুজি!

আপনি ভেবে দেখছেন না কেন, ভগবান স্বয়ং আমাদের সাহায্য করেছেন।'

জয়কৃষ্ণ আমতা আমতা করে বলেন, 'ভগবান এভাবে আমার হালতের ওপর মেহেরবান হলে দুনিয়াতে বোধহয় আমার শ্বাস কাটার জায়গা থাকবে না।'

নির্মলা শত চেষ্টা করেও হাসি থামাতে পারল না একথা শুনে।

॥ পাঁচ ॥

বাইরে কারো পদশব্দ শুনে ঘাবড়ে জয়কৃষ্ণ বলে ওঠলেন, 'কে?'

জনৈক ভৃত্য জবাব দিল, 'মহারাজ! ঠাকুরজি এসেছেন।'

জয়কৃষ্ণ মুহূর্তেই নির্মলার দিকে ইশারা করতেই ও শুয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে রইল রোগির মত।

'কোথায় ঠাকুরজি ?' দরোজার দিকে এগুতে গিয়ে বললেন জয়কৃষ্ণ।

নওকরের স্থলে ঠাকুরজি কামরায় পা রেখে বললেন, 'দেখলেন! খোদ আমাকেই শেষ পর্যন্ত আসতে হলো। নির্মলার অবস্থা কেমন?'

'ঘুমুচ্ছে। দাওয়া তালাশ করতে প্রচুর সময় ব্যয় হয়েছে। এইমাত্র জনৈক নওকর মারফত খবর পাঠিয়েছি। খুব সম্ভব সে আপনার দেখা পায়নি।'

'না, তাই ঠিক! আমি খুব পেরেশান ছিলাম। ঘটা করে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পুরোহিতজি দীর্ঘক্ষণ আমার সাথে কথা বলেছেন।'

'বসুন!'

'হ্যাঁ। তাতে নির্মলার ঘুমের ব্যঘাত ঘটবে। ফিরে যাচ্ছি আমি। আপনি আরাম করুন!'

'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। সকাল পর্যন্ত ওর ওষুধের ক্রিয়া থাকবে। এখন ওর কাছে কেউ ঢোল পেটালেও ঘুম ভাংবে না। ওষুধটা যা না।'

'ইশ্বরকে ধন্যবাদ। ওষুধটা তাহলে পেয়েছেন আপনারা।' এতমিনানের শ্বাস ফেলতে ফেলতে চেয়ার পেতে বসে বললেন ঠাকুরজি।

'পুরোহিতজিকে কেমন একটা পেরেশান মনে হলো আমার। তিনি আপনার কাছে তেমন কোন জরুরী কথা বলেননি তো ?'

'পুরোহিতজি সোমনাথের ব্যাপারে মহারাজার সাথে কোন জরুরী কথা বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁর ধারণা, সুলতান মাহমুদ অচিরেই সোমনাথ মন্দিরে হামলা করবেন। আর দেবতাগণেরও মর্জি, তার সেপাইদের লাশে সোমনাথ প্রাঙ্গন ভরপুর হোক। পুরোহিতজির আশা, আগামী মাসে সমগ্র মহারাজা সোমনাথে একত্রিত হোক, যাতে বিপদের কালে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সোমনাথ রক্ষায় এগিয়ে আসতে পারে। আমাদের মহারাজার কথা ছিল, আনহলওয়ারার ফৌজ সোমনাথে না গিয়ে কুঠিয়াওয়াড় সীমান্তে মাহমুদ বাহিনীকে প্রতিহত করবে। কিন্তু আনহলওয়ারার ফৌজ মাহমুদের অগ্রাভিযান রোধ করার সমর্থ রাখেনা বলে তাঁর বিশ্বাস। এজন্য খোদ নিজে এখন রাজার মত পাল্টাতে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় তাঁর সাথে যাওয়া আমার জন্য জরুরী।'

'আপনার মতামত কি ?'

'আমার মত দক্ষিণের সমস্ত মহারাজা সোমনাথে একত্রিত হোক। আমরা স্ব-স্ব সীমান্তে একত্রিত হই। আমার বিশ্বাস, আমরা সীমান্ত রক্ষা করতে পারব। তা না পারলেও গেরিলা আক্রমন চালাতে পারব। এতে সোমনাথ পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতে মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তারপর যারা সোমনাথে পৌঁছুবে তারা অতি সহজেই শত্রুকে কুপোকাত করতে পারবে। দুশমনের একটা সৈন্যও আমাদের দেবতাদের রোষানল থেকে বাঁচতে পারবে না। পুরোহিতজি আমার সাথে কথা বলার পর বলেছেন, মহারাজার কাজে যাবার পূর্বে শিবাজী মন্দিরের পূজারীদের কাছে যাবেন। তাই এখন মহলে না থেকে চলে গেছেন সেখানে।'

'এখন?'

'হ্যাঁ! এইমাত্র তাকে পৌঁছে এলাম। রথে না চেপে পুরোহিতজি পায়ে হেটে গেছেন। তিনি যে সাক্ষাৎ এক দেবতা। নিদ্রা ও ক্লান্তি তার কিছুই করতে পারে না। কিন্তু কিছু পূজারীদের অবস্থা কেরোসিন। তারা হাটছেন ও ঘুমাচ্ছেন।'

'তারা সকলেই কি পুরোহিতজির সাথে গিয়েছেন?

' না। মাত্র জনা সাতেক পূজারী ও কিছু সেপাই।'

'আপনি তাদের সেবার জন্য আপনার সেপাই পাঠালেন না কেন ?

'আমি তাই চাচ্ছিলাম, কিন্তু পুরোহিতজি বললেন, আমার মন্দির যাত্রা কেউ না জানুক। মন্দিরের দরোজায় গিয়ে তিনি আমাকেও বিদায় করে দিলেন। তিনি বলেন, তুমি নির্মলার খবর নাও। বাকী রাত আমরা এখানেই কাটাব।'

'নির্মলা আমার সাথে এসেছে সে কথা উনি জানেন কি ?'

'না। তাকে পেরেশান না করার জন্যই একথা বলিনি।'

'তাহলে আপনি এখানে আরাম করুন। অতি সকালে আপনাকে জাগিয়ে দেব।'

'না না। সকাল তো হয়েই আসছে। বাড়ী গিয়ে পুরোহিতজির অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। ভগবান যেন সকালে রওয়ানা দেবার ইচ্ছা তার পরিবর্তন করান। নইলে আমার বারোটা বেজে যাবে।'

'একটু অপেক্ষা করুন! আপনার জন্য রথের ব্যবস্থা করছি। আপনি খুবই ক্লান্ত শ্রান্ত।'

'রথের প্রয়োজন নাই। তারচে' আমি আপনার ঘোড়া নিয়ে যাই।'

এই কথোপকথনের মাঝে ঘুমের ভান ধরে থাকা নির্মলা মনে মনে একটা ফায়সালা করে ফেলেছিল। ঠাকুরজির ওঠার অবস্থা আঁচ করতেই ও পার্শ্ব পরিবর্তন করে পানি পানি বলে ওঠল এবং সেই সাথে চোখ খুলল।

'এই আনছি খুকী!' বলে জয়কৃষ্ণ বাইরে গেলেন।

ঠাকুর অগ্রসর হয়ে ওর ললাটে হাত রেখে বললেন, 'কেমন লাগছে তোমার নির্মলা!'

'ভালো। আপনি কখন এলেন?'

'এইমাত্র।' বলে তিনি ওর পাশটিতে বসে গেলেন।

'আপনার আরাম করা দরকার। ওষুধ সেবন করা মাত্রই আমার ঘুম এসে যায়। কেন বাপুজি আপনার কাছে খবর পাঠাননি ?

'না। তার খবর পাইনি। পেলেও তোমাকে না দেখা পর্যন্ত আমার স্বস্তি আসত না। খুব সকালে আমি পুরোহিতজির সাথে আনহলওয়ারা যাচ্ছি। ওখানে বেশ ক'দিন থাকতে হবে। এজন্য এর পূর্বে তোমার হালত জানা দরকার। এই রোগের চিকিৎসা চলতে থাকা দরকার। আসার সময় মনুরাজকে নিয়ে আসব।

'না না। আপনি তাকে তকলীফ দেবেন না। এই দাওয়া সেবন মাত্রই আমার আরাম এসে যায়। আফসোস! আমার জন্য পুরোহিতজি ও অন্যান্য মেহমানবৃন্দের পেরেশান হতে হল।'

'না না। তার কোন পেরেশানী আসেনি। তুমি এখানে সে কথাও জানেন না তিনি।'

'আপনাকে বিদায় জানাতে আমাকে মহলে থাকা দরকার।'

'হ্যাঁ! পুরোহিতজির দর্শন নিলে তোমার মঙ্গল হবে, কল্যাণ হবে। তুমি আরামবোধ করলে সকালে সকালে তোমার জন্য পালকী পাঠাব।

'আমি বিলকুল সুস্থ। আপনি অনুমতি দিলে আপনার সাথেই ....।'

'কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার যে তকলীফ হবে।'

'স্বামীদের সাথে চলতে স্ত্রীদের কোন তকলীফ হয় না।'

ঠাকুরজির হৃদয়ে আনন্দের বান ডাকল। বিয়ের পর থেকে ঠাকুরজি ওর কথাবার্তা ও চাল-চলন দ্বারা এটাই অনুমান করেছেন যে, যাবতীয় বিত্ত-বৈভবের বিনিময়ে তিনি নির্মলার প্রেম খরিদ করতে পারেননি। তিনি কৃতজ্ঞতাবশে অপ্রত্যাশিত পতিভক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখে বললেন, 'তাইলে চলো। আমার কাছে এর চেয়ে খুশীর সংবাদ আর কি হতে পারে।'

এদিকে জয়কৃষ্ণ পানির মটকা নিয়ে কামরায় প্রবেশ করলেন। নির্মলা মটকা হাতে নিল। ঠাকুরজি বললেন, 'আপনি এজাযত দিলে ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।'

'নির্মলার তবিয়ত ঠিক থাকলে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এখন .. ?

নির্মলার ক'ঢোক পানি গলাধঃকরণ করে বলল, বাবা! ঠাকুরজি অতি প্রত্যুষে পুরোহিতজির সাথে মহারাজার কাছে যাচ্ছেন। তাঁকে বিদায় জানাতে আমার মহলে যাবার প্রয়োজন। তাজা হাওয়ায় পায়দল চললে তবিয়ত আরো ফুরফুরে হয়ে যাবে।'

'কিন্তু কথাটা কেমন হলো। যাক মা। তোমার যা মন বলে-তাই করো।'

ঠাকুরজি ও নির্মলা মহলের দিকে রোখ করছিলেন। ঠাকুর ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়লেও মনে মনে খুব খুশী। জয়কৃষ্ণের মহল থেকে বেরোনোর পর তিনি নির্মলার হাত নিজের হাতের মুঠোয় পুরে বললেন, 'নির্মলা! এখন থেকে আমার প্রতি কদমে তোমার সাহারা নিতে হবে।'

নির্মলা আস্তে জবাব দিল, 'আপনার সেবা আমার ওপর ফরয।'

ঠাকুর ওর হাতে দু'ঠোঁট নামিয়ে বললেন, 'তুমি আমার দেবী নির্মলা। তোমার এই পূজারী এ ছাড়া আর কিছু চায় না যে, তুমি তাকে ঘৃণা না কর।'

নির্মলা অনুধাবন করছে, কে যেন ওর হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার বসিয়ে দিয়েছে।

নির্বাক নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে ও। আচমকা হাত গুটিয়ে বলে, 'চলুন!'

ঠাকুরজি মনক্ষুণ্ন হয়ে বলেন, 'জানি, নির্মলা! আমার সাদা চুলের সাথে তোমার প্রেম হতে পারে না। আমি তোমার কাছে স্রেফ করুনা ভিক্ষা চাই।' নির্মলা আহত কণ্ঠে বললো, 'অমন কথা মুখে আনবেন না। আগামীতে আপনাকে অভিযোগ করার মওকা দেবনা। চলুন! আপনি বড্ড ক্লান্ত।'

'না না। তোমার প্রতি কোন অভিযোগ নেই আমার। এক পূজারী তার দেবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস করতে পারে কি ? বলে ঠাকুর ওর সাথে থপথপ করে হেটে চললেন।

॥ ছয় ॥

মহলে এসে ওরা জানল, পুরোহিতজি তখনও পৌছুননি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো নির্মলা। উপর তলার এক কুঠরীতে উপনীত হলে ঠাকুরজি ওকে বললেন, 'নির্মলা! সকাল হয়ে আসছে তুমি ঘুমাও। পুরোহিতজি এলে আমি তোমাকে ডেকে দেব।'

'আরাম তো আমার চেয়ে আপনার দরকার বেশী। পুরোহিতজির দেরী করে আসার সম্ভাবনা বেশী। খানিক আরাম করে নিন। সকালে দূরপাল্লার সফর। আমি তো সারাদিনই ঘুমিয়ে কাটাতে পারব।'

ঠাকুর কান্তিতে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তিনি শুতে গিয়ে বললেন, 'আমার কোমড়টা ব্যথায় মোচড়াচ্ছে। জিরিয়ে নেই খানিক। ঠাকুর শুয়েই নাক

ডাকা শুরু করলেন। চেরাগের আবছা আলোয় নির্মলা ওর পতির চেহারার দিকে তাকাল এবং আপনার চোখ বন্ধ করে নিল। কল্পনার রঙিন পাখায় ভর করে নিকট অতীতে ফিরে গেল সেই সাথে। ফিরে গেল সেই অতীতে রণবীরের সপ্নে যা ভরপুর। চলে গেল বিগত সেই স্বপ্নতটে নবযৌবনপুষ্ট উদ্দীপিত অনুরাগ যেখানে মাথাকুটে মরত। সেই খুইয়ে বসা সময় মঞ্চে যাতে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয় যা ওকে আহ্ ও আঁসূর পুঁজি দিয়ে ভবিষ্যতের ভয়ানক প্রান্তরে ঠেলে দিয়েছে। নির্মলার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। উঠে বেলকনির দিকে এগিয়ে যায় ও। গণ্ড বেয়ে পড়া অশ্রু মুছে তাকায় খোলা আকাশের দিকে। পূর্ব আকাশে সুরাইয়া সেতারা উঠছে।

ক্রমশঃ তারকার দীপ্তি ম্লান হতে চলেছে। রাতের তিমিরতা ভোরের আলোকচ্ছটার সামনে মাথাকুটে মরে বিদায় নিচ্ছে। এ সময় মহলের বাইরে সম্মিলিত ঘোড়ার পদধ্বনি শোনা গেল এবং সাথে সাথে ও কজন সওয়ারকে মহলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। আরো দেখল কিছু সওয়ার আস্তাবল থেকে বেরিয়ে কোথাও চলে যাচ্ছে। নির্মলা মন্দিরে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখল পুরোহিতজি মহলের দিকে আসছেন। ও জলদি ঠাকুরের বাবু নাড়া দিয়ে বললো, পুরোহিতজি এসে গেছেন। 'উনি নীচতলার কামরায় যাচ্ছেন।'

'ভগবান যেন ওনার সফর মুলতবি রাখার ব্যবস্থা করেন।' বলে তিনি দ্রুত দরোজার দিকে এগিয়ে যান। ঘন্টা খানেক পর ঠাকুরজি এসে দেখলেন নির্মলা ঝিমুচ্ছে, 'ওহ! তুমি এখনো বসে আছো, তোমার শুয়ে যাবার দরকার ছিল।'

'আমি আপনার অপেক্ষাই করছিলাম।'

'আমি আজ যাব না। পুরোহিতজি মুন্নিগড় যাবার এরাদা বদলেছেন। তাঁর তবিয়ত ঠিক নেই। তিনি মহারাজাকে এখানেই ডেকে পাঠাতে চান। তার পয়গাম আমি মহারাজাকে দিয়ে দিয়েছি।'

'আপনাকে জাগানোর পূর্বে মহলের আস্তাবল থেকে কিছু ঘোড়া সওয়ারসহ দ্রুত কোথাও হাওয়া হয়ে যেতে দেখলাম।'

'হ্যাঁ! ওরা পুরোহিতজির দেহরক্ষীবাহিনী। তিনি আমাদের প্রতি রাজা-মহারাজাদের কাছে ওদের পাঠিয়েছেন যেন তারা তাঁর দর্শনের জন্য এখানে চলে আসেন। পুরোহিতজি আমাকে বিস্ময়কর একটা কথা বলেছেন।'

'কি সেটা ?'

'বলেছেন, খুবছুরত এক মেয়ে সোমনাথে দাসী হয়ে এসেছিল, কিন্তু পূজারীরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারে, সে মুসলিম গোয়েন্দা। সুতরাং তাকে গ্রেফতার করা

হয়। বেশ কিছুদিন হয় সে কয়েদখানা থেকে পালিয়েছে। এর দ্বারা বোঝায় মন্দির-রক্ষা বাহিনীর কিছু লোক ওদের দলে ভিড়েছে। সোমনাথের গুপ্তচররা তাকে অনেক খোঁজাখুজি করেছে। কিন্তু তারা জানতে পেরেছে যে, সে আমাদের শহরের কোথাও আত্মগোপন করে আছে। আমার অবশ্য এ কথায় তেমন কোন বিশ্বাস আসেনি। এতদসত্ত্বেও আমি খানা তল্লাশীর হুকুম দিয়েছি– নিতান্তই তাকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে। এক্ষণে আমার সেপাইদের সহায়তায় পূজারীরা খানা তল্লাশী চালাবে। সেই মেয়েটা পাওয়া গেলে তার অন্যান্য সহকর্মিদের খোঁজ নেয়ার জন্য তাকে সোমনাথে নিয়ে যাওয়া হবে। সোমনাথে দুশমনের চর পরিস্থিতিকে মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। আমি শহরে ঢোল পিটানোর এরাদা করেছি। মেয়েটাকে ধরে দিতে পারলে এনাম দেব বলেও স্থির করেছি। যাও তুমি শুয়ে পড়। পুরোহিতজি মধ্যাহ্নের পূর্বে আজ কারো সাথে দেখা করবেন না।'

নির্মলা কিছু বলতে যাচ্ছিল এমতাবস্থায় জনৈক বৃদ্ধা হন্তদন্ত হয়ে কামরায় দাখেল হলো। তার পোশাক ছিন্ন ভিন্ন। চেহারায় মারার দাগ।

ঠাকুরজি তাকে দেখামাত্রই চিনে ফেললেন। এ তার পুরানো চাকরানী। রামনাথের ঘরে তাকে পাঠিয়েছিলেন। বৃদ্ধা ফুঁপিয়ে কেঁদে ঠাকুরজির পায়ে পড়ল। আরো কিছু চাকর-চাকরানী পেরেশান হয়ে দরোজার বাইরে দাঁড়ান। বৃদ্ধার দু'হাত ধরে ওঠালেন তিনি। বললেন, এ অবস্থা কেন তোমার ?'

'মহারাজ! দস্যুরা আমাকে মারধর করেছে। শেষরাতে ওরা হাবেলীতে প্রবেশ করে। চৌকিদার ও তিন চাকরকে ওরা হত্যা করেছে। আরেক চাকরের অবস্থা আশংকাজনক। দস্যুরা আমাকে এবং চৌদিকার ও মালি-বৌকে এক কামরায় আটকে রাখে। নাঙ্গা তলোয়ারের প্রহরায় দু'জন আমাদের পাহারা দেয়। অন্য ক'জন আমাদেরকে বলে, তোমাদের সর্দার বৌ কোথায়? কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছো –বলো। মহারাজ! আমরা কিছু জানিনা– সে কোথায় তাও আমাদের জানা নেই। বলেছিলাম রাতের বেলায় তিনি ছিলেন। হাবেলীর বাইরে তো তাকে যেতে দেখিনি। কিন্তু তারা একথা মানতে রাজী নয়। বললো, নিশ্চয়ই তাকে কোথায়ও লুকিয়েছো। পরে তারা মহলের কোণে কোণে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু সাবিত্রী কোথাও নেই। অতঃপর দরোজা বন্ধ করে আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। মালি-বৌ ও চৌকিদারের স্ত্রী একথা বলে রেহাই পায় যে, তাদের ঘর মহলের অপর কোণে। রাতে কেবল আমি সাবিত্রীর খেদমতে ছিলাম। ওরা আমাকে ক্ষেতে নিয়ে যায়। ওরা আমাকে মেরে বেহুশ করে ফেলে। হুশ ফিরে পেয়ে দেখি ওখানে কেউ নেই। ভয়ে আমি হাবেলীতে যাইনি। এ পর্যন্ত আসতে বেশ ক'বার যমীনে আছড়ে পড়েছি।'

'আমার শহরে কার এমন দুঃসাহস যে এমন স্পর্ধা দেখায়! তুমি তাদের কাউকে চিনতে পেরেছ? বললেন মহারাজ ,

'না মহারাজ! ওদের মুখে ছিল গালপাট্টা।'

'সংখ্যায় কত ছিল? '

'মহারাজ! জনা আষ্টেক লোক হাবেলীর ওপর চড়াও হয়েছিল। তিন জনকে দেখেছিলাম ক্ষেতে।'

'সর্দার রামনাথের বৌ সম্পর্কে তাহলে তুমি কিছুই জানো না ?'

'জী-না মহারাজ! কিছুই জানিনা, রাতে শোয়ার পূর্বে তাকে কামরায় দেখেছিলাম।'

'আচ্ছা এখানেই থাক তুমি!' বলে ঠাকুরজি দরোজার দিকে এগিয়ে যান। নওকরদের ঠেলে বেরিয়ে যান।

দুপুরের দিকে শহরের ঘোষকরা হামলাবাজ দস্যু, রামনাথের স্ত্রী ও সোমনাথ থেকে পলাতক মেয়ের সন্ধানদাতার নামে পুরস্কার ঘোষণা করছিল।

॥ সাত ॥

দুপুরের সামান্য পরে পেয়ারলাল একটি ছোট বসতিতে প্রবেশ করল। একটানা সফরের ক্লান্তিতে ও নেতিয়ে গেছে। ঘোড়া দম ফেল করেছে। গাঁয়ের চৌপালের বাইরে মানুষের নাতিদীর্ঘ বৈঠক। পেয়ারলাল গ্রাম্য লোকদের থেকে কাজ আদায় করার কৌশল জানত। ক্ষণিকের মধ্যেই লোকজনকে হাত করে ফেলে ও এবং তারা ওর ঘোড়ার দানা পানির ব্যবস্থা করে। ওর নিজের জন্য নিয়ে আসে মাখন, রুটি ও লাচ্ছি। ক্লান্তি কাটাতে ও বিশ্রাম নেয় খানিক। জনৈক বৃদ্ধ প্রশ্ন করে। 'মহারাজ! আপনি কোত্থেকে?'

'মহারাজ' শব্দ শুনে পেয়ারলাল হৃদয়ে এক ধরনের পুলক জন্মাল। বললো, ' তোমরা মুন্নিগড়ের ঠাকুরজিকে চেন?'

'কে না তাকে চিনে মহারাজ! আপনি তার ...... '

পেয়ারলাল তার কথা কেটে বললো, 'দেখ ভাই! তুমি আরাম করে বসো।'

বয়োবৃদ্ধ এক লোক বললো, 'মহারাজ! আপনার ঘোড়া খুবই ক্লান্ত। অনুমতি দিলে ওর জিন খুলতাম।'

গর্দান উঁচিয়ে হাকিমের সুরে বললো সে, 'না! আমি এখনই রওয়ানা করব। আরেক বৃদ্ধ বললো, 'মহারাজ! আপনার ঘোড়াটি খুবই খুবছুরত।'

পেয়ারলাল বললো, 'তোমরা ওকে ছুটন্ত অবস্থায় দেখনি। এক সন্ধ্যায়ই আমরা মুন্নিগড় থেকে এখানে পৌঁছেছি, পথে কোথাও যাত্রাবিরতি করিনি।'

'এত তাড়াতাড়ি!' গ্রাম্য লোকেরা হয়রান হয়ে বলে ওঠে।

'তা ছাড়া আর কি।'

গ্রাম্য লোকেরা একের পর এক উঠে ওটির আপাদমস্তকে স্নেহপরশ বুলাতে মেতে ওঠল। সাদাসিধে জনৈক গ্রাম্য লোক জিজ্ঞাসা করল, 'মহারাজ! এটির দাম হতে পারে কি পরিমাণ?'

'কেন কিনতে চাও নাকি ?'

পেয়ারলাল রাগতস্বরে তাকাল।

'না মহারাজ! এমনিতেই প্রশ্ন করছিলাম।'

খানিক পর দ্রুতগামী এক ঘোড় সওয়ারকে আসতে দেখা গেল। ওরা সকলে দাঁড়িয়ে গেল। ওদের দেখাদেখি উঠে দাঁড়াল পেয়ারলালও। কিছুক্ষণের মধ্যে সওয়ার চৌপালের নিকট পৌছে গেল। কিন্তু তাকে বারণ করার কোশেশ করল না। গ্রাম্য লোকেরা এদিক সেদিক সড়ে গেল। ঝড়ের বেগে সওয়ার স্থানটি অতিক্রম করল। পেয়ারলাল চিৎকার দিল, 'মহারাজ! রামনাথ,! দাঁড়ান! দাঁড়ান!! রামনাথ! রামনাথ!!'

কিন্তু রামনাথ দিগন্তপ্রসারী ধুলিঝড় উড়িয়ে ওদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। পেয়ার ওর পিছু নিল। কিন্তু রামনাথের ঘোড়ার গতির সামনে ওর ঘোড়াকে খুবই অসহায় মনে হলো। ওর বিশ্বাস, রামনাথ দম নিতে কোথাও দাঁড়াবেন নিশ্চয়ই। পথিমধ্যে বসতি ও লোকজন দেখলে তাদের কাছে রামনাথের কথা জিজ্ঞেস করত। ওর ঘোড়ার গতি ক্রমশঃ শ্লথ হয়ে আসছিল। পেয়ারলাল এটির গতিবৃদ্ধির জন্য পদাঘাত করতেই ও'টি লম্ফন কুর্দন করতে করতে বসে গেল। বাধ্য হয়ে সে পায়ে হাটতে লাগল। এলাকাটা ঘণ ঝোপঝাড়ে ও গাছ-গাছালিতে ঠাসা। আধাক্রোশ চলার পর ও কোথাও ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি শুনতে পেল। সরুপথ এড়িয়ে ও তাই খোলা ময়দানে এল। জনা পনের সশস্ত্র লোক এগিয়ে আসছে। ও তখন ভয়ে গাছে ওঠল। ধুলিঝড় উড়িয়ে এরা অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘোড়ার লাগাম ধরে ও পুনরায় সরুপথে এলো। ক্লান্ত ঘোড়া গর্দান নীচু করে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। কদ্দুর চলার পর গাধার পিঠে সওয়ার জনৈক বুদ্দুর সঙ্গে দেখা। পেয়ারলাল ওকে হাতের ইশারায় থামিয়ে বললো, সামনের গাঁও এখান থেকে কত দূরে?'

'মহারাজ! তা ক্রোশ দুয়েক তো হবেই।'

'রাস্তায় কোন সওয়ার দেখেছ কি ?'

'অনেক দেখেছি। এই মাত্র বিরাট একদল সওয়ার গেছে। আপনিও হয়ত তাদের দেখে থাকবেন।

'হ্যাঁ! কিন্তু তারা কারা ?

'জানিনা মহারাজ। গ্রাম থেকে বেরিয়ে ওদের সাথে সাক্ষাৎ। ৪০/ ৫০জন সেপাই ঘোড়া দৌড়ে আমার সামনে থেকে অতিবাহিত হয়। দেখলাম তারা সুঠামদেহী এক সওয়ারকে ঘিরে নেয়। গাধার পিঠ থেকে নেমে ঝোপের আড়ালে লুকোই গিয়ে। সেপাইরা তার অস্ত্র ফেলে দিতে আহবান জানাল কিন্তু সে অস্বীকার করল। বললো, কার হুকুমে তোমরা গ্রেফতার করতে এসেছ–তা না জানা পর্যন্ত অস্ত্র ফেলব না।'

পেয়ারলাল তার কথা কেটে বলল, 'ওই সওয়ারের ঘোড়ার রং কি মেটে ছিল ?'

'জী হ্যাঁ!'

'আচ্ছা এরপর কি হলো ?'

'অতঃপর এক লোক অগ্রসর হলো। তার চেহারা ছুরত অবিকল মুন্নিগড় পূজারীর মত। সে বলল, তোমাকে গ্রেফতার করে মুন্নিগড় নিয়ে যেতে চাই। ওখানে গিয়েই জানতে পারবে কি অপরাধ তোমার। কিন্তু সওয়ার বললো, আমি তো মুন্নিগড় যাচ্ছি। তোমরা আমার পেছনে চললেই পার। এরপর এক সেপাই বললো, আমরা সোমনাথের সেপাই। পুরোহিতজি মহারাজের হুকুমে তোমাকে বন্দী করতে এসেছি। আনহলওয়ারা মহারাজা কিংবা মুন্নিগড়ের ঠাকুর তোমার মদদ করবেন–এ আশা ছেড়ে দাও। এ কথা শোনা মাত্রই সে তলোয়ার বের করে একদিকে কেটে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু এক সেপাইয়ের নেযা ওর ঘোড়ার গরদানে লাগলে সেটি দু'তিন লাফ মেরে পড়ে গেল। সওয়ার নিজকে সামলাতে পারল না। সেপাইরা ওর চারপাশে নেযা তাক করে দাঁড়াল। এক্ষণে আত্মসমর্পন করা ছাড়া ওর সামনে আর কোন উপায় নেই। জনা তিনেক সেপাই ঘোড়া থেকে নেমে ওকে শক্ত রশির দুশ্ছেদ্য বাঁধনে আটকাল। এক সেপাই আমাকে দেখে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। 'আমি গরীব গ্রাম্য মানুষ, আপনাদের ভয়তে এখানে পালিয়েছি' বললে আমাকে ছেড়ে দিল। ক'জনে তাকে নিয়ে গেল। আর বাদবাকী অন্য দিকে গেল। আপনি তাকে চিনেন মহারাজ? '

'কাকে ?'

'যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে?'

'না।' বলে পেয়ারলাল ঘোড়ার পদাঘাত করল।

ঘোড়া আস্তে আস্তে চলতে লাগল। পেয়ারলাল লোকটার প্রতি তাকিয়ে বললো, 'ভাই আমার সাথে একটা সওদা করবে কি ?'

'কি সওদা?'

'গাধার বিনিময়ে আমার ঘোড়া নিবে। কোনদিন মুন্নিগড় এলে তোমাকে এনাম দেব। সামনের বস্তিতে বাহন মিলে গেলে তোমার গাধা ফেরৎ দেব।'

লোকটা জবাব না দিয়ে গাধার গর্দানে ডাণ্ডা মেরে ঘন ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ আট ॥

পরদিন।

দুপুর বেলা।

নির্মলা ওর কক্ষে বসা।

ওর চেহারায় পেরেশানী ও ক্লান্তির ছাপ।

ঠাকুর রঘুনাথ এ সময় কামরায় দাখেল হন এবং নির্মলার সম্মুখে একটি চেয়ার পেতে বসে বলেন, 'আমার কিছুই বুঝে আসছে না। পুরোহিতজি রামনাথের অন্যায় প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন কেন ?

'আপনি রামনাথের সাথে কথা বলেছেন?' বলল নির্মলা।

'না। পুরোহিতজি ওর সাথে কাউকে দেখা করতে দিচ্ছেন না। মন্দিরের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ও। দরোজায় পুরোহিত ফৌজের প্রহরা। শহরে কারো মন্দিরের কাছে আসার অনুমতি নেই।'

'আপনার শহরের এক লোককে কেন গ্রেফতার করা হলো–এ কথাটুকু জিজ্ঞেস করারও কি অধিকার নেই আপনার ?'

'পুরোহিতজির সামনে আমার সমস্ত অধিকার মাথাকুটে মরতে বাধ্য।'

'আপনি অত্র শহরের হাকেম। রামনাথ কোন অন্যায় করে থাকলে তাকে আপনার আদালতে পেশ করার কথা। তাও সে যেনতেন লোক নয়, মহারাজার দোস্ত।'

'পুরোহিতজি চাইলে আমাকেও গ্রেফতার করতে পারেন।'

'খামাকাই। কোন প্রকার অন্যায় ছাড়াই ?'

'পুরোহিতজি নিরপরাধ একটা লোককে গ্রেফতার করেছেন–একথা ভাবছ কেন তুমি?'

'না, আমার ভাবাভাবির দরকার নেই। আমি নিশ্চিত রামনাথ নিরপরাধ। অপরাধ করলেও সেটা এমন যা প্রকাশ পেলে পুরোহিতের মুখে চুনকালি পড়বে।'

'ঠাকুরজি রাগতস্বরে বললেন, 'নির্মলা! ভগবানের দিকে চেয়ে সাবধানে কথা বলো। মহলের কোন নওকরের সামনে এ ধরনের কথা বলতে যেও না।'

'আমার ওপর রাগ না করে পুরোহিতজিকে জিজ্ঞেস করুন- মন্দিরের দেবী মহাদেবের চরণে পৌঁছার পর কি করে আবার দুনিয়াতে জীবিত ফিরে আসে ?

'উহ্ নির্মলা! তোমার কি হলো আজ। ভগবানের দিকে চেয়ে আমায় পেরেশান করো না। কিছুই বুঝে আসছেনা আমার।'

নির্মলা কিছু বলতে চাচ্ছিল এমতাবস্থায় জয়কৃষ্ণকে দরোজার সামনে দেখা গেল। ঠাকুর উঠে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। কাছটিতে বসিয়ে তাকে বলেন, 'আপনাকে ডেকে পাঠাতে চাচ্ছিলাম। নির্মলা আজ কেমন যেন আবোল তাবোল বকছে। কেউ বোধহয় ওকে পুরোহিতজির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। ওকে আরো বোঝান যে, পুরোহিতজির বিরুদ্ধে মনে কুখেয়াল পোষণ করাও পাপ।'

জয়কৃষ্ণ না জানার ভান ধরে বললেন, 'নির্মলা! কি অভিযোগ তোমার পুরোহিতজির বিরুদ্ধে?'

'কিছু না বাবা! আমি তাকে স্রেফ এতটুকু বলেছি যে, রামনাথের কোন অন্যায় থাকলে তাকে কেন ঠাকুরজির আদালতে পেশ করা হচ্ছে না? কি ভয় তাঁর এতে?'

'দেখ নির্মলা! তোমাকে শেষ বারের মত বলছি। পুরোহিতজির বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না। কিছুতেই না।' বললেন ঠাকুরজি।

নির্মলা দ্রুত ওখান থেকে কেটে পড়ল। ঠাকুরজি পেরেশান হয়ে জয়কৃষ্ণকে বললেন, 'আমার কিছুই বুঝে আসছে না। ওর আজ কি হোল ভগবানই ভালো বলতে পারেন ?

'নির্মলার কথায় আপনি কিছু মনে নিবেন না। ও বহুত রহমদিল। কনৌজে থাকাকালেও ও নিকৃষ্ট দুশমনকে সাজা দেয়ার স্থলে তাকে বাঁচাতে কোশেশ করত। ব্যাপারটি আমি সমাধা করব।'

রঘুনাথ চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললেন, 'আপনারা কথা বলুন! আমি একটু নীচ থেকে ঘুরে আসি।'

ঠাকুরজি চলে গেলে জয়কৃষ্ণ ওপাশের কামরায় চলে গেলেন। নির্মলা বেলকনিতে দাঁড়িয়ে খোলা আকাশে তাকাচ্ছিল। জয়কৃষ্ণ ওর কাছে গিয়ে বললেন, 'খুকী! আগুন নিয়ে খেলা করার কোশেশ করো না। একথা পুরোহিতের কানে গেলে

আমাদের রক্ষা নেই। আমাদের কৃতকর্ম ফাঁস হলে তার ফৌজ কনৌজ সীমান্ত পর্যন্ত রূপাবতির খোঁজ নিবে। আমাদের জন্য না হলেও কমপক্ষে রূপাবতির জন্য বেশ কিছুদিন তোমাকে মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে হবে।'

অশ্রুসজল নয়নে নির্মলা বললো, 'কিন্তু বাবা! ওরা রামনাথকে হত্যা করে ফেলবে। সেমতাবস্থায় রূপাবতি কি নিয়ে বাঁচবে?'

'পুরোহিত ওকে হত্যা করবেন না। রূপাবতিকে পাকড়াও করার আগ পর্যন্ত তো নয়ই। রামনাথের জীবন হুমকির মুখে নয়। খোশ কিসমত বলতে পার যে, রূপাবতিকে মুন্নিগড় ও রামনাথের জায়গীরে তালাশ করা হচ্ছে। পথিমধ্যে পেয়ারলালকে পাকড়াও করে ওর কাছে দেয়া তোমার পত্র ফাঁস হলে আমাদের ধ্বংসের জন্য সেটা যথেষ্ট হত। এখনও আমার ভয় হয় যে, পেয়ারলালের মত নওকরের কাছ থেকে সত্য উদঘাটন তাদের জন্য তেমন কঠিন কিছু নয়।

তুমি ঠাকুরজির সাথে অমন কথা বলতে যেও না। রামনাথের জন্য যা করার তা আমরা করেছি। এক্ষণে ভগবানই পারেন ওকে রক্ষা করতে। ওকে বাঁচানো আমাদের সাধ্যাতীত। ওয়াদা করো তুমি সাবধানতা অবলম্বন করবে।'

'ওয়াদা করছি বাবা!' চোখের কোণে জমাট আসু ওড়নায় মুছে বললো নির্মলা।

॥ নয় ॥

মুন্নিগড় শিবাজী মন্দির বিস্তৃতি ও নির্মাণ শৈলীর দৃষ্টিকোণে ভারত বিখ্যাত। পাথুরে দেয়ালের মাঝে বিশাল একটি দীঘি ছিল। ঐ দীঘির মাঝখানে পানির মধ্যে চতুর্ভূজ মন্দির। এর সোনালী দীপ্ত আভা দূর সুদূরের দর্শকদের নযর কাড়ত। এর মধ্যে এক সহস্রাধিক মূর্তি স্থাপিত ছিল। মূল মন্দিরে পৌছার পথে মরমর পাথরে গাঁথা রাস্তা ছিল। প্রাত্যহিক হাজারো তীর্থযাত্রী ঐ দীঘিতে পবিত্র স্নান করত এবং পরে পবিত্র দেহে মূর্তির জন্য নিয়ে যাওয়া মানত ঠুকত। ভারতবর্ষের অপরাপর মন্দিরের মত শিবাজী মন্দিরের পূজারীরাও সোমনাথের পুরোহিতকে তাদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়েছিল এবং বার্ষিক একটা হারে তাদের অর্জিত কানা-কড়ির অংশ দিত।

বিগত দু'দিন ধরে এই মন্দিরে পুরোহিতজির পদধুলিতে সাজ সাজ রব। মন্দিরের গোটা দরোজা সাধারণ তীর্থ যাত্রীদের জন্য রুদ্ধ। এমনকি খণ্ডকালীন পূজারীদেরও মন্দিরে আসা নিষেধ। মূল ফটকে সোমনাথ সেপাইয়ের প্রহরা। সোমনাথ পুরোহিত, তার ভাবশিষ্য ও এই মন্দিরের কিছু পূজারীরা ছাড়া অন্য কেউ

জানেন না, ভেতরে হচ্ছেটা কি!' সাধারণ জনতা স্রেফ এটুকু জানত যে, রামনাথকে সাধারণ এক কয়েদি হিসাবে বন্দী করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই সোমনাথের বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্রের ফর্দ জনসম্মুখে প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

মন্দিরের এক পিলারের সাথে রামনাথকে বেঁধে রাখা হয়েছে। জনৈক সেপাই ওর খোলা পিঠে চাবুক মারছে। সোমনাথ পুরোহিত ও ক'পূজারী ওর নিকটে দণ্ডায়মান। রামনাথের মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেলে হাতের ইশারায় জল্লাদকে বারণ করলেন পুরোহিত। তিনি রামনাথের চুল ধরে বললেন, 'বলো সে কোথায়?'

চোখ খুলে রামনাথ জবাব দেয়, 'আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তোমার বাহানা তালাশ করার দরকার ছিল না। আমি তাকে মহলেই রেখে গিয়েছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে সে যদি গায়েব হয়ে যায় তাহলে আমার চেয়ে তো তোমার পেটুয়া বাহিনীর তা জানার কথা অধিক।'

জনৈক পূজারী বললো, 'মহারাজ! এ বড় শক্তপ্রাণ। দিমাগ ওর ঠিক আছে কিনা সন্দেহ।'

দিমাগ খুব শীঘ্রই ঠিক হবে ওর। বলে তিনি সেপাইয়ের দিকে ইশারা করতেই সে সপাং সপাং করে কোড়াঘাত করতে লাগল।

খানিকবাদে রামনাথের ওপর বেহুশী প্রভাব পড়লে পুরোহিতজি আরেকবারের মত সেপাইকে বারণ করলেন এবং পানি আনতে বললেন। সেপাই দীঘি থেকে এক বালতি পানি এনে রামনাথের নিকটে রাখল এবং পেয়ালা ভরে ওর মুখে ছোঁয়াল। রামনাথে ঠোঁটে জিহবা চেটে চোখ খুলল। এক ঢোক পান করার পূর্বেই পুরোহিত পেয়ালা সড়িয়ে নিলেন এবং পেয়ালাটি মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে গেল। পুরোহিত বললেন, 'জলপান করতে চাইলে আমর প্রশ্নের জবাব দাও।'

রামনাথ ভাঙ্গা গলায় বললো, 'তুমি যদি আমার জায়গায় রশিবদ্ধ থাকতে আর ঐ জলের পেয়ালা আমার হাতে থাকত তাহলে শহরবাসী জানত, রূপাবতি কোথায়?

'এটা তোমার জন্য আখেরী মওকা। এরপর তোমার জন্য আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দরদ উতলাবে না।' বললেন পুরোহিতজি।

রামনাথ খানিক ভেবে বললো, 'তুমি আমার কাছে রূপাবতির সন্ধান চাচ্ছ, কিন্তু কামিনী সম্পর্কে কিছু জানতে চাচ্ছ না যে?'

পুরোহিতের চেহারা আচমকা কালো হয়ে গেল, অসহায় দৃষ্টিতে তিনি এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। বললেন, কামিনীর ব্যাপারে তুমি কি জানো?'

'কামিনী সম্পর্কে আমি এটুকু জানি যে, তোমার পেটুয়া পূজারীরা যখন তাকে তথাকথিত মহাদেবের চরণে পৌছে দিতে যাচ্ছিল পথিমধ্যে তখন তাকে অপহরণ করা হয়। বিনিময়ে মহাদেবের চরণে ক'পূজারীকেই পাঠানো হয়েছিল। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আরো কিছু জানতে চাইলে আমাকে মুন্নিগড়ের ঠাকুর ও মহারাজার কাছে নিয়ে চলো। কথা বলো, চুপ কেন হে পুরোহিতজি! তুমি কি জানতে চাও, সোমনাথের দেবী কোথায়? কি হালতে আছে। 'তোমার অন্ধকার দিকটা নিয়ে এত ভয় পাও কেন শ্রী পুরোহিত?' পুরোহিতজি মন্ত্রমুগ্ধের মত রামনাথের কথাগুলো গিলছেন যেন। ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে তিনি সিপাহির হাত থেকে ছড়ি নিয়ে রামনাথকে এলোপাতাড়ি পেটানো শুরু করেন।

'মহারাজ! মহারাজ!' জনৈক পূজারী বললো, 'ও বেহুশ হয়ে গেছে, ওকে জীবিত রাখতে হবে। কামিনীও রূপাবতির মত অর্ন্তধান হলে এর মতলব সোমনাথে রামনাথের সাঙ্গপাঙ্গরা এখনো আত্মগোপন করে আছে। ওকে হত্যা করার পূর্বে আমাদেরকে সব তথ্য উদঘাটন করতে হবে।'

পুরোহিত যমীনে ছড়ি ছুঁড়ে মেরে বললেন, 'এক মুহূর্তের জন্যও ওকে এখানে রাখা চলে না। তোমরা ওকে দ্রুত সোমনাথে চালান করে দাও। পথিমধ্যে কারো সাথে কথা বলতে চাইলে যবান কেটে দিও। রূপাবতিকে তালাশ করে তবেই ফিরব আমি। এক্ষণে তোমরা সফরের তৈরী নাও।'

শেষরাত।

ভেতর আঙিনার দরোজার সামনে গভীর নিদ্রায় মগ্ন শম্ভুনাথ।

তার আশে পাশে দু'নওকর বসে বসে নাক ডাকছে। আসমানে হালকা মেঘের আনাগোনা। পরিবেশ কেমন যেন থমথমে। জনৈক পাহারাদার করিডোরের দিকে অগ্রসর হলো। শম্ভুনাথকে ঝাকুনি দিয়ে জাগিয়ে তোলার কোশেশ করে সে বললো, 'জ্যাঠা শম্ভু! উঠুন রণবীর এসে গেছেন।'

শম্ভুনাথ ধড়ফড়িয়ে উঠে বললো, 'কোথায় কবে এসেছেন ?'

পাহারাদার প্রধান ফটকের দিকে ইশারা করে বললো, 'ঐ দেখুন। ঐ যে আসছেন উনি।' মহলের কিছু নওকরের মাঝে মশালের আলোয় রণবীরকে আবিষ্কার করল শম্ভুনাথ। সে তার সঙ্গীদের জাগাল। পাগড়ী পেঁচিয়ে দ্রুত উঠানে নামল। পাগড়ীটা প্রয়োজনের তুলনায় বড়। উঠানে পৌঁছতে পৌঁছতে তা ঝাড়ুর কাজ দিচ্ছিল। পাহারাদার ভুলে তার পাগড়ী পাড়া দিল। গর্দানে হালকা ঝাকুনি খেতেই পাগড়ী খুলে পরে গেল। অন্য সময় হলে এই গোস্তাখী সে হজম করত না। কিন্তু রণবীরকে আসতে দেখে সে স্রেফ 'গাধা' শব্দটা উচ্চারণ করল। পাগড়ী ওখানেই রেখে টেকো মাথায় অগ্রসর হলো।

'মহারাজ! মহারাজ! আপনি এসে গেছেন ভগবানকে ধন্যবাদ। সেই কবে থেকে শকুন্তলা আপনার পথ চেয়ে।' বলে সে রণবীরের পা ছুঁতে গেল। কিন্তু খপ করে রণবীর তার হাত ধরে ফেলল।

শম্ভুনাথ তার সাথে সাথে চলতে চলতে বলল, 'মহারাজ! আমরা বড্ড পেরেশান ছিলাম। শকুন্তলা দেবী সকাল-সন্ধ্যা আপনার অপেক্ষায় তার কক্ষে মোম জ্বেলে রাখত। আজো গভীর রাত পর্যন্ত সজাগ থেকে ঘুমিয়েছেন। তাকে ডেকে দেই!'

'না জ্যাঠা! আমি খোদ তাকে জাগাব।' বলে রণবীর দরোজার দিকে এগিয়ে গেল, ততক্ষণে অন্যান্য নওকররা দরোজা খুলে ফেলেছে। ভেতর আঙিনায় ঢুকে রণবীর দ্বিতলের সিঁড়িতে চড়তে লাগল। অতঃপর ও আপনার রুমের রৌশন চত্বরে দন্ডায়মান হলো ঠিক ঐ মুসাফিরের মত যে পানিহীন ও শুষ্ক মরুতটে বিচরণ করে অবশেষে আশার খর্জুর বাগানের সন্ধান পায়।

শকুন্তলা আপনার বিছানায় শায়িত। ও মনে করছে সময়ের তিমিরাচ্ছন্নতা কেটে গেছে। ওর বোন এখন এক পূর্ণ নারী। কিন্তু চেহারায় নিষ্পাপত্বের আবীর ছোঁয়া এখনও। রণবীর নিস্পন্দন ও 'থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কৃতজ্ঞতার আঁসু দু'চোখ বেয়ে নামে। শেষে কম্পিত হাত শকুন্তলার ললাটে নামিয়ে দেয়। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে ডাকে। 'শকুন্তলা! শকুন্তলা!

'কে?' চকিতে চোখ খুলে প্রশ্ন করে ও।

'শকুন্তলা! শকুন্তলা! আমি রণবীর।' কম্পিত কণ্ঠ রণবীরের।

শকুন্তলা ক্ষণিকের তরে স্তম্ভিত হয়ে যায়। রণবীর ওর কাছটিতে বসে হাত উঁচু করে ধরে। উঠে ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে ও। 'দাদা! দাদা!' এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারে না। তড়পানো হৃদয়ের উপচানো অনুভূতি কম্পিত ওষ্ঠে জড়িয়ে যায় ওর। কাঁদতে থাকে সুবোধ বালিকার মত। আচমকা রণবীরের দিকে তাকিয়ে দেখে ওর দু'চোখ অশ্রু টলমল।

'দাদা! দাদা! শকুন্তলা খানিক থেমে বলে, 'বলো এ স্বপ্ন নয় তো?'

রণবীর ওর গরদান বুকে চেপে বলে, 'না শকুন্তলা, এ স্বপ্ন নয়। এখন থেকে আর পরস্পরে স্বপ্ন দেখব না। তোমার দাদার জন্য আর মঙ্গল প্রদীপ জ্বালাতে হবে না প্রতি রাতে।'

খানিক বাদে ভাইবোন অশ্রুভেজা মুচকি হাসি হাসছিল। শকুন্তলা বললো, 'দাদা! স্বপ্নে প্রতি রাতে দেখতাম আপনি নির্জন নিশিতে আগমন করছেন ঠিক ঐ খিরকি পথে।'

'একবার ঐ পথে এসেছিলাম কিন্তু এখানে তোমার স্থলে অন্য এক মেয়ে ছিল।'

'জয়কৃষ্ণের মেয়ে! আমি তার সম্পর্কে জেনেছি। আমাদের চাকরানী বলেছে, আমার কক্ষে রাতে লক্ষ্মীদেবী আসা যাওয়া করতেন। সুতরাং আমার মত সেও মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে রাখত। গাঁয়ের মেয়েরা বলেছে, সে জয়কৃষ্ণের মত নয়। আমার অন্তর্ধানে সে খুব দুঃখ প্রকাশ করেছিল। নিছক ওকে খুশী করতেই জয়কৃষ্ণ আমার সন্ধানদাতার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।'

'শকুন্তলা! এক্ষণে শুধু তোমার কথা শুনতে চাই।'

'না দাদা! এখন আপনার আরামের দরকার। আপনি খুবই ক্লান্ত। ঘুমানোর থেকে ওঠার পর আপনার সাথে মন খুলে কথা বলব। এখানে আপনার গরম লাগতে পারে। উপরে খোলা বাতাসে শোয়ার ব্যবস্থা করি।'

'এক্ষণে আমার আরামের দরকার নেই। তোমাকে দেখার পর ক্লান্তি কেটে গেছে আমার।'

'তাহলে কিছু খানা দানার ব্যবস্থা করি।' শকুন্তলা এ কথা বলে ওঠল এবং দরোজার দিকে এগুলো।

'শকুন্তলা! দাঁড়াও! খানার জরুরত নেই। নওকরকে বলো আমার জন্য দই আনতে। খানার ঝামেলা পথিমধ্যে এক সর্দারের ওখানে সেড়ে এসেছি।'

খানিক পর চেয়ারে বসে শকুন্তলা ওর কাহিনী শুনিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

আঁধার কেটে ভোরের আলো ফুটে উঠল। ক'দিন টানা সফরের পরও রণবীরের চোখে ঘুম বলতে ছিল না। আচানক কারো আওয়াজ শুনে শকুন্তলাকে থামিয়ে ও বললো, 'এ কিসের আওয়াজ শকুন্তলা! মনে হচ্ছে এ গ্রামের কোন মুসলিমের আজানের আওয়াজ ? গভীর নযরে ভায়ের প্রতি তাকিয়ে শকুন্তলা বললো, হ্যাঁ দাদা! জনৈক আগন্তুকের আগমন হয়েছে এখানে। তাঁর দ্বারা অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। জ্যাঠা শম্ভুনাথ বলেছেন লোকটার কথায় জাদু আছে।'

'শকুন্তলা! তুমি আরাম করো। আমি একটু ঘুরে আসি।' বলে রণবীর দরোজার দিকে এগিয়ে গেল।

শকুন্তলা পেরেশান হয়ে বললো, 'দাদা! এ সময় আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'এসে বলবো।' বলে বেরিয়ে গেল রণবীর।

শকুন্তলা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে ছাদে টহল দিতে লাগল। আসমানে গুমোট বাঁধা মেঘ। পূর্ব আকাশে সূর্য উঁকি মারছে। কিছুক্ষণ টহল দিয়ে নীচে নেমে আসে ও। জনৈকা চাকরানীকে নাশতা তৈরী করতে বলে আবার উপরে আসে।

'দাদা গেল কৈ! বেশ দেরী হয়ে গেল।' বারবার এ আত্মজিজ্ঞাসা ওর মনে ভেসে ওঠল। অবশেষে ও ছাদ থেকে নেমে মরমর পাথরে বাঁধা বেলকনিতে এসে বসল। 'শকুন্তলা! শকুন্তলা! আচমকা রণবীরের ডাক ওর কানে এলো। ওর মনে আনন্দের শিহরণ। সিঁড়ি বেয়ে রণবীর ওর কাছটিতে এগিলে এলো। 'দাদা' শকুন্তলার কণ্ঠে অভিযোগের সুর। 'বেশ দেরী করেছেন আপনি। কোথায় গিয়েছিলেন ? 'বসো শকুন্তলা! শকুন্তলা বসে গেল এবং জিজ্ঞাসুনেত্রে রণবীরের দিকে তাকাল। রণবীর খানিক থেমে বললো, 'শকুন্তলা! তোমাকে একটা খোশ খবর শোনাতে চাই। আমি ....'

'হ্যাঁ দাদা বলুন! থামলেন কেন ? '

'ভয় করে, তুমি না আবার বিগড়ে যাও।'

'দাদা আপনার ওপর বিগড়ে গেলে আমি বাঁচব কি! আমার ইষ্ট-অনিষ্টের নির্ভরতা আপনার সন্তুষ্টির ওপর। জানি আপনি কি বলতে চান। আপনি মুসলমান হয়েছেন –একথা বলবেন তো ?'

'হ্যাঁ! কিন্তু তুমি জানলে কি করে তা ?'

'তার আগে বলুন আপনি একথা বলতে চেয়েছিলেন কি-না ? '

'হ্যাঁ! এটাই বলতে চেয়েছিলাম।' রণবীর স্নেহের হাত ওর মাথায় বুলালো।

'আর আযান শুনে আপনি নামায পড়তে গিয়েছিলেন ?

'হ্যাঁ!'

'দাদা! আপনার ওপর অভিযোগ। একথা সর্বাগ্রে আমাকে জানালেন না কেন? আপনার দোস্ত আসার পরই একথা আমি জেনেছিলাম।'

'কে ? আব্দুল ওয়াহিদ ?'

'হ্যাঁ!'

'কিন্তু তিনিও তো জানেন না যে, আমি মুসলমান হয়েছি। আমি সেদিনই কলেমা পড়েছি যেদিন তোমার বাড়ীতে পৌঁছার সংবাদ পাই।'

'তিনি অবশ্য আপনার মুসলমান হবার কথা বলেননি। তবে আমার মন বলছিল, তার কোন দোস্তের ধর্ম বৈষম্য থাকতেই পারে না। এমনকি তার প্রাণঘাতি দুশমনও তাকে নিকট থেকে দেখার পর তার ধর্মের প্রতি বিরূপ হতে পারে না।'

'আর আমার ভয় ছিল, আমার আদরের বোন ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে না আবার বিগড়ে যায় এবং টুটি চিপে ধরতে না আসে। আজ বাদ নামায এই দু'আ করেছি, খোদা তোমায় যেন ইসলাম গ্রহণের তৌফিক এনায়েত করেন।'

শকুন্তলার চোখ খুশীতে ডগমগ করে ওঠল। সে বলল, 'দাদা! আপনার দু'আ কবুল হয়েছে। বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকেই আমি ইসলামের সততার উপর ঈমান এনে সেড়েছি। আজই জনপদের সমস্ত নারীদের ডেকে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করব।'

এরপর ভাইবোন চুপচাপ একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। পরে শকুন্তলা দুষ্টুমি ভরা হাসি টেনে বলে, 'আপনি এ কাজে রাগ করবেন না তো দাদা!'

'তোমার কোন কাজে রাগ করেছি কি কোনদিনও শকুন্তলা! তুমি আমার গর্ব। এ ব্যাপারে আমার বোনের হৃদয়টা এত রৌশন জানলে এতদিন দোদুল্যমান থাকতে হত না আমাকে। দোয়া করো খোদা যেন আমাকে ঈমান একীনের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন।

'ভাইয়া! ওকথা আপনাকে বলতে হবে না। আমার তামাম দু'আ সেতো আপনার জন্যই। আমি ছাড়াও গ্রামের অনেক লোক আপনার জন্য দু'আ করে থাকে।

'নামাযে গিয়ে দেখি জামাত শুরু হয়ে গেছে। পেছনের কাতারে দাঁড়িয়েছিলাম। লোকেরা আমাকে দেখে খুশীতে উদ্বেল হয়ে পড়ে। ইমাম সাহেব আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। আমি তার কাছে ওয়াদা করেছি, আজ বাদ জোহর গ্রামের সকল লোকের প্রতি ইসলামের আহ্বান জানাব।'

'ইসলামের মুবাল্লিগের স্ত্রী রোজানাই আমার কাছে এসে থাকেন। তাঁর কাছে ওয়াদা করেছি যেদিন আমার ভাই আসবেন সেদিন খোলাখুলিভাবে সকলের সামনে ইসলাম গ্রহণ করব।'

'মনে কর আমি যদি পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরে না এতাম তাহলে কি করতে ?

'ভাইয়া! আমার ধারণা ছিল ইসলামের রওশন থেকে আপনি চোখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না। '

স্রেফ আব্দুল ওয়াহিদের কথা দ্বারা তোমার এই ধারণা জন্মেছে ?'

'না! শুধু তার কথাই নয় বরং জয়কৃষ্ণের মেয়ের সাথে আপনার চমৎকার ব্যবহার দেখে মনে হয়েছে, আপনার মধ্যে বিরাট এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এ কথা আমি মুবাল্লিগের স্ত্রীর কাছে রাখলে তিনিও বললেন, তোমার ভাইয়ার ইসলাম গ্রহণ সময়ের ব্যাপার মাত্র।'

'ধর্মান্তরনের পাশাপাশি আমি নামও পরিবর্তন করেছি। আজ থেকে তোমার ভাইয়াকে রণবীরের স্থলে ইউসুফ নামে ডাকবে।

'ইউসুফ! বাহ্ চমৎকার নাম তো ভাইয়া– আমরা উভয়ে নতুন নামে পরিচিত হব।'

'এখনও তোমার কোন নাম চিন্তা করিনি।'

'সে চিন্তা আপনার না করলেও চলবে। মুবাল্লিগের স্ত্রী আমাকে মুবাল্লদা বলে ডাকেন। আর নামটি আমার পছন্দেরও।'

সারাদিন জনপদের মানুষের মুখে মুখে এ নাম চর্চা হতে লাগল। এ সপ্তাহের মধ্যে জনপদের অর্ধেক লোক ইসলাম গ্রহণ করল এবং মাটির যে কুটিরে ৮/১০ জন লোক নামায আদায় করত সেখানে একটি মসজিদ নির্মিত হতে লাগল।

রণবীরের নওকরদের মধ্যে শম্ভুনাথ এগিয়ে এলো ইসলামের প্রতি। রণবীর ও শকুন্তলার ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে সে মুবাল্লিগের কাছে এলো। বললো, ইউসুফ শব্দের অর্থ কি ?'

'ইউসুফ এক নবীর নাম।' বললেন মুবাল্লিগ।

'নবী, সে আবার কারা ?'

'মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে সব মহামানবকে প্রেরণ করেছেন– নবী তাঁরাই।'

'ইউসুফের কোন নওকরের নাম আপনার স্মরণ আছে কি ?'

'না তাঁর কোন নওকরের নাম এ মুহূর্তে বলতে পারছি না। কিন্তু কেন ?'

'মহারাজ! আমার সর্দার মুসলমান হয়েছেন। নাম বদলে রেখেছেন ইউসুফ। আমি মুসলমান হতে চাই। আমার নামটাও বদলে দিন।

'আগে মুসলমান হোন। পরে নামের চিন্তা করা যাবে।'

'আমি প্রস্তুত।'

খানিকবাদে শম্ভুনাথ মহলে ফিরে এলো। নওকররা তার পাশে সমবেত হলে তার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করল। বললো, 'তোমার নাম ইব্রাহীম। সকলে ভালো করে শুনে নাও। যে আমাকে শম্ভুনাথ বলেছ- তার আর রক্ষা নেই।'

॥ তিন ॥

ইউসুফ সারাদিন মসজিদ নির্মাণে ব্যস্ত থাকল। সময়ে সময়ে আশে পাশের বসতিতে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিত। যুবায়দা মুবাল্লিগের স্ত্রীর থেকে কুরআন শিখেছিল। গাঁয়ের নও মুসলিম মহিলাদের জন্য তার মহলের দরোজা খোলা থাকত। তারাও ওর সাথে দরসে কুরআনে বসত।

রাতে শোয়ার পূর্বে ভাইবোন দীর্ঘক্ষণ আলাপ করত পুরানো দিনের কথা। যুবায়দা ইউসুফকে তার মুসিবতকালীন কাহিনী শোনাত আর ও শোনাত নন্দনার বন্দীদশার করুন কথা। ইউসুফের অধিকাংশ কথার মধ্যে জুড়ে থাকত আব্দুল ওয়াহিদের নাম। ভায়ের মুখে আব্দুল ওয়াহিদের অগাধ-ভালবাসা ও ভক্তি শ্রদ্ধার প্রসংগ দেখে ওর অনুরাগে প্রবৃদ্ধি হত শনৈঃ শনৈঃ। শেষ সাক্ষাতের পর আব্দুল ওয়াহিদ ওর আশা-আকাংখার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায়। ভবিষ্যতের কাণ্ডারী হিসাবে তাকে কল্পনা করে। কিন্তু মাঝে মধ্যে ভায়ের কথা শুনে মনে হয় ও শুধু স্বপ্নপুরীতে বিচরণ করে ফিরছে। মাঝে মধ্যে ভাবে, 'আব্দুল ওয়াহিদ দাম্ভিকদের মস্তকচূর্ণ করতে, অসহায়ের সহায় হতে, নিরন্নকে অন্ন দিতে, মজলুমের অশ্রু মুছতে এবং পথহারা জাতিকে পথ দেখাতে জন্ম নিয়েছেন। আমার সৌন্দর্য তার মাঝে প্রভাব ফেলবে না এতটুকু। আমার স্থলে অন্য কোন মেয়ে মুসিবতে পড়লে তাহলে হয়ত

সে তাঁর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতো।' এই ভাবনাজাল বুনতে বুনতে ও 'থ হয়ে বসে থাকত। পরে আবার সাক্ষাতের পয়লা দিনটির কথা মনে পড়ত। ও ভাবে, সেদিন আমাকে দেখে উনি স্তম্ভিত হয়ে গেছিলেন কেন ? আশা কে? আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন কেন ?

একদিন ইউসুফ নন্দনার কোন কয়েদীর কাহিনী শোনাচ্ছিল। যুবায়দা সহসাই প্রশ্ন করে,

'ভাইয়া! আব্দুল ওয়াহিদের স্ত্রী কি জীবিত ?'

'এখন পর্যন্ত তার বিয়েই হয়নি।'

'আপনি কিছু মনে না করলে একটা কথা বলব ?'

'বলো।'

'আশা কে ছিলেন ? '

'আশা সম্পর্কে তুমি জানলে কি করে ?' ইউসুফের চোখ মুখে বিস্ময়।

'আমি তার সম্পর্কে কিছু জানি না। আপনার দোস্ত আমার সাথে প্রথম দেখায় তার মুখ থেকে শব্দটি বের করেছিলেন। তার পরে তিনি কতকটা পেরেশান হয়ে বলেছিলেন, তোমার চেহারা আরেক মেয়ের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। দৃষ্টি আমার কেমন যেন ধোঁকা খাচ্ছে। আমি তখন মনে করতাম, আশা তার স্ত্রী। এ কথা জিজ্ঞাসা করারও কোশেশ করেছি। কিন্তু 'এ প্রশ্ন এখন করোনা' বলে তিনি আমার খামোশ করে দিয়েছেন।'

'তিনি কি একথা বলেছিলেন যে, তোমার চেহারা আশার মত ?'

'জী হ্যাঁ!'

'উনি আমাকে আশার কাহিনী শুনিয়েছেন। কাহিনীটা এতই লোমহর্ষক যে, তা শোনা তোমার ধৈর্যে কুলাবে না।

'আমি শুনতে চাই ভাইয়া!' যুবায়দার কণ্ঠে দৃঢ়তা।

'বহুত আচ্ছা। শোন তাহলে!' বলে ইউসুফ আশার কাহিনী বলা শুরু করল। হৃদয় বিদারক কাহিনীর শেষ পর্যায়ে উপনীত হলে যোবায়দার চোখে অশ্রুর বন্যা দেখা গেল। আব্দুল ওয়াহিদ ওর জন্য আলেয়ার আলো নয়। তিনি এমন এক লোক যাকে প্রেম-প্রীতি দিয়ে ভরিয়ে দেয়ার জন্য এক মমতাময়ী নারীর সাহারা প্রয়োজন। 'হায়! আমি কি তার হারিয়ে যাওয়া আশা হতে পারব ?' এ আত্ম জিজ্ঞাসা যুবায়দার।

বিছানার কোলে আশ্রয় নিয়েও দীর্ঘক্ষণ ঘুম এলো না। 'আশা' শব্দটি বারংবার তার কানে গুঞ্জন করে ফিরছিল। সেই 'আশা' –আব্দুল ওয়াহিদের সাথে

যাকে নদী, পাহাড় ও জলপ্রপাতের নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করতে দেখা যায়। এর, পর রাজ সেপাইরা যাদের পেছনে হন্যে হয়ে খুঁজছে। ওরা দৌড়াচ্ছে প্রাণপণ। আচমকা যেন সন্ধ্যা আঁধারী নেমে আসল। অতঃপর রাজ সেপাইরা ওদের ধরে কালী মূর্তীর বেদীমূলে আছড়ে ফেলছিল। ভয়াল প্রকৃতির একলোক ছোরা নিয়ে দাঁড়ান। ওরা চিৎকার দিচ্ছে। 'আমাদের ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও।'

॥ চার ॥

একদিন দুপুর বেলা ইউসুফ হন্তদন্ত হয়ে কামরায় প্রবেশ করল। বুলন্দ আওয়াজে বলল,

'যুবায়দা! যুবায়দা! তিনি এসে গেছেন।'

'কে ?' যুবায়দা চকিতে প্রশ্ন করে।

'আব্দুল ওয়াহিদ! আমি এইমাত্র তার পয়গাম পেয়েছি। তিনি গজনী থেকে কনৌজ এসেছেন। কালই তার সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি।'

যুবায়দার চেহারা খুশীতে রওনক হয়ে ওঠল, 'আপনি ফিরছেন কবে ?'

ইউসুফ ওর সামনে চেয়ার পেতে বসে বলে, 'খুব শীঘ্রই।'

'তিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কি ?'

'না। তাঁর দূত কেবল আমার খবর নিতে এসেছেন। দূত মারফত তিনি বলেছেন, কর্মব্যস্ততা না থাকলে তিনি খোদ এখানে আসতে পারেন। আমি তাকে দাওয়াত করতে যাচ্ছি। জরুরী একটা কাজও আছে তার সাথে।'

'কি কাজ ?' হৃদয়ের ধুক ধুকুনিকে সংযত করে প্রশ্ন করে যুবায়দা।'

ইউসুফ খানিক চিন্তা করে বলে, 'যুবায়দা! তোমার ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করলে আমার চিন্তা চেতনা এদিক সেদিক বিচরণ শেষে আব্দুল ওয়াহিদ কেন্দ্রীক হয়ে ওঠে। আমার মন বলে, তোমার ভবিষ্যতের যথার্থ মুহাফেয সে-ই। আরো বিশ্বাস আমার, তোমরা একে অপরের জন্য কুদরতের অপার এনাম প্রমাণিত হতে পার। যাবার আগে তোমার কাছে অনুমতি চাই। জবাব না দিয়ে যুবায়দা দু'নো হাতে চেহারা ঢেকে নেয়।

ইউসুফ বলে, 'আমার নির্বাচনের প্রতি তোমার কোন আপত্তি নেই তো ?' যুবায়দা কিছু না বলে কামরা থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ইউসুফ থমকে বসে রইল। অতঃপর ও ডেকে বললো, 'যুবায়দা! যুবায়দা! এদিকে এসো।'

লজ্জানম্র বদনে যুবায়দা দ্বিতীয়বার কামরায় প্রবেশ করল। ওর দৃষ্টি যমীনে নিবদ্ধ। গণ্ডে লজ্জার লাল মিশ্রন। চোখে আনন্দদ্যুতি। ইউসুফ ওর হাত ধরে বসাল। বললো, 'যুবায়দা! রামনাথ ও রূপাবতির এতদিনে এখানে পৌঁছে যাবার কথা। ওদেরকে নিয়ে আমি পেরেশান। একদিন পূর্বেও তোমার খবর পেলে ওদের সঙ্গে নিয়ে আসতাম। ওরা কুঠিয়াওয়াড়ের সীমান্ত অতিক্রম করতে যেয়ে বন্দী হলো কি-না! আমার অনুপস্থিতিতে এলে ওদের খেয়াল রেখ। রামনাথ আমার মুহসেন। ও-ই আমার জীবন বাঁচিয়েছে। কামিনীকেও ওরা সঙ্গে নিয়ে আসবে। কামিনী মযলুম। 'দুনিয়ায় ও নিঃস্ব'-এ উপলব্ধি হতে দিও না ওকে।'

'আপনি চিন্তা করবেন না ভাইয়া!' বড্ড বে-চাইন হয়ে ওদের এন্তেযার করছি।

কুরসী থেকে ওঠতে গিয়ে ও বললো, 'আচ্ছা! এখন তাহলে উঠি।

'ভাইয়া! যুবায়দা দ্বিধাবোধ কণ্ঠে বলে। 'একটা কথা বললে আপনি কিছু মনে নিবেন না তো ?'

'না। বলো!'

'নির্মলা কোথায় জানেন কি ?'

'জানতে চেষ্টা করিনি। সোমনাথ থেকে কোথায় গেছে। কিন্তু ওর কথা মনে হলো কেন তোমার ?

'ভাইয়া! আমার মন বলেছে, ও আপনার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার হক্‌দার। গ্রামীণ মহিলারা বলেছে, আমার অন্তর্ধানের পর মন্দিরে গিয়ে আমার সন্ধানের জন্য প্রার্থনা করেছে। জয়কৃষ্ণকে বাধ্য করেছে, আমার সন্ধানদাতার জন্য পুরস্কার ঘোষণায়। এমনকি তিনি আপনার জান বাঁচানোরও কোশেশ করেছেন। চাকরানী বলেছে, আপনি জীবিত পালাতে পেরেছেন –এ খবর না পাওয়া পর্যন্ত তার চোখের পানি শুকোয়নি। ভাইয়া! ও যখন এখানে ছিলো তখন আপনার হৃদয়ে ওর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়েছিল কি?'

'ঐ সময় আমি স্রেফ এতটুকু মনে করেছি যে, সে জয়কৃষ্ণের মেয়ে।'

'আর এখন ?'

'আর এখন ওসব ভেবে কি লাভ। ওর আর আমার পথ চিরদিনের জন্য জুদা হয়ে গেছে।'

বলে ইউসুফ সফরের তৈরী নিতে ওপাশের কামরায় চলে গেল।

॥ পাঁচ ॥

এক সপ্তাহ পর।

শেষ বিকালে আসমান গুমোট মেঘে ঢাকা। হালকা বৃষ্টি পড়ছে থমকে থমকে। যুবায়দা কামরার শার্সি খুলে বাইরে তাকাচ্ছিল। আচমকা বাইরে কারো পদধ্বনি শোনা গেল। ঘুরে ও দরোজার দিকে তাকাল। ইউসুফ কামরায় প্রবেশ করল। ও উঠে দাঁড়াল।

'বসো যুবায়দা!' ওর মাথায় হাত রেখে বলল ইউসুফ।

যুবায়দা বসে পড়ল। তলোয়ার আলনায় লটকায় ও । যুবায়দা ভাইয়ের দিকে তাকায় তো তাকায় না। হৃদয়ের থির থির কম্পমান অনুভূতি চোখে মুখে আটকা। পরিধি বাড়ানো ঠোঁটে হাসে ইউসুফ। 'যুবায়দা!' ইউসুফ বলে, 'আগামী চাঁদের পাঁচ তারিখে তোমার বর আসছেন। আব্দুল ওয়াহিদের সমীপে আমার আরজ করতে হয়নি। যখন বলি আমি একটা দরখাস্ত নিয়ে এসেছি, তখন তিনি বলেন, দাঁড়াও! আমার দরখাস্ত এর আগেভাগে শুনে নাও। পরে বোঝলাম, তার কাছে কোন কিছুই গোপনীয় নেই। যুবায়দা দাসী নয় রাজরানী হিসাবে তুমি তার কাছে যাচ্ছ। ইচ্ছে ছিল তোমার শাদী ধুমধামের সাথে দেব, কিন্তু আব্দুল ওয়াহিদ এগুলো পছন্দ করেন না। তার সাথে কেবল জনাপনের লোক আসবেন। আব্দুল ওয়াহিদ বলেছেন, বার্ষিক ছুটির অবসরে তিনি এখান থেকে হয়ে যাবেন।

সন্ধ্যার দিকে গোটা জনপদে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, ইউসুফের বোনের শাদী কনৌজের গভর্নরের সাথে হতে যাচ্ছে। পুরুষ ও নারীরা দলে দলে এসে ওদের মোবারকবাদ দিতে লাগল। এর ঠিক এগার দিন পর যুবায়দা মহলের ছাদে উঠে নয়া মাসের চাঁদ দেখছিল। পরে এক সকালে নয়া দুলহানের পোশাক পরিধান করে কামরায় বসেছিল। পাশে প্রতিবেশী নও মুসলিম ও হিন্দু রমনীদের ভীড়। জনৈক বালিকা উঠানে প্রবেশ করে বললো, 'বরযাত্রী এসে গেছে' মুহূর্তে উৎসাহী পুরুষেরা ছাদে আর মহিলারা উঠানে জড়ো হলো।

দৈউড়ীতে মহিলাদের প্রচন্ড ভীড়। বরযাত্রীরা এসে ঘোড়া থেকে নামল। অভিজাত লোকেরা তাদের পুষ্পমাল্যে ভূষিত করল। দুলহা সমেত বরযাত্রী ১৫ জন। তন্মধ্যে জন আষ্টেক কনৌজের ফৌজি অফিসার, বাদবাকী ওখানকার প্রভাবশালী সর্দার। এরা উঠানে প্রবেশ করলে ওই এলাকার প্রথা মাফিক মহিলারা বিশেষ সংগীত শুরু করে দেয়।

মেহমান খানার সামনে নজর কাড়া শামিয়ানার নীচে মেহমানবৃন্দ আসন গ্রহণ করেন। আব্দুল ওয়াহিদকে বর পোশাকে এক তুর্কি মনে হচ্ছিল। শামিয়ানার আশে পাশে জড়ো হওয়া দর্শকদের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ।

খানিক বাদে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলে জনৈকা রাজপুতনী যুবায়দার কানে কানে বললো, 'ভগবানের দোহাই! তোমার পতিকে দেবতা দেবতা লাগছে।'

পরদিন বেয়ারারা যুবায়দার পাল্কী নিয়ে বেরুলে ইউসুফের চোছে পানি এসে যায়।

আব্দুল ওয়াহিদ ও তাঁর সঙ্গীদের বিদায় জানানোর পর ইউসুফের কাছে চার দিকের পরিবেশ কেমন শূন্য শূন্য মনে হয়। কোন কথা না বলে সে দ্বিতলে উঠে যায়। দরোজা বন্ধ করে বসে যায়, 'বোন আমার! আমার শকুন্তলা! যুবায়দা আমার!' অবুঝ বালকের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। কেউ দরোজা খটখটালে ইউসুফ বলে, 'কে?'

চাকরানী বলে, আমি মহারাজ!'

'কি খবর?'

'মহারাজ! জনৈকা নারী আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

'কে সে ? এ সময় আমি কারো সাথে কথা বলব না।'

কেউ ক্ষীণকণ্ঠে বলে ওঠে, জী আমি রূপাবতি!'

'রূপাবতি!' জলদি উঠে দরোজা খুলে দেয় ইউসুফ। চাকরানীর সাথে হাড্ডিসার এক যুবতী দন্ডায়মান। পেরেশান ইউসুফ তার দিকে তাকিয়ে। চেতনা ফিরে পেয়ে বলে, 'রামনাথ কোথায়?'

রূপাবতির চোখ থেকে অবিরাম ধারায় অশ্রু বেয়ে পড়তে লাগল। ফোঁপানো কাঁদার সুরে ও বললো,

'জানিনা, আমার ধারণা ছিল ও পৌছে যাবে এখানে আমার আগেই। মুন্নিগড়ের আরেক লোকের সাথে এসেছি আমি। অসুস্থতার কারণে পথিমধ্যে আমাকে যাত্রাবিরতি করতে হয়েছিল। এতদিনে তো ওর পৌছে যাবার কথা। ও গ্রেফতার হলো কি-না।'

'এসো! ভেতরে এসো। এতমিনানের সাথে কথা বলব।'

রূপাবতি একটি কুরসিতে বসে পড়ল।

'তুমি কি এইমাত্র এসেছ ?'

'না। গতকাল এসে পৌছেছি। কিন্তু আপনার বোনের বিবাহতে কর্মব্যস্ত ছিলেন। এজন্য আপনাকে পেরেশান করতে চাইনি। গাঁয়ের জনৈক কিষাণের বাড়িতে উঠেছিলাম।'

'তোমার সাথে কে এসেছে ?'

'জয়কৃষ্ণের নওকর।'

'কোন জয়কৃষ্ণ ?'

'নির্মলার বাপ। তিনি আমার মদদ না করলে দ্বিতীয়বারের মত হয়ত এতদিনে সোমনাথে পৌঁছে যেতাম।'

'গোটা পরিস্থিতি আমাকে এতমিনানের সাথে শোনাও তো !' বলে ইউসুফ একটি চেয়ার পেতে বসল। রূপাবতি ওর পুরো কাহিনী বলে গেল।

ইউসুফ দীর্ঘক্ষণ মাথা ঝুকে বসে থেকে বললো, 'তাহলে রামনাথের তোমার আগেই পৌঁছে যাবার কথা। আমার শংকা ও বোধহয় কোন মুসিবতে আটকে গেছে। কিন্তু তুমি ভরসা হারিও না। মুন্নিগড় গিয়ে আমি ওর খোঁজ নেব। জয়কৃষ্ণের নওকর কৈ ?'

'দরোজার বাইরে দাঁড় করে রেখে এসেছি।'

'আগামী সপ্তাহে বোনকে আনতে আমার কনৌজ যাবার কথা। এক্ষণে ওকে আমার মুন্নিগড়ে যাবার কথা জানিয়ে দিতে হবে। ওদের ওখানটা খুব একটা দূরে নয়। কিছুক্ষণের মধ্যে গিয়ে ফিরতে পারব। সর্বোদয়ের মধ্যেই রওয়ানা হয়ে যাব। জয়কৃষ্ণের নওকরের নাম কি ?'

'গোবিন্দরাম!' রূপাবতি জবাব দেয়।

'আমি ওকে মেহমান খানায় পাঠাচ্ছি। ওখানেই আরাম করুক। চাকরানী তোমাদের খানা দেবে' বলে ইউসুফ বাইরে বেরিয়ে গেল।

দুপুরের দিকে ইউসুফ ফিরে এলো! রূপাবতিকে বললো, 'আমার বোন আগামী সপ্তাহে আসছে। সময় পেলে আব্দুল ওয়াহিদও ওর সাথে আসবেন। তোমার চিকিৎসার জন্য বিজ্ঞ হেকিম দরকার। আব্দুল ওয়াহিদকে বলে দিয়েছি। তিনি ওয়াদা করেছেন বিজ্ঞ হেকিম পাঠাবেন। আগামীকাল সকালে আমি ও গোবিন্দরাম মুন্নিগড় রওয়ানা হয়ে যাব। ওখানে ওকে আমার দরকার হবে।

সন্ধ্যার সময় নির্মলা পাইন বাগানে ঘোরাফেরা করছিল। আচমকা গোবিন্দরামকে ওর দিকে আসতে দেখল। ভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে ও অগ্রসর হলো। হাত বেঁধে প্রণাম করে গোবিন্দরাম বললো, 'আমি রূপাবতিকে ওখানে রেখে এসেছি।'

নির্মলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'ফিরেছ কবে ?'

'এইমাত্র এসে পৌছেছি। সর্দার বাড়ীতে নেই দেখে আমার সরাসরি আপনার এখানে আসা। রামনাথ সম্পর্কে খুবই ভয়াল সংবাদ শুনেছি। এক্ষণে ওকে বাঁচানোর কোন পন্থা নেই।'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছ। ওকে বাঁচানোর কোন পন্থা নেই আমাদের। বেশ দেরীতে ফিরেছ তুমি। রূপাবতিকে নিয়ে আমার সেকি পেরেশানী।'

'তার অসুস্থতার কারণে পথিমধ্যে বেশ ক'দিন যাত্রাবিরতি করতে হয়েছে।'

'রণবীর বাড়ী ছিল ?'

'হ্যাঁ! তিনি আমার সাথে এসেছেন।'

মুহূর্তে নির্মলার শিরাতন্ত্রীর খুন চেহারায় এসে জমায়েত হলো। ও কম্পিত কণ্ঠে বললো, 'রণবীর তোমার সাথে এসেছেন– কোথায় ?'

'আমি তাকে ধর্মশালায় রেখে এসেছি।'

'এখানে কেন এলেন না তিনি?'

'রামনাথের খবর নিতেই ওখানে গেছে।'

'ওর বোন সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছে কি ?'

'জী হ্যাঁ! যেদিন আমরা পৌছুলাম ওদিন তার বোনের বিবাহ ছিল। কনৌজের মুসলিম গভর্নর তার ভগ্নিপতি'।

'মুসলমানের সাথে ?'

'জী হ্যাঁ! রণবীর নিজেও মুসলমান হয়েছে।'

'একথা শহরের আর কাউকে বলোনি তো ? ওয়াদা করো বাবাকেও বলবে না।'

'ওয়াদা করলাম।'

'রণবীর কি জানে যে, তুমি আমার কাছে আসছ?'

হ্যাঁ তিনি খোদই আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন। তিনি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

নির্মলা খানিক ভেবে বললো, 'তুমি তাকে বলো, আপনি আমাদেরকে এখনো ঘৃণার পাত্র মনে না করলে দেখবেন বাপুজির ঘরের দরোজা আপনার জন্য খোলা। আপনাকে ধর্মশালায় অবস্থান করার কোন দরকার ছিল না। তিনি এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে তাকে ওখানে নিয়ে যেও। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌছে যাচ্ছি। বাড়ীর কোন নওকর তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলে দিও, গোয়ালিয়রের মামা তাকে বাবার কাছে জরুরী কাজে পাঠিয়েছেন।'

'কিন্তু আপনি এখন বাড়ী যাচ্ছেন কেন– ঠাকুরজি এ প্রশ্ন করলে কি জবাব দেবেন ?'

'তিনি সোমনাথ গেছেন। তিনি এখানে থাকলেও বাপের বাড়ী যেতে কোন অনুমতির প্রয়োজন পড়ত না।'

গোবিন্দরাম চলে যাবার পর নির্মলা মহলের দিকে রোখ করল। হৃদয়ে ওর খুশী, ভীতি ও পেরেশানীর রেশ। ওর পা কাঁপছিল। এর কিছুক্ষণ পর পাল্কী করে বাপের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোল।

॥ দুই ॥

কামরার দরোজা ফাঁক করে তাকাচ্ছিল নির্মলা। খোলা আঙিনার দিকে পেয়ার লাল দ্রুত ভেতর আঙিনায় প্রবেশ করল। সে বললো, আপনি ডেকেছেন ?'

'হ্যাঁ ! বাবা এখনও ফিরেননি কেন ?'

'সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরবেন বলে কথা। হতে পারে অন্য কোন গ্রামে ফসল দেখতে গেছেন। আজ হয়ত ওখানেই থাকবেন।

'তুমি এখনই ঘোড়ায় চেপে তার কাছে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে বলো, বাড়ীতে বড় মেহমান এসেছেন।'

'মেহমান কে ?'

'সময় নষ্ট করোনা জলদি যাও, মেহমান কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবেন।'

'গোবিন্দরাম সম্পর্কে জেনেছেন ?'

'হ্যাঁ! কিন্তু এখন কথার সময় নয়। তুমি শীঘ্র বাপুজিকে নিয়ে এসো।'

পেয়ারলাল আরো কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু নির্মলার প্রভাবশালী চেহারার পানে তাকিয়ে নীরবে আস্তাবলে চলে গেল। করিডোরে খানিক পায়চারি করে নির্মলা কামরায় গিয়ে বসে গেল। রণবীরকে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে ওর পেরেশানী বেড়েই চলছিল।

ইউসুফ ও গোবিন্দরাম মহলে প্রবেশ করল। গোবিন্দরামের হাতে ওর ঘোড়ার লাগাম। দেউড়ীর সামনে জনৈকা চাকরানী দণ্ডায়মান। সে অগ্রসর হয়ে ইউসুফকে প্রশ্ন করল। 'আপনি গোয়ালিয়র থেকে এসেছেন বুঝি?'

ইউসুফ এই প্রশ্নের উত্তর ভাবছিল, এমন সময় গোবিন্দরাম বললো, 'হ্যাঁ ভেতরে আসুন।'

ইউসুফ চাকরানীর সাথে ভেতরে এলো। প্রশস্ত আঙিনা পেরিয়ে ওরা সদর দরোজা দিয়ে মহলে প্রবেশ করল। চাকরানী একটি নজরকাড়া কারুকার্যখচিত দরোজার সামনে এসে দাঁড়াল। বললো 'আপনি প্রবেশ করুন, আমি নির্মলা দেবীকে ডেকে দিচ্ছি।'

ইউসুফ দ্বিধাগ্রস্থচিত্তে হলঘরে প্রবেশ করল। প্রতি মুহূর্তে ওর হৃদয়ের ধুক ধুকুনি বেড়ে চলছিল। খানিক বাদে ডান দিকে দরোজা নড়ে ওঠতে দেখা গেল। ঘুরে তাকিয়ে ও উঠে দাঁড়াল। দরোজায় সৌন্দর্যের পিরামিড নির্মলা দাঁড়িয়ে। ইউসুফ দৃষ্টি সংগত করল। কিন্তু একটি চিত্র ওর দিমাগ গেঁথে থাকল।

'বসুন!' অগ্রসর হয়ে আহবান জানায় নির্মলা।

ইউসুফ আবারো কুরসিতে বসে পড়ে।

নির্মলা সময় নিয়ে বলে, 'বাবা আজ ফসল দেখতে গেছেন। উনি খুব শীঘ্র এসে যাবেন।

'জানেন কি জন্যে এসেছি ?'

নির্মলা ওর সামনে চেয়ার টেনে বসে বললো, 'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু এখন রামনাথকে বাঁচানোর কোন সম্ভাবনা নেই। সোমনাথ পুরোহিতের বন্দী এখন সে।'

'আপনার কি বিশ্বাস ও এখনও জীবিত ?'

'হ্যাঁ ! তিনি ওকে হত্যা করবেন না। প্রাত্যহিক মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ানক সাজা দিবেন। জিজ্ঞাসা করতে থাকবেন রূপাবতির সন্ধান। কে তাকে মন্দির থেকে বের করেছে। জানি সে আপনার দোস্ত। এজন্য বেশ চোট পাবেন আপনি। কিন্তু হায়! আমি যদি তাকে মদদ করতে পারতাম।'

'এ যাবত আপনারা যা করেছেন তা-ই বা কম কি ! আপনার বাবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

'আপনার মুখে এই শব্দ আমার কাছে বিরাট এক এনাম, আপনার থেকে একটি ওয়াদা নিতে চাই।'

'নিন !'

'আপনি সোমনাথে ওর খোঁজে যাবেন না।

'জানি এ মুহূর্তে ওখানে গিয়ে কিছু করতে পারব না। কিন্তু জীবনবাজি রেখে ওকে উদ্ধার করতে পারব এমন সুযোগ এলে হাতছাড়াও করব না।'

'আমিও সে কথা বলছি যে, আপনি এক্ষণে প্রচন্ড ঝুঁকি নিলেও দোস্তের কোন সহায়তা করতে পারবেন না।'

'শীঘ্র ওখানে আমার যাবার কোন এরাদা নেই, তবে সেদিন বুঝি বেশী দূরে নয় যেদিন সোমনাথ আমার পথের অন্তরায় হতে পারবে।'

খানিক খামোশ থেকে নির্মলা বললো, 'আপনার জন্য খানা নিয়ে আসছি।'

'না ! খানা আমি খেয়েই এসেছি।'

'তাহলে একটু দুধের ব্যবস্থা করি।'

'না ! তারও দারকার নেই।'

নির্মলা হতাশ হয়ে আবারো কুরসীতে বসে পড়ল। বললো, 'আপনার বোনের খবর আমাকে আনন্দ দিয়েছে। আপনি কিছু মনে না করলে ওর বিয়ের একটা তোহফা দিতে চাই।'

'আপনার তোহফা সে পেয়েছে।'

'কিসের তোহফা ?'

'যে কাঁকন আপনি রেখে এসেছিলেন।'

'ওটা তো আমার ছিল না।' নির্মলার চোখ উছলে ওঠল।

'আপনার বাবা এখনও ফিরেননি। আমি তার সাথে মিলিত হতে চেয়েছিলাম।'

'নওকর দ্বারা তাকে ডেকে পাঠিয়েছি, কিন্তু আজ আপনি যেতে পারছেন না।'

'এটা কি আপনার নির্দেশ ?'

'নির্দেশ নয় অনুরোধ। যদিও এর অধিকার নেই আমার।'

ইউসুফ কিছু বলতে চাচ্ছিল, আচমকা ওর মনে হলো, একটি খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। ওর অন্তরাত্মা ডেকে বলছে, 'ইউসুফ সাবধান! অতীতকে তুমি ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তোমাদের সম্মুখে একটি অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর দাঁড়িয়ে। তোমাদের দু'জনার চলার পথও গেছে ভিন্ন হয়ে।' বেদনাদায়ক মনে ও চোখ বন্ধ করল।

নির্মলা সম্ভবত ওর বাহ্যিক চেহারার অবস্থা দেখে মনের হালত আঁচ করতে পারল। ও কম্পিত স্বরে বললো, 'রণবীর! আমার দিকে তাকাও।'

ইউসুফের গোটা দেহ ঝটকা মেরে ওঠল। গর্দান উঁচিয়ে নির্মলার দিকে তাকাল। ওর চোখে অশ্রু বেয়ে পড়ছে শ্রাবন মেঘের দিনের মত। ইউসুফ চোখ নামিয়ে ভরাক্রান্ত হৃদয়ে বললো, না না ! আপনার দিকে তাকানোর কোনই অধিকার নেই। আমি ইউসুফ, রণবীর নই।'

'জানি আপনি মুসলমান হয়েছেন, কিন্তু তা আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।'

ইউসুফের প্রতিরোধ শক্তি সজাগ হয়ে ওঠল। ওঠতে ওঠতে বললো, 'আপনি আমাকে বারবার এই অনুভূতি দেয়ার কৌশল করবেন না যে, আমি এখানে এসে ভুল করেছি।'

'আপনাকে আমি ফেরাতে পারব না। কিন্তু হামেশা আপনাকে আমার হৃদয় ডাকতে থাকবে। ইউসুফ খানিকটা নীরব হয়ে বললো, 'কিন্তু নির্মলা এখন তোমার বিবাহ হয়ে গেছে।'

নির্মলা ফোঁপানো কাঁদার সুরে বললো, ঠাট্টা কারো না রণবীর। আমার বলিদানকে বিবাহ বলো না। আমি তাকে ঘৃণা করি।'

ইউসুফের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ও কিছু না বলে দরোজার দিকে এগিয়ে গেল।

'দাঁড়াও রণবীর! আমাকে বেদনার বারিধি তীরে উপনীত করে যেও না। আমি উন্মাদ হয়ে গেছি, আমাকে ক্ষমা করো।'

ইউসুফ থামল, কিন্তু নির্মলার দিকে তাকানোর হিম্মত নেই ওর।

চাকরানী এ সময় হন্তদন্ত হয়ে কামরায় প্রবেশ করে বললো, 'নির্মলা দেবী ! সর্দারজি মহারাজ এসে গেছেন।'

চোখের আঁসু আঁচলে মুছে নির্মলা বললো, 'নিয়ে এসো তাকে এখানে।'

ভেজানো দরোজা ঠেলে চাকরানী বললো, ঐ যে আসছেন তিনি।'

ইউসুফ থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে। জয়কৃষ্ণ কামরায় প্রবেশ করলেন। নির্মলা উঠে দাঁড়াল।

'তুমি .... ?' বলে জয়কৃষ্ণ ভ্রু-কুঞ্চিত করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমি রণবীর।'

নিশ্চল 'থ মেরে যান জয়কৃষ্ণ। রণবীরের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন, 'আশা ছিল কোন একদিন তুমি অতি অবশ্যই আমার ঘরে মেহমান হয়ে আসবে।'

ইউসুফ তার হাত ধারণ করে। দু'জনে কেবল করে মুখ চাওয়া চাউয়ী।

'বসো' চেয়ার দেখিয়ে আহ্বান রাখেন জয়কৃষ্ণ।

ইউসুফ কুরসিতে বসে গেল।

জয়কৃষ্ণ ওর পাশটিতে বসে নির্মলার দিকে তাকিয়ে বললো, বসো খুকী! ওকে খানা খাইয়েছ কি ?'

'না বাবা উনি আমাদের খানা খাবেন না।'

'এখানে আসার পূর্বে খানা খেয়েছি। তবে আপনার অভিযোগ থেকে মুক্তি পেতে দুধ খেতে পারি।'

'এই আনছি।' বলে নির্মলা বেরিয়ে গেল।

জয়কৃষ্ণ ও ইউসুফ নিশ্চুপ দু'টি প্রাণী। জয়কৃষ্ণ বললেন, 'মেয়েটা তোমাদের ওখানে পৌছেছে ?'

'হ্যাঁ! এর জন্য আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর আমার বোনও পৌছেছে।'

'কবে ?'

'গোয়ালিয়রে মুসলমানদের হামলার পরপরই। সোমনাথে অবশ্য খবরটা দেরীতে পেয়েছি।'

'ছিল কোথায় ?'

'গোয়ালিয়রে এক দরিদ্র কিষাণের বাড়ীতে।'

জয়কৃষ্ণ খানিক ভেবে বললেন, 'আমার কথায় হয়ত তুমি বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু ভগবান জানেন, আমি রোজানা ওর জন্য প্রার্থনা করতাম। আমার মেয়ের সাথে তুমি যে ব্যবহার করছে তাতে পাথরেরও মোমের মত গলে যাবার কথা। আজ আমার মনের কি অবস্থা তা তোমাকে বোঝাতে পারব না।'

রূপার পেয়ালায় দুধ নিয়ে কামরায় দাখেল হলো নির্মলা। ইউসুফ ওর হাত থেকে তা গ্রহণ করল। এক চুমুকে দুধটা সাবাড় করে দিয়ে বললো, 'এখন তো কোন অভিযোগ নেই ?'

'না।' বিমর্ষ চেহারায় হাসির রেখা টেনে বললো নির্মলা। চাকরানী রূপার পেয়ালা নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। বাবার ইশারায় তার পাশের চেয়ারেই ও বসে গেল।

'রামনাথের খবর নিতে এসেছি।' বলল ইউসুফ।

'বড্ড আফসোস হয় ওর জন্য। ওকে হুঁশিয়ারী করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার নওকরের সামান্য গাফিলতিতে সব কিছু উল্টে গেছে। এক্ষণে সে পুরোহিতের কয়েদ খানায়। হায় ! আমি ওর জন্য যদি কিছু করতে পারতাম।

পুরোহিতের সামনে দেশের প্রভাবশালী রাজারা পর্যন্ত উচ্চবাচ্য করার সাহস পান না। রামনাথকে এখন কোন গায়বী শক্তিই পারে বাঁচাতে।' বললেন জয়কৃষ্ণ।

'সোমনাথের নিশ্ছিদ্র শক্তিকে মিসমার করার মত অপ্রতিরোধ্য বাহিনীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সুলতান মাহমুদ গযনবী কোষ থেকে যে তলোয়ার বের করেছেন তা ভারতবর্ষের নিপীড়িত মজলুম মানবতার ফরিয়াদের জবাব দিতে বদ্ধ পরিকর।' বলল ইউসুফ।

'তোমার কি বিশ্বাস, সে সোমনাথে হামলা চালাবে ?'

'অবশ্যই চালাবে!'

'এবং ওই শক্তিরও কি বিশ্বাস আছে তোমার, যারা ঐক্যবদ্ধভাবে তাকে প্রতিহত করবে ?'

'হ্যাঁ!'

'এরপর মাহমুদ সোমনাথ বিজয় করবে বলে মনে কর' ?

'হ্যাঁ! আমি জানি তাকে কেউই প্রতিহত করতে পারবে না। কুদরত যে উদ্দেশ্যে মাহমুদকে নির্বাচিত করেছেন তা পুরা হবেই। তিনি টর্নেডো গতিতে আসবেন। সোমনাথের দেয়ালে জমে থাকা বাহিনী তাঁর ফুঁৎকারে তৃণলতার মত উড়ে যাবে।'

মেয়ের মুখে রূপাবতির কাহিনী শোনার পর সোমনাথ পুরোহিতের প্রতি তার ঘৃণা জন্মেছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সোমনাথ মন্দির ও মূর্তির প্রতি তার ঘৃণা নেই একটুও। তিনি কথার মোড় ঘুরানোর জন্য বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে তুমি বড্ড ক্লান্ত, আরাম কর গিয়ে।'

'না। এখন এজাযত চাই।'

'কোথায় যাবে এখন ?'

'ফিরে যেতে চাই।'

'পরিস্থিতি যা বলছে তাতে তোমাকে রাখারও সাহস পাইনা। পুরোহিতের টিকটিকি রামনাথের সাথীদের তালাশ করে ফিরছে। বিশেষ করে এই শহরে ওদের সংখ্যা বেশী।'

'যাবার আগে আপনার সাথে একটি জরুরী কথা বলতে চাই।'

'বলো।'

'কনৌজের রাজা আপনাপর ভূ-সম্পত্তি ছিনিয়ে আবার বাবাকে দিয়েছিল আমাদের কব্জার সম্পত্তি আপনাকে ফিরিয়ে দিতে চাই। আমার বোনেরও সিদ্ধান্ত এটা।'

জয়কৃষ্ণ হয়রান হয়ে নির্মলা পরে ইউসুফের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কথার মতলব বুঝলাম না।'

'মতলব হলো, আপনার বাড়ী ও যমীন হস্তান্তর করার ফয়সালা করেছি।'

জয়কৃষ্ণ ভারাক্রান্ত সুরে বলেন, 'রণবীর! বেশ পূর্ব হতেই লজ্জা ও অনুতাপের বোঝা বয়ে চলছি। ভগবানের দিকে চেয়ে আমাকে আর লজ্জিত করো না।'

ইউসুফ পেরেশান হয়ে বললেন, 'আমার কথায় কষ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার একনিষ্ঠতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করবেন না।'

'তোমার একনিষ্ঠতার প্রতি আমি তিলমাত্র সন্দিহান নই। ওই মহল ও যমীনের পুনরুল্লেখ আমার সহ্যাতীত।'

'অতীতকে ভুলে যেতে হবে আমাদের। আপনার সম্পত্তি আমার কাছে আমানত। যখন ইচ্ছে ফিরিয়ে নিতে পারেন।

'কিন্তু ঐ সম্পত্তি তোমার বাবার নয়, ছিনিয়ে নিয়েছিলেন কনৌজের রাজা! এর প্রতি এখন কোন অধিকার নেই আমার। যদি অধিকার আছে বলে মনে কর তাহলে তার দাবী আমি প্রত্যাখ্যান করলাম।'

'না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পূর্বে আপনি ভালো করে একবার ভেবে দেখুন। কোন দিন মাতৃভূমিতে পদার্পন করলে আমার ঐ ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দেয়ার দরকার নেই। এখন আমায় অনুমতি দিন।' বলে ইউসুফ দাঁড়িয়ে গেল।

'বসোনা খানিক, তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ইউসুফ বসে গেল। জয়কৃষ্ণ খানিক ভেবে বললেন, 'এইতো সেদিনের কথা, তুমি আমায় হত্যা করতে বদ্ধপরিকর ছিলে। আর আজ তুমি আমাকে কনৌজ যাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছ। তোমার এই জাগতিক পরিবর্তনের হেতু কি?'

'যে আঁধার রাতে আমি উদভ্রান্ত ঘুরে ফিরছিলাম, অবসান ঘটেছে তার। এক্ষণে আমি এক রৌশন সুবহে সাদিকের হাতছানি পেয়েছি। এক্ষণে তাই আমার সামনে পিতৃহন্তাকে দেখছি না, দেখছি আপনার জীবন মুঠে নিয়ে এক নিষ্পাপ মেয়ের জীবন রক্ষাকারী মানুষকে।'

'তোমাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমার জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র খত্‌রা দেখলে ঐ মেয়েকে আমি মদদ করতাম না।'

'সোমনাথ দেবতার নারাজীর ঝুঁকি নেয়ার চেয়ে খতরনাক বিষয় আর কি হতে পারে?

'আমার মাকছাদ সোমনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা নয়, এক নিরপরাধ মেয়েকে জুলুমের হাত থেকে বাঁচানো।'

'সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন সোমনাথ মন্দিরকে পুরোহিতের চেয়েও ঘৃণ্য মনে হবে। নন্দনার কয়েদখানায় আমি যে আলোকচ্ছটা দেখেছি এখানে তার আভা ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। আলোকবর্তিকা দেখার পর বেশ কিছুকাল আমি সন্দিহান ছিলাম। আপনিও খুব সম্ভব এমনটা করবেন। তবে সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন আপনার আমার চলার রাস্তা এক ও অভিন্ন হবে। আমার মত আপনারও ততদিন শান্তি আসবে না যতদিন আপনি কোটি দেবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে এক খোদার দিকে মুখ না করছেন। মাথা না নোয়াচ্ছেন সাত আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তার সামনে। এতো সেই দেবমূর্তি যারা মানুষকে স্বজাতির রক্ত নিয়ে হোলি খেলতে শেখায়। এগুলোর স্থায়ীত্ব নাই বেশী দিন। ইনসানিয়াতের জয় গানে পৃথিবী আবারো মুখরিত হবে। অচ্ছুৎ-ছুত গলে গলা মিলিয়ে চলবে। মানবতার পরিচয় রক্তে নয় তার কৃতকর্মে।'

'তুমি মুসলমান হয়েছ কি ?'

'হ্যাঁ! আমার মন বলছে উদীয়মান সূর্যের সামনে আপনিও বেশীদিন চোখ বন্ধ করে থাকতে পারবেন না। এক্ষণে আমায় এজাযত দিন। আর মনে রাখবেন কোন প্রকার শর্তারোপ ছাড়াই আপনাকে কনৌজ যাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

'দাঁড়াও ! আমি মুসলমান হলে তোমার লাভ কি! দুনিয়াতে সকল লোক তার পাশে এমন লোককেই ভেড়াতে চায় যে তার খেয়ালে উত্তম চরিত্রের। আমি জানতে চাই আমার সামনে ইসলাম-চর্চার কারণ কি তোমার। আর পিতৃহন্তা তোমার সাথে বুলন্দ কোন মাকছাদে তোমার সঙ্গ দেবে? জানি তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করেছ, কিন্তু এটা কি করে জানব যে, তোমার শত্রুতা বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়েছে ?

'আমার কথায় আপনি বিস্ময় প্রকাশ করবেন যে, এমন এক ব্যক্তির আহ্বান আমাকে ইসলামের প্রতি নীত করেছে যাকে আমি দুশমন ভাবতাম। নন্দনার যুদ্ধে পরাজিত হবার পর পাহাড়ের চূড়ায় ঘাঁটি গেড়েছিলাম। তিনি তার একদল সঙ্গীসহ ঐ ঘাঁটি অবরোধ করেন। জীবন নিয়ে ফেরার কোন সুযোগ ছিল না। হাতিয়ার না ফেলে তখন যত পারা যায় শত্রু সেনার প্রাণপাত করতে সচেষ্ট হয়েছিলাম; কিন্তু তিনি সেপাইদের পেছনে রেখে একাকী অগ্রসর হলেন। যবানে তার যাদু ছিল। তার কথায় আমার সাথীরা অস্ত্র ফেলে দিল । তার মিঠা কথা আমার জন্য বিষমিশ্রিত ছুরি মনে হলো। মুচকি হাসি মনে হচ্ছিল আমার কাছে গালি। আমার খুন টগবগ করে উঠেছিল। আমার তীরের আওতায় এসেছিলেন তিনি। ভবিষ্যত সম্পর্কে উদাসীন হয়ে তাঁকে মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু তিনি এমন এক কথা বললেন যাতে বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহা মনে জাগল। পরে জানলাম দুনিয়ার উত্তম বন্ধু আমার সে। যুদ্ধে আমরা পরস্পর মোকাবেলায় নামলে– হয়

সে, না হয় আমি মারা পরতাম। কিন্তু আজ তাকে ভাই ডাকতে গর্ববোধ করি। তখনও তার প্রতি আমার ঘৃণা ছিল না যখন সে আমার ধনুকের আওতায় ছিল। তার সবচেয়ে বড় খায়েশ ছিল আমি মুসলমান হয়ে যাই।'

'আর আজ সেই খায়েশ নিয়েই তুমি আমার কাছে এসেছো বুঝি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে ততক্ষণ ইসলাম কবুল করতে বলব না যতক্ষণ এর সততার প্রতি আপনি আস্থাশীল না হন।'

'এক্ষণে আমার ব্রেনে কিছুই ধরছে না। শুধু এতটুকু মনে ধরছে, সর্দার মোহন চাঁদের পুত্র আমার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। আজীবন আমার আত্মা সন্থিতে থাকতে পারবে না। রণবীর! তুমি আমায় হত্যা করোনি কিন্তু আমার স্বপ্নের জগতকে বিরান করে দিয়েছ। ধন-দৌলতের আশাবাদী নই আমি। নই হুকুমতের কোন আশাবাদী। তুমি আমার যাবতীয় মনোবাঞ্ছাকে মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত করেছ।'

ইউসুফ কুরসী থেকে উঠতে গিয়ে বললো, 'আমি খুব শীঘ্র ঐ জগতে আপনার সাথে মিলিত হব যা আপনার বর্তমান দুনিয়ার চেয়েও আরো বিস্তৃত, রঙীন ও নয়নাভিরাম। যেখানে আশা সর্বদা সজীব থাকে। জুলুম ও স্বৈরাচারের যে আলীমহল মজলুমের হাড্ডির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এক ঝটকায় তা ভূলণ্ঠিত হয়। আমার বিশ্বাস আপনি জন্নুর প্রাচীরকে সোজাকারী ব্যক্তিদের সঙ্গ দিবেন না।'

'হায়! এ কথা যদি আমার মনে ধরত। স্রেফ এতটুকু জানি, আমি কারো সঙ্গ দেব না।'

ইউসুফ নির্মলার দিকে বিদায় প্রত্যাশী দৃষ্টিতে তাকাল। ও উঠে বাবাকে বললো, 'বাবা' একটু বসুন। তাঁর বোনের জন্য একটি তোহফা আনছি। নির্মলা অন্দরে চলে গেল।

॥ তিন ॥

জয়কৃষ্ণ ও ইউসুফ খামোশ হয়ে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিল। নির্মলা দ্বিতীয়বার কামরায় দাখেল হলো এবং ইউসুফকে একটা রৌপ্য বক্স উপহার দিল। বক্স খুলে একটি খুবছুরত আংটি বের করে বললো, 'আমার বোন আপনার তোহফা পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হবে।'

নির্মলা কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু আবেগের আতিশয্য ওর কথন শক্তি রহিত করে দেয়। খানিক পরে ওর দৃষ্টি যাতে হাজারো আকুতি ছিল ইউসুফের চেহারায় নিবদ্ধ হলো। ইউসুফ জয়কৃষ্ণের প্রতি মনোনিবেশ পূর্বক বললো, 'চলুন!' 'ওরা

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। নির্মলা নিশ্চল নিথর বারান্দায় দাঁড়ান। শুনছে ওদের চলে যাওয়া লঘুপদধ্বনি । ওর চোখে আঁসুর পর্দা।

জয়কৃষ্ণ ইউসুফের সাথে যখন আঙিনায় তখন চাঁদ ফোকলা দাঁতে হাসছে। দেউরির সামনে ক'নওকর পরস্পরে কথা বলছে। জয়কৃষ্ণ গোবিন্দরামকে ডাকলে সে এগিয়ে এলো। তিনি বললেন, 'উনি চলে যাচ্ছেন। তাঁর ঘোড়া দমরুদ্ধ, শ্রান্ত। আমার মেটে ঘোড়াটি তাঁকে দাও। আর দেখ পেয়ারলাল কোথায় ?'

'মহারাজ ! সে কুঠরির ছাদে ঘুমাচ্ছে।'

'ওকে এখানে ডেকে পাঠাও এবং একটির স্থলে দু'টি ঘোড়া তৈরী কর।'

গোবিন্দরাম চলে গেলে ইউসুফ জিজ্ঞাসা করল, 'দু'টি ঘোড়া কার জন্য ?'

'এক নওকরকে তোমার সাথে পাঠাতে চাই। ওর বাড়ী তোমাদের বাড়ীর কাছেই। ওখান থেকে ও আমার সাথে আসে। আত্মীয়-স্বজনদের খুব মনে পড়ছে ওর। কেবল তোমার ভয়েই সে জনপদে যেতে চায়নি। সান্ত্বনা দিয়ে ওকে নিয়ে নাও। নওকর হিসাবেই তোমার কাছে রেখ। কিছুটা বেকুফ হলেও সে ওফাদার। ওর এখানে থাকা এজন্য নিরাপদ নয় যে, ওকে রামনাথের খোঁজে পাঠিয়েছিলাম, ভয় করছে ওর নির্বুদ্ধিতায় শেষ পর্যন্ত না আবার হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দেয় আর আমরা ফেঁসে যাই। নাও আসছে সে। '

পেয়ারলাল চোখ মুছে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। জয়কৃষ্ণ বললেন, 'পেয়ারলাল! বাড়ী যেতে চাও তো চটজলদি তৈরী হও।'

'মহারাজ ! আপনার মতলব আমি বাড়ী যাবার জন্য তৈরী নেব ?'

'হ্যাঁ, এখন তোমার বাড়ী যেতে কোন বাধা নেই। সর্দার রণবীর খোদ তোমার সঙ্গে থাকবেন।'

'সর্দার রণবীর!'

'হ্যাঁ! সর্দার রণবীর' তোমার সামনে দণ্ডায়মান, কেন তুমি তাকে চেন না ?

পেয়ারলাল জবাব না দিয়ে ইউসুফের দিকে হয়রান হয়ে তাকাল।

'এখন তোমার কোন ভয় নেই। আমিই তোমার দেখভালের জিম্মা নিয়ে নিয়েছি।'

'যাও জলদি তৈরী হও। গোবিন্দরামকে বলেছি তোমার ঘোড়ার জিন লাগাতে। কিন্তু এখানকার কেউ যেন ওর পরিচয় না জানে।'

'মহারাজ! আমার প্রতি বিশ্বাস রাখুন! আজ পর্যন্ত আমি রামনাথ সম্পর্কিত কোন কথা কাউকে বলিনি। কিন্তু আপনি কিছু মনে না করলে স্রেফ এতটুকু জানতে চাইবো– ইনি কি আসলেই তিনি ?'

'হ্যাঁ! তিনিই।'

'মহারাজ! তার মানে সর্দার মোহন চাঁদের পুত্র ?'

'হ্যাঁ! তোমার বিশ্বাস না হলে নির্মলাকে জিজ্ঞাসা করো, কথা বলে সময় অপচয় করো না।'

'আমাকে মাফ করে দিন মহারাজ! আমার ভাবনায়ও ছিল না যে, উনি আসতে পারেন। আমি এখনি তৈরী হচ্ছি। বলে পেয়ারলাল কামরায় চলে গেল। ওখানে গিয়ে একটি কাঠের বস্ত্র চাঁদের আলোয় মেলে ধরল। ওখান থেকে এক জোড়া সুন্দর কাপড় বের করল। পুটলি বেঁধে কি মনে আসায় নির্মলার কাছে গেল। নির্মলার সাথে কথা বলে গুর সন্দেহ দূর হলো। দ্রুত এলো আস্তাবলে। গোবিন্দরাম দু'টি ঘোড়া নিয়ে দন্ডায়মান। একটির লাগাম হাতে নিয়ে বললো, 'গোবিন্দরাম! বহুদূরে যাচ্ছি। আমার কামরায় যে মাল সামান আছে তার সবটাই তোমার।'

খানিক বাদে নৈউড়িতে জয়কৃষ্ণ ইউসুফ ও পেয়ারলালকে আল-বিদা দিলেন।
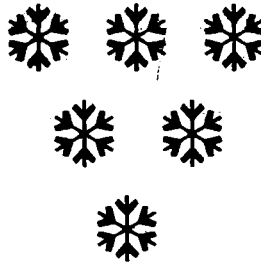
মুলতান থেকে আগে

কালিঞ্জরের শেষ অভিযান শেষে প্রায় আড়াই বছর সুলতান মাহমুদের বাহিনী দক্ষিণ প্রান্তরে তেমন একটা মনোনিবেশ করতে পারেনি। ঐ সময়টাতে সোমনাথ ভারতবর্ষের বিশাল প্রতিরোধ শিবিরে রূপ নিয়েছিল। দেশের হাজারো রাজা ও সর্দারবৃন্দ নিজেদের দুর্ভেদ্য কেল্লাগুলোকে অসংরক্ষিত মনে করে সোমনাথের চার দেয়ালের মাঝে আশ্রয় নিয়েছিল। বিভিন্ন মন্দিরের পূজারীরা তাদের স্বর্ণ-রৌপ্যের মূর্তিগুলো ওখানে জমায়েত করছিল। এদিকে সোমনাথের পূজারীরা হিন্দু সমাজের শিরার খুন নিংড়াতে চক্কর লাগাতেছিল। তারা সোমনাথ দেবতার অলীক কাহিনী শুনিয়ে আওয়ামকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে যাচ্ছিল। প্রত্যহ তাই সোমনাথে মানুষের ভীড় বেড়েই চলছিল। সকলেরই এক রব 'চলো চলো সোমনাথ চলো।' প্রায় আড়াই বছর ধরে প্রতিরোধ শক্তি তৈরী করার পর তারা চিন্তা করল- এ খবর শুনে মাহমুদ বোধহয় এদিকে আসার সৎসাহস দেখাবে না। শেষ পর্যন্ত আমাদেরকেই গজনীর পথ ধরতে হবে।

এক সময় সেদিনটি ঘনিয়ে এলো যেদিনে পঞ্চ দরিয়ার সরেজমিনে ইসলামী গাজীদের অশ্বক্ষুড় ধুলি ওড়াল। সুলতান মাহমুদ ২২ শে শাবান ৪১৬ হিজরীতে গজনী থেকে কোচ করলেন এবং ১৫ই রমজান মুলতান এসে একটি খোলা ময়দানে তাবু ফেললেন। তাঁর ফৌজে অন্তর্ভুক্ত ছিল সুদক্ষ ৩০ হাজার সেপাই। পথিমধ্যে বেড়ে চলল আরো, মুলতান ও সোমনাথের মাঝে ঐ মরুভূমি অন্তরায় ছিল যাতে পা রাখা মৃতকে ডেকে আনার নামান্তর। পথে খোড়াকি ও চতুষ্পদ জন্তুর দানা-পানি প্রাপ্তিরও কোন আশা ছিল না। সুলতান মাহমুদ প্রতি সেপাইয়ের খোড়াকি ও পানির জন্য দুটি করে উট নির্ধারণ করেছিলেন। এছাড়া ২০ হাজার উট কেবল পানি উঠানোর জন্য নির্ধারিত ছিল।

রমজান পর্যন্ত মরু পাড়ি দেবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। ঈদের মেম্বারে দাঁড়িয়ে সুলতান মাহমুদ সেপাহী ও স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্দেশ্যে জ্বালাময়ী ভাষণ রাখেন-

"আমার বন্ধুরা! তোমরা শুনেছ, কাল আমরা এখান থেকে কোচ করছি। আমাদের গন্তব্য দূরপাল্লার ও বন্ধুর, সোমনাথ যুদ্ধ আমার কাছে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিমের চূড়ান্ত লড়াই। আসন্ন যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করলে মুবাল্লিগে ইসলামের ধর্ম প্রচারের মূল অন্তরায় দূর হবে। পক্ষান্তরে আমাদের পরাজয়ের সাথে তাদের বাহুর শক্তি টুটে যাবে, এদেশে যারা ইনসানিয়াতের জয়গান গাইতে চায়। তোমরা সেই সীসা ঢালা প্রাচীর কুদরত যাদেরকে বাতিলের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন।

সুখ্যাতি ও নাম যশের জন্য আমরা বেশ কিছু দেশে ঘোড়া ছুটিয়েছি। আজ যে উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে তলোয়ার উঠাতে বলছি তা আমার ব্যক্তি সত্তার চেয়েও বুলন্দ। তোমাদের মধ্যে যারা নিছক আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধে হিস্যা নিতে চাও, ফিরে যেতে পার তারা। স্রেফ এমন কিছু শেরদিল মুজাহিদ আমার দরকার যারা কেবল শাহাদাতের তামান্না করে। সোমনাথ সেই অন্ধকারের আখেরী আশ্রয়স্থল যার পশ্চাদ্ধাবনে আমরা গঙ্গা-যমুনার তীরে গিয়েছি। সোমনাথের দেউড়িতে ঠিক তাদের সাথে তোমাদের মুকাবিলা হবে যারা পাথরের মূর্তিকে খোদার শরীক সাব্যস্ত করে। ওদের সংখ্যা ও অস্ত্র তোমাদের চেয়ে ঢের বেশী। কিন্তু মনে রেখ! যে সব মুজাহিদের খুনে তোমাদের অতীত ইতিহাস চকচকে পৃষ্ঠা লিখেছে, বাতিলের মোকাবেলায় তাদের সংখ্যা হামেশাই কম ছিল। হাজার ভেড়ার ম্যাও ম্যাও ডাক এক ব্যঘ্রের হুংকারের সামনে কিছু নয়। সোমনাথ তার পূজারী ও লশকরদের নিয়ে গর্ববোধ করে। ভরসা ওদের নিষ্প্রাণ প্রস্তর মূর্তির ওপর। কিন্তু তোমরা যদি সততঃ হৃদয়ে একথার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর যে, জয় পরাজয়ের মালিক তোমাদের খোদা; তাহলে আমি তোমাদের আগাম বিজয়ের সংবাদ দিতে পারি। নিছক খোদার সন্তুষ্টি নিয়ে তোমরা অগ্রসর হলে মরু, পাহাড় ও সমুদ্র তোমাদের চলার পথে অন্তরায় হতে পারবে না। খোদার জয়গান তোমাদের হবি হলে জাগতিক তামাম অনুদান তোমাদের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।"

পরদিন সকালে সুলতানের এই আজীমুশ্বান কাফেলা ধূলিঝড় উড়িয়ে সোমনাথ অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছিল। শীতলক্ষ্যা নদী অতিক্রম করে এ বাহিনী ঐ মরুভূমিকে পদার্পন করল যার দিগন্তে নীল আসমান নেমে গেছে বলে মনে হয়। দুর্গম এই মরুতে সবুজের টিকিটি নেই। শীত মওসুমের কারণে মরুতে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। দিনান্তের ক্লান্তি শেষে বাহিনী যখন বিশ্রাম নিত তখন মহাশূন্যে উটের আওয়াজ ও ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শোনা যেত। রাতে সেপাইরা ঠান্ডা বালুতে শুয়ে যেত। শেষ রাতে নকীবের আওয়াজে সকলে ঘুম থেকে জেগে উঠত। অতঃপর মুয়াজ্জিনের আজান শোনা যেত। নামাজ শেষে উদীয়মান সূর্য এদের পরবর্তী মঞ্জিলে রোখ করতে দেখত।

রসদ পানি বন্টনে পূর্ণ সাম্যতা রক্ষা করা হতো। একজন সাধারণ সেপাই যে রেশন পেত ঠিক তা-ই পেতেন সুলতান মাহমুদ গজনবী।

পথিমধ্যে সুলতান নাওদরোয়ার বিখ্যাত কেল্লায় হামলা করেন। কেল্লাবাসী সামান্য কিছুক্ষণ জমে লড়তে পেরেছিল। কিন্তু অজেয় মুসলিম বাহিনীর সামনে ওরা বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারল না। সুলতানের বীর সিপাহীরা পাথর ও তীর বৃষ্টি উপেক্ষা করে সিড়ি ও কমান্ডোদের মাধ্যমে প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ

করলে কেল্লারক্ষীরা হাতিয়ার ফেলে দেয়। অতঃপর দীর্ঘ এক মাসের সফর শেষে সুলতান বাহিনী আনহলওয়ারা এসে তাবু গাড়ল।

॥ দুই ॥

আনহলওয়ারা মহারাজা ভীমদেব-এর আত্মবিশ্বাস খামোকাই ছিল না। তার বাহিনীর ফিরিস্তিতে ছিল এক লাখ অশ্বারোহি, দু'শ হাতি ও ৯০ হাজার পদাতিক। তিনি সোমনাথ পুরোহিতকে সান্ত্বনা স্বরূপ বলেছিলেন, দুশমন উত্তর মরু পাড়ি দেয়ার ঝুঁকি নিবে না দুশমন সেনারা। সুতরাং সুলতান মাহমুদের পূর্বদিকের বিরাট এলাকা ঘুরে আসতে হবে। তারপরও সে সোমনাথে উপনীত হবার পূর্বে আনহলওয়ারামুখো হলে তাকে প্রতিহত করা হবে। আমাদের সাথে সে যুদ্ধে না জড়িয়ে সোমনাথের পথ ধরলে আমরা তাদের পেছন থেকে হামলা করে যুদ্ধসাধ মিটিয়ে দেব। কিন্তু মরু পথে সুলতানের অগ্রযাত্রার খবর আনহলওয়ারার ভীতে কাঁপন ধরায়। রাজা ভীমদেব ৩০ হাজার অগ্রবাহিনী প্রেরণ করেন সুলতানকে ঠেকাতে। বাদবাকী যে ফৌজ পূর্ব সীমান্তে ছিল তাদেরকে রাজধানীমুখো করা হয়।

রাজা ভীমদেবের প্রাসাদ।

রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট তিনি।

রাজার প্রতিবেশী গভর্নরগণ পালাক্রমে চেয়ারে বসা।

মহারাজা উপস্থিত গভর্নরদের লক্ষ্য করে বলেন, 'আফসোস! আমাদের; কিছু মিত্র সঙ্গ ছেড়েছেন; কিন্তু শত্রু অপেক্ষা আমাদের সৈন্য অগনিত। দুশমন কান্তার মরু পাড়ি দিবে বলে আমরা কল্পনাও করিনি। কিন্তু এক্ষণে আমাদের পেরেশান হলে চলবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ৩০ হাজার অগ্রবাহিনীই উত্তর সীমান্তে দুশমনের অগ্রযাত্রাকে রুখতে যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও আমাদের বাহিনী পিছু হটলে আনহলওয়ারার চার দেয়ালের মাঝেই সোমনাথের লড়াইয়ে লড়তে হবে। প্রমাণ করতে হবে কালিঞ্জর, কনৌজ, গোয়ালিয়র আর আনহলওয়ারা এক নয়।'

জনৈক করদাতা গভর্নর হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মহারাজ! অনুমতি দিলে আমি একটা কথা বলতাম।'

'বলুন।' বললেন রাজা ভীমদেব।

'মহারাজ! আমাদের যেসব মিত্র সঙ্গ ভঙ্গ করে সোমনাথের পথ ধরেছেন তাদেরকে কাপুরুষতার ধিক্কার দেব না। দেশের বেশ কিছু জ্যোতিষী বলেছেন, দুশমন সোমনাথ পৌছুবে অতি অবশ্যই। আপনার দরবারে যেসব রাজা ও সর্দার রয়েছেন তাদের সকলের অভিমত হলো, অন্যান্য রাজাদের ফৌজের মত আমাদের

ফৌজও সোমনাথ যাক। সোমনাথের চার দেয়ালের মধ্যে আমরা আরো আত্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনার সাথে লড়াই করতে পারব। আমার ভয় হচ্ছে, ভগবান না করুন উত্তর সীমান্তে আমাদের বাহিনী পরাজিত হলে আনহলওয়ারায় হতাশা ছড়িয়ে পড়বে এবং এতে করে আমাদের আরো মিত্রকে দলছুট হয়ে সোমনাথমুখো হবার সম্ভাবনা আছে।'

রাজা ভীমদেব উত্তেজনা ভরে বললেন, 'তোমাদের কেউ আমার সঙ্গ ছাড়লে তার পথ আগলাব না। শেষ সময় পর্যন্ত আমরা এই অঙ্গীকারের ওপর থাকব যে, আমাদের লাশ না মাড়ানো পর্যন্ত সুলতান মাহমুদ গযনবী সোমনাথমুখো হতে পারবে না।'

জনৈক বৃদ্ধ সর্দার দাঁড়িয়ে, কিছু বলতে যাবেন ঠিক সেই মুহূর্তে দরোজায় আনহলওয়ারা সেনাপতিকে দেখা গেল। পীন পতন নিস্তব্দতার মধ্যে সকলের দৃষ্টি তার প্রতি আটকে থাকল। সেনাপতি মসনদের নিকটে এসে সেনা কায়দায় কুর্নিশ করলেন এবং পরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

ভীমদেব শুষ্ক গলায় বললেন, 'সেনাপতি ! আপনি এ সময় এখানে কেন ?

'অন্নদাতা! আমি ....'

'বলুন! থামলেন কেন ?'

'অন্নদাতা ! আফসোস আমি কোন খোশ খবর নিয়ে আসিনি। দুশমনের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা।'

'তোমার চেহারাই অনেক কিছু বলছে। সত্য করে বলছনা কেন যে, তোমরা পরাভূত!'

'মহারাজ! দুশমনের হামলা এতই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, আমরা নিজদেরকে সামলানোরও সময় পাইনি। মুহূর্তে তার বাহিনী আমাদের সর্বদিক থেকে হামলা করে। অতঃপর আমাদের বাহিনী কেমন যেন ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ে।'

মহারাজ তার কথার মাঝখানে বললেন, 'আর তুমি সেই ফাঁকে পালিয়ে এলে- এই তো! জানতে ইচ্ছা করে, তুমি কি পরিমাণ সৈন্য বাঁচিয়ে আনতে পেরেছ।'

'অন্নদাতা! আমাদের ৮ হাজার সেপাই মারা পড়েছে।'

'আর দুশমনের ক্ষতি আমাদের চেয়ে বেশী।'

'হ্যাঁ মহারাজ!'

'আমি জানি তুমি একথাই বলবে। পরাভূত সেনাপতিরা রণেভঙ্গ দিয়ে একথাই বলে। আমাদের এ খবর জানানোর মত তকলীফ করতে গেলে কেন ? বাকী ২২ হাজার সৈন্যের কেউই কি তোমার দূত হবার যোগ্য ছিল না ?'

'অন্নদাতা কিছু কথা এমন আছে যা বলতে আমার আসা জরুরী ছিল। মহারাজ অধিকাংশ সেপাইদের খেয়াল, দুশমনকে কেবল সোমনাথেই পরাভূত করা সম্ভব। আমার মনে হয় এ মানসিকতার লোকজন রাজধানীতে আসতেই সাধারণ লোকজনের মনে হতাশা ছড়িয়ে পড়বে।'

'আমাদের সেপাইদের মধ্যে এ মানসিকতার লোক পূর্ব থেকেই কম ছিল না। বেশ কিছু রাজার সৈন্য ইতোমধ্যেই সোমনাথে পৌছে গেছে।'

'মহারাজ! আনহলওয়ারায়-ই আমাদের বাহিনী দুশমন বাহিনীকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে পারত। কিন্তু হায়! সাথীদের যদি একথা বোঝাতে পারতাম যে, দুশমন সোমনাথ ছাড়া আর সকল ময়দানেই বিজয়ী হবে।'

'কিন্তু তুমি কথার প্রতি ঠাট্টা ছুঁড়তে।'

'এক্ষণে একথার স্বীকৃতি দিচ্ছি যে, দুশমনের শক্তি সম্পর্কে আমার ধারণা গলদ ছিল। ওরা এমন এক সয়লাব দেবতাদের মদদ ছাড়া যাদেরকে স্রেফ শক্তি ও অস্ত্র বলে রোখা সম্ভব নয়।'

মহারাজা দরবারীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, 'এক্ষণে আমাদের সেনাপতিও পরামর্শ দিচ্ছেন যে, প্রজাদের এই অবস্থায় রেখে ফৌজ সোমনাথে চলে যাক। কিন্তু মনে রেখো! যে সৈন্য একবার দুশমনের সামনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সে পুনরায় সীনা টান করে লড়তে পারে না।'

জনৈক করদাতা উঠে বললেন, 'মহারাজ! যুদ্ধে পন্থা বদল আর পৃষ্ঠপ্রদর্শন এক জিনিষ নয়।

মহারাজা গর্জে ওঠলেন, 'তোমার মত মিত্রের দরকার নেই। তুমি যেতে পার। দুশমনের মুকাবিলায় আমার সৈন্যই যথেষ্ট।'

এই রাজা উঠে চলে গেলেন।

ভীমদেব চিৎকার দিয়ে বললেন, 'তোমাদের আরো কেউ দলত্যাগ করতে চাইলে তার অনুসরণ করতে পার।'

করদাতা মিত্রদের আরো ক'জন উঠে দাঁড়াল। দরবারে ছেয়ে গেল পীন পতন নীরবতা। ভীমদের রাগে ঠোঁট কামড়ে বললেন, 'এদের কাছে সোমনাথ যাবার বাহানা না থাকলে সবগুলোকেই জীবিত কবর দিতাম। বাহাদুর ও কাপুরুষদের একই মোর্চায় রাখার পক্ষপাতি নই আমি। সেনাপতিজি! আপনিও ওদের সাথে যেতে পারেন।'

সেনাপতি বললেন, 'অন্নদাতা! সঠিক অবস্থা আপনাকে জানানো দরকার ছিল। এরপর যে ফয়সালা হয় সে অনুযায়ী আমল করা আমার ধর্ম।'

'এখন থেকে সেনাপতি নয় সাধারণ এক সেপাই হিসাবে আমাদের সঙ্গ দিতে পার।' বলে মহারাজা উপস্থিত রাজাদের দিকে তাকালেন, 'আমাদের আখেরী ফয়সালা হলো, আমরা এখানে লড়ব। যারা এই মতের সাথে একমত নও তারা এই মুহূর্তেই দরবার ত্যাগ করতে পার।'

জনৈক সর্দার বললেন,

'মহারাজ! আমাদের জীবন-মরণ আপনার সাথেই হবে।'

মহারাজা বললেন, 'আমি আরেকবার তোমাদের কাছে প্রশ্ন করছি, তোমরা কি আমাদের সাথে থাকতে চাও ?'

'হ্যাঁ মহারাজ!' উপস্থিত সকলে সমস্বরে সায় দিল।

এরপর দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ কৌশল নিয়ে কথা হলো। সবশেষে দরবার মুলতবি ঘোষাণা করা হলো।

॥ তিন ॥

শেষ রাত।

গভীর নিদ্রা থেকে ঘুম ভেঙে মহারাজা তার নতুন সেনাপতির মৌখিক বক্তব্য শুনছিলেন যে, তার নিয়মিত সৈন্যের ১৫ হাজার বরখাস্ত সেনাপতির নেতৃত্বে সোমনাথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। বাদবাকী ফৌজের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

'তুমি ওদের রুখতে কোশেশ করলে না কেন?'

গোস্বা কম্পিত কণ্ঠে মহারাজা বললেন।

'মহারাজ! আমি আমার অধীনস্ত ফৌজকে ওদেরকে ঘিরে নেয়ার হুকুম দিয়েছিলাম; কিন্তু কেউই আমার কথায় সাড়া দেয়নি। তাদের সকলেরই এক কথা, সোমনাথ রক্ষার জন্য কাউকে বাধাদান মহাপাপ। আমি ওদের এই সন্দেহ কিছুতেই দূর করতে পারিনি যে, সোমনাথ ছাড়া কোন ময়দানে আমরা বিজয়ী হতে পারব না। কোন কোন সেনা অফিসার একথা পর্যন্ত বলতে দ্বিধাবোধ করেননি যে, মহারাজার আনহলওয়ারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে হবে। সকাল নাগাদ আরো ফৌজ দলত্যাগ করবে বলে মনে হয়। অষ্ট প্রহরে দুশমন এখানে উপনীত হবে। যথা শীঘ্র এই পরিসংখ্যান করতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত কি পরিমাণ সৈন্য আমাদের দলে থাকে। সৈন্য ছাড়াও নগরবাসীকে শান্ত করতে হবে। ওরা ঘরদোর ছেড়ে পালাচ্ছে।'

'তুমি একটি ছাউনী খালী করে দাও। ফৌজকে বলো, শহরের প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে দিতে। হায়! এই কাপুরুষদের শৃঙখলাবদ্ধ করে যদি দুশমনের সামনে আছড়ে ফেলতে পারতাম।'

সেনাপতি সহসাই বললেন, 'মহারাজার আখেরী ফয়সালা কি তাহলে এই যে, আমরা শেষ পর্যন্ত আনহলওয়ারায়-ই লড়ব ?'

'এখন কোন ফায়সালা দিতে পারছিনা– তুমি যাও এখন।'

সেনাপতি কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। মহারাজা ধপাস করে একটি কুরসিতে বসে পড়লেন। ওপাশের কামরা থেকে মাহারাণী বেরিয়ে এলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'সেনাপতি কি বলছেন ?'

'কিছু না। আরাম করো গিয়ে তুমি।'

'কিন্তু আপনি বড্ড পেরেশান।' মহারাণী তার সামনে বসে বললেন।

মহারাজা দরোজার বাইরে কারো লঘু পদধ্বনি শুনলেন। ফের কেউ দরোজা নক করে বললো, 'অন্নদাতা!' মহলের দারোগা হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই বললেন, 'শহরের লোক মহলের দরোজায় জমায়েত হচ্ছে এবং ব্রাহ্মণদের এক দল আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

মহারাজা দ্রুত বেরুলেন। সেনাপতি ও কেল্লার কিছু ফৌজি অফিসারকে দেখা গেল। সেনাপতি অগ্রসর হয়ে বললেন, 'মহারাজ! পরিস্থিতি বিস্ফোরনোম্মুখ। নগরবাসী মহলে জড়ো হচ্ছে। আমাদের ফৌজেরও একদল ওদের দলে মিশেছে। ব্যাপারটা আপনার গোচরে আনতে আমাকে আবারো আসতে হলো।'

মহারাজা থতমত খেয়ে বললেন, 'ওরা কি বলতে চায় ?

'মহারাজ! ওরা স্রেফ সোমনাথ যাত্রার শ্লোগান ঠুকছে। তবে আমার যা বিশ্বাস, আপনার দু'চার কথা ওদেরকে ঠান্ডা করতে পারে।

ভীমদেব বললেন, 'চলো।'

খানিক বাদে মহারাজা মহলের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার আওয়াজ 'সোমনাথ চলো' শ্লোগানের সামনে ম্লান হয়ে গেল।

পরদিন সুলতান মাহমুদের বাহিনী আনহলওয়ারা থেকে এক মঞ্জিল দূরে ছাউনী ফেলল। মহারাজা ভীমদেব কণ্ঠকোটের পথে পালিয়ে গেলেন। হাতি ছাড়াও ২০ হাজার অশ্বারোহী তার সাথে। ইতোমধ্যে তার ৩০ হাজার ফৌজ সোমনাথ দেবতার চরণে জীবন উৎসর্গ করার অভিলাষে সোমনাথে ঠাঁই নিয়েছিল। অন্যান্যরা পশ্চিম উপকূলে।

॥ চার ॥

ঠাকুর রঘুনাথ মহলের বাইরে খোলা ময়দানে প্রতিবেশী সর্দার ও অন্যান্য সেনাবাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করছিলেন। নির্মলা মহলের প্রশস্ত কামরায় উপবিষ্ট। জনৈকা চাকরানী এসে বললো, 'আপনার বাবা এসেছেন।'

'নিয়ে এসো তাকে।' বললো নির্মলা।

'খানিক বাদে জয়কৃষ্ণ কামরায় প্রবেশ করলেন। কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়া বললেন, নির্মলা! তুমি এখনও তৈরী হওনি।'

'বাবা! আমি এখনও মুন্নিগড় ছাড়ার ফয়সালা করিনি।'

'খুকী! এখন চিন্তা করার সময় নেই। মুসলিম ফৌজ আনহলওয়ারার দোরগোড়ায় এবং আনহলওয়ারা সম্পর্কে আমি যে তাজা খবর পেয়েছি তাতে বলা যায়, সুলতান মাহমুদের এখানে পৌঁছাতে খুব একটা সময় লাগবে না।'

'আনহলওয়ারা সম্পর্কে আপনি কি শুনেছেন ?'

জয়কৃষ্ণ চেয়ারে বসে বললেন, 'ঠাকুরজি তোমায় বলেননি।?'

'না! উনি আমাকে স্রেফ সফরের তৈরী নিতে বলেছেন। আনহলওয়ারা সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি।'

'আমি যদ্দুর জানি সুলতান মাহমুদের অগ্রযাত্রা রুখতে মহারাজা যে বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, পরাভূত হয়েছে তারা এবং মহারাজার সাথীদের মধ্য থেকেও কিছু স্বসৈন্যে সোমনাথের পথ ধরেছেন। গতরাতে এই ফৌজ আমাদের শহরের নিকট থেকে অতিবাহিত হয়েছিলেন। তুমি জলদি তৈরী নাও।'

'বাবা! আমি যে এখানেই থাকতে চাই।'

'দেখ খুকী! বোকামি করোনা। মুসলমান সম্পর্কে তোমার এ পরিমাণ আস্থা ঠিক নয়। ঝড় তুফান এলে আগাছার পাশাপাশি ফলদার বৃক্ষকেও উপড়ে ফেলে। ওরা এলে রণবীরের মত লোকের টিকিটি খুজে পাবে না। এই টর্ণেডো উৎরে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে মুন্নিগড়ের বাইরে থাকতে হবে। ঠাকুরজি তার খাজানাও আমার হাতে সোপর্দ করেছেন। তোমার কারণেই রণাঙ্গন থেকে দূরে থাকার বাহানা পেয়ে যাব আমি। তুমি এখানে থাকার জিদ ধরলে ঠাকুরজির সাথে আমাকে রণাঙ্গনে যেতে হবে।'

ঠাকুরজি হন্তদন্ত হয়ে কামরায় দাখেল হলেন। বললেন, 'আপনি এখনও তৈরী হননি। জলদী করুন!'

'আমরা প্রস্তুত।' জয়কৃষ্ণ উঠতে উঠতে জবাব দেন।

ঠাকুরজি নির্মলার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'নির্মলা। পেরেশানীর কিছু নেই। কণ্ঠকোট পৌঁছার পূর্বেই তুমি জানবে আমরা দুশমনের গতিরোধ করেছি।'

'কিন্তু আমি তো শুনেছি আনহলওয়ারার ফৌজ এখনই পলায়ন শুরু করেছে।' বলল নির্মলা। ঠাকুরজি প্রভাবিত হয়ে বললেন, 'কিছু বুযদিল রাজা সর্দারদের পশ্চাদপদতায় আনহলওয়ারা বাহিনীতে কোন প্রভাব পড়ে না। জলদী করো। যাবার পূর্বে তোমাকে রুখসত করে যেতে চাই।'

এক ঘন্টা পর নির্মলা, জয়কৃষ্ণ, নারী ও শিশুদের একটি কাফেলা কণ্ঠকোট রোখ করছিল। দু'চাকরানীর সাথে হাতিতে সওয়ার ছিল নির্মলা। অপর পাঁচটি হাতির ওপর সর্দারদেব বাল-বাচ্চারা, দু'টি হাতিতে ঠাকুর রঘুনাথের সম্পদ। অন্যান্য নারী শিশুদের কেউ ঘোড়ায় আর কেউ গরুর গাড়ীতে। প্রায় দেড়শ সেপাই এদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। জয়কৃষ্ণ এদের পথ প্রদর্শক।

॥ পাঁচ ॥

নির্মলাকে রওয়ানা করিয়ে ঠাকুর রঘুনাথ ২০ হাজার অশ্বারোহী ও ৪০টি হাতিসহ আনহলওয়ারা অভিমুখে রওয়ানা হন; কিন্তু তারা বেশীদূর এগুতে না এগুতেই উত্তর দিগন্তে বিশাল এক বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ঠাকুরজি সৈন্যদেরকে থামতে নির্দেশ দেন। জনৈক অভিজ্ঞ সেনা অফিসারের নেতৃত্বে কিছু সেপাই পরিস্থিতি আঁচ করতে পাঠালেন। তারা এসে জানাল, এই বাহিনী আনহলওয়ারা থেকে এসেছে। সেনাপতি ঠাকুর দাস খোদ ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

'ওরা যাচ্ছে কৈ?' ঠাকুরজির প্রশ্ন।

'মহারাজ! ওরা সোমনাথ যাচ্ছে।'

'কিন্তু তা হয় কি করে! মহারাজের এই অভিপ্রায় থাকলে তিনি আমাদের আনহলওয়ারায় সমবেত হতে বললেন কেন ? ঠাকুর দাস তো এখন অবসরপ্রাপ্ত।'

'মহারাজ! আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি। আমার তামাম প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, তুমি ঠাকুরজিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। দেখুন মহারাজ! উনি রাস্তাও পরিবর্তন করেছেন। খুব সম্ভব তারা আমাদের এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে।'

'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত স্বসৈন্যে তুমি এখানে থাক।' ঠাকুরজি অফিসারকে নির্দেশ দিয়ে ঘোড়ার পদাঘাত করলেন।

ঘন্টা খানেক পর ফিরে এসে ঠাকুর রঘুনাথ অফিসার ও সর্দারদের এক নয়া পরিস্থিতি শোনাচ্ছিলেন। আনহলওয়ারা বাহিনী চলে গেল। আনহলওয়ারার বড়

বড় অফিসারগণ বাদানুবাদ শেষে সামনের শহরে ছাউনী ফেলার পর রাজধানীর তাজা খবর জানতে চাইল। সুতরাং সূর্যাস্তের পূর্বে এই বাহিনী সামনের ছোট একটি শহরে ছাউনী ফেলল এবং একদল সেপাইকে আনহলওয়ারার তাজা খবর আনয়নের জন্য পাঠানো হলো।

পরদিন ঠাকুরজি এদের মারফত জানতে পারলেন, মহারাজা কণ্ঠকোটের পথে পালিয়ে গেছেন। কাজেই বিনা বাধায় অতি সহজে সুলতান বাহিনী আনহলওয়ারা কেল্লা কব্জা করেছে।

ঠাকুরজি তার বাহিনীকে কোচ করার হুকুম দিলেন। শেষ প্রহরে এ বাহিনী মুন্নিগড়ের সাত ক্রোশ দূরবর্তি একটি জনপদে শ্রান্ত-ক্লান্ত ঘোড়াকে পানি পান করাচ্ছিল। এক সেপাই উত্তর দিকে ইশারা করে বললো, 'মহারাজ! মহারাজ! আরেকদল ফৌজ আসছে।'

ঠাকুরজি ও তার সাথীরা দিগন্তে ঘুরে তাকালেন। চোখের শেষ সীমায় দেখা যাচ্ছে বিশাল এক বহরের আবছায়া। ঠাকুর বললেন, 'এটা শত্রুসৈন্য হতে পারে না। ওরা এত দ্রুত এখানে পৌছুতে পারে না।

জনৈক বৃদ্ধ সর্দার বললেন, 'দুশমন তার অগ্রগামী বাহিনীকে আগেভাগেই রওয়ানা করিয়ে দিতে পারে। সুতরাং অতি শীঘ্রই এখান থেকে আমাদের চলে যাওয়া দরকার।'

ঠাকুরজি গর্জে ওঠলেন। 'ওরা দুশমন সেপাই হলে আমরা ওদের মোকাবেলা করব, পলায়নকারীদের সঙ্গ দেব না কিছুতেই।'

বাহাদুর সর্বদা সীনায় তীর খেতে প্রস্তুত থাকে।

মুন্নিগড়ের সর্দার থতমত, পেরেশানি ও ভয়কাতুরে দৃষ্টি নিয়ে ঠাকুরজির প্রতি তাকালেন। তিনি ঘোড়া ছেড়ে হস্তিপৃষ্ঠে চড়ে চিৎকার দিয়ে বললেন,

'মনে রেখো! আজ সোমনাথ দেবতা তোমাদের দেখছেন। আমরা খোলা ময়দানেই দুশমনকে প্রতিহত করব।

খানিক পর মুন্নিগড় বাহিনী একটি খোলা ময়দানে 'সোমনাথ কি জয়' শ্লোগান দিয়ে পরিবেশ কাঁপিয়ে তুলল। দিগন্ত থেকে আগত ফৌজ আধা মাইল দূরে এসে থমকে গেল। এদের সংখ্যা ৫ হাজারের কাছাকাছি। মুন্নিগড় ফৌজের হতাশা ও বিক্ষিপ্ততা বিশেষ এক আত্মবিশ্বাসে পর্যবসিত হচ্ছিল। রঘুনাথের হুকুমে জনৈক ফৌজি অফিসার ঘোড়া হেঁকে সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি এসে জানালেন। 'ওরা সুলতান বাহিনী।' রঘুনাথ কোন প্রকার অপেক্ষা না করে অগ্রসর হয়ে হামলা করার হুকুম দিলেন। মুন্নিগড় বাহিনীর মাঝখানে হাতি বহর। ডানে, বায়ে ও পেছনে

অশ্বারোহী বাহিনী ধুলিঝড় উড়িয়ে অগ্রসর হলো, কিন্তু আনহলওয়ারা থেকে আগত সুলতান বাহিনী স্ব-স্থানেই দাঁড়িয়ে রইল।

মুন্নিগড় বাহিনীর সামনের কাতারের অশ্বারোহী বাহিনী দুশমনকে দু'পাশ দিয়ে হাতি বহরের মাধ্যমে ঘিরে ফেলার মানসে চক্রাকারে অবরোধ করল। আচমকা মুসলিম বাহিনীর মাঝে পাল্টা আক্রমনের চিহ্ন ফুটে ওঠল। মহাশূন্য গুঞ্জরিত হল নারায়ে তাক্‌বীর ধ্বনিতে। তীরন্দায বাহিনী মুন্নিগড় ফৌজের বাম পার্শ্বে সাড়াশী হামলা চালাল। বাকী ফৌজ চালালো পেছন দিয়ে। কাতার চিরে এগিয়ে গেল তারা সামনে। মুন্নিগড় বাহিনী ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছিল। তাদের আশে পাশে মুসলিম বাহিনী। মুন্নিগড় বাহিনী এই হামলার ধকল সামলাতে না সামলাতে মুসলিম বাহিনী পুনরায় হামলা চালাল। বাম পার্শ্ব ছাড়া গোটা হিন্দু সৈন্য ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। কেননা ঐ পার্শ্বে হাতি বহর।

আরব আফগানিস্তানের কিছু সেনা পেছন দিয়ে হামলা চালাল। কাতার চিরে তারা হাতি বহরের নিকটে পৌছুল। গোটা হিন্দু বাহিনী এ সময় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। মুসলিম বাহিনী যেদিকেই হামলা শানাল সেদিকের হিন্দু সেনা-ই কচুকাটা হতে থাকল। অশ্বারোহি বাহিনী সম্মিলিত হামলা না চালিয়ে বিক্ষিপ্ত হামলা করল। বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও রঘুনাথ বীরত্ব প্রদর্শন করে যাচ্ছিলেন। আরেকবার তিনি হাতি বহর শত্রুর দিকে তাক করলেন। কিন্তু প্রতিবার তার ছুটন্ত ঘোড়া এদিক ওদিক চলে যেত। ঘন্টাখানেক পর মুন্নিগড়ের কিছু সর্দার তাদের সঙ্গ-পাঙ্গসহ পালালে রঘুনাথ ঘোড়া ছেড়ে হাতির পীঠে চাপলেন এবং সবাইকে ধর্মের দোহাই শোনালেন। আচমকা দুশমনের একটা তীর তার বুকে লাগল। হাওদার পিঠেই তিনি ঢলে পড়লেন।

এ দৃশ্য দেখে জনৈক অফিসার বাহিনীকে পিছু হটার নির্দেশ দেন।

মুন্নিগড়ের বহু সৈন্য ইতোমধ্যেই ময়দান ছেড়ে দিল। হাতি বহর রণাঙ্গন ছাড়তেই অন্যান্য বাহিনীও পলায়ন করল। মুসলমানরা ক্রোশ তিনেক এদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং হাজারো সেপাইকে মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত করল। শেষ পর্যন্ত তাদের সেনাপতি সকলকে থামতে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'আমরা এর সামনে যাব না। ঘোড়াগুলো দম ফেল করেছে। মাগরিব নামায পড়ে আমরা আশে পাশের কোন বসতিতে রাত্রী যাপন করব। অতঃপর তিনি এক নওজোয়ান অফিসারকে নির্দেশপূর্বক বলেলেন, 'নামায পড়েই তুমি আনহলওয়ারা রওয়ানা হয়ে যাও। সুলতানকে বলো, আনহলওয়ারা থেকে মুন্নিগড়ের পথ বিপদমুক্ত।

আমরা আগামীকাল মুন্নিগড় অবরোধ করব।

॥ ছয় ॥

মুন্নিগড়ের অধিকাংশ লোকালয় যেখানে মন্দির ছাড়াও বড় বড় সর্দারদের মহল ছিল, এর সিংহভাগই শহরের চার দেয়ালের বাইরে ছিল। সুলতান বাহিনী গেরিলা হামলার স্থলে চারদিক থেকে উহা অবরোধ করল এবং পূর্বদিক থেকে শহরে প্রবেশ করল। মন্দিরের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে ঐ বাহিনী পদে পদে মারাত্মক বাধার সম্মুখীন হলো। তাদের হামলা জোরদার হতে চললেও মন্দির পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হলেন না। মন্দিরের ভেতরে হাজারো মানুষ শেষ মুহূর্তে লড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ওদের একদল পিছু হটলে অপর একদল ওদের স্থানে জমে দাঁড়াত।

মন্দিরবাসী যে হিম্মৎ ও শৌর্যবীর্যের সাথে ভেতরে লড়ছিল মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে পাল্টা হামলা চালালে মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্যকে শহরের বাইরে তাড়িয়ে দেয়া খুব একটা মুশকিল হত না। কিন্তু ব্রাহ্মণরা ওদের বলেছিল, মন্দির ছেড়ে বাইরে গিয়ে হামলা চালালে দেবতারা তাদের প্রতি নাখোশ হবেন।

দুপুরের দিকে মন্দির চত্বর লাশে ভরপুর হয়ে গেল। এদিকে হামলা প্রতিহতকারীরা মন্দিরের দরোজা বন্ধ করে দিলেন। মুসলমানরা একস্থান থেকে দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করলেন। মন্দিরের রক্ষীবাহিনী এদের ঘিরে নিতে চাইল। কিন্তু এতক্ষণে আরেকদল এসে গেছে। তারা রক্ষীবাহিনীকে একদিকে হাঁকিয়ে অন্যান্য সেনাদের জন্য ফটক খুলে দিলেন। মূল মন্দিরে প্রবেশের সময় সুলতানের আরো ১০ হাজার তাজাদম ফৌজ এদের সাহায্যার্থে এসে দলে ভিড়ল। মুন্নিগড় বাহিনীর হিম্মৎ এ সময় সম্পূর্ণ উবে গেল। তারা হতাশ হয়ে দীঘিতে ঝাঁপ দিল। মন্দির পূজারী প্রধান পরাজয় সুনিশ্চিত দেখে দক্ষিণের গুপ্ত পথে পলায়ন করলেন।

শেষ বিকালে সুলতান মাহামুদ তার বাহিনীসহ মুন্নিগড় এসে পৌঁছুলে একমাত্র মন্দির ছাড়া শহরের অন্যান্য স্থানে ইসলামী পতাকা ওড়তে দেখলেন এবং দীঘির আশে পাশে মন্দির কর্তৃক স্থাপিত হাজারো মূর্তি ভাংচুর করে ওগুলোর নিষ্ক্রিয়তা প্রমাণ করতে দেখতে পেলেন।

আনহলওয়ারার চেয়ে মুন্নিগড়ে ঢের সম্পদ হাসিল করলেন সুলতান মাহমুদ গজনবী।

ঠাকুর রঘুনাথের যখমী হবার খবর কিছু অফিসার ও সেপাইরা ছাড়া আর কেউ জানত না। ঠাকুর ও পূজারীরা রাতের বেলা তাদের দেখতে এলো। ঠাকুরজির হালত আশংকাজনক। পুরোহিত শহরের অভিজাতগণকে বললেন, 'ঠাকুরের যখমী হালত শহরবাসী জানলে তাদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়বে। এজন্য আমাদের ঘোষণা করতে হবে যে, তার বাহিনী পরাজিত হবার পর তিনি রাজা ভীম দেবের কাছে সৈন্য আনতে কণ্ঠকোট গেছেন এবং খুব শীঘ্র ফিরে আসবেন।'

ঘটনাচক্রে আনহলওয়ারা শাহী হেকিম ওখানে ছিল। ঠাকুরজির নওকর তাকে নিয়ে এলো। সুলতান মাহমুদ স্বসৈন্যে আগমন করলে মহলকে অরক্ষিত মনে করে তাকে এক গরীব কুটিরে স্থানান্তর করা হলো। এক নওকরকে জয়কৃষ্ণের কাছে এই পয়গাম দিয়ে পাঠানো হলো যে, ঠাকুরজি মারাত্মক যখমী। এজন্য আপনি পথিমধ্যে অপেক্ষা করে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকুন।

মুন্নিগড় জয় করে সুলতান মাহমুদ ঠাকুরজির মহলে অবস্থান করলেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানলেন না যে, এই মহলের মালিক পাশেই একটি জীর্ণ বস্তিতে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তৃতীয় দিন সুলতান স্বসৈন্যে কোচ করলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বারের মত ঠাকুরকে মহলে আনা হলো। মনুরাজ ঠাকুরজির কোন উপকারে এলেন না। মহলে পৌঁছেই ঠাকুর ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'নির্মলা এখনও আসেনি ?'

মনুরাজ বলেন, 'আপনার যখমী খবর শুনে সে পথিমধ্যে যাত্রাবিরতি করছে। দুশমন এখান থেকে চলে যেতেই এক নওকরকে তাদের খবর দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, কাল নাগাদ তারা এসে পৌঁছুবে।'

কিন্তু ঠাকুরের যে ততক্ষণ অপেক্ষার সময় নেই। পরদিন সকাল বেলা নির্মলা যখন তার বাবাসহ মহলে উপনীত হয়, এর ক'মুহূর্ত পূর্বে শেষবারের মত প্রিয়তমার নামটি উচ্চারণ করে ঠাকুরজি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

॥ দুই ॥

ঠাকুরজির লাশের কাছে নির্মলা উপবিষ্ট। শহরের মহিলারা ওকে স্বামীর শেষকৃত্য পালনের প্রস্তুতি নিতে বলছিলেন। মন্দিরের যারা মুসলমানদের চলে যাওয়াতে সম্বিত ফিরে পেয়েছিল তারা মহলে এসে জড়ো হতে লাগল। ঠাকুরের মৃত্যু তাদের জীবনে এক হিরোর মৃত্যু। শহরের নারীদের ভীড়ে জয়কৃষ্ণ মেহমান

খানায় যান। ওখানে ঠাকুরের নিকটতম আত্মীয়, আমীর-উমরা ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত। এরা ঠাকুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছিল। মন্দিরের পুরোহিত প্রধান যিনি বিপদ দেখে পলায়ন করেছিলেন পুনরায় লোকজনসহ এই মহলে এসে সমবেত হলেন। তিনি শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে বললেন, 'আফসোস! ঠাকুরজির মৃত্যুর পূর্বে আমাদের ধর্মশত্রুকে পরাভূত দেখতে পেলেন না। দেবতাগণ মুসলমানদেরকে ধ্বংসের পথে ডাকছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকব। যাদের লড়ার শক্তি আছে দ্রুত তাদেরকে সোমনাথে উপনীত হতে হবে। দুশমন দ্বিতীয়বারের মত এখানে আসবে না। ওদের পশ্চাদ্ধাবন এখন প্রতিশোধ নেয়ার একমাত্র উপায়। রাজা ভীমদেব দেবতাদের নারাজ করেছেন। কাজেই আমাদের সমাজে এক্ষণে তার কোন ঠাঁই নেই। তিনি কাপুরুষতা প্রদর্শন না করলে এই বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতো না।'

জনৈক ব্রাহ্মণ অগ্রসর হয়ে পুরোহিতের কানে কিছু বললেন। তিনি জয়কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে বললেন, 'সর্দার জয়কৃষ্ণ! আমাদের রায় ঠাকুরজির শেষকৃত্য খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হোক। এখানের কাজ শেষ হলে আমি দ্রুত সোমনাথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হব। ভেতরে গিয়ে আপনি নির্মলা দেবীকে প্রস্তুত করুন।'

জয়কৃষ্ণের বুঝতে বাকী নেই নির্মলাকে কোন উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিতে বলা হচ্ছে। তিনি বড্ড অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকালেন। ফের খানিক ভেবে বললেন,'আমার মতে ঠাকুরজির গোটা খান্দান না পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হোক। আর মহারাজা ভীমদেবও আগামী কাল নাগাদ এসে পৌঁছবেন।'

পুরোহিত বলেন, 'আনহলওয়ারা থেকে পলায়নের পর ভীমদেব আমাদের রাজা থাকেননি। এক্ষণে তিনি ঠাকুরজির রিশ্‌তা হিসাবে শেষকৃত্যে অংশ নিতে পারবেন না।'

জয়কৃষ্ণ বললেন, 'আমাদেরকে কমপক্ষে অন্যান্য রিশ্‌তাদের অপেক্ষা করা প্রয়োজন।'

'যারা ভীমদেবের সাথে কণ্ঠকোট গেছে ঠাকুরজির আত্মীয়কে স্পর্শ করার কোন অধিকার নেই তাদেরও। ঠাকুরজির রিশ্‌তা কেবল তারা যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার সাথে ছিল। এক্ষণে দেখুন, শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মহলের বাইরে জড়ো হচ্ছে। সেই হাজারো লোকের একজন আমি, শত্রু সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবনের পূর্বে যে ঠাকুরজির সৎকার করতে চায়।'

জয়কৃষ্ণ ক্রন্দন করে বললেন, 'ঠাকুরজির ইচ্ছে ছিল না, তার চিতায় নির্মলাকে জীবন্ত পোড়ানো হোক। এ প্রথাকে তিনি যারপরনাই ঘৃণা করতেন এবং এ কারণেই ওকে মুন্নিগড়ের বাইরে প্রেরণ করেছিলেন।'

উপস্থিত সকলের দৃষ্টি জয়কৃষ্ণের চেহারায় আটকে থাকল। ঠাকুরজির জনৈক আত্মীয় বললেন, 'ঠাকুরজি মৃত্যুর পূর্বে তার স্ত্রীকে বাড়ীতে দেখতে চেয়েছিলেন।'

পুরোহিত বললেন, 'ভাবতে অবাক লাগে কনৌজের এক রাজপুত ও আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন সর্দার তার মেয়েকে সতীদাহ করতে নারাজ। তাও আবার ঠাকুরজির মত স্বামীর সাথে।'

ঠাকুরজির মামাত ভাই অর্জুনদেব উত্তেজনা ভরে বললেন, 'মহারাজ! কনৌজের রাজপুতদের খুন সাদা হয়ে গেছে। তাই ঐ মহৎ কাজের জন্য জয়কৃষ্ণের পরামর্শের দরকার নেই আমাদের।'

শহরের কিছু অভিজাতবর্গ এই তর্কে জড়িয়ে পড়ল। জয়কৃষ্ণ ভেবে দেখলেন এক্ষণে ফরিয়াদ অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এক্ষণে নির্মলাকে নিয়ে পালানোর কৌশল ছাড়া অন্য কিছু কাজে আসবে না। কিছুক্ষণ ভাবার পর তিনি কতকটা নরম সুরে বললেন, 'আপনারা বিগড়ে গেলেন কেন ? আমি এই প্রথার বিরোধী নই। স্রেফ ঠাকুরজির রায় প্রকাশ করছিলাম। ঠাকুরজির স্ত্রী সতীদাহ ছাড়া গত্যান্তর নেই। আর আমার মেয়ের শিরায়তো এক নীতিবান রাজপুতের রক্ত প্রবাহিত। নিষেধ করলেও ঠাকুরজির জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিবে।'

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। পুরোহিত বললেন, 'আপনার থেকে এই আশাই করছিলাম। সুতরাং এখন আর দেরী নয়। সূর্যাস্তের পূর্বেই সৎকারটা করে ফেলা দরকার।'

'আমাদের পক্ষ থেকে দেরী হবে না মহারাজ।'

বললেন আত্মীয়দের মধ্যে কেউ।

পুরোহিত জয়কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠাকুরজি যে ধন-ভান্ডার আপনার কাছে সোপর্দ করেছিলেন– তা কৈ?'

'মহারাজ! তা এখানে না নিয়ে এসে কণ্ঠকোটের ফৌজের স্বার্থে পাঠিয়ে দিয়েছি। স্রেফ কিছু অলংকারাদি নির্মলার কাছে আছে। আমার কাছেও কিছু আছে। এসব কিছু মওকামত দান করে দেয়া হবে। নির্মলার খায়েশ ঠাকুরজির তামাম সম্পত্তি মন্দিরে দান করা হবে।' ব্রাহ্মণদের চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু ঠাকুরজির আত্মীয়দের মুখ কালো হয়ে গেল। পুরোহিতজি তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বললেন, 'কৃষ্ণজি! আপনি তৈরী হয়ে নিন।'

জয়কৃষ্ণ উঠে গেলেন।

॥ তিন ॥

খানিকবাদে নির্মলার এক চাকরানী ওর কানে কানে বলল, 'ওপাশের কামরায় আপনার বাবা অপেক্ষা করছেন।'

নির্মলা চাকরানীর অনুসরণ করল। মহলের কোণে কামরার দরোজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো জয়কৃষ্ণ। নির্মলা তার কাছে এসে দাঁড়াল। পরে ফুঁপিয়ে কেঁদে বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

চাকরানীকে জয়কৃষ্ণ বললেন, 'তুমি এক্ষুণি একজোড়া পুরানো কাপড় নিয়ে এসো। খবরদার। কেউ যেন টের না পায়।

'চাকরানী চলে গেল। জয়কৃষ্ণ ওর বাযু ধরে কামরার ভেতরে টেনে নেন।

'নির্মলা! হায়! তুমি যদি আমার কথা মত আমল করতে। আহা! যদি আমরা এখানে না আসতাম।'

'কিন্তু তিনি মরে যাবেন তা কে জানত। আর আমাকে তার সাথে সতীদাহ হতে হবে? বাবা! আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না, কিন্তু ঠাকুরজির চিতায় ঝাঁপ দিয়ে মরা আমার জন্য বেদনাদায়ক।'

'নির্মলা! এক্ষণে তোমার জীবন বাঁচানোর একটি মাত্র পথ আছে। গভীরভাবে আমার কথা শোন। তোমার চাকরানী আমাদের সঙ্গ দেবার অঙ্গীকার করেছে। এখনই সে তার ব্যবহৃত পুরান কাপড় নিয়ে আসবে। লেবাছ পাল্টে গবাক্ষ পথে তুমি আমাদের মহলে যাবে। আমি গোবিন্দরামকে ঘোড়া তৈরী করতে বলেছি। সে তোমার অপেক্ষায় থাকবে। তুমি দ্রুত চৌরাস্তায় যাবে। মুসলমানদের ফৌজ ওখানে আছে। ওদের কাছে যেতে পারলে এখানকার কেউই তোমার পিছু নিতে সাহস পাবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার কথা শোনার পর মুসলমানরা তোমাকে আশ্রয় দিবে। তোমাকে পলায়নের সুযোগ দিতে এখানে কিছুক্ষণ থাকব আমি। যে কোন মঞ্জিলে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে।'

'না না বাবা! এটা হতে পারে না। আপনাকে এখানে একাকী ছেড়ে.....'

জয়কৃষ্ণ ওর কথা অসম্পূর্ণ রেখে বলেন, 'আমার কোন খত্‌রা নেই এখানে। আমি যতক্ষণ মহলে আছি ততক্ষণ তোমাকে নিয়ে ভাববে না কেউই। মহলের পেছনের দরোজা খোলা দেখে এসেছি। আজ ওদিকটায় তেমন কোন প্রহরীও নেই। এই হুলস্থুলের মধ্যেম কেউ তোমার পিছু নেয়ার চিন্তা করবে না। হাজারো নারী মহলে গিজ গিজ করছে। স্রেফ এতটুকু খেয়াল রাখবে, কেউ যেন তোমার চেহারা না দেখে।'

'কিন্তু বাবা........'।

'ভগবানের দিকে চেয়ে এখন তর্কে যেও না। তুমি জানো, তোমায় ছাড়া আমার জীবনের কোন মূল্য নেই। তোমার পূর্বেই আমি চিতায় যেতে চাই। আমার কথা মানলে তোমার আমার দু'জনের জীবনই বেঁচে যেতে পারে। পলায়নের চেষ্টা এ মুহূর্তে ঝুকিপূর্ণ নিশ্চয়ই কিন্তু জলন্ত চিতায় পুড়ে খাক হয়ে যাবার মত নয়। পালাতে সক্ষম হলে তো জীবন বেঁচে গেল কিন্তু চিতার লেলিহান শিখা থেকে পালানোর কোন উপায় আছে কি বেটি? নির্মলা! আমার মন বলছে, তুমি বেঁচে যাবে। যে রামনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে ভগবান মুসলিম জাতিকে সোমনাথের পথ দেখিয়েছে, সে অবশ্যই তোমার মদদ করবে। হিম্মৎ করো মা!'

চাকরানী বোগলে পুরান কাপড় পেঁচিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল। কাপড় হাতে নিয়ে নির্মলা বললো, 'বাবা! আপনি নিশ্চিত যে, আপনার কোন বিপদ নেই?'

থতমত খেয়ে জয়কৃষ্ণ জবাব দেন, 'না বেটি আমার কোন বিপদাশংকা নেই। ভগবানের দিকে চেয়ে জলদি করো।'

নির্মলা পেছনের কামরায় প্রবেশ করল। জয়কৃষ্ণ চাকরানীকে বললেন, 'তুমি আজ যে মদদ করলে আজীবন তার ঋণ শোধ করতে পারব না। এক্ষণে তোমার শেষ দায়িত্ব, নির্মলাকে গবাক্ষ পথ পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া।'

চাকরানী অশ্রুসজল নয়নে জবাব দেয়, 'নির্মলার জন্য আমি জান কোরবান করতে প্রস্তুত।'

'নির্মলাকে বের করে দিয়ে আমাকে খবর দিও। অতঃপর তুমি ঠাকুরজির লাশ ঘরে যাবে। ওখানকায় অবস্থিত নারীদের ওর ব্যাপারে সন্দেহ হবে। তুমি ওদেরকে নানা কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখবে।'

পোশাক পাল্টে পেছনের কক্ষ থেকে বেরোল নির্মলা। জয়কৃষ্ণ ওকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে করিডোরের দিকে ঠেলে দিলেন। চাকরানী গেল ওর সাথে। জয়কৃষ্ণ দরোজা বন্ধ করে ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন।

॥ চার ॥

নির্মলাকে রওয়ানা করিয়ে জয়কৃষ্ণ নেহাৎ পেরেশানীর সাথে দরোজায় কান লাগিয়ে ছিলেন। করিডোরে কারো পদধ্বনি শোনা গেলে তার হৃদয়ের ধুক ধুকুনি বেড়ে যেত। ভেজানো দরোজা সামান্য ফাঁক করে তিনি করিডোরে তাকাতেন, কিন্তু নির্মলার চাকরানীর স্থলে অন্যকে দেখে ফের দরোজা বন্ধ করে দিতেন। প্রতি মুহূর্তে তার এই পেরেশানীতে প্রবৃদ্ধি ঘটে চলছিল। চাকরানী এখনো কেন এলো না?

দরোজার বাইরে নির্মলাকে কেউ চিনে ফেলল কি ? চাকরানী কি আমাকে খবর না দিয়ে সরাসরি ঠাকুরজির লাশ ঘরে গেল ? এই প্রশ্নের সান্ত্বনাদায়ক কোন জবাব নেই জয়কৃষ্ণের কাছে। কামরার মধ্যে এক একটা মুহূর্ত তার কাছে দীর্ঘ মাসের মত মনে হচ্ছিল। বন্ধ হয়ে আসছিল তার দম। দরোজা ছেড়ে কামরায় বিক্ষিপ্ত পায়চারী করছিলেন। ইতোমধ্যে করিডোরে কারো পদধ্বনি শোনা গেল। সহসাই তিনি দরোজায় কান লাগিয়ে দাঁড়ান।

দরোজা নক করে কেউ বললো, 'দরোজা খুলুন!'

জয়কৃষ্ণ হৃদয়ে হাতুড়ি পেটা শুরু হোল। তিনি ভাঙ্গা গলায় বললেন, 'কে?'

বাইরে থেকে কেউ নির্দেশসূচক জবাবে বললো, 'দরোজা খুলুন!' কণ্ঠটি ঠাকুর রঘুনাথের মামাত ভাই সর্দার অর্জুন দেবের।'

জয়কৃষ্ণ ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'আমার সাথে কোন কাজ আছে কি ?'

'বাইরে আসুন। বলি নির্মলা দেবীকে আপনি পাঠাচ্ছিলেন কৈ ?'

জয়কৃষ্ণ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কম্পিত হাতে তিনি দরোজা খুলে দেন। সর্দার অর্জুন ছাড়াও মহলের পাঁচ নওকর ও দু'ব্রাহ্মণ দন্ডায়মান। তাদের চেহারা সাক্ষ্য দিচ্ছে নির্মলা ধরা খেয়ে গেছে। জয়কৃষ্ণ অর্জুন দেবের হাত ধরে ফেললেন। আকুতি মিনতি করে বললেন, 'অর্জুন! আমার প্রতি দয়া করুন। নির্মলা আমার একমাত্র মেয়ে। ও আমার জীবনের শেষ সাহারা। ও ব্যতীত আমার জীবন অর্থহীন।

অর্জুন দেব বললেন, 'ওহ্হো! তাহলে ও আপনার যোগ সাজসেই পালাচ্ছিল।'

'হ্যাঁ। কোথায় সে?'

'সে জবাব আপনি শহরের পঞ্চায়েতেই পাবেন। নীচে চলুন!'

'ভগবানের দিকে চেয়ে বলো, সে কোথায়?'

'নীচেই আছে। যতক্ষণ সতীদাহ প্রথা সম্পন্ন না হয় ততক্ষণ সে পুরোহিতজি মহারাজের অধীনেই থাকবেন।'

জয়কৃষ্ণ তার পায়ে আছড়ে পড়ে বললেন, 'অর্জুন দেব! তার জীবন বাঁচাও। বিনিময়ে আমাকেই নিক্ষেপ করো ওর স্থলে জ্বলন্ত চিতায়।'

'এমন এক রাজপুতের মুখে এই প্রস্তাব সত্যিই আমাকে লজ্জিত করছে। জয়কৃষ্ণ! হুশ করে কথা বলুন! দুনিয়া কি বলবে ? '

'আমি আমার খুকীর জান বাঁচাতে চাই। তুমি আমার তামাম সম্পত্তি নিয়ে নাও। কিন্তু নির্মলাকে এই বর্বর শাস্তি দিও না।'

'রাজপুত তার আত্মসম্ভ্রমবোধকে সওদা করে না। একথা আপনার সেদিনই চিন্তা করার দরকার ছিল যেদিন আপনি ঠাকুরজির কাছে মেয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন।'

জয়কৃষ্ণ উঠে তার দু'বাযু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'নির্মলার এজাযত ছাড়া তাকে ঠাকুরজির চিতায় ফেলতে পার না। এটা পাপ বৈ তো নয়। আমি এ ধরনের পাপ হতে দেব না।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ।' অর্জুন তাকে ধাক্কা মেরে পিছনে ঠেলে দিয়ে বললেন।

জয়কৃষ্ণ পাগলের মত ঠাকুরজির লাশ ঘরে দৌড়ে গেলেন। 'নির্মলা! নির্মলা! তিনি বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার দিলেন। মহিলারা ঘাবড়ে এদিক-ওদিক সরে গেল। নির্মলাকে ওখানে না পেয়ে তিনি সিড়ির দিকে দৌড়ে যান। নীচে প্রশস্ত দালানের সামনে মানুষের ঠাসা ভীড়। জয়কৃষ্ণ ঠাসা জনতার ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢোকেন। মুন্নিগড়ের পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ সমাজ ওখানে উপবিষ্ট। নির্মলা অসহায় ভাবে তাদের সামনে দণ্ডায়মান।

'নির্মলা! নির্মলা!' জয়কৃষ্ণ চিৎকার দেন। আর ও 'বাবা! বাবা!' বলে জয়কৃষ্ণের বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'নির্মলা আমার মেয়ে। আমার জীবন থাকতে তোমরা ওর সতীদাহ করতে পারবে না। এরা আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে দিতে পারে না মা। বলে দাও, তুমি তোমার মর্জির বিরুদ্ধে ঠাকুরজিকে বিবাহ করেছিলে।'

নির্মলা ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। জয়কৃষ্ণ এবার পুরোহিতের প্রতি নজর ফেলান, 'তোমরা ওর সতীদাহ এজন্য করতে চাও যাতে ওর অলংকারাদি পেয়ে যাও। ওকে চিতায় না ফেলেও তোমরা এই স্বার্থোদ্ধার করতে পার। আমার ভূ-সম্পত্তিও তোমাদের দিতে রাজি। নির্মলা তো তোমাদের কারো পাকা ধানে মই দিতে যায়নি। ভগবানের দিকে চেয়ে ওকে ছেড়ে দাও।'

সর্দার অর্জুন দেব বলেন, 'বেটা উন্মাদ হয়ে গেছে। নিয়ে যাও ওকে।'

ক'নওকর অগ্রসর হয়ে জয়কৃষ্ণের বাযু ধরল। ঠাকুরের আরেক আত্মীয় নির্মলাকে তার বাহু বন্ধন থেকে মুক্তি দিল। নওকররা জয়কৃষ্ণকে নিয়ে গেল। তিনি চিৎকার করে বলছেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও! তোমরা জালেম, ব্যঘ্র ও কসাই। মনে রেখো! মুসলমানরা আবার আসবে এবং তোমাদের থেকে নির্মলার মৃত্যুর চরম প্রতিশোধ নিবে।'

॥ পাঁচ ॥

পুরোহিত ও শহরের গন্যমান্য লোকদের রায়, জয়কৃষ্ণকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হোক। কিন্তু অর্জুন দেব এই মতের বিরোধিতা করে বললেন, 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জয়কৃষ্ণের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের এটা ভুললে

চলবে না যে, তিনি ঠাকুরজির শ্বশুর। যতক্ষণ সতীদাহ প্রথা পালন না হয় ততক্ষণ তাকে মহলের তৃতীয় তলায় আটকে রাখা হোক। আমার মনে হয় দু'এক দিনেই দেমাগ ঠিক হয়ে যাবে। এক্ষণে আমাদেরকে ঠাকুরজির আরোথি উঠাতে দেরী করা চলবে না।'

শহরের অধিকাংশ সর্দার অর্জুনদেবের মতের প্রতি ঐক্যমত পোষণ করল। জয়কৃষ্ণকে তৃতীয় তলায় এক কামরায় আটকে রাখা হোল। নির্মলাকে দামী পোষাক ও অলংকারে সাজানো হলো। জনৈকা বৃদ্ধা চণ্ডাল রমনী তাকে বোঝাচ্ছিল, খুকী! স্মিত করো। তোমার গর্ব করা উচিত যে, তুমি ঠাকুরজির মত দেশ প্রেমিক স্বামীর সাথে সতীদাহে যাচ্ছ। মুন্নিগড়ের নারীরা তোমার ভাগ্য নিয়ে ঈর্ষা করে। স্বামীর ইজ্জত রেখ, নির্মলার একথার প্রতি তেমন কোন আকর্ষণ নেই। ওর দৃষ্টির সম্মুখে তখন ভেসে বেড়াচ্ছে এক ভয়ানক দৃশ্য।

মহলের তৃতীয় তলায় জয়কৃষ্ণ কপাট ভাংতে কোশেশ করছিলেন। কামরার একটি দরোজা থেকে উঠানের দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু সে পথে জীবিত বের হবার কোন সুযোগ নেই। জয়কৃষ্ণ ঐ পথে মাথা বেরিয়ে চিৎকার দেন, 'ভগবানের দিকে চেয়ে আমাকে বের করো। আমি শেষ বারের মত আমার মাকে দেখতে চাই।'

কিন্তু তার এই আর্তনাদ শত মানুষের কোলাহলে হারিয়ে যায়। ক্রমবর্ধমান শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে দুপুরের দিকে ঠাকুরজির আরোথি উঠানো হলো। সামনে ব্রাহ্মণদের একদল ভজনগীত গাইতেছিল। নির্মলা নয়া দুলহানের মত দামী লেবাছ ও অলংকারে সজ্জিত হয়ে খোলা পাল্কীতে বসেছিল।

'নির্মলা! নির্মলা! জয়কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিতে চিৎকার দেন। কিন্তু এ আওয়াজ নির্মলার কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। এরপর নারী পুরুষের চিৎকারের মাঝে উঠানে কোন ভারী বস্তু পতনের শব্দ হয়। মুহূর্তে উঠানে মানুষের ঠাসা ভীড় লেগে যায়। নির্মলার বাবা উঁচু ইমারত থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

আরোথি যাত্রা থেমে গেল। নির্মলা পাল্কী থেকে নেমে বাবার লাশের ওপর আছড়ে পড়ল। অতঃপর ও শহরের লোকদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ভগবানের দিকে চেয়ে বাবার শবযাত্রাও আমাদের সাথে করে নাও।'

শেষ বিকালে ঠাকুর রঘুনাথের শব মিছিলে জয়কৃষ্ণকেও শামিল করা হোল।

॥ ছয় ॥

নির্মলার অনুরোধে প্রথমে জয়কৃষ্ণের চিতায় আগুন লাগানো হলো। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশমুখী হতেই নির্মলা বাবার চিতায় ঝাঁপ দিতে চাইল। অর্জুন দেবের জন্য এ ঘটনা অপ্রত্যাশিত নয়। নির্মলা চিৎকার দিয়ে বলে, 'আমাকে ছেড়ে

দাও! ঠাকুরজির স্থলে আমি বাবার চিতায় পুড়ে খাক হতে চাই।' কিন্তু লোকেরা ওর হাত-পা বেধে ঠাকুরজির চিতায় বসিয়ে দিল মানবতা বিধ্বংসী নির্মম নিষ্ঠুর তথাকথিত ধর্মপ্রথা পালনের নেশায়।

ঠাকুরের দু'নওকর ও আত্মীয়-স্বজন শুকনো কাষ্ঠে আগুন লাগাল এবং কাষ্ঠস্তুপে ঘি ছিটাল। অতঃপর ধূপ-চন্দন ও খোশবু ছিটানো হলো। কিছু ব্রাহ্মণ মশাল উঁচাল। মুন্নিগড়ের পুরোহিত উচ্চৈঃস্বরে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করছিলেন।

নির্মলার চোখ বাবার জলন্ত চিতার প্রতি। মনে মনে আওড়াচ্ছিল ও, 'বাবা! তোমায় মরে যাওয়াই ভালো ছিল। খানিক পরে আগুনের লেলিহান শিখা আমাকেও গ্রাস করবে। জীবিত থাকলে তুমি আমার চিৎকার বরদাশত করতে পারতে না। তুমি বলতে, আমি জীবিত থাকব এবং তখন আমি মৃত্যুকে খুব ভয় পেতাম বাবা। কিন্তু এখন আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। এ জীবনের কোন দরকার নেই আমার। এখন আমার চিৎকারে দুঃখ প্রকাশ করার মত কেউ নেই।' অতঃপর রণবীরের কথা মনে পড়লে ওর কাছে মৃত্যু বিভীষিকাময় হয়ে দেখা দিল। কল্পনার রঙিন পাখায় ভর করে রণবীরকে খেতাব করে বলছিল, 'হায়! তুমি যদি এখানে থাকতে। আহা! আগুন গ্রাস করে নেয়ার সময় উচ্চঃস্বরে যদি তোমার নামোচ্চারণ করতে পারতাম। বলতাম, রণবীর! কনৌজ ছাড়ার পর এমন কোন মুহূর্তও যায়নি যেখানে তোমাকে স্মরণ করিনি আমি। সর্বদা চিন্তা করেছি তুমি কোনদিন আসবে। তুমি এলে, কিন্তু তোমার দৃষ্টি আমার হৃদয়ের গভীরতা খুঁজে পায়নি। আমি সর্বদা তোমার ছিলাম প্রিয়। কিন্তু সর্বদাই আমাকে পর ভেবে ঠেলে দিয়েছ দূরে! রণবীর! তুমি কৈ ?'

পুরোহিতের সাথে ব্রাহ্মণরাও ভজন গাইতে লাগল। তাদের আওয়াজ ক্রমশই বুলন্দ হতে চলছিল। পুরোহিতের নির্দেশে জনৈক নওকর জলন্ত মশাল উঁচিয়ে চিতার দিকে এগিয়ে গেল। নির্মলা ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। এই বুঝি আগুন ওকে পুড়ে ঝলসে দেবে। এই বুঝি জলজ্যান্ত একটা মানুষ সবার সামনে আগুনের উদরপূর্তি হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে ভীড়ের মধ্যে আওয়াজ ওঠল, ' ফৌজ এসে গেছে ফৌজ! মুহূর্তে ওখানে হতাশা ছড়িয়ে পড়ল। পূর্ব দিগন্তে আগুয়ান সওয়ারের রেখা দেখা গেল। একজনে হতাশাগ্রস্থ অবস্থায় মশাল ফেলে দিলো। এর থেকে চিতায় আগুন লেগে গেল। সওয়ারদের চোখ শহরের দিকে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভীড় তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিছু সওয়ার দলছুট হয়ে শশ্মানভূমির দিকে এগিয়ে এলো।

৷৷ সাত ৷৷

মানুষের মধ্যে ছেয়ে গেল বিশৃঙ্খলা। পুরোহিত বুলন্দ আওয়াজে বললেন, 'বেকুফের দল! এরা তো আমাদের সেপাই!, তোমরা পালাচ্ছ কেন ? চিতায় ভালো করে আগুন লাগাও। কিছু লোক চিতায় পর পর ক'টি মশাল ছুঁড়ে মারল। কিন্তু চিতার স্থলে সকলের দৃষ্টি সওয়ারদের দিকে নিবদ্ধ। সওয়াররা যখন চিতার কাছে এগিয়ে এলো তখন আগুন নির্মলাকে ছুঁই ছুঁই করছে। মানুষেরা চিৎকার করে পালাল। সওয়ারদের মধ্যে এক জোয়ান চিতায় ঝাঁপ দিল। নির্মলাকে তার পৌরুষ বহুল বাহুদ্বয়ের মাধ্যমে বাইরে বের করে নিয়ে এলো। নির্মলা বেহুঁশ। নওজোয়ান তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল। খঞ্জর বের করে কেটে দিল ওর হাত-পায়ের বাঁধন। ততক্ষণে অন্যান্য সওয়াররা ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। নওজোয়ান সেপাই পানি তলব করল। সাথীরা পানির মশ্‌ক ওর হাতে দিল।

নওজোয়ান নির্মলা! নির্মলা! বলে ওর মুখে পানি ছিটাল। হুঁশ ফিরে পেয়ে নির্মলা চোখ খুলল। ওর দৃষ্টি নওজোয়ানের চোহারায় আটকে থাকল। নওজোয়ানটি ইউসুফ। কম্পিত ঠোঁটে ক্ষীণ আওয়াজে নির্মলা বললো, 'রণবীর! তুমি এসেছো প্রিয়। জানতাম মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে আমাদের দেখা হবেই।'

'তুমি জীবিত নির্মলা!' গর্দানে হাত রেখে ওকে ওঠাতে গিয়ে বললো ইউসুফ।

ফ্যালফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নির্মলা ওর বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফোঁপানো কাঁদার সুরে বললো, 'ওরা........ ওরা আমাকে ঠাকুরজির চিতায় সতীদাহ করছিল। এখন তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। তোমার বিরহ বরদাশত করতে পারব না আমি। ওদিকে দেখ, আমার বাবার চিতা। দুনিয়ায় এখন আমার কেউ নেই।'

ইউসুফ অশ্রুসজল নয়নে বললো,' তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।'

'আমি এক বিধবা।' বলে নির্মলা উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে ওঠল।

ইউসুফ ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'এদেশের নতুন প্রথায় বিধবাকে ঘৃনার চোখে দেখা হয় না।

'সত্যিই কি আমি জীবিত রণবীর! এটা কোন স্বপ্ন নয়তো।'

'না স্বপ্ন নয় নির্মলা! ওঠো আমাদের সাথে চলো।'

'কোথায় ?'

'আজ তোমাদের শহরে অবস্থান করব।'

'নির্মলা উঠে দাঁড়াল। ইতোমধ্যে আরো দু'হাজার সৈন্য এসে পড়ল। আব্দুল ওয়াহিদ উজিরে আলা। তিনি ঘোড়া থেকে নামলে ইউসুফ বললো,

'ও নির্মলা! সতীদাহ হচ্ছিল ওর।'

আব্দুল ওয়াহিদ বললেন, 'খোদার শোকর আমরা সময়মত এসে পৌঁছেছি।'

নির্মলা অশ্রুসজল নয়নে বললো,'আপনারা আর কিছুক্ষণ আগে এলে হয়ত আমার বাবার জীবনও বেঁচে যেত।

আব্দুল ওয়াহিদের কিছু প্রশ্নের জবাবে নির্মলা জয়কৃষ্ণের মৃত্যুর নেপথ্য কারণ বলে গেল।

নির্মলার শোকে সহানুভূতি জানিয়ে আব্দুল ওয়াহিদ ইউসুফের দিকে তাকালেন, 'আমরা আজ মুন্নিগড়ে রাত কাটাব। খুব সকালে রওয়ানা করব। পথিমধ্যে সুলতান আমাদের অপেক্ষা করবেন না। সোমনাথ যুদ্ধের পূর্বেই আমরা ওখানে পৌঁছুতে পারব বলে আমার বিশ্বাস। শহরের লোক এদিক সেদিক পালিয়ে গেছে। কিন্তু পুরোহিত ও মন্দিরের ক'ব্রাহ্মণ ওখানে তখনও দাঁড়িয়ে। তারা ভয়ে এগিয়ে এলেন। দাঁড়ালেন আব্দুল ওয়াহিদের সামনে হাত বেঁধে।

'তোমরা ?' প্রশ্ন আব্দুল ওয়াহিদের।

'মহারাজ! আমি....... এই শহরের পুরোহিত।'

'যাও! শহরবাসীকে বলো, তাদের জান মালের প্রতি কোনই আশংকা নেই।'

'মহারাজ! আপনি কোত্থেকে এসেছেন।'

'সে প্রশ্নের জবাব তুমি না হয় নাইবা জানলে।'

পুরোহিত তার সঙ্গীদের কাছে চলে গেলেন।

॥ আট ॥

রাতের বেলা নির্মলা মহলের এক কামরায় বসেছিল। জনৈকা চাকরানী দরোজা ঠেলে বললো, 'উনি ওপরে আসছেন।'

'নিয়ে এসো তাকে।'

চাকরানী চলে গেল। খানিকবাদে নির্মলা করিডোরে কারো পায়ের আওয়াজ অনুভব করল। পেরেশানী নিয়ে ও উঠে দাঁড়াল। কেউ দরোজায় টোকা মারলে ও বললো, 'ভেতরে আসুন।'

কামরায় প্রবেশ করে ইউসুফ কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই বললো, 'সালারের সাথে পরামর্শ করে বলছি, 'যদি তুমি সফরের উপযুক্ত হও তাহলে তৈরী হয়ে নাও। শেষ রাতে আমরা রওয়ানা করব।' নির্মলা ইউসুফের দিকে তাকাল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বললো, 'আমি প্রস্তুত।'

'নির্মলা! এখন ধৈর্যধারণ ছাড়া কোন গতি নেই।'

'বসুন না খানিক।' চোখের অশ্রু মুছে বলে ও।

'না। এখন তোমার আরাম করা দরকার', বলে দরোজার দিকে পা বাড়াল ইউসুফ।

'নির্মলা বললো, 'আপনার কাছে শকুন্তলা ও রূপাবতির কথা জানতে চাই।'

'শকুন্তলা বড্ড খোশ। রূপাবতি ক্রমশঃ চাঙ্গাবোধ করছে। কিন্তু ওর যখমের কোন এলাজ নেই আমাদের কাছে। ও আমাদের সাথে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু বাধা দিয়ে বলেছিলাম, এই দূরপাল্লার সফরের ধকল সামলাতে পারবে না তুমি। খোদা যেন রামনাথকে জীবিত রাখেন, নইলে ও পাগল হয়ে যাবে।'

'গোবিন্দরামের সাথে পথিমধ্যে আমার দেখা হয়েছিল। সকালে সকালে ওকে প্রস্তুত থাকতে বলেছি। দেখুন! আপনার প্রহরায় মহলে লোক লাগিয়েছি।'

'চিতার থেকে জীবিত মুক্তি পাওয়ার পর মৃত্যু ভয় দূর হয়েছে আমার। ওই মালিকের হেফাজত কি আমার জন্য যথেষ্ট নয়, যিনি আপনাকে আমার মদদের জন্য প্রেরণ করেছেন?'

ইউসুফ খানিক ভেবে বললো, 'আমার গতি খুবই দ্রুত হবে। এজন্য আপনাকে ঘোড়ায় চড়তে হবে।'

'আমার চিন্তা করতে হবে না আপনাকে। আমি পায়দল চলতেও প্রস্তুত। এই মহলে এক মুহূর্তও থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'বহুত আচ্ছা। এখন আমায় এজাযত দিন।' বলে ইউসুফ ওর জবাবের তোয়াক্কা না করে বেরিয়ে গেল।

পরদিন কনৌজের নয়া কাফেলা দক্ষিণমুখো হচ্ছিল। নির্মলা চেপে ছিল একটি ঘোড়ায়। ওর গন্তব্য জানা নেই। ইউসুফ ওর সাথে এটাই ওর বড় সান্ত্বনা।

॥ নয় ॥

সোমনাথের কয়েদখানায় রামনাথের এক একটা মুহূর্ত মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ানক মনে হচ্ছিল। ভুখা, পিপাসা, মারপিট ও নানান কষ্টের পরও পুরোহিতের লোকেরা ওর থেকে সান্ত্বনাদায়ক কোন জবাব পায়নি যে, 'রূপাবতি কোথায়?'

প্রথম প্রথম ও ভেবেছিল, রূপাবতি বুঝি পুরোহিতের কব্জায়। সুতরাং যখন ওকে কষ্ট দেয়া হত তখন চিৎকার দিয়ে ওঠত, 'তোমরা আমার জীবন নিতে পার কিন্তু পুরোহিতের পাপের রহস্য চাপা দিয়ে রাখতে পারবে না। রূপাবতি জীবিত থাকলে সে পুরোহিতের কব্জায়ই আছে। আর মরে থাকলে তাকে হত্যা করেছে তোমাদের পুরোহিত-ই।' কিন্তু ক'সপ্তাহের ব্যবধানে ও অনুমান করল, রূপা পুরোহিতের কব্জায় নেই। মুন্নিগড়ে তার আবির্ভাব ঘটতেই ও গা ঢাকা দিয়েছে।

একরাতে পুরোহিত ওর কক্ষে প্রবেশ করলেন। বললেন, 'রামনাথ ! তোমার জিদ অর্থহীন। যমীন রূপাবতিকে না গিলে থাকলে তাকে একদিন না একদিন খুঁজে পাব-ই। তাছাড়া আমরা ওকে ভয়ও পাই না। কেননা, ওর কথায় ভারতবর্ষের কেউই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তুমি আমাকে রূপাবতির সন্ধান দিয়ে জীবন বাঁচাতে পার। ওয়াদা করছি, রূপাবতির ওপর কোন প্রকার কোন জুলুম করব না।'

'তোমার অজানা নেই যে, আমার কাছে এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। রূপাবতিকে আমি বাড়িতে রেখে গিয়েছিলাম এরপর ফেরার পথে তোমাদের লোকের হাতে গ্রেফতার হই। এক্ষণে আমি কি করে বলব, 'ও কোথায় ?'

পুরোহিত খানিক থেমে আবারো বললেন, 'বিশ্বাস করলাম রূপাবতিকে তুমি দ্বিতীয়বার দেখনি। কিন্তু আমি জানতে চাই, ও ঘরের থেকে কি করে পালাল ?

রামনাথ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, হায়! আমি যদি তা জানতাম।'

'তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, তোমার অজান্তেই রূপাবতি গা ঢাকা দিয়েছে, কিন্তু তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে, মন্দির থেকে ও পালাল কি করে ? ওকে মন্দির থেকে পলায়ন করতে যারা মদদ করেছিল তাদের সন্ধান দিলে তোমার জীবন রক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।'

রামনাথ খানিক চিন্তা করে বললো, 'তোমার পাহারাদারদের উপস্থিতিতে এর জবাব শুনতে আশা করি পছন্দ করবে না।'

পুরোহিত পাহারাদারদের প্রতি ইশারা করলে তারা চলে গেল। রামনাথ বললো, 'তুমি কখনও এদিকটা চিন্তা করেছ কি যে, কামিনীকে যারা সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে গিয়েছিল তারা কেন ফিরে এল না ?

বিস্ময়ে 'থ হয়ে যান পুরোহিত। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'তুমি ওর সম্পর্কে জানো ?'

'আমি তার সম্পর্কে এতটুকু জানি যে, তাদের অনেকেই ওর সাথে হাত মিলিয়েছিল। বাদবাকীদের ওরাই সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল।'

'মিথ্যা বলছ তুমি, এটা কখনও হতে পারে না। এ ধরনের কল্প কাহিনী শুনিয়ে তুমি আমায় ধোঁকায় ফেলতে পারবে না।

'মিথ্যা বলছি না আমি। পূজারীরা ক'ক্রোশ দূরে গিয়ে নৌকায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সকাল পর্যন্ত তারা উপকূলীয় ঝোপঝাড়ে আত্মগোপন করেছিল। রূপাবতির প্রতি কামিনীর টান ছিল। আমার ও রূপাবতির সম্পর্ক পর্যন্ত তার জানা ছিল। পরদিন এক গ্রাম্য মহিলার ছদ্মাবরণে ও মন্দিরে এসেছিল। সে আমাকে সব খবর বলেছিল। সারাদিন তাকে আমার কক্ষে লুকিয়ে রাখলাম। রাতের বেলা যখন

নয়া দেবীর উৎসব পালন হচ্ছিল তখন তোমার মহলে আমায় নিয়ে গিয়েছিল সে-ই। মন্দিরের তামাম গুপ্তপথ তার নখদর্পণে। এজন্য কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই আমরা তোমার প্রমোদ ভবনে পৌঁছাই। অতঃপর রূপাবতিকে নিয়ে যখন তুমি ওখানে পৌঁছুলে তখন ওই কক্ষেই আমরা লুকানো ছিলাম। এরপর যা কিছু হয়েছে বোধকরি তা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা। তোমার জন্য এতটুকু জানা যথেষ্ট যে, যারা কামিনীকে ফেলতে গিয়েছিল জেলেদের একটি নৌকায় খোদ তারাই নিকট সমুদ্রে আমাদের অপেক্ষা করছিল। রূপাবতির সামান্য অলংকার জেলেদের জন্য যথেষ্ট ছিল। দু'দিন আমরা নৌকায় থাকলাম। পরে আমরা মালাবারের একটি জাহাজ পেয়ে গেলাম। সিন্ধুর দিকে চলমান ওই জাহাজ আমাদের তুলে নিল। পথিমধ্যে রূপাবতি অসুস্থ হয়ে পড়ল। সুতরাং ওর সাথে আমাকে জাহাজ থেকে নামতে হলো। কিছুদিন সফর করার পর আমরা মুন্নিগড় পৌঁছুলাম।'

এই কল্প কাহিনী রামনাথের ক'দিনের চিন্তার ফসল। কিন্তু এটা পুরোহিতের জন্য খুবই প্রতিক্রিয়ামূলক সাব্যস্ত হলো। তিনি চিন্তা-ভাবনা করে বললেন, কামিনী ও পূজারীরা কোথায় ?'

'আমরা ওদেরকে জাহাজে রেখে এসেছিলাম। আমার ধারণা ওরা সিন্ধু পৌঁছে গেছে। কামিনী বলেছিল, সে নাকি সুলতান মাহমুদ গজনবীর কাছে যাবে।'

কামিনী ও পূজারীরা জানত কি যে, 'তুমি মুন্নিগড় যাচ্ছ?'

'হ্যা! আমি তাদের বলেছিলাম যে, আমরা আনহলওয়ারা যাচ্ছি। ওখানকার মহারাজা আমার দোস্ত। ওখানে কোন ভয় নেই।'

'তাহলে তোমার মতে আমার পূজারীরা মুসলমানদের কাছে চলে গেছে ?'

' এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। তবে জাহাজের ডেক-এ ওদের আলাপ দ্বারা বুঝেছি, বিগত পাপে ওরা অনুতপ্ত। ওরা সোমনাথ ও সোমনাথ পুরোহিতকে ঘৃণা করে।'

'জাহাজের ক্যাপ্টেন কে ছিল ?'

'তিনি এক মুসলমান। যদিও তার নাম জানা নেই।'

পুরোহিত বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা সাগরে ডুব সাতার দিলেন। বললেন, 'তুমি বড্ড চালাক। মিথ্যা বলতে পটু। আমাকে বেকুফ বানাতে পারবে না। আমার পূজারীরা গাদ্দারী করতে পারে না।'

জানি, 'সোমনাথকে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। যতক্ষণ এই ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে না পাচ্ছি ততক্ষণ আমার বন্দীদশা থেকে তোমার মুক্তি নেই।'

'এক্ষণে তোমার বন্দীদশাকে ভয় পাই না আমি। কিন্তু তোমার কাছে একটি অনুরোধ করতে চাই।'

'কি ?'

আমাকে স্রেফ এতটুকু বলো, 'রূপাবতি কোথায় এবং তোমরা ওর সাথে কি ব্যবহার করেছ ?'

'একথা জানার পূর্বে তোমাকে বলতে হবে, অত্র এলাকায় আমাদের দুশমনের গোয়েন্দা কারা ?'

'আমি কোন গোয়েন্দাকে চিনি না।'

'অনেক কিছুই জানো তুমি। খুব সম্ভব নতুন শ্রীঘরে গেলে অনেক কিছুই বলবে।' বলে পুরোহিত বেরিয়ে গেলেন এবং পাহারাদারকে কিছু পরামর্শ দিলেন।

ঐদিনই রামনাথকে ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে স্থানান্তর করা হোল। ঐ অন্ধকার পূরীতে রামনাথের রাত যেন আর পোহাত না। রোজানা পাহারাদার এসে ওর খানা পানি রেখে যেত; কিন্তু কারো কথা বলার অনুমতি ছিল না ওর সাথে। মাস দুয়েক পর পুরোহিত এলেন; কিন্তু তা খুব কম সময়ের জন্য। তিনি বললেন, 'যদি শত্রু-গোয়েন্দাদের সন্ধান দাও তাহলে তুমি মুক্তি পাবে। কিন্তু রামনাথের প্রথম ও শেষ জবাব এটাই যে, আমি কোন গোয়েন্দার সাথে পরিচিত নই।'

এরপর আরো বেশ 'ক মাস অতিবাহিত হয়েছে। রামনাথের মনে হলো, কারা কর্তৃপক্ষ বোধহয় ওর কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

'ঐ অসহনীয় মৃত্যু পুরীতে শেষ ভরসা ওর রূপাবতি। এই আশা-ভরসা ওর আঁধার পুরীতে চেরাগ জ্বালাতে উৎসাহ যোগাত। ও সেই উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়েছিল সোমনাথের নিপীড়ন পুরীতে যা সুবহে সাদিকের পয়গাম নিয়ে আসবে। কল্পনার উড়ন্ত পাখায় ভর করে ও সোমনাথের লৌহ ফটকে ঐ বিশাল ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা দিত রূহিতের কিনারে সর্বপ্রথম যার সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল ওর।'

সুলতান মাহমুদ গজনবী দেলাদায় উপনীত হলে আচমকা ঈষাণ কোণে বিভীষিকা মেঘ ধারণ করল। প্রকৃতিতে ছেয়ে গেল কালো মেঘের ভীড়। অন্ধকার নেমে এলো সর্বত্র। দুপুরকে মনে হচ্ছিল মধ্যরাত্রি। বীর সেপাহীরা সামনে দেখতে পাচ্ছিল না কিছুই। কিন্তু যাত্রাবিরতি করার পক্ষপাতি নন সুলতান মাহমুদ।

দেলাদার ব্রাহ্মণরা মানুষকে বোঝাচ্ছিলেন, এটা দেবতাদের অলৌকিক কারিশ্‌মা মাত্র। এটা একথার ইঙ্গিতবহ যে, সোমনাথে পদে পদে দুশমন বাহিনী ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

শহরের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ঘোষণা করল, 'দুশমনের মোকাবেলায় আমাদের লড়াই করার জরুরত। দুশমন বিধ্বস্ত হবার জন্য তাদের সোমনাথ যাওয়াই যথেষ্ট। সুতরাং মাহমুদ বাহিনী যখন সোমনাথে প্রবেশ করেন তখন তারা বিনা প্রতিরোধে হাতিয়ার ফেলে দেয়।

দেলাদা-এ আব্দুল্লাহ ও তার ক'সাথী সুলতানকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য প্রস্তুত ছিল। এদের থেকে সোমনাথের তাজা খবর শোনার পর সুলতান মাহমুদ তার জেনারেলদের নিয়ে সভায় বসলেন। ওই সভায় আব্দুল্লাহর কিছু সাথী ছাড়াও জনৈক আরব্য জোয়ান ছিল। সুলতানসঙ্গীদের কাছে জোয়ানটি একেবারেই অপরিচিত। সুলতান তাকে তাঁর ডান পার্শ্বে বসালেন। বললেন জেনারেলদের উদ্দেশ্যে, 'ও আমাদের সাথী। নাম সালমান। তোমরা ওকে সোমনাথ যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখবে।'

সভার কার্যক্রম শুরু হলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ অনুমান করলেন, সুলতান যুবকটিকে খামোকাই গুরুত্ব দিচ্ছেন না। সোমনাথ কিল্লার দুর্ভেদ্যতা এবং ফৌজি শক্তির ব্যাপারে তার সীমাহীন অভিজ্ঞতা সকলকে হতবাক করে দিল। বৈঠক শেষে বড় বড় জেনারেলগণ উঠে এসে তার সাথে উষ্ণভরে করমর্দন করলেন। পর দিন। আব্দুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে ২ হাজার স্বেচ্ছাসেবী ফৌজ এসে এ বাহিনীর সাথে মিলিত হল। তৃতীয় দিন সুলতান সোমনাথের উদ্দেশ্যে দেলাদা ছাড়লেন।

॥ দুই ॥

৬/১/১০২৬ খ্রিস্টাব্দের বৃহস্পতিবার।

সুলতান মাহমুদ স্বসৈন্যে সোমনাথের নজর কাড়া দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। রসদবাহী সেনাদের পেছনে রেখে মহামান্য সুলতান অগ্রসর হলেন। হিন্দুরা

সর্বশক্তি নিয়ে কেল্লায় জমায়েত হচ্ছিল। শহর ও জনপদ শূন্যতায় পরিণত হয়েছিল। কাজেই কোন রকম প্রতিরোধ ছাড়াই সুলতান বাহিনী ওগুলো দখল করে নিলেন। অতঃপর সুলতান কেল্লামুখো ছুটলেন। দুপুরের আগক্ষণে তার বাহিনী খানিক দূরে এক বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করলেন।

সোমনাথের অগনিত ফৌজ কেল্লা প্রাচীরে চড়ে উদ্দীপনাভরে তাদের আহ্বান জানাচ্ছিল। কেউ মুখে হাত রেখে আবার কেউ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলছিল, এবার তোমরা বেঁচে যেতে পারবে না। গোটা ভারতবর্ষের মূর্তি অপমানের প্রতিশোধ নেবেন দেবতাগণ। কেল্লার প্রাচীরের মত ছাদেও অতি উৎসাহী হিন্দু স্বেচ্ছাসেবীদের ঠাসাভীড়। কেল্লার প্রশস্ত চত্বরে তিল বরাবর ফাঁক নেই। অগনিত মানুষের চিৎকার জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির উৎক্ষিপ্ত লাভার চেয়ে বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি করছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, দেশের সব জনপদের হিন্দু জাতি সোমনাথে ঠাঁই নিয়েছেন।

রিজার্ভ বাহিনীকে কমাণ্ড করে সুলতান বললেন, অশ্বারোহীদের পেছনে নিয়ে যাও। অতঃপর তিনি নেহাৎ এতমিনানের সাথে জোহরের নামায আদায় করেন। দরবারে ইলাহীতে বিজয় ও সাহায্য কামনা করেন। এরপর সেপাইদের দিকে ঘুরে আগুনঝরা এই বক্তব্য রাখেন ঃ

'শহীদী কাফেলার সাথীরা আমার! হিন্দুস্তানের সরেযমীনে কুফর আর ইসলামের চূড়ান্ত লড়াই আসন্ন। সোমনাথের আঁধার পুরীতে হেলালের সবুজ নিশান উড়াতে চাই। এক্ষণে আমাদের সামনে দু'টি পথ খোলা রয়েছে; হয় বিজয়, না হয় শাহাদত।

খোদার বান্দাদের সবচেয়ে বড় ঢাল তার ঈমান। বন্ধুরা আমার! হিমালয়ের বুকে রক্ত আখরে তোমরা যদি বিজয় কাহিনী লিখে যেতে যাও, শহীদী দেহের তপ্ত খুনে যদি ভারতীয় মাটি লাল করতে পার, কলিজার ঘাম দিয়ে যদি ভারত মহাসাগরের ব্যাত্যা বিক্ষুব্ধ উন্মত্ত উর্মিমালার গতি যদি রুদ্ধ করতে পার তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি; আসন্ন অগ্নি পরীক্ষায় তোমরা উৎরে যাবেই।

মর্দে মুমিন মুজাহিদ ভায়েরা! এ সেই ভারত ১৭ বছরের তরুন সেনাপতি যেখানে হেলালী নিশান উড়িয়েছিল। উল্টে দিয়েছিল স্বৈরাচারী রাজা দাহিরের তখত তাজ। এক্ষণে আমি চাই এমন কিছু বক্ষ, শত্রুর তীর খেতে যা থাকবে উন্মুক্ত। চাই এমন কিছু মুখ, তীর কামানের পশলাবৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে যা হাসবে। চাই এমন কিছু কোষমুক্ত তলোয়ার, দুশমনের হাড় কাটতে কাটতে যা হয়ে যাবে ভোঁতা।

হায়দারী চেতনার সংগ্রামী সাথীরা আমার! দুশমন তার তলোয়ার শান দিয়ে ফেলেছে। তুনীর ভরে ধনুক বাঁকা করেছে। এক্ষণে তোমাদের পালা। তোমরা

এগিয়ে যাবে খালিদী চেতনা নিয়ে, তারিকী প্রেরণা সহকারে, হায়দারী হুংকার মেরে, জাফরী উদ্দীপনা নিয়ে। দুশমনের ভরসা খড়কুটো ও মাটি দিয়ে গড়া শক্তিহীন মূর্তি। তোমাদের ভরসা লা-শরীক আল্লাহ। তোমরা যদি কম্পন সৃষ্টি করতে পার ভূমিকম্পের মত, ধেয়ে যেতে পার যদি টর্নেডো গতিতে, হুংকার মারতে পার যদি সিংহ শার্দুলের আকারে, যদি ইস্রাফিলের শিংগা ধ্বনির মত কিয়ামতের বিভীষিকা কায়েম করতে পার তাহলে আমি কসম করে বলতে পারি, আগামী কালকের জু'মুআর নামায আমারা সোমনাথ মন্দিরেই আদায় করব ইনশাল্লাহ।'

'নারায়ে তাকবীর' আল্লাহু আকবর শ্লোগানে সোমনাথের পাষাণ গাত্র কেঁপে উঠল। ঘোড়ায় চেপে সুলতান মাহমুদ যুদ্ধ কাতারে চক্কর লাগালেন। সালারদের কিছু পরামর্শের পর যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দিলেন। মুহূর্তে ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত মুসলিম বাহিনী কেল্লা প্রাচীরের দিকে ধেয়ে গেল। 'আল্লাহু আকবার' শ্লোগানের জবাবে প্রাচীর থেকে ভেসে এলো 'মহাদেব কি জয়।' সেই সাথে নেমে এলো পশলা পশ্লা তীর বহর। হামলাকারীরা তীরের জবাব দিচ্ছিলেন তীর দিয়ে, কিন্তু প্রাচীরে অবস্থানরতঃ হিন্দু বাহিনী অপেক্ষাকৃত সংরক্ষিত স্থানে। আফগান-তুর্কী তীরন্দাজদের একটি দল ঢাল দ্বারা তীর প্রতিরোধ করতে করতে দেয়ালের নীচে গিয়ে উপনীত হলো। কমান্ডো ও সিড়ির মাধ্যমে তারা প্রাচীরে চড়তে কোশেশ করল। কিন্তু দুশমন তাদেরকে প্রাচীরে পা রাখার মওকা দিতে নারাজ। সুলতানের জানা ছিল শত্রু সৈন্যের কথা। কিন্তু ওদের এই উদ্দীপনার কথা তার জানা ছিল না।

সন্ধ্যা পর্যন্ত লড়াই করে মুসলিম বাহিনী প্রাচীরে পা জমাতে পারল না। রাতের বেলা কেল্লা থেকে দূরে সুলতান ছাউনী ফেলতে বললেন। ওদিকে মন্দির অভ্যন্তরে কাষ্ ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে শ্লোগান তোলা হলো, 'মহাদেব কি জয়' বলে। মুসলমানরা এ সময় এশার আজান দিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল।

॥ তিন ॥

পরদিনের সূর্য সোমনাথ প্রাচীর তলে এক রক্তক্ষয়ী লড়াই দেখছিল। তীর বৃষ্টির মাঝে ইস্পাত কঠিন দাঁড়িয়ে পৌত্তলিক ত্রাস মাহমুদ গজনবী। তার জানবায সেপাইরা বীরত্ব প্রদর্শনে প্রতিযোগিতা করছে। প্রাচীর রক্ষীরা তীর-ধনুকের পাশাপাশি ড্রামের পর ড্রাম তেল মারছে। কমান্ডো টুটে যাচ্ছিল।, সিড়ি জ্বলছিল সর্বপরি সিড়ির নীচে লাশের স্তুপ জমে গিয়েছিল। কিন্তু হামলাকারীরা দমে নেই। তাদের জেহাদী জোশ বেড়ে যাচ্ছিল। ক্রমশঃ পূর্ব কোণের কিছু তীরন্দায প্রচন্ড তীর নিক্ষেপ করে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও হিন্দু বাহিনীকে মোর্চায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। কিছু জানবায এই ফাঁকে প্রাচীরে চড়তে লাগল। তীরন্দাযরা দুশমনকে মাথা

উঠানোর মওকা দিল না এবং ১৫/২০ জন হিন্দু তীরন্দাযকে প্রাচীর থেকে জাহান্নামে পাঠিয়ে অবস্থান মজবুত করে নিল। প্রাচীর রক্ষীরা পাল্টা হামলা সানাল। মুসলমানদের পা নড়বড়ে হয়ে গেল। অবশ্য ততক্ষণে মুসলিম বাহিনীর আরো কিছু সদস্য দেয়ালে চড়ে হিন্দুদের ডানে-বামে হাঁকিয়ে দিল।

খানিক পর প্রাচীরে চড়া একটি বুর্জের সিঁড়ি দখল করে নিতে কোশেশ করে মাহমুদ সৈন্যরা। কেল্লার ভেতর থেকে পঙ্গপালের মত মন্দিররক্ষীরা এগিয়ে এলো। পাল্টা আঘাত হানল মুসলিম বাহিনী। কিছু জানবায লাশের স্তুপ মাড়িয়ে উঠানে নেমে এলো। ডানে- বামে সামনে জনসমুদ্র। ঐ জনসমুদ্রের ঢেউ তাদের গিলে নিতে এলো। কিন্তু প্রাচীরের পথে মুসলমানরা পাহাড়ী ঝর্ণা ধারার মত নেমে আসছে। যাদের সামনে তামাম প্রতিবন্ধকতা টুটে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে হাজারো মুসলমান উঠানে জমায়েত হলো এবং এলোপাতাড়ি দুশমনের ওপর তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। এদিকে প্রাচীরে চড়া বাহিনীর সংখ্যা ক্রমশ-ই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সুলতান মাহমুদ নিজেই এ সময় প্রাচীরে চড়লেন। তিনি কুচকানো ললাটের গভীর দৃষ্টিতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন। সেপাইদের নির্দেশ দিলেন বাইরের কিছু সিড়ি টেনে উঠানে নামার ব্যবস্থা করতে। হিন্দুরা এটা দেখে আগে বাড়ল। কিন্তু তীরের প্রচন্ডতা তাদের সে আশার গুড়ে বালি ছিটাল। ঘন্টা খানেকের মধ্যে সুলতানের ৮ হাজার সেপাই মন্দির চত্বরে নামল। ততক্ষণে উত্তর দিকের বাহিনী ঐ দিকের প্রাচীরের খানিকটা দখল করে নিল।

টর্নেডোর গতি নিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন মাহমুদ গজনবী। দুশমনের কাতার চিরে তারা পূর্ব ফটকে গিয়ে হলেন উপনীত। ফটক রক্ষায় সীসাঢালা প্রাচীরের মত দাঁড়িয়েছিল হিন্দু বাহিনী। কিন্তু মুসলিম জাতির ধারাল তলোয়ারের সামনে এই সীসাঢালা প্রাচীর কলা-কচুতে পরিণত হল। কিছুক্ষণের মধ্যে লাশের স্তূপ হয়ে গেল। ফটক খুলে দিল মুসলমানেরা।

বাইরে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি বুলন্দ হোল। সুলতান বাহিনী অন্দরে ঢোকল। এর সাথে হিন্দুরা চালাল প্রচন্ড হামলা। পূর্ব ফটকে শুরু হলো আরেক রক্তক্ষয়ী লড়াই। কখনও কাতার চিরে মুসলমানরা অগ্রসর হয় আবার কখনও হিন্দুরা তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে। ইতোমধ্যে সুলতানের উত্তর বাহিনী ঐ দিকের দরোজা খুলে ফেলে। মুসলমানদের হামলায় হিন্দুদের মধ্যে হতাশা ও ভগ্নোৎসাহ ভাব সৃষ্টি হয়। এর পরপরই উত্তর ও পূর্ব দরোজা থেকে প্রবেশ করা বাহিনী এসে চত্বরে অবস্থান নেয়া সৈন্যদের সাথে মিলিত হয়। হিন্দুরা এই সম্মিলিত হামলা সহ্য করতে না পেরে মূল মন্দিরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কেল্লা ও মন্দিরের মধ্যবর্তী পরীখা মোড়ে হিন্দুরা জমে দাঁড়াল। তাদের বাদবাকী ফৌজ কাঠের পুলে চেপে

ওপারের মন্দিরে গিয়ে উপনীত হলো। সামান্য পরে হিন্দুদের নগণ্য কিছু ফৌজ পরিখা মোড়ে অপ্রতিরোধ্য মুসলমানদের প্রতিহত করার কোশেশ করছিল। অন্যান্যরা মন্দিরে আশ্রয় নিল। পুলের এপারে থাকা সামান্য হিন্দুদের জাহান্নামে পাঠাতে মুসলমানদের খুব একটা সময় লাগল না। কিন্তু তাদের জন্য পুল মাড়িয়ে মন্দিরে প্রবেশ করার কোন সুযোগ ছিল না।

কিল্লার বিশাল চত্বরের হিন্দুদের বিক্ষিপ্ত বাহিনী ইমারতে আশ্রয় নিল। এদিকে তখন জুমুআর নামাযের সময় আসন্ন। সুলতান নির্দেশ দিলেন ঐ ইমারত দখল করার পূর্বেই আমরা জুমুআর নামায আদায় করব। উত্তর বুর্জে দাঁড়িয়ে মুয়াযযিন আযান দিলেন। মুসলমানরা দাঁড়াল সাড়িবদ্ধভাবে। তাদের নামাযের দৃশ্য বড়ই মনোমুগ্ধকর। কিল্লার ইমারত থেকে হিন্দুরা তীর বর্ষণ করতে লাগল। মুসলমানরা নেহায়েত ধৈর্যসহকারে নামায আদায় করল। বাদ নামায সুলতান জানবায সেপাইদের প্রতি তাকালেন। তার স্ফীত ললাট বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছিল। চোখে তার কৃতজ্ঞতার আঁসু।

সুলতান শহীদ ও যখমীদের কেল্লার বাইরে নিয়ে যাবার হুকুম দেন। বাদবাকীদের কিল্লার ইমারত দখল করার নির্দেশ দেন। শেষ বিকেলে মুসলমানরা বেশ ক'টা ইমারত কব্জা করে নিল। কিন্তু এ যুদ্ধের প্রকৃত গন্তব্য তখনও অনেক দূরে ছিল। পরিখার তীরে হিন্দু সন্তানেরা তাদের দেবতাদের রক্ষার অদম্য স্পৃহায় ইস্পাত কঠিন দাঁড়িয়েছিল।

আচমকা মন্দিরের ঘন্টা ও কাষ্‌গুলো বেজে ওঠল এবং কাঠের পুল যা ইতোপূর্বে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল আবারো তা লাগানো হলো। পঙ্গ পালের মত হিন্দু বাহিনী মন্দির চত্বরে ধেয়ে এলো। এই হামলা যতটা অকস্মাৎ ততটা প্রচন্ডও। কিছুক্ষণের মধ্যে হিন্দুরা কেল্লার এক তৃতীয়াংশ দখল করে নিল। মুসলমানরা পাল্টা হামলা চালালেন। হিন্দুরা পুনরায় পুলের দিকে পিছু হটতে বাধ্য হলো। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টাই সামুদ্রিক প্রবল মহাপ্লাবনের সম্মুখে বালির বাঁধ স্থাপনের মত। পুলের ওপর ওরা মানব বন্ধন সৃষ্টি করছিল। মুসলমানদের ধারণা সোমনাথ মন্দির এক নয়া বাহিনী জন্ম দিচ্ছে।

সূর্যাস্তের দিকে মুসলমান ফৌজ উত্তর ও পূর্ব ফটকে পিছু হটছিল। সন্ধ্যা আঁধার নেমে এলে সুলতান তার বাহিনীকে শিবিরে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। মুসলমান সুশৃঙ্খলভাবে লড়তে লড়তে বেরিয়ে এলো।

৷৷ চার ৷৷

রাতে মজলিসে শুরা শেষে ছাউনীতে পায়চারী করছিলেন সুলতান মাহমুদ। তার চেহারায় পেরেশানী ও সিদ্ধান্তহীনতার ছাপ সুস্পষ্ট। জনৈক ফৌজি অফিসার কামরায় প্রবেশ করলেন। ভক্তিভরে সালাম প্রদর্শন করে বললেন, আলীজাহ্! সালমান আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

'ডাকো তাকে।'

অফিসার পুনরায় সালাম দিয়ে ছাউনী থেকে বেরিয়ে গেল। সালমান প্রবেশ করলেন।

তিনি মোসাফাহা শেষে বললেন, তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। বলো কি খবর এনেছ ?'

সালমান জবাব দেন, 'দুশমনের যে ১২টি জাহাজ সম্পর্কে গতকাল আপনাকে খবর দিয়েছিলাম, সেগুলো নোঙ্গর করাই আছে সোমনাথ উপকূলে। সন্ধ্যার পরপরই আমার জাহাজকে ওদের জাহাজের কাছে নিয়ে আসি। দুশমন আমাদের সম্পর্কে এখনও বেখবর। সকাল নাগাদ ওরা ঠাহর করতে না পারলে বেশ কয়েকটা এই সময়ের মধ্যে ধ্বংস করে দিতে পারব। সেপাই ছাড়াও অধিকাংশ জাহাজের মাল্লারা সোমনাথ মন্দিরে জমায়েত হয়েছে। কিন্তু জাহাজ কব্জা করে নেওয়াও আমার জন্য অসম্ভব কিছু নয়। আমি তখনই হামলা করতে চাই যখন যুদ্ধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করবে। সোমনাথ উপকূলে দুশমনের হাজারো নৌকা ভেড়া। আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে দুশমন ওগুলো থেকে যেন উপকৃত হতে না পারে।

'আমি এর এন্তেযাম করে ফেলেছি। আমার সওয়ারদের একদল উপকূলের পাশাপাশি দুশমনের নৌকার পিছু নেবে। ভুখা ও পিপাসা ওদেরকে খুব শীঘ্র মাঝ সমুদ্রে যেতে বাধ্য করবে।'

'দুশমন তীরে বাধার সম্মুখীন হয়ে হতাশ হলে পাশের কোন দ্বীপে আশ্রয় নিবে। আমার ইচ্ছা ওদেরকে প্রতিহত করার জন্য আপনাকে কিছু জাহাজ তৈরী করে দিতে পারব। এক্ষণে আমায় এজাযত দিন। আমার জাহাজ পৌঁছুতে অনেক পথ ঘুরে যেতে হবে।'

'আমি তোমার কামিয়াবীর জন্য দোয়া করব। কাল ইনশাল্লাহ সোমনাথ মন্দিরে আমাদের সাথে দেখা হবে। খোদা হাফেজ।'

'খিমার থেকে ক'কদম দূরে জনৈক সেপাই ঘোড়া নিয়ে দাঁড়াল। সালমান ঘোড়ার পিঠে চেপেই পদাঘাত করলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সমুদ্র উপকূলে পৌঁছে গেলেন। ঘোড়া থেকে নেমে নৌকায় চাপলেন। নৌকা জেটির দিকে এগিয়ে চলল।'

॥ পাঁচ ॥

পরদিন মুসলমানরা আবারো কেল্লা কব্জা করে নিল। কেল্লা ও মন্দিরের সেতুর মুখে প্রচন্ড লড়াই হতে লাগল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কিন্তু অনড় হিন্দু বাহিনী। মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান হামলার কারণে তাদের বেশ ক্ষতি-হয়েছিল। কিন্তু এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ওদের কাছে লোকের কমতি ছিল না। প্রতি মুহূর্তে মন্দির থেকে তাজা দম ফৌজ বেরিয়ে আসছিল এবং শূন্য সাড়িতে প্রবেশ করে শূন্যস্থান পূরণ করছিল।

সুলতান তার বাহিনীকে পিছু হটতে নির্দেশ দিলেন। হিন্দুরা একে বিজয়ের লক্ষণ মনে করে খুশীতে 'মহাদেব কি জয়' ধ্বনি দিচ্ছিল। প্রশস্ত চত্বরে এসে মুসলমানরা অকস্মাৎ পাল্টা হামলা চালাল। মুসলিম বাহিনী ক'দলে ভাগ হয়ে সাড়াষি হামলা চালাল। হিন্দুদেরও এজন্যে ক'ভাগে ভাগ হতে হল। আচমকা মুসলিম সৈন্যদের একদল দুশমনকে হেঁকে সেতুর কাছে নিয়ে এলো। হিন্দুরা হতাশ হয়ে সেতুতে চাপল। মুসলমানরা ওদেরকে দ্বিতীয়বার প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ দিল না। হিন্দুরা সেতু রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা চালাল। ওদের শেষ প্রচেষ্টা, মুসলমানরা যেন সেতুতে ওঠতে না পারে। কিন্তু সুলতানের বামবাহুর সৈনিকেরা পুলের এক প্রান্ত দখল করে নিল। বাধ্য হয়ে হিন্দুরা অন্য দু'সেতুতে চড়ল।

ঘন্টা খানেক পর তিনটা পুলই মুসলমানরা দখল করে নিল এবং তাদের বেশ কয়েক প্লাটুন ফৌজ পুলের ওপারে পৌঁছে গেল। বাদবাকী সৈন্য কেল্লা চত্বরে অবশিষ্ট হিন্দু নিধনে ব্যাপৃত থাকল।

মন্দিরে কুফর ও ইসলামের চূড়ান্ত লড়াইয়ের শেষ ধাপ শুরু হল। হিন্দু বাহিনী সোমনাথ মূর্তির সামনে কান্নাকাটি করে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। বারান্দা, বেলকনি ও করিডোর হিন্দু লাশে স্তুপ হয়ে গেল। এবার মুসলমানরা সেই প্রশস্ত চত্বরে প্রবেশ করল যেখানে ছিল অভিজাত পূজারী ও দাসীদের বাস। কোমড়ে গামছা বেঁধে হাজারো পূজারী এখানে অপেক্ষায় ছিল। ক্রমবর্ধমান হামলার ধকল সহ্য করতে না পেরে ওরা একপাশে সরে যেতে বাধ্য হলো। তাজাদম হিন্দু ফৌজ উঁচু মহল থেকে নেমে চত্বরের সাথীদের মদদ করতে লাগল। কিন্তু মুসলমানরা চত্বর কব্জা করে সেড়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে উঠানে হাজারো লাশের পাহাড়। বাদবাকীরা আশ্রয় নেয় পাশের মঞ্জিলে।

॥ ছয় ॥

যুদ্ধের তৃতীয় দিন।

মুসলমানরা আশে পাশের ইমারত কব্জা করেছে। এবার হিন্দুরা অন্দরের সেই কক্ষটি হেফাজতে ব্যস্ত হলো যেখানে সোমনাথ মূর্তি স্থাপিত। ওই কক্ষের আশে

পাশের কামরাগুলোয় হিন্দুরা ওঁৎপেতে থাকল। ঐ কামরাগুলো দখল করার মানসে মুসলমানরা প্রচণ্ড হামলা চালাল। কিন্তু হিন্দুরা ওদের পা জমাতে দিতে নারাজ। এই কামরাগুলোর নীচে ভূগর্ভস্থ কক্ষ রয়েছে। ঐ ভূগর্ভস্থ কক্ষ হতে হিন্দুরা বেরিয়ে নিহত কিংবা আহত সাথীদের স্থানে পা জমে লড়ত। ক্রমাগত হামলা করে মুসলমানরা একটি কক্ষ কব্জা করে নিল। কিন্তু মধ্যের যে কক্ষটিতে লৌহ দরোজা সেটি ইস্পাত কঠিন। অনেকে এই দরোজা ভাংতে চেষ্টা করল। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর ঐ দরোজা খুলে গেল। ওখানে আবার এক মারাত্মক যুদ্ধ। স্থানটি সরু হওয়ায় উভয় সৈন্য ধস্তাধস্তিতে লেগে গেল। কখনও মুসলমানদের পাল্লা ভারী থাকে। আবার কখনও হিন্দুদের। মুসলমানরা এই হাতাহাতির মাঝে তলোয়ার বাদ দিয়ে খঞ্জর ব্যবহার করতে থাকে। সোমনাথের পুরোহিত মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিচ্ছিলেন ঃ 'বাহাদুরের জাতি! হিম্মতের সাথে কাজ করো। দুশমনের পতনের সময় আসন্ন। আমাদের দেবতা মুসলমানদের ভস্ম করে দেয়ার জন্য তোমাদের আত্মসম্ভ্রমের পরীক্ষা নিচ্ছেন। আজকের দিনে দুশমনের সামনে সীনা টান করে দাঁড়ানো ও নিহত মানুষেরা সরাসরি স্বর্গবাসী হবে।'

হিন্দুরা দেবতাদের শেষ অলৌকিকতা দেখার আশায় জানবাযী রেখে লড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রচন্ড এক হামলা চালিয়ে মুসলমান কিছু সেপাই মধ্য কামরায় প্রবেশ করল। হিন্দুরা ওদের ধাক্কিয়ে বের করে দেয়ার কোশেশ করল। অন্য দিকে ওপাশের উপকক্ষটি দখল করে এই কক্ষে ঢোকার অপর কপাটটি ভেঙ্গে নারায়ে তাকবীর দিয়ে ভেতরে ধেয়ে এলো, এবার ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে হিন্দু সেপাইরা বেরিয়ে লৌহ কপাটের কাছে সমবেত হলো। এই কপাটটি সমুদ্রে যাবার রাস্তা। কিছুক্ষণের মধ্যে সমুদ্র উপকূলে ঠাসা ভীড় লেগে গেল। সোমনাথ মূর্তির সামনে তুমুল লড়াই হচ্ছিল। আর উপকূলীয় হিন্দুরা ভেতর প্রবেশের জানতোড় প্রতিযোগিতা করছিল।

মধ্য কামরার লড়াকুদের সাথে ছিলেন সুলতান মাহমুদ। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে তিনি বুলন্দ আওয়াজে বললেন, হিন্দুদের দিকে নির্ভয়ে অগ্রসর হও। বিজয় তোমাদের সুনিশ্চিত।' সালাররা মুহূর্তে এ খবর সৈনিকদের কানে পৌঁছে দিল। মুসলমানরা উত্তর ও দক্ষিণ দিক চক্কর কেটে উপকূলে হামলা সানাল। এদিক মূল কক্ষের লড়াকু মুসলিম বাহিনী জোড়ালো হামলা করল। হিন্দুরা ধাক্কা খেতে খেতে কোন ক্রমে উপকূলে পৌছুল। পাল্টা হামলা করে ওরা আবারো দেবতাদের চরণে যাবার খায়েশ করল; কিন্তু মুসলমানরা ওদের সামনে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান। এটাই সোমনাথের শেষ যুদ্ধ। মন্দিরের মূল কামরা মুসলমানদের দখলে যাবার পর হিন্দুদের হিম্মত টুটে গেল। ওদের আর্তনাদ দেবতাদের অসহায়ত্বের

স্বীকৃতি দিচ্ছিল। সমুদ্রে হাজারো কিশতী ভেড়া। মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান হামলায় দিশেহারা হয়ে হিন্দুরা নৌকায় চড়তে লাগল। উপকূল থেকে সামান্য দূরে রাজা-মহারাজাদের জাহাজ দেখা যেতে লাগল। আচমকা একটি জাহাজে আগুন লাগতে দেখে মাল্লারা চিৎকার জুড়ে দিল। হিন্দুদের অবশিষ্ট ফৌজের মধ্যে চরম হতাশা ছড়িয়ে পড়ল। ওরা চিৎকার দিতে দিতে নৌকায় চড়তে লাগল। হাজারো ফৌজ যারা নৌকায় জায়গা পেল না তারা সমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

খানিকপর নৌকার ফেরারী সেপাইরা আরেক মুসিবতের সম্মুখীন হলো। অজানা কোন দুশমন ওদের তিনটি জাহাজে আগুন লাগিয়ে দিল। পাঁচটি জাহাজে ওদের রাজাদের পতাকার স্থলে মুসলমানদের পতাকা শোভা পাচ্ছিল। ওগুলো ক্রমশঃ উপকূল থেকে গভীর সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিল। জলন্ত জাহাজের পেছনে আরো দু'টি জাহাজ যাতে হেলালী নিশান পত্পত্ করে উড়ছিল। আচমকা তারা আরো দু'টি জাহাজে অগ্নি গোলা নিক্ষেপ করে আগুন ধরিয়ে দিল। দু'টি জাহাজে আগুন লেগে তার লেলিহান শিখা সমুদ্র বক্ষে বিভীষিকার সৃষ্টি করল। ইতোমধ্যে বেশ কিছু নৌকা জাহাজের কাছে পৌঁছে যায় বাদবাকীরা উপকূলের পথ ধরে।

মন্দিরের অবশিষ্ট ফৌজ পালাবার তামাম পথ রুদ্ধ দেখে হাতিয়ার ফেলে দিল। রাজা, সর্দার ও পূজারীরা সুলতান মাহমুদের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াল। মন্দিরের এদিক সেদিকে ৫০ হাজার সৈন্যের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। পুরোহিতের কোন খবর নেই। সুলতানের সেপাইরা তার মহলে তালাশ করতে গিয়ে হাজার দাসী বেরিয়ে এলো। জনৈকা দাসীর কথায় জানা গেল, পুরোহিত মন্দিরের দেবীকে নিয়ে মহলের কোন অদৃশ্য পথে আত্মগোপন করেছেন। ঐ পথের সন্ধান চালানো হলো। কিন্তু সে পথে কাউকে পাওয়া গেল না। এক সেপাই দেয়ালে কান লাগিয়ে বললো, এই দেয়ালের পাশে কেউ কাতরাচ্ছে ভালো করে দেখো। এখানে কোন দরোজা থাকতে পারে।' অতঃপর সে ছাদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঐ শেকলটা ধরে টান মারো।' এক সেপাই শেকল ধরে টান মারলে আস্তে আস্তে একটি ফাটল বেরিয়ে আসতে লাগল। সেই ফাটল থেকে একটি দরোজা। চোরা দরোজাটি খোলা হলো। দু'সেপাই দ্রুত সংকীর্ণ একটি কক্ষে প্রবেশ করল। সোমনাথ পুরোহিতের লাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তার পাশে মন্দিরের দেবীর বুকে খঞ্জর গাঁথা। সে আখেরী শ্বাস নিচ্ছিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, এক্ষণে আমার আর কারো ভয় নেই। আমি পুরোহিতকে হত্যা করেছি। এই ছিল তার প্রাপ্য সাজা। হায়! ওই রাতেই যদি তার বুকে তলোয়ার বসাতে পারতাম। তাহলে মন্দির আজ ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যেত। তোমাদের বাদশাহ্ কোথায়? তিনি বড্ড দেরীতে এসেছেন। আরো পূর্বে তার আসার দরকার ছিল। এক হিন্দী নও মুসলিম সাথীদের

এ কথার অনুবাদ বোঝাল। তারা দেবীকে উঠিয়ে আনল। খোলা উঠানে দিল শুইয়ে। জনৈক সেপাই ফৌজি হেকিম ডাকতে গেল। কিন্তু মন্দিরের দেবী হেকিম আসার পূর্বেই এ জগতের সফর শেষ করল।

॥ সাত ॥

রামনাথ একটি সংকীর্ণ অন্ধকার কুঠরীতে পড়েছিল। সোমনাথ যুদ্ধকালীন ওর মধ্যে চাপা পেরেশানী দেখা দিয়েছিল। পয়লা দিন ও দরোজায় কান লাগিয়ে মন্দির রক্ষীদের চিৎকার শুনছিল। দরোজার বাইরে কারো পায়ের আওয়াজ শুনলে ও চিৎকার দিয়ে বলত; 'ভগবানের দিকে চেয়ে আমায় বলো, বাইরে কি হচ্ছে? মুসলিম ফৌজ কি এসে গেছে ? মন্দিরের ওপর তারা চড়াও হয়েছে কি ?' কিন্তু ওর এই চিৎকারে জবাব দেয়ার মত কেউ নেই। পর দিন 'মহাদেব কি জয়' এর স্থলে নারায়ে তকবীর ধ্বনি শুনলে ওর হৃদয়ে আনন্দের বান ডেকে যায়। ওর আশার প্রদীপে তেল সঞ্চার হয়।

মন্দিরে চূড়ান্ত লড়াই শুরু হলে রামনাথের জীবনের অনাবিল আনন্দ বয়ে যায়। যুদ্ধের পর ঘন্টা ও কাষ্ধ্বনির পাশাপাশি পূজারীদের চিৎকার বন্ধ হয়ে যায়। এর দ্বারা যুদ্ধের ফলাফল ওর পক্ষে আন্দাজ করা মুশকিল হয় না। কিন্তু এরপর প্রতিটা ক্ষণ ওর জন্য অসহনীয় হয়। মুসলমানরা জয়লাভ করে কি চলে গেল ? তাদের কারো মনে কি এই খেয়াল এলো না যে, জনৈক মজলুম ইনসান এখানে তাদের পথ চেয়ে বসে আছে। ওরা যদি আমাকে ছেড়ে চলে যায় তাহলে কি হবে? বহুক্ষণ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ও বললো, 'মুসলমানেরা! তোমরা আমাকে ছেড়ে যেও না। আমি দীর্ঘদিন ধরে তোমাদের পথ চেয়ে বসে আছি। কেঁদে কেঁদে তোমাদের বিজয় প্রার্থনা করেছি।'

কিন্তু পাষাণ কক্ষ কেবল ওর এই আওয়াজের প্রতিধ্বনি উপহার দিল মাত্র। খানিক লৌহ কপাট থাবড়ে হতাশ হয়ে বিছানায় শুয়ে গেল। কেঁদে কেঁদে বলছিল, 'মুসলমানদের খোদা হে! আমি তোমার সত্তার ওপর ঈমান এনেছি। তোমার আশ্রয় কামনা করছি। তুমিই আমার আখেরী সাহারা। এই নিশ্ছিদ্র কুঠিতে আমার দম আটকে আসছে। মৃত্যুর পূর্বে স্রেফ একবার তোমার সূর্যের কিরণ, চাঁদের আলো, তারকার হাসিও ফুলের সৌরভ উপভোগ করতে চাই। চাই খোলা আকাশের নীচে দম নিতে। তোমার শ্রেষ্ঠত্বের গীত গেতে চাই পাহাড়ের চূড়ায় ও নদী উপকূলে যেয়ে। মুসলমানদের খোদা! খোদা আমার! সারা দুনিয়ার খোদা! আমাকে মদদ করো।'

দোয়া খতম করে রামনাথ নিথর নিস্তব্ধ বিছানায় পড়ে রইল। আচমকা কপাটের বাইরে কারো পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। পরে যেন কে বলছিল, 'মহারাজ! রামনাথ এই কুঠরিতে।'

কেউ নির্দেশসূচক কণ্ঠে বললো, 'বহুত আচ্ছা! দরোজা খুলে দাও। জলদি করো।

পরে তালা খোলা ও ভারী শেকলের কড়কড় আওয়াজ কানে আসে ওর। অতঃপর ধাক্কিয়ে কেউ দরোজা খুলে দেয়। রামনাথের সামনে দু'কারা রক্ষি ও সুলতান ফৌজের সালার আব্দুল ওয়াহিদ ও ইউসুফ দাঁড়িয়ে।

রামনাথ, রণবীর রণবীর' বলতে বলতে কামরার থেকে বেরিয়ে এলো এবং আনমনেই ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফোঁপানো কাঁদার সুরে বললো, রণবীর! রণবীর! তুমি এসেছ। আমার বিশ্বাস ছিল কুদরত আমাকে মদদ করবেন-ই। বলো রূপাবতি কোথায় ?'

'রূপাবতি আমাদের বাড়ীতে তোমার অপেক্ষা করছে।'

রামনাথের মনে আনন্দ ও খুশীর হিন্দোল। আব্দুল ওয়াহিদের দিকে তাকিয়ে ও বলে 'একথা কি সত্য ?'

'হ্যাঁ! সত্য' আব্দুল ওয়াহিদ ওকে বুকে টেনে নেন।

'তো এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার পূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করছি।'

আব্দুল ওয়াহিদ তার সেপাই ও কারারক্ষীদের কারার সেল খোঁজ করে সমস্ত কয়েদীদের রেহাই করে দিতে বলেন।

॥ আট ॥

আছরের নামযের পর সুলতান মাহমুদ সোমনাথ মূর্তির কক্ষে প্রবেশ করেন। ঐ মূর্তির আশে পাশে ছোট খাটো মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত। সুলতানের হুকুমে সমস্ত মূর্তিগুলোকে বিনাশ করে দেয়া হলো। বড় মূর্তির পালা এলে হিন্দু ব্রাহ্মণ, পূজারী ও ভক্তরা সুলতান মাহমুদের পায়ে পড়ল। তারা ঐ মূর্তি না ভাঙ্গার বিনিময়ে সম ওজন সম্পন্ন স্বর্ণ দিতে রাজী হলো।

সুলতানের চেহারা গোস্বায় লাল হয়ে গেল। তিনি জবাব দিলেন, 'আমি মূর্তি নির্মাতা নই, ইতিহাসে মূর্তি বিনাশী হিসাবে পরিচিত হতে চাই। সুলতান উভয় হাতে গুর্জ ধরলেন। সোমনাথ পূজারীরা চিৎকার করে ওঠল। সাথে সাথে পাথরের টুকরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেপাইরা সুলতানের অনুসরণ করল এবং আঘাতে আঘাতে মূর্তিটাকে শত টুকরা করে ফেলল। অতঃপর সুলতানের হুকুমে ভাঙ্গা মূর্তি জড়ো করে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো।

এই মন্দিরের মালে গনীমতের ফিরিস্তীতে ছিল দু'কোটি দীনার। অতঃপর সুলতান স্বসৈন্যে ছাউনীর দিকে কোচ করেন।

লড়াই হলো শেষ

রাতের বেলা যখন মুসলমানরা ছাউনীর কাছে শহীদদের লাশ দাফন করছিল তখন রামনাথ ও নির্মলা একটি খিমায় পরস্পরে কথা বলছিল। রামনাথকে আপনার পুরো কাহিনী শোনানোর পর নির্মলা নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা জানাল। ইউসুফ ওর নাম সাঈদা রেখেছে– বললো তাও।

রামনাথ বললো, 'কয়েদখানার দরোজা খোলার পূর্বেই আমি মুসলমান হয়েছি। সর্ব প্রথম ঐ মহামানবের পেছনে নামায আদায় করেছি যিনি এদেশে কুফরের সবচেয়ে বড় কেল্লাকে মিসমার করেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার নাম পাল্টানোর সুযোগ আসেনি।'

'ভাইয়া! মুসলমানদের বেশ কিছু নাম জানা আছে আমার। তুমি এর থেকে যে কোন একটা বেছে নিতে পারো।'

'আচ্ছা বলো।'

'নির্মলা কয়েকটা নাম বাতলে দিল। খানিক ভাবার পর রামনাথ বললো, 'ওসমান নামটা পছন্দ করলাম।'

'ভাইয়া ! আপনাকে এখন পর্যন্ত একটা খোশ খবর শোনানো হয়নি।'

'কি সেটা?'

'ইউসুফ আমাকে বলেছে, রূপাবতিও মুসলমান হয়ে গেছে। ওর সুন্দর একটা নাম রাখা হয়েছে। কিন্তু নামটি আমার মনে নেই।'

কিছুক্ষণ ওরা দু'জনেই খামোশ থাকল। রামনাথ বললো, 'বহু দেরী হয়ে গেল। সে এখনো এলোনা।'

'আপনার ঘুম আসছে? ওর খিমা ডান পার্শ্বে। বাইরে তার নওকর দাঁড়ান আছে। ওখানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'দীর্ঘদিন পরে আজ আমার ঘুম আসছে।

'খানিক বাদে রামনাথ আধাঘুম অবস্থায় ইউসুফের খিমায় শুয়েছিল। ইউসুফ প্রবেশ করে ওকে বললো, রামনাথ ঘুমিয়েছ ?'

'এই শুইছি মাত্র।'

'আচ্ছা শুয়ে যাও।' বলে ইউসুফ অপর কোণে শুয়ে গেল।

রামনাথ খানিক থেমে বললো, 'রণবীর! .... মাফ করুন। আপনার পুরান নামটি ভুলতে পারি না। নতুন নামটাও কেমন যেন মুখে আসে না। জানতে চাই। রূপাবতির নতুন নাম কি ?'

'নির্মলা ওর ইসলাম গ্রহণের কথা বলেছে তোমাকে ?'

'কিন্তু তার নাম তার স্মরণে নেই।'

'রূপাবতির নতুন নাম তাহেরা।'

'তাহেরা, তাহেরা!' রামনাথের হৃদয়ে এই প্রিয় নামটি বারবার উচ্চারিত হতে থাকে।

পরদিন গভীর নিদ্রা থেকে ঘুম ভাংলে রামনাথ দেখল আব্দুল ওয়াহিদ, সাইদা ও ইউসুফ ওর সামনে দাঁড়িয়ে। রামনাথ চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললো, 'সকাল হয়ে গেছে?'

'সকাল নয়, দুপুর হয়েছে। গাঢ় নিদ্রায় বিভোর ছিলে তুমি।'

'দীর্ঘদিন পরে এমন ঘুম ঘুমালাম।'

'এজন্যেই তোমাকে ডাকিনি। এখন সূর্য মাথার ওপর। জলদি সফরের তৈরী নাও। তোমার সাথীরা অপেক্ষা করছে।' বলল ইউসুফ।

'আমরা তাহলে আজই যাচ্ছি ?' প্রশ্ন রামনাথের।

'হ্যাঁ, আজই, সাইদাও তোমার সাথে যাবে। এখান থেকে কণ্ঠকোট পর্যন্ত আমরা সুলতানের সাথে থাকব।'

রামনাথ হয়রানী ও পেরেশানীর সাথে ইউসুফের দিকে তাকাল।

আব্দুল ওয়াহিদ বললেন, 'আমাদের হাজার দেড়েক সেপাই তোমাদের সাথে যাবে।'

খানিক বাদে রামনাথ সাথীদের সাথে খিমা থেকে বের হলো। দীর্ঘদিন সূর্য-না দেখার কারণে তাপে ওর চোখে কেমন ঝাপসা দেখাল। ফৌজি সেপাই কোচ করার জন্য প্রস্তুত। রামনাথ ও সাঈদা (নির্মলা) ঘোড়ায় চেপে ওদের সাথে কোচ করল।

॥ দুই ॥

সোমনাথ মন্দির লাশে পরিপূর্ণ। আকাশে চিল-শকুনের আনাগোনা। সুলতান উপকূলীয় স্বাস্থ্যকর স্থানে ছাউনী স্থানান্তর করলেন। তাঁর হাজারো সৈন্য সোমনাথ যুদ্ধে আহত হয়েছে। ওদের দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন। সুলতান এখানে হপ্তাদুয়েক থাকলেন। এ সময় মুবাল্লিগীনের কোশেশে আশে পাশের অসংখ্য হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেন।

পনেরতম দিনে সুলতান ওখান থেকে কোচ করলেন।

সোমনাথের পরাজয় কুঠিয়াওয়াড়ের প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের গোস্বা আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিল। যে রাজা ও সর্দাররা সুলতানের তেজোদীপ্ততার সাথে কুলিয়ে ওঠতে না পারার দরুন সোমনাথ যুদ্ধে শরীক হতে পারেনি তারা 'আবু'-এর রাজা প্রেম দেবের পতাকাতলে সামিল হয়। এরাদাশি পাহাড়ের ঘাঁটিতে ওরা ওঁৎপেতে থাকে। সুলতানের সামনে এ সময় বড় চিন্তার বিষয় ঐ সব যখমী সেপাই যারা এখনও যুদ্ধের যোগ্য হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া ঐ কান্তার মরু পারি দেয়ার ঝুঁকি নিতে চাচ্ছিলেন না তিনি। এজন্য পশ্চিম উপকূল দিয়ে চলার মনস্থ করলেন।

একদিন সুলতান ও তার বাহিনী এমন এক ঝিলে উপনীত হলেন যেখানে শুধু পানি আর পানি। ঐ এলাকা থেকে পিছু হটলে পেছনের দুশমন থেকে হামলার আশংকা ছিল বিধায় তিনি পানিতে ঘোড়া নামিয়ে দেন। সুলতানের পিছনে অন্যান্য ফৌজও তার অনুসরণ করে। এই বিলটির গভীরতা সুলতানের ধারণাতীত। সুলতানের ফৌজের ঘোড়া কখনও হাঁটু আবার কখনও গলা অবধি পানিতে ডুবে যেত। কখনও দৃষ্টির শেষ সীমায় বালুর দ্বীপ দেখে তারা মনে করত স্থল বুঝি এলো, কিন্তু ওখানে গিয়ে আবার তাদের সামনে ভেসে ওঠত দিগন্ত প্রসারী পানি রাশি।

সোমনাথ আক্রমণ করতে এসে যে বাহিনী বিশাল মরু পাড়ি দিয়েছিল সেই বাহিনীই এখন স্থল সমুদ্রে ডুব খেতেছিল। বীর জোয়ানদের জন্য এ এক এমন পরীক্ষা যারা ভারতবর্ষে সুহাসিনী ভোরের পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন। তাদের স্পৃহা অদম্য ও হিম্মৎ অজেয়।

টানা দু'দিন অসাধ্য সাধন করে সুলতান বাহিনী শুকনো যমীনের সন্ধান পেলেন। অসংখ্য অগণিত মুসিবতের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও বোঝাবাহী উট ও ঘোড়ার নির্বিঘ্নে পানি অতিক্রম করা মুজিযা-ই বটে। এখান থেকে সুলতান কণ্ঠকোট আক্রমন করেন। সুলতানের আগমন শুনতেই রাজা ভীমদেব পালিয়ে যান। কোন প্রকার রক্তারক্তি ছাড়াই সুলতান কণ্ঠকোট জয় করেন। এখানে দু'দিন অবস্থান করলেন তিনি। তৃতীয় দিন সকালে আব্দুল ওয়াহিদ ও তার সঙ্গীরা সুলতানকে আলবিদা দিতে দাঁড়ানো ছিলেন।

বিদায়কালে একে একে সকলের সাথে সালাম-মোসাফাহা করে আব্দুল ওয়াহিদ, ইউসুফ ও অন্যান্য নও মুসলিমদের লক্ষ্য করে বলেন–

'আমি আমার অঙ্গীকার পূরণ করেছি। জুলুম ও বর্বরতার সবচেয়ে আকাশচুম্বী প্রাসাদকে মূলোৎপাটিত করেছি, কিন্তু তোমাদের হিস্যার অনেক কাজই পড়ে রয়েছে।

আব্দুল ওয়াহিদ! ইউসুফ! তোমার চোখে দেখছি আঁসু। আমার নির্গমনে তোমরা কষ্ট নিবেনা। জীবন চলার রাজ পথের আমার আখেরী মঞ্জিল অত্যাসন্ন। খুব সম্ভব আমরা একে অপরকে আর দেখব না। কিন্তু যে মহান স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুদরত আমাদের নির্বাচিত করেছিলেন, চির অম্লান থাকবে তা। খোদার রাহে ঐ সকল লোক অতি অবশ্যই আমার অগ্রজ যারা সোমনাথের প্রাচীর তলে শাহাদত বরণ করেছেন। আর তোমরা সেই বৃক্ষের ফসল, বুকের তাজা খুন ঢেলে যার গোড়া সিঞ্চন করেছো। তাঁরা কুফর, শিরক ও নাস্তিক্যতার ইমারত ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছেন, এক্ষণে তোমাদের দায়িত্ব সেখানে এক ইমারত গড়া।

এই বিশ্বাস নিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছি যে, তোমরা ঐ প্রদীপকে কখনও নিষ্প্রাণ হতে দিবে না, আমাদের জ্যাত্যাভিমানী শহীদান কলিজার ঘাম ফেলে যাতে তেল সঞ্চার করছেন। হক ও ন্যায় নিষ্ঠার ঐ পতাকাকে তোমরা কভু ভূ-লুণ্ঠিত হতে দিবে না, রাহে লিল্লায় বীর সেনানীরা যাকে বুলন্দ করেছেন। খোদা হাফেজ।'

সুলতান একথা বলে ঘোড়ায় পদাঘাত করলেন।[১]

খানিক পরে আব্দুল ওয়াহিদ ও তার সাথীরা ঐ বিশাল ব্যক্তিত্বের কাফেলার শেষ ঝলক দেখছিলেন বিগত ৩০ বছর ধরে যিনি ভারতের অন্ধকার পুরীতে বিজয় কেতন উড্ডীন করেছিলেন।

॥ তিন ॥

তাহেরা (রূপাবতি) মহলের এক কামরায় বাদ আছর হাত উঠিয়ে দোয়া করছিল। এ সময় করিডোরে যুবায়দার আওয়াজ শোনা গেল, 'তাহেরা! তাহেরা।'

'কি হোল বোন?' দোয়া খতম করে দরোজার দিকে তাকিয়ে বললো তাহেরা।

'তাহেরা ও এসে গেছে।' ভেতরে উঁকি মেরে যুবায়দা বলল।

মুহূর্তে জীবনের অনুভূতি দু'চোখে এসে জমা হোল।

করিডোরে তাকিয়ে যুবায়দা বললো, 'এসো । থামলে কেন ?'

---

(১) পরবর্তী বছর মার্চ মাসে ঐ জাঠদের সাজা দিতে সুলতান আক্রমণ করেন। সুলতান এসে ছাউনী ফেলে নৌকার সাড়ি বানান। প্রতিটি নৌকায় ২০ জন সেপাই ছিল। জাঠরা ৪ হাজার নৌকায় চড়ে আক্রমণ করতে আসে। সুলতান এদের শোচনীয়ভাবে পরাভূত করেন। জাঠ জাতি পলায়ন করার চেষ্টা করে। উত্তর তীরে ওঁৎপেতে থাকা মাহমুদ বাহিনী ওদের টার্গেট করে। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল হাজারো জাঠের লাশ নদীতে ভাসছে। হাজারো লাশ কিনারায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এই যুদ্ধের পর সুলতান আর ভারতবর্ষে আসেননি।

তাহেরা উঠে দরোজার দিকে এগিয়ে গেল। কাঁপছিল ওর পা। উসমান (রামনাথ)-কে দরোজার মোড়ে দেখা গেল। খানিক খামোশ দাঁড়িয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়েছিল। থির থির কাঁপছে ওদের ওষ্ঠযুগল। চোখে অশ্রু প্লাবন।

যুবায়দা একদিকে সরে গেল। উসমান কামরায় প্রবেশ করল, 'আমার রূপা। আমার তাহেরা। জিন্দেগী আমার।'

খুশী আনন্দে দুচোখ বন্ধ করে ও।

তাহেরা পিছু হটল। আচমকা কিবলামুখি হয়ে সেজদায় নিপতিত হলো। ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ও। নীরব নিথর পাশটিতে দাঁড়িয়ে উসমান। মাথা উঠালে দেখা গেল চোখে আঁসুর বারিধারা কিন্তু ঠোঁটে পরিধি বাড়ানো মুচকি হাসি। ও বললো, রামনাথ! আমি মুসলমান হয়েছি।'

'সে কথা জানি। মুসলমান হয়েছি আমিও।'

'ভাই ইউসুফ কোথায়?'

'কিছু দিনের মধ্যে এসে যাবেন। তোমার এক বান্ধবী আমার সাথে এসেছে।'

'কে?'

'সাঈদা!'

'সাঈদা! সে আবার কে ?'

'নির্মলার নতুন নাম।'

'নির্মলা! আমার বোন। আমার মোহসেন। কোথায় সে?'

বলে তাহেরা করিডোরে দৌড়ে গেল। ওপাশের কামরা থেকে যুবায়দা ডেকে বললো, 'তাহেরা ! নির্মলা এখানে,' আনমনে কামরায় প্রবেশ করে নির্মলার বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাহেরা।'

॥ চার ॥

তিনমাস পর।

এসময় সাঈদা ও ইউসুফের এবং তাহেরা ও উসমানের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। এদিকে ইউসুফের বোন যুবায়দা স্বামীর সাথে কনৌজ চলে যায়।

একদিন ইউসুফ আব্দুল ওয়াহিদের পয়গাম পেল, 'তুমি জলদি কনৌজ চলে এসো। দূত মারফত ও জানতে পারল, আব্দুল ওয়াহিদ ঐ এলাকার প্রভাবশালী সর্দারদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইউসুফ ও উসমান তৎক্ষণাৎ দূতের সাথে রওয়ানা হয়ে যায়। শেষ বিকালে ওরা কনৌজে উপনীত হয়।

আব্দুল ওয়াহিদের বাসভবনে গিয়ে তারা জানল, উনি অফিসে, উসমানকে মেহমান খানায় রেখে ইউসুফ বোনের সাথে দেখা করল। ওখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে উসমানকে নিয়ে দফতরে গেল। আব্দুল ওয়াহিদ ওদের আগমন সংবাদ শুনেই দফতরে ডেকে পাঠান। মোসাফাহা শেষে ইউসুফ ও উসমান কুরসীতে বসে পড়ে। ইউসুফকে লক্ষ্য করে আব্দুল ওয়াহিদ বলেন, 'তুমি বাসা হয়ে এসেছ?'

'জী হ্যাঁ! যুবায়দা আমাকে নেহায়েত পেরেশানীমূলক খবর দিয়েছে। আপনি কি সত্যিই কনৌজ ছেড়ে যাবার খেয়াল করেছেন।'

'হ্যাঁ !, মুচকি হেসে বলেন আব্দুল ওয়াহিদ।

'কিন্তু কেন ? সুলতান কি আপনার কর্মকান্ডে খুশী নন?'

'খোদ আমিই সুলতানের কাছে দরখাস্ত করে বলেছি, আমাকে রুখসত করা হোক। আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। ওখানেই আমার দরকার বেশী। বাকী জীবনটা আমি তাবলীগে কাটিয়ে দিতে চাই। এ যমীন এখন খোদার দ্বীন প্রসারের জন্য কন্টকমুক্ত হয়েছে। এখানে 'আশা'র মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য দরবেশ চরিত্রের মুবাল্লিগ এসেছেন যাদের সীনা নূরে পরিপূর্ণ। এখন শুধু মনের বিজয় দরকার। এ কাজে তাদের দৃষ্টি তলোয়ারের চেয়েও ধারাল প্রমাণিত হবে। কিন্তু নগরকোটের দুর্গম অঞ্চলে এমন লোকদের দরকার যারা তাবলীগে জীবন চিল্লা লাগাতে পারে।

ঐ শহরে আমি খোদার তৌহিদ ও মানবিক সাম্যতা নিশান উড়াতে চাই যেখানে কালীমূর্তির সামনে মানুষকে বলিদান করা হয়। সেই নদীর তীরে আমি আজান দিতে চাই, যেখানে আমি 'আশা'র শেষ চিৎকার শুনেছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হাজারো মানুষের ভীড়ে ও আমার অপেক্ষা করছে।'

'কিন্তু এখানে আপনার স্থলাভিষিক্ত হবেন কে ?'

'এখানে এমন অভিজ্ঞ লোক আছে যারা এ দায়িত্বপালন করতে সক্ষম। সুলতান তাদের মধ্য থেকেই একজনকে কনৌজের গভর্ণর নিযুক্ত করেছেন। আমার যদ্দুর বিশ্বাস কনৌজের মুসলিম, নও মুসলিম জনতা তাকে স্বাগত জানাবে।

'কে সে ?'

'আগামী পরশু জনসম্মুখে সে নাম ঘোষণা করব।

'আপনি কিছু মনে না করলে তার নামটা জানতে চাইব।' বলল ইউসুফ।

বহুত আচ্ছা। কিন্তু তার আগে বলো, তুমি আমার পক্ষ হয়ে তাকে সাহায্য করবে তো ?'

'আপনি যাকে স্থলাভিষিক্ত বানাবেন তাকে সাহায্য না করার ঔদ্ধত্য কোথায় আমার। আব্দুল ওয়াহিদ মুচকি হেসে ওর চেহারায় তাকালেন। বললেন, 'কনৌজের ভাবী গভর্নর এক্ষণে আমার সামনে বসা। নাম তার ইউসুফ।'

ইউসুফ চমকে ওঠল। পেরেশান হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'না না! আমি এর যোগ্য নই।' আব্দুল ওয়াহিদ মেয্ থেকে একটি ফরমান ওঠালেন। ইউসুফকে তা পেশ করে বললেন, এই নাও সুলতানের ফরমান। তার পরামর্শে আমি এমন একজনের নামোল্লেখ করেছি, যে এই পদের যোগ্য। আমার আশা তুমি আমায় নিরাশ করবে না।

ইউসুফ বসে গেল। আব্দুল ওয়াহিদের পীড়াপীড়িতে কম্পিত হাতে ফরমান নিল। সবশেষে বললো, 'আপনি আমার কাঁধে বিশাল এক দায়িত্ব চাপালেন।'

'তোমার কাঁধ এক পাহাড়ের বোঝা বহন করতে পারে।'

॥ পাঁচ ॥

তৃতীয় দিন।

কনৌজের সর্দার প্রতিবেশী দেশের দূত কেল্লার প্রশস্ত চত্বরে জমায়েত হলেন। আব্দুল ওয়াহিদ তাদের সামনে ভাষণ দেন ঃ

'ভাই বন্ধুগণ! এই খবর জানানোর জন্য আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি যে, আমি আমার দায়িত্ব থেকে অবসর নিচ্ছি। সুলতানের কাছে দরখাস্ত করে বলেছিলাম স্বদেশে ফিরে যেতে চাই। তিনি আমার এ দরখাস্ত কবুল করেছেন। যাবার আগে আপনাদের কাছে আখেরী পয়গাম এই যে, এক্ষণে আমাদের দেশে এক নয়া যুগের সূচনা হয়েছে। উত্তর আফগান থেকে যে শান্তি দূতের আবির্ভাব ঘটেছিল সে চলে গেছে। এক্ষণে এর থেকে উপকার গ্রহণ করা আমাদের দায়িত্ব। যে মহান উদ্দেশ্যে সুলতান মাহমুদকে নির্বাচিত করেছিলেন কুদরত তা পুরা হয়েছে। যে সমাজ ব্যবস্থা মানুষের মাঝে ঘৃণার দেয়াল খাড়া করে অচ্ছুৎ-অস্পৃস্যতার জন্ম দিয়েছিল, ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে এর সৌধ চূড়া। যে সংস্কৃতি বর্ণবাদী প্রথার উন্মেষ ঘটিয়েছিল, উঁচু নীচু জাতিভেদ প্রথার হাড্ডির ওপর প্রমোদ ভবন নির্মাণ করেছিল, এমন এক সংস্কৃতি তাকে মাত করেছে যার উদ্দেশ্য রং ও বংশ সীমাবদ্ধতাকে চুরমার করে দেয়া। মাহমুদ গজনবী এদেশে সুহাসিনী ভোরের পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন। তার আগমন ঐ কোটি মানবতার আহবানের জবাব ছিল, যারা জুলুম ও নিপীড়নের কবলে পড়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছিল। আজ ঐ

মূর্তিগুলোর তেলেসমাতি ধুলিস্মাৎ হয়েছে যেগুলো মানুষকে বাঘ ও বাঘকে ভেড়ায় পরিণত করেছিল। এই সুশীল সংস্কৃতিকে এক্ষণে আর কেউ রদ করতে পারবে না। এই সংস্কৃতিতে, মানবতার পরিচয় তার কর্মে, রক্তে কিংবা বর্ণে নয়।

প্রিয় দেশবাসী! আমি তোমাদেরকে ঐসব লোক থেকে হুঁশিয়ারী দিচ্ছি, যারা পরের খেয়ে বাঁচে, তারাই এই সংস্কৃতির বিরোধিতায় তোমাদের ক্ষেপিয়ে তুলবে। ওরা কস্মিনকালেও দরিদ্র ও অসহায় মানুষদেরকে তাদের যাঁতাকল থেকে মুক্তি দিবে না। ওরা তোমাদেরকে ঐসব মূর্তির সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য করবে যারা ওদেরকে উঁচু জাতের সার্টিফিকেট দিয়েছে। মনে রেখ! মানুষের হাতে তৈরী মূর্তি মানুষেরাই ভাংতে থাকবে। ওরা কোন নয়া সোমনাথ বানালে কুদরত নয়া কোন মাহমুদকে প্রেরণ করবেন।

কনৌজের সর্দার ও প্রতিবেশী রাজারা আমাদের সাথে এই মর্মে অঙ্গীকার করেছেন যে, তারা ইসলাম প্রসারে কোন প্রকার বাধা দিবেন না। এই আশায় আমি চলে যাচ্ছি যে, আপনারা আপনাদের কৃত অঙ্গীকারের ওপর মজবুত থাকবেন। নইলে মনে রাখবেন, উত্তর সীমান্ত থেকে আবার এক তুফান উছলে ওঠবে যা পূর্বের চেয়ে আরো বিভীষিকাময় হবে। নও মুসলিম ভাইদের বলব, আপনাদের আশা যতটা উচ্চ তেমনি জিম্মাদারীও অনেক। এদেশে ইসলাম প্রসারের জন্য জান কবুল মেহনত প্রয়োজন। তোমাদের শহীদান বুকের তাজা খুনে এদেশের যমীন লাল করেছেন। এক্ষণে নতুন চারা গাছ লাগানোর জিম্মাদার তোমরাই।

উপসংহারে বলবো। কনৌজের হাকেম থাকাকালীন যথাসম্ভব আমি ইসলামী মৌলিকতায় বিশ্বাস রেখেই শাসন করেছি। জেনে শুনে কোন মুসলিমের সাথে অশোভন আচরন কিংবা কোন অমুসলিমের প্রতি কঠোরতা করিনি। এতদসত্ত্বেও আমার কথা কিংবা কাজে কেউ কোন প্রকার কষ্ট পেয়ে থাকলে সত্য হৃদয়ে ক্ষমা করবেন। আমি এখন আমার আখেরী জিম্মা পালন করতে চাই। এক্ষণে আপনারা আমার স্থলাভিষিক্তের নাম শোনার আশায় বে-কারার হয়ে আছেন। সুলতানে মোয়াজ্জম আমার দরখাস্ত মোতাবেক ইউসুফকে আপনাদের গভর্নর নিযুক্ত করেছেন। রণবীর নামেই সকলের কাছে তিনি পরিচিত। এ কাজে আমি তাকেই যথোপযুক্ত মনে করেছি। আমার আন্তরিক দোয়া থাকবে, তিনি যেন নিজেকে সকলের বন্ধু ও একনিষ্ঠ সেবক প্রমাণ করতে পারেন যাতে কিয়ামতের দিন খোদার দরবারে আমাকে লজ্জিত হতে না হয়। এক্ষণে আপনাদের নয়া গভর্নরের কাছে দরখাস্ত করব তিনি যেন তার আসন অলংকৃত করেন।'

ইউসুফ উঠে মসনদের নিকটে এগিয়ে গেল। তাকাল জনতার দিকে। তারপর দ্বিধাগ্রস্থ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'ভায়েরা আমার! আমি শুধু এতটুকু বলব যে, আমার কাঁধে বিশাল এক জিম্মাদারী চাপানো হয়েছে। ওয়াদা করছি সঠিকভাবে আমার দায়িত্ব পালন করব। এদেশে ন্যায় ও ইনসাফের ঝাণ্ডাকে ভূ-লুণ্ঠিত হতে দেবনা। যারা ইনসানিয়তের পতাকা সবার ওপরে তুলে ধরতে চায়, আমার থেকে তাদের প্রতি কোন হুমকি নেই। আর যারা ইনসানিয়তের দুশমন তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সবার আগে দেখবেন। ঐসব লোকেরই সাহায্য দরকার আমার, যারা কনৌজে শান্তি ও নিরাপত্তা চায়। এ মুহূর্তে আমি এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারব না।'

॥ ছয় ॥

পরদিন।

শহরের বাইরে হাজারো জনতা আব্দুল ওয়াহিদকে আলবিদা জানাতে দাঁড়িয়েছিল। যে ৫০ হাজার সেপাই নগরকোট থেকে এসেছিল তারা তাঁর সাথে যাচ্ছিল। যুবায়দাও স্বামীর সাথে একটি ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। ইউসুফ ওর ঘোড়ার লাগাম ধরা।

'ভাইয়া!' যুবায়দা ভারাক্রান্ত আওয়াজে বলল, 'আমাকে ভুলে যাবেন না তো!'

ইউসুফের চোখে অশ্রু প্লাবন। ও জবাব দেয়, 'পাগলী কোথাকার! তোকে ভুলে থাকব কি করে ?'

'যাবার পূর্বে ভাবীর সাথে দেখা করে যেতে পারলাম না। ওয়াদা করুন, তিনি সহ নগরকোট আসবেন।'

'ওয়াদা করলাম, বছরে অন্ততঃ তোমার ভাবীসহ দেখা করে আসব।'

অতঃপর যুবায়দা উসমানের দিকে তাকাল, আপনি ও বোন তাহেরা যাবেন তো আমাদের ওখানে ?'

উসমান জবাব দেয়, 'বোন! অবশ্যই যাব। আমরা খুব শীঘ্র গোয়ালিয়র যাব। ওখান থেকেই তোমাদের নগরকোট হয়ে আসব।'

'আপনি গোয়ালিয়র কেন যাবেন ? ভাইয়ার কাছে থাকবেন না ?'

'না। আমিও আমাদের জন্মভূমিতে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে চাই।'

আব্দুল ওয়াহিদ মোসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন, 'এক্ষণে আমাদের অনুমতি দাও।'

ইউসুফ ও উসমান পর পর তাদের সাথে মোসাফাহা করে। আব্দুল ওয়াহিদ কাফেলা কোচ করার হুকুম দেন।

খানিকবাদে ইউসুফ ও উসমান উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে চলমান কাফেলার শেষ দৃশ্য দেখছিল। তাদের চোখে আঁসুর পর্দা। ইউসুফ আনমনে এই বাক্য দোহরাতেছিল।

'খোদা হাফেয! আমার ভাই! আমার দোস্ত! আমার মোহসেন! রাহবার আমার। খোদা হাফেজ!!'

ঐতিহাসিক উপন্যাস

চূড়ান্ত লড়াই

নসীম হিজাযী

অনুবাদ : ফজলুদ্দীন শিবলী

পৌত্তলিক সমাজের আশা-ভরসার স্থূল-স্বর্গরাজ্য সোমনাথ মন্দির; এক দুর্ভেদ্য কেল্লা, সুবিশাল এক রাজত্ব।

শতাব্দীকাল ধরে এর বেদীমূলে ঝরেছে হাজারো নিম্নজাতের খুন। হিন্দু ব্রাহ্মণদের লীলাখেলার শিকার হয়েছে রূপাবতির মতো হাজারো অবলা নারী। সোমনাথের সেই লৌহ বলয় থেকে ভারতবাসীকে মুক্তি দিতে গজনীর হিমেল উপত্যকা থেকে ছুটে এলো এক প্রলয়ংকরী তুফান।

থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল মন্দিরের পাষাণ গাত্র, টনক নড়লো ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের।

কারাজীবনের দুঃসহ যাতনা ভোগ করে বাড়ী ফিরল রণবীর। কিন্তু কোথায় তার বাড়ী? কে দখল করেছে তার স্বপ্নের ঠিকানা? তার বোন শকুন্তলার পালঙ্কে শায়িত ও কে? শকুন্তলা-না অন্য কেউ?

রূপাবতিকে সোমনাথে নিয়ে গেল পূজারীরা। কিন্তু কেন? রূপার রূপের ঝিলিক সোমনাথ মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করবে, না কি করবে কলংকিত?

স্বধর্মত্যাগী অসিৎ ওরফে আব্দুল ওয়াহিদের জন্য শকুন্তলার মন কাঁদে কেন? একজন ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়েও ও কি পেয়েছিল ওর স্বপ্নের মানুষটিকে?

রামনাথের মনে এ কিসের দহন?

পিতৃহন্তার মেয়ে নির্মলার প্রতি রণবীরের এত সহানুভূতি কেন?

গজনবীর জানবায মুসলিম সেনানীরা মুখোমুখি হল বিশাল এক পৌত্তলিক সমাজের, শুরু হল এক চূড়ান্ত লড়াই। কি হবে এই লড়াইয়ের পরিণতি? কার ভাগ্যে জুটবে বিজয়ের বরমালা?

আল-এছহাক প্রকাশনী

ISBN-984-832-001-6